ভাসানী
মুজিব
জিয়া

১৯৭২-১৯৮১

জিবলু রহমান

ভাসানী-মুজিব-জিয়া

(১৯৭২-১৯৮১)

জিবলু রহমান

শুভ প্রকাশন

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ ❑ মে ২০০৪
স্বত্ব ❑ লেখক
প্রচ্ছদ ❑ এস কে মাসুম
প্রকাশক ❑ এস কে মাসুম, শুভ প্রকাশন ৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০
অক্ষর বিন্যাস ❑ হৃদয় কম্পিউটার, ঢাকা-১১০০. মুদ্রণ ❑ আল ফয়সাল
অফসেট প্রিন্টার্স, ঢাকা-১১০০
মূল্য ❑ ৩৫০.০০ টাকা

Bhashani -Mujib -Zia (1972-1981) : By Jiblu Rahman. Published
by S K Masum. Shubho Prokashon. 34 North Brook Hall Road.
Banglabazar. Dhaka—1100. Cover design : S K Masum
Price : Taka 350.00 Only.
US $ 20

ISBN 984-8404-34-1

www.pathagar.com

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় ফুফা
শিক্ষা বিভাগের
প্রাক্তন কর্মকর্তা
শফিকুর রহমানকে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের কথা

স্বাধীনতা-উত্তরকালে আওয়ামী দুঃশাসনের বিভীষিকায় জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও তার পতন ঘটানোর ক্ষমতা কারো ছিল না। কারণ সুচতুর শাসক গোষ্ঠী ভারতীয়দের পরামর্শ মতো দেশ চালিয়েছিল, কায়েম করেছিল হিটলারী কায়দার বাকশালী শাসন ব্যবস্থা। জনগণের জান, মাল, ইজ্জত, আবাস কোন কিছুই নিরাপদ ছিল না। ১৯৭৫ এর ২৫ জানুয়ারী একদলীয় বাকশাল কায়েম করার পর প্রশাসন থেকে শুরু করে সব পর্যায়ে যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছিল তা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় ১৯৭৫-এর ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিবের বাকশালী শাসন ব্যবস্থার পতনের পর জনগণের ধিক্কার দ্বারা। স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রথম জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বক্তৃতাকালে মুজিব উল্লেখ করেছিলেন, 'এ সংবিধান হবে শহীদের রক্তে লিখিত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।' তিনি সমাজতন্ত্র কায়েমে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। মুজিবের শাসনামলে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে, তবে তা সর্বজন স্বীকৃত নয়, বরং দলীয় নেতা-কর্মীদের জন্য। মুজিবের শাসনামলে সমাজতন্ত্রের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আত্মীয়-স্বজন ও দলীয় লোকদের বড় বড় পদে বসিয়ে শত শত কোটি টাকা লুটপাট করানো হয়। বেপরোয়া লুন্ঠন, অপচয় ও পাচারে জাতীয় অর্থনীতিকে বিপর্যয়ের শেষ ধাপে নামিয়ে আনা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সমূহ লুটেপুটে খেয়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলো বেআইনীভাবে দখল করে, লাইসেন্স, পারমিট বিক্রি ও হুন্ডির হিড়িক লাগিয়ে আওয়ামী-বাকশালীরা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়। সংবাদপত্রে শিরোনাম আসে, 'প্রভাবশালীদের জন্য ব্ল্যাক মার্কেটারদের শাস্তি হয় না। খাদ্য-শস্য, রেশনের চাল, সিগারেট ও সিমেন্ট দিয়ে গ্রামাঞ্চলে ঢালাও কালোবাজারী।'

আওয়ামী-বাকশালীরা বছরের পর বছর বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যে সমাজ ব্যবস্থা ও ধ্যান ধারণার মধ্যে জীবন যাপন করেছিল, যে আদর্শ ও ঐতিহ্য রক্তের শিরায়-উপশিরায় মিশে গিয়েছিল তার নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে ইতিহাসের বই থেকে পুরনো পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী আদর্শকে চিরতরে কবর দিয়ে এপার বাংলা-ওপার বাংলা ধ্যান-ধারণা সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়। সেক্রেটারিয়েটে বিদেশী কর্তা ব্যক্তিদের প্রভু হিসেবে জেঁকে বসানো হয়। তারা আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা ঠিক-ঠাক করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য পরিকল্পনা ঢেলে সাজাতেন যাতে এদেশটাকে নিজেদের একটা পাকাপোক্ত উপনিবেশ করা যায়। আর একটি সিকিম বানানো যায়। আওয়ামী-বাকশালী নেতারা তাদের প্রভুদের এই মহানুভবতায় বত্রিশ দাঁত বের করে কৃতজ্ঞতার হাসি সর্বদাই হাসতেন। তারা প্রভুদের মনোতুষ্টির জন্য একটির পর একটি দাসখতে দস্তখত দিতে লাগলেন। বাংলাদেশের ভূখন্ড ভারতের প্রভুদের চরণে নজরানা দিলেন। তাদের হাতে তুল দিলেন পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া শত শত কোটি টাকার অস্ত্র। বাংলাদেশের পাটের ব্যবসা প্রভুদের দেশে মাড়োয়ারী-মহাজন ও জুটব্যারণদের হাতে তুলে দেয়া হলো। বাংলাদেশের পাটকলগুলোর যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে ভারতের পাটকলগুলোর শ্রীবৃদ্ধি করা হলো, সীমান্ত খুলে দেয়া হলো। এইভাবে মাত্র পৌনে চার বছরে আওয়ামী-বাকশালীদের প্রভুরা সোনার বাংলার পাঁচ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুন্ঠন করে!

স্বাধীনতার পর দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য গুদামে মজুদ ছিল। কিন্তু আওয়ামী সরকারের অবহেলা এবং অপারগতার ফলে খাদ্যগুদাম হতে সবকিছু লুণ্ঠিত হয়, ভারতে পাচার করে তা

www.pathagar.com

আবার এদেশের মানুষকেই চড়া দামে ক্রয় করতে বাধ্য করা হয়। দেশের জনগণের খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সরকারের প্রধান দায়িত্বের একটি। তা না করে আওয়ামী সরকার শোষকদের অধিকার নিশ্চিত করেছিল। সরকারের অবহেলার প্রতিবাদে ও খাদ্য সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করার জন্য মওলানা ভাসানীসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ ভূখা মিছিল পর্যন্ত আয়োজন করেছিল। আওয়ামী সরকার সে দাবীর দিকে দৃষ্টিপাত না করে পুলিশ বাহিনী দিয়ে মিছিলে হামলা চালিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল নেতৃবৃন্দ ও জনতাকে। জাতীয় নেতৃবৃন্দের কর্মসূচির সমালোচনা করে বলা হয়েছিল, 'এগুলো পাগলের কার্যকলাপ।' আওয়ামী শাসনামলে এদেশের অগণিত জনতা খাদ্যের অভাবে আত্মহত্যা করেছিল, না খেয়ে মরেছিল। ১৯৭৪-এর মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত ঘটেছিল ১৯৭২ সালে। ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম করে ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তখন জোর গলায় বলেছিলেন, 'একটি লোকও অনাহারে মরবে না।' কিন্তু দেশ তখন দ্রুতগতিতে দুর্ভিক্ষের দিকে ধাবিত হচ্ছিলো। সেই সময় সরকারের ঐচ্ছিক অবহেলার প্রতিবাদে মওলানা ভাসানী আন্দোলনমুখর হয়ে উঠেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা-সফর করে মুজিব সরকারকে ভালভাবে দেশ পরিচালনা করতে আহবান জানিয়েছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে ভাসানীর সেইসব বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। এ গ্রন্থে অনেক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিবর্গ উপকৃত হতে পারেন। মুজিবের পতনের পর খন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতা গ্রহণ করলেও তিনি বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। বিভিন্ন সামরিক অভ্যুত্থান, হত্যার মধ্য দিয়ে অবশেষে জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এগিয়ে আসতে হয়েছিল স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানকে। বর্তমান গ্রন্থে জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণের পটভূমি, রাজনৈতিক দল গঠন, নির্বাচনী প্রচারণা প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করে শুভ প্রকাশন-এর প্রধান নির্বাহী এস কে মাসুমকে আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। এ গ্রন্থে উল্লেখিত বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে পাঠকরা যদি সামান্যতম উপকৃত হন তবে আমার শ্রম স্বার্থক হবে।

জিবলু রহমান

বাড়ি নং-১৪, ফ্লাট-এ/২
সড়ক নং-৩৬
গুলশান-২, ঢাকা।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মুজিব ও ভাসানীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন / ৯
মেজর জলিলের বন্দিজীবন / ১৬
স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা ও ২৫ বছরের চুক্তি / ২০
জহির রায়হানের অন্তর্ধান নাকি হত্যাকাণ্ড? / ২৪
মওলানা ভাসানীর শিবপুর কৃষক সম্মেলন / ৩৩
সাপ্তাহিক হককথা পত্রিকার উপর নিপীড়ন / ৪০
১৯৭২ সালে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে মওলানা ভাসানী / ৫৪
জাসদ ও সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন / ৭৯
মুজিব শাসনামলে ছাত্রহত্যা / ৮৬
সংসদ নির্বাচনে ভাসানীর তৎপরতা ও সরকারি সন্ত্রাস / ৯১
মওলানা ভাসানীর অনশন / ১০৫
রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন ও সিপিবির কুমন্ত্রণা / ১১৫
রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পদত্যাগ / ১২৩
ন্যাপ নেতা যাদু মিয়ার মুক্তিলাভ / ১২৫
বিশেষ ক্ষমতা আইন বিল পাস / ১৩২
১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ জাসদের উপর নিপীড়ন / ১৩৩
জেনারেল ওসমানীর মন্ত্রিসভা ত্যাগ / ১৪১
ন্যাপের ভাঙ্গন / ১৪৩
ভাসানীর বন্দিজীবন / ১৪৬
১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ ও অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিনের বিদায় / ১৫৫
প্রেসিডেন্ট মুহম্মদউল্লাহর জরুরি অবস্থা জারি / ১৬৯
সিরাজ সিকদারের হত্যাকাণ্ড / ১৭২
বাকশাল শাসন কায়েম / ১৯১
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দলন : ১৯৭২-১৯৭৫ / ২০৪
শেখ মুজিবের পতন / ২১৮
মুজিবের পতনের পর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া / ২২৩
রাষ্ট্রপতি হিসেবে মোশতাক মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগ / ২৪০
৭ নভেম্বরের বিপ্লব / ২৪৭
মওলানা ভাসানী ফারাক্কা মিছিল / ২৬৪
প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিয়াউর রহমানের দায়িত্ব গ্রহণ / ২৮৩
জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা / ২৮৭
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নির্বাচনী তৎপরতা / ২৯০
জিয়ার মন্ত্রিপরিষদ / ৩০১

www.pathagar.com

বি.এন.পি গঠন ও সাংবাদিক সম্মেলন / ৩০২
জিয়া হত্যাকাণ্ড / ৩০৫
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারের দায়িত্বভার গ্রহণ / ৩১২
জিয়াউর রহমান সম্পর্কে বহির্বিশ্বের মূল্যায়ন / ৩১৫
পরিশিষ্ট-১
পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস / ৩১৯
পরিশিষ্ট-২
পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা সাহসী হোন, দৃঢ়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করুন, জাতীয় শত্রু খতম করুন, জাতীয় মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলুন, কর্মসূচি বাস্তবায়িত করুন / ৩৩৪
পরিশিষ্ট-৩
দেশপ্রেমিকের বেশে ছয় পাহাড়ের দালাল / ৩৩৭
পরিশিষ্ট-৪
জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে কৃষকের ওপর নির্ভর করুন; পাক সামরিক দস্যুদের শীতকালীন অভিযান এবং ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের জনগণ বিরোধী তৎপরতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করুন, গেরিলা যুদ্ধকে বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিন! / ৩৪৭
পরিশিষ্ট-৫
পূর্ব বাংলার বীর জনগণ, আমাদের সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি, পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মহান সংগ্রাম চালিয়ে যান! / ৩৫৮
পরিশিষ্ট-৬
বাংলার বীর কৃষকগণ! দেশ গঠনে প্রস্তুত হও / ৩৬৯
পরিশিষ্ট-৭
আওয়ামী লীগের কথা ও কাজ : ওয়াদা ভঙ্গের এক অতুলনীয় নজির / ৩৭৫
পরিশিষ্ট-৮
সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী / ৩৮৬
পরিশিষ্ট-৯
জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েমে সংগঠিত হোন / ৩৯৫
পরিশিষ্ট-১০
জিয়াউর রহমানের নেতৃত্ব মেনে নেব তবে........ / ৩৯৮
পরিশিষ্ট-১১
আওয়ামী নেতা রাজ্জাক-তোফায়েলের বাকবিতণ্ডা / ৪০৪

www.pathagar.com

মুজিব ও ভাসানীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

পাকিস্তানি যুগে প্রথম বিরোধীদল আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং বিরোধী রাজনীতির সূচনা করা থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম প্রকাশ্য আহ্বান জানানো পর্যন্ত সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে মওলানা ভাসানী থেকেছেন অগ্রবর্তী অবস্থানে। ১৯৭০ সালের ৩০ নভেম্বর মওলানা ভাসানী মুদ্রিত প্রচারপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং নিজের স্বাধীনতাকে ভারতের হাতে তুলে দিয়ে হলেও স্বদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে গঠিত কলিকাতাকেন্দ্রিক মুজিবনগর সরকারের সংঘাত ও অনৈক্যের অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নেয়া ছিল মওলানা ভাসানীর প্রধান অবদান।

১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি হতে ২১ মার্চ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আয়োজিত ২৮টি জনসভায় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে নবতিপর বৃদ্ধ নেতা মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ শুরু হওয়ার পর মওলানা ভাসানী রৌমারী সীমান্ত পথে ভারতে চলে যান।

ইয়াহিয়ার আইনগত কাঠামোর অধীনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ বার নদী তের চরা ঘুরে বাধার বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করে অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট করে মুজিবনগর সরকার গঠন করে। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্টরূপে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রীরূপে তাজউদ্দীন আহমদ দায়িত্ব পালন করার সময় আওয়ামী লীগের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পদে বসার প্রতিযোগিতা ও নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল প্রকট আকার ধারণ করে। দেশ স্বাধীনের পর অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সদলবলে ঢাকায় ফিরে এসে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই তিন নীতির উপর ভিত্তি করে দেশ চলবে বলে ঘোষণা করেন। তারপর আন্তর্জাতিক জনমতের চাপের মুখে নতি স্বীকার করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো অবশেষে নব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবকে ছেড়ে দিতে সম্মত হন। ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সবার অজান্তে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেবার পর তিনি কলকাতা সফর করে ১০ জানুয়ারি বাংলার বুকে পদার্পণ করেন। পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ভারতের কলকাতা প্যারেড গ্রাউন্ডের সংবর্ধনা সভায় ইন্দিরা গান্ধীর উপস্থিতিতে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে জাতীয়তাবাদ আদর্শটি সংযোজন করেন।

ভারতের সঙ্গে দেনা-পাওনা মিটিয়ে নতুন রাষ্ট্রের নীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা দেয়ার পর শেখ মুজিব স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করার পর তাকে একনজর দেখার ও প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানাবার জন্য লাখ লাখ মানুষ রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। শেখ মুজিব লাখো জনতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, 'পাকিস্তানি কারাগার থেকে

www.pathagar.com

আমি যখন মুক্ত হই, তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন-সম্ভব হলে আমি যেন দু'দেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাকে বলেছিলাম আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে।'

অগণিত জনতার মাঝে সভা মঞ্চে মুজিব দাঁড়ানোর পর আওয়ামী লীগের একজন কর্মী চিৎকার দিয়ে অন্যান্য শ্লোগানের সঙ্গে বলেন, 'দেশে এলো নতুন বাদ।' জনতা বিষয়টি বুঝতে না পারায় শ্লোগানদাতা উপস্থিত সবাইকে শিখিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমি যখন বলবো দেশে এলো নতুন বাদ আপনারা সবাই তখন বলবেন, মুজিববাদ মুজিববাদ।' এই বলে তিনি শ্লোগান ধরলে সবাই মুজিববাদের কথা শিখলো। এক ব্যক্তির নামানুসারে এই মুজিববাদ আদর্শই পরবর্তীতে বাকশালরূপে রূপান্তরিত হয়েছিল।

শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিন পরে ঢাকার পত্রিকা মওলানা ভাসানীকে নিয়ে নানা ধরনের লেখা-লেখি শুরু করে। তখন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের আগ্রহে এবং উদ্যোগেই ভারত সরকার মওলানা ভাসানীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করেন। তখন তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা বেশ ভাল ছিল না। ডিসেম্বরে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি দিল্লীর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ভারত থেকে দেশে ফেরার পূর্বে তিনি আসাম যান। সেখানে তাঁর পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার অনুমতি চেয়েছিলেন ভারত সরকারের কাছে। ভারত সরকার তাতে সম্মত হন। ২১ জানুয়ারি আসামের ফরিদগঞ্জে তিনি এক জনসভায় ভাষণ দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস তিনি তুলে ধরেন এবং পাকিস্তানি বর্বরতার ও ২৩ বছরের শোষণের একটি চিত্র দেন। মওলানা ভাসানী ১০ জানুয়ারিতে প্রদত্ত শেখ মুজিবের ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ভুট্টো শেখ মুজিবকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমি ভুট্টোকে একথাই শুধু বলতে চাই যে, বর্তমানে যে এটা শুধু অসম্ভব তাই নয়, আগামী শত শত বছরেও তা সম্ভব নয়। বর্বর পাকিস্তানিদের অত্যাচারের কথা বাংলাদেশের মানুষ কোনকালেই ভুলবে না।' বাংলাদেশের স্বাধীনতায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও তার দল এবং অন্যান্য দলের নেতাদের প্রতিও মওলানা ভাসানী শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণ এই হৃদয়বান মহিলার (ইন্দিরা গান্ধীর) কথা এবং ভারতের জনগণের সাহায্য-সহযোগিতার কথা কোনদিন ভুলবেন না। ভারতের মতো বাংলাদেশও ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশ হয়ে বিশ্বসভায় স্থান করে নেবে বলে আমি আশা করি।'

২২ জানুয়ারি মওলানা ভাসানী মেঘালয় থেকে ভারত সরকারের একটি জীপে করে বাংলাদেশের হালুয়াঘাট পৌছান। তাঁর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন চিকিৎসক ছিলেন। হালুয়াঘাটে তাঁকে ছোট-খাটো অভ্যর্থনা জানান ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক খসরুজ্জামান চৌধুরী ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও তাঁর ভক্তমণ্ডলী। সড়কপথে ক্লান্ত দেহে তিনি শেষ রাতে পৌছেন টাঙ্গাইল। রাতে সার্কিট হাউসেই তিনি রইলেন, কারণ মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সন্তোষে তাঁর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। পরদিন সকালে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা, স্থানীয় আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মী তাঁকে দেখতে সমবেত হলেন সার্কিট হাউসে।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবকে তিনি সন্তানতুল্য জ্ঞান করতেন। শেখ মুজিবও ভাসানীকে পিতার মতই শ্রদ্ধা করতেন। উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক বরাবর ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের সূচনাও হয়েছিল মওলানা সাহেবের সাহচর্যে। তাঁর উষ্ণ সহযোগিতার ফলেই কার্যত শেখ মুজিব তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শীর্ষে আরোহণ করেছেন। মওলানা সাহেব শেখ মুজিবের তীব্র সমালোচনা করতেও কোন সময় দ্বিধান্বিত হননি। স্বাধীনতার পর আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধেও মওলানা ভাসানীই প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন। সরকারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি ভারতের সম্প্রসারণবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলা ছিল মওলানা ভাসানীর অবিস্মরণীয় অবদান। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বৃদ্ধ বয়সেও মওলানা ভাসানীকে নির্যাতিত হতে হয়েছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি অনশন করেছেন এবং আওয়ামী সরকার তাঁকে গ্রেফতার ও গৃহবন্দি করেছে।

দেশের মানুষ চেয়েছিল শেখ মুজিব আসলে বছর বছর ধরে অধিকার বঞ্চিত সকল কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু দেখা গেল মুজিববাদ কায়েমের জন্য একপক্ষ মুজিবের চারপাশে তোষামুদিতে ব্যস্ত থাকলো অপরদিকে মুজিবনগর সরকারের আমল থেকে বিরাজমান কোন্দলের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে কোন্দলপন্থীরা দেশ পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ ও ঐক্যবদ্ধ না থেকে পূর্বের এবং চলমান কোন্দলকে তীব্র হতে তীব্রতর করলো। শেষ পর্যন্ত তাদের এই কোন্দল পরিসমাপ্তির জন্য শর্ত হিসেবে যোগ হলো ক্ষমতায় ভাগ দেয়ার প্রশ্ন। অক্ষম শেখ মুজিব তাদের শর্তের প্রতি সায় দিয়ে কাউকে মন্ত্রিত্ব, দলীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ, ব্যবসার সুযোগ প্রভৃতি প্রদান করেও দলের সংহতি টিকিয়ে রাখা এবং কোন্দলমুক্ত করতে পারলেন না।

জীবন থেকে শেখা রাজনীতি চর্চায় মওলানা ভাসানীর কোন কৃত্রিমতা ছিল না, ছিল না কোন শেখানো বুলি। তাই জনগণের সমস্যা এবং জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করতে তাঁর কোন অসুবিধা হত না। এ কারণে তখন তিনি যেসব সমস্যার কথা বলেছেন, বাংলাদেশে এখন তা সমস্যা হয়েই রয়েছে। আজকের দিনেও ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের রূপরেখা কেমন হওয়া উচিত তার সুস্পষ্ট বিবরণ তাঁর স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রদত্ত বক্তব্যের মধ্যে মেলে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে মওলানা ভাসানী এক ধরনের অপপ্রচারের শিকার হন। টাঙ্গাইলের আসাদনগর থেকে ২৪ মার্চ ১৯৭২ শুক্রবার সকালে ঢাকা আগমনের পর দুপুরে স্থানীয় পূর্বাণী হোটেলে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী বলেন, "দেশের শত্রু, বিশ্বাসঘাতক মার্কিনীদের দালাল সি.আই.এ-র এজেন্ট এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী, ষড়যন্ত্রকারী বলে পত্রিকাবিশেষে আমার বিরুদ্ধে কুৎসা ও মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। জীবনের শেষ মুহূর্তে এর চেয়ে মর্মান্তিক পরিহাস আর কি হতে পারে? এখন আমার এদেশ থেকে হিজরত করাই শ্রেয়।"

সি.আই.এ ও চীনের যোগসাজশে স্বাধীনতা নস্যাতের ষড়যন্ত্র করছেন বলে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে মওলানা ভাসানী তার সত্যতা চ্যালেঞ্জ করেছেন। তিনি বলেন, "রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু দেশকে ভালবাসি না এমন কথা অতীতে কেউ কখনো বলতে পারেনি। আজীবন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম করে এসেও আজ আমাকে কিনা মার্কিন দালাল হতে হলো। একথা শোনার জন্যই কি বেঁচে ছিলাম?"

সত্যতা প্রমাণের জন্য হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে জোর দাবি জানিয়ে ভাসানী বলেন, "এই অভিযোগ সত্য

www.pathagar.com

প্রমাণ হলে আমাকে এই ৯০ বছর বয়সেই ফাঁসি দেয়া হোক। আমার কোন দুঃখ থাকবে না কিন্তু তদন্ত কমিশন গঠন করা না হলে আমি এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বর্তমান সরকারকে উৎখাত করবো।"

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে কোনো সরকার উৎখাতের অর্থ স্বাধীনতা বিপন্ন করা নয়। তিনি বলেন, "জনগণ স্বাধীনতা এনেছে, জনগণই তা রক্ষা করবে। দেশে অরাজকতা চলছে। লুটতরাজ, রাহাজানি, বলপূর্বক অন্যের জমি, বাড়ি দখল, অহেতুক ভীতি প্রদর্শন-হয়রানি, চোরাচালানী অবাধে চলছে।" তিনি অভিযোগ করেন, "এর সাথে কিছু গণপরিষদ সদস্য প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।"

তিনি বলেন, "গণপরিষদ সদস্য ও একটি দলের কর্মীদের পারমিট শিকারের এত হিড়িক কুখ্যাত মুসলিম লীগের সরকারের আমলেও আমি দেখিনি।" তিনি ভারত ও সোভিয়েতসহ কোন দেশের সাথে কোন প্রকার সামরিক চুক্তি না করার জন্যে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "আমরা বন্ধুরাষ্ট্র ভারতসহ সকলের সাথেই মৈত্রীচুক্তি করবো। সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্য চুক্তি করবো। কিন্তু আমরা সব রকমের সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করবো।"

সাংবাদিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী বলেন, "সমাজতন্ত্রের উত্তরণের পরই বাংলাদেশ ও ভারতের সর্বহারা জনগণের মধ্যে সত্যিকারের বন্ধুত্ব ও দীর্ঘস্থায়ী মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু কোন যুদ্ধজোট সে ভারত, রাশিয়া বা আমেরিকার সাথেই হোক না কেন আমি তার প্রতিবাদ করবো।" সাংবাদিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা জনাব বজলুস সাত্তার উপস্থিত বিপুলসংখ্যক বিদেশী সাংবাদিকদের জন্য ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

তিনি বলেন, "একদিকে আমি যখন আশা করছি বাংলাদেশের এক ইঞ্চি মাটিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পায়ের তলায় নেই ঠিক তখনই এসব মিথ্যা প্রচারে দুনিয়াবাসীর কাছে তুলে ধরা হল বিদ্রোহী ষড়যন্ত্রকারীদের শক্তি কম নয়। কারণ, তাদের সাথে স্বয়ং ভাসানী রয়েছেন। আমার যেমন তেমন, তাতে যে বাংলাদেশ সরকারের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা অভিযোগকারীরা বুঝতেই পারছেন না।"

তাঁর সম্পর্কে ঢাকার একটি বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত খবর প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী বলেন, "আমার সম্পর্কে অশালীন ভাষায় যে ভিত্তিহীন কথা লেখা হয়েছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক।" তিনি বলেন, "শেখ মুজিব ভালোভাবে জানেন যে, মার্কিন প্রশ্ন নিয়ে আওয়ামী লীগের সাথে আমার নীতিগত ভেদাভেদ এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির প্রতিবাদেই আমি আওয়ামী লীগ ত্যাগ করি।"

সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন শাসকগোষ্ঠীর সাথে যদি আমাকে বেহেস্তেও স্থান দেয়া হয় তবে আল্লাহর কাছে আমাকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানাবো-এই কথার পরে মওলানা ভাসানী বলেন যে, "পত্রিকাবিশেষে আমাকে দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর আগেও বহু অত্যাচারী সরকার ছিল তাদেরকেও আমি কঠোর সমালোচনা করেছি।"

আবেগজড়িত কণ্ঠে বৃদ্ধ মজলুম জননেতা বলেন, "আমার শত্রুরাও কোনদিন আমার দেশপ্রেম সম্পর্কে এতবড় প্রশ্ন তুলতে সাহস করেনি।" তিনি বলেন, "আজ থেকে ষোল বছর আগে কাগমারীতে আমিই স্বাধীনতার কথা বলেছিলাম-অন্য কেউ নয়। দক্ষিণাঞ্চলের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পর ৪ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে আবার আমি স্বাধীনতার কথা বলি। তখনো আওয়ামী লীগ ৬ দফার কথা বলেছে।"

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী সমন্বয় কমিটি সম্পর্কে বলেন, "এই কমিটির বৈঠকে আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি এক রকম চাপিয়ে দিতে হয়েছিল।" তিনি ঘোষণা করেন যে, "দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করবো।" তিনি বলেন, তিনি মনে করেন বাংলাদেশের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক চক্রের কোনো স্থান নেই। কিন্তু তাঁকে (ভাসানীকে) নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চক্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাতের চেষ্টা করেছে বলে যে অভিযোগ করেছেন তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "আওয়ামী লীগের কর্মসূচির সাথে আমার পার্টির কর্মসূচির মধ্যে কোন মতভেদ নেই। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে দেশে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে উভয় পার্টির মুখ্য উদ্দেশ্য।"

আওয়ামী লীগ সরকারের নাম ভাঙিয়ে আওয়ামী লীগের কতিপয় কর্মীসহ যেসব গণপরিষদ সদস্য, ভূয়া মুক্তিবাহিনীর সদস্য ও সকল সরকারি কর্মচারী চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছে এবং স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিকে যারা প্রশ্রয় দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুরকে সজাগ থাকার জন্য মওলানা ভাসানী আবেদন জানান। তিনি বলেন, 'এই শ্রেণীর লোকদের দমন করা না হলে বাংলার মেহনতি কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, কামার, কুমার, ছাত্র-জনতার অর্থনৈতিক মুক্তি কখনোই আসবে না।"

মওলানা ভাসানী বলেন, "শেখ মুজিব আমার ছেলের মতো। মুজিবের আরো উন্নতি হোক, আমি দোয়া করি। আমার বিরুদ্ধে এমন ভিত্তিহীন জঘন্য প্রচারে সে উস্কানি দিতে পারে না। কারণ এ কাজে কারা উস্কানি যুগিয়েছে আমি তাদের জানি। একদিন চরম দুর্দিনে তাদের আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম। আজ মস্কোপন্থী নামে পরিচিত কমিউনিস্টরাই এসব ইন্ধন যোগাচ্ছে।"

তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্য মোজাফফর গ্রুপ ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টিকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, "শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সম্পর্কে ভালভাবেই জানেন যে, তিনি (ভাসানী) কেমন।" তিনি বলেন, "এর জন্য দায়ী মস্কোপন্থীরা।" তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে মওলানা বলেন, "মওলানা ভাসানী এখনো মরেনি। সাবধান, আমি মাঠে নামলে সব ভেসে যাবে।" মওলানা ভাসানী বলেন, তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা হককথাতে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সার্বিকভাবে তুলে ধরায়ই তাঁর বিরুদ্ধে একটি অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মওলানা বলেন, "আমি কখনো ধ্বংসাত্মক সমালোচনা করি না-সব সময়ই সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করি।"

সাংবাদিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী বলেন, "সরকার আওয়ামী লীগের একদলীয় হলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা একা আওয়ামী লীগ আনেনি। দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ, কামার, কুমার, জেলে, মাঝি, তাঁতি, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, জনগণ ও রাজনৈতিক কর্মীর ঐতিহাসিক ত্যাগ স্বীকার ও রক্তদানের মধ্যদিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে।" তিনি বলেন, "স্বাধীনতা সংগ্রাম গত বছর শুরু হয়নি। ভারতবর্ষ ভাগাভাগি হওয়ার পর ১৯৪৮ সাল থেকেই স্বাধীনতার লড়াই শুরু।" তিনি বলেন, "মুসলিম লীগ সরকারের অত্যাচার ও দমননীতির বিরুদ্ধে তিনি ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। এই আওয়ামী লীগের জন্য আমি কিনা করেছি। অথচ আজ সেই আওয়ামী লীগের শাসনামলে আমার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন জঘন্য অপবাদ দেয়া হল। আমাকে এখন ভয় দেখান হয়। কিন্তু কারো ভয়ে আমি ভীত নই। এক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছাড়া আমি কাউকে ভয় করি না।"

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ গঠনের সাড়ে তিন বছর পর শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁর দলে যোগদান করেন। এরও পরে আওয়ামী লীগের তদানীন্তন সম্পাদক শামসুল হকের মস্তিষ্ক বিকৃতির পর মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগের সম্পাদক করা হয়। তিনি বলেন, তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি থাকাকালে আওয়ামী লীগের উপর মুসলিম লীগ সরকারের অকথ্য নির্যাতন চলে। কিন্তু তাঁকে দমানো যায়নি। সাংবাদিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী দেশ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, "আমার ৯০ বছর বয়সে এতো চোরাকারবার কখনো দেখিনি। বিপুল পরিমাণ ধান-চাউল, হাঁস-মুরগী, ডিম, তরিতরকারি সব সীমান্তের ওপারে অবাধে চলে যাচ্ছে। যার ফলে এখন চালের মণ হয়েছে ৯০ টাকা।" তিনি বলেন, "দেশে সামরিক প্রশাসন দুর্বল। পুলিশ বাহিনী নেই। তথাকথিত ভূয়া মুক্তিবাহিনী, যারা দেশের জন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করেনি, তারা সর্বত্র অত্যাচার চালাচ্ছে। সকল প্রকার দায়িত্বহীন কাজ করে যারা রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে তাদের রক্তের অবমাননা করেছে। তারা তাদের দলীয় সরকারের ক্ষমতার অপ-ব্যবহার করছে। তিনি কিছু আওয়ামী লীগারদের বিরুদ্ধে লাইসেন্স, পারমিট, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, শিল্প কারখানা দখলের তদবিরের সমালোচনা করে বলেন যে, "যদি এই অশুভ তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ না করেন তবে পূর্বতন সরকারসমূহের মতো তাদেরকে ভরাডুবির সম্মুখীন হতে হবে।" তিনি একথাও বলেন যে, "স্বাধীনতা বিরোধীদের সম্পত্তি নিয়ে নেওয়ার অধিকার কেবলমাত্র সরকারেরই আছে, কোন ব্যক্তিবিশেষের নেই।" তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে এইসব দুর্নীতি দমনের দাবি জানান। তিনি বলেন, "দেশের জনগণ একাজে সরকারকে সাহায্য করবেন।" সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন, "সমাজতন্ত্র একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারজন্য কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। দেশে খাঁটি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে দেশের মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন আবশ্যক।" তিনি বলেন, "কেবলমাত্র শ্লোগান দিয়ে, লাখো লাখো মানুষের সভা করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের বাস্তব প্রচেষ্টা না থাকলে জনগণের উন্নতি হবে না।"

তিনি বলেন, "আবার পুঁজিপতিদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে জাতীয়করণ করলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না। তজ্জন্য দরকার-ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করে দেশের যাবতীয় সম্পদের সমবণ্টন।" মওলানা ভাসানী বলেন, "সত্য কথা বলায় তাঁকে মুক্তিবাহিনীর ভয় দেখানো হচ্ছে।" তিনি বলেন, "মুক্তিবাহিনীর ভয় দেখিয়ে ভাসানীকে ঠাণ্ডা করা যাবে না। নির্যাতিত মানুষের জন্য মরবার অধিকার একশ'বার আমার আছে। আমি প্রস্তুত, তবু কোনদিন কারো কাছে ক্ষমা চাইব না।' আইনের শাসন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সব অবাঙালি রাজাকার নয়। বিনাবিচারে যেন কাউকে আটক রাখা না হয়, হয়রানি করা না হয়, অত্যাচার করা না হয়।" তিনি বলেন, "সরকারকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বাংলাদেশ সরকার দুনিয়াতে অসভ্য বলে পরিচিত না হয়।"

উল্লেখিত পত্রিকার রিপোর্টে মওলানা ভাসানী ষড়যন্ত্রের সাথে লন্ডনের বারবারা হকের যে উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন, "বারবারা হক ভারত সরকারের অতিথি হিসেবেই দিল্লী আসেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময় ভারতীয় পররাষ্ট্র সেক্রেটারী টি এন কাউলসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বারবারা হকের সব ব্যয় ভারত সরকারই বহন করেন।"

তিনি বলেন, সরকার তাঁকে আটক রেখেছে কি-না সেটা দেখার জন্যই বারবারাকে দিল্লী আনানো হয়েছে। লন্ডনে সফর সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন, "লন্ডনে যাবার

www.pathagar.com

ছাড়পত্রের জন্য তিনি কোন দরখাস্তই করেননি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবই আমাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি এখন সুস্থ আছি। তবুও মুজিবের নির্দেশে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড প্রতিমাসে আমাকে পরীক্ষা করছেন। প্রয়োজন হলে মুজিবই আমাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাবে।" পরিশেষে মওলানা ভাসানী বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীচুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে ভারতে অবস্থানকালে তাঁর প্রতি সৌজন্যতা প্রকাশ করায় তিনি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, "উভয় দেশের পরস্পরের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অন্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং উভয় দেশে প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রকৃত মৈত্রী অক্ষুণ্ন থাকবে।" বাংলাদেশে কলকারখানা জাতীয়করণের জন্যে তিনি আহ্বান জানান। কিন্তু কলকারখানা যাতে কোন ব্যক্তির নামে লিখে দেয়া না হয় সে দিকে সতর্ক থাকার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। *(সূত্রঃ গণবাণী-এপ্রিল–১৯৭২, সম্পাদক আজাদ সুলতান। সহকারী সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর)*

আজাদ সুলতান সম্পাদিত সাময়িকী গণবাণী-২ (মে-জুন-জুলাই–১৯৭২) তে প্রদত্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে মস্কোপন্থী ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির অদ্ভুত ধরনের কার্যকলাপের সমালোচনা করে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মওলানা ভাসানী বলেন যে, "বাংলাদেশের মস্কোওয়ালারা সুবিধাবাদ কায়েমী স্বার্থকে নির্লজ্জের মত প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। ওরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে, মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে কুৎসিত ষড়যন্ত্র করছে।" মওলানা ভাসানী বলেন যে, "মহামানব লেনিনের কমিউনিস্ট পার্টি তথা খাঁটি কমিউনিস্টদের একটা মহান আদর্শ থাকে, আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য তারা অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেন। মানুষের কল্যাণের স্বপক্ষে তারা রক্তাক্ত সংগ্রামকে বরণ করে জীবন-মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েন, দেশে দেশে মুক্তি সংগ্রামে সহায়তার ব্যাপারে তাঁরা সর্বস্ব পণ করেন, পৃথিবীর যে কোন স্থানে ফ্যাসিস্টটের চক্রান্তকে প্রতিরোধ করেন। কিন্তু তথাকথিত কমিউনিস্ট নামাবলী গায়ে লাগিয়ে বাংলাদেশের মস্কোওয়ালারা আজ কি করেছেন? মণি সিং-এর কমিউনিস্ট পার্টি কি লেনিনের আদর্শের তোয়াক্কা করে? তা যদি করতো তবে, এরা চরম সুবিধাবাদের রাস্তা বেছে নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়ে আওয়ামী লীগের লেজুড় হয়ে ঘুরে বেড়ায় কেন? লেনিনের কমিউনিস্ট পার্টি নির্যাতিত, শোষিত-বঞ্চিত সর্বহারাদের পার্টি-কিন্তু বিলাস ব্যসনের পূজারী মস্কোওয়ালারা কি তাই?" ভাসানী বলেন, "মস্কোওয়ালারা আমার বিরুদ্ধে আজকাল নোংরা অপপ্রচার করে বেড়াচ্ছে। বাংলাদেশে-ভারতের সর্বত্র আজকাল ওদের আক্রমণের লক্ষ্য আমি। আমারই দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতীয় মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট (তথাকথিত) পার্টির নেতা ভুপেশ গুপ্ত, রাজেশ্বর রাও এবং ভবানী সেন আমারই বিরুদ্ধে নির্লজ্জ কুৎসা করে গেছেন। এইসব ভারতীয় মস্কোওয়ালাদের সামান্য ভদ্রতা জ্ঞানও নেই, আন্তর্জাতিক রীতিনীতির তোয়াক্কাও ওরা করে না। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, এত স্পর্ধা তাদের আসে কোত্থেকে?" ভাসানী বলেন যে, "ভারতীয় মস্কোওয়ালারা ভারতের শাসকশ্রেণীর দালালি করছে, বাংলাদেশে এসেও সেই একই দালালি করে গেল।" মওলানা ভাসানী বলেন যে, "মস্কোওয়ালারা যেসব কুৎসিত পন্থায় জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে বেড়াচ্ছে এবং সরকারের অন্যায় কাজের স্বপক্ষে দালালি করে জনগণের স্বার্থকে নস্যাৎ করছে তা খুবই দুঃখজনক।"

-০-

www.pathagar.com

মেজর জলিলের বন্দিজীবন

মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টর কমান্ডার স্বদেশপ্রেমী রাজনীতিবিদ, লেখক, মেজর এম.এ. জলিল স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম পর্ব থেকেই লিপ্ত হন অসম সমরে, নবম সেক্টর পরিচালক হিসেবে। মে মাসের মাঝামাঝি ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত ভারতীয় এলাকার হাসনাবাদে তিনি প্রথম ক্যাম্প স্থাপন করেন। জুলাই মাসের শেষ দিকে তিনি মোট ১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন। প্রশিক্ষণ দান করেন অসংখ্য তরুণকে। জ্বালিয়ে তোলেন সবার বুকে স্বাধীনতার জন্য চিরন্তন আগুন। প্রথমে স্বাধীনতা যুদ্ধ তেমন সংহত হতে পারেনি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে যার মতো শত্রুর মোকাবিলা করেছে। ক্রমে ক্রমে, বিশেষ করে মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাধীনতা যুদ্ধে এলো গতি। সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চল সহযোগে গঠিত হয় নবম সেক্টর। নবম সেক্টরের নেতৃত্বে থেকে মেজর জলিল দায়িত্ব পালন করেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। ক্যাম্প নির্মাণ, রেশনিং-এর ব্যবস্থা, অস্ত্র সরবরাহ, রণক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন সব বিষয় তাঁকে দেখতে হয়েছে। দেখেছেন তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে। তাঁর সহযোদ্ধারা তাই তাঁর প্রশংসা করার সময় এসব কথা বলতে বলতে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, আবেগ ভরে। *(সূত্রঃ মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিল, এমাজউদ্দীন আহমদ, দৈনিক দিনকাল, ১৯ নভেম্বর-১৯৯৮)*

মেজর জলিলের স্বাধীনচেতা দুঃসাহসিক মনোভাব অনেক সময় ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের মনঃপুত হতো না। প্রথম থেকেই এই ধরনের সংঘাত সুস্পষ্ট হয়েছে। তাঁর নিজের কথায়, "নভেম্বরে ভশারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং শিবিরগুলোর দায়িত্ব সরাসরি নিতে চেষ্টা করে। আমার সেক্টরে ততটা সুবিধা করতে না পারলেও কর্তৃপক্ষ ভারতীয় অফিসার নিয়োগ করেছিল। ট্রেনিং শিবিরের অস্ত্রগুলোও প্রত্যাহার করে নেয়ার নির্দেশ প্রদান করে। তখনই শুরু হয় বাক-বিতণ্ডা এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করে। আমি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করেই অধিকাংশ অস্ত্র-বারুদ ক্যাপ্টেন জিয়া উদ্দিন, শাহজাহান ওমর, নৌ-কমান্ডার বেগের হাতে তুলে দেই এবং তাদেরকে ভারতীয় ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ করে দেই।"

জলিল শুধু যুদ্ধ করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। যুদ্ধের পর বন্ধুর বেশে আগত ভারত যখন বাংলাদেশের সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য উন্মত্ত হয়ে পড়ল, সেদিন এই অকুতোভয় দেশপ্রেমিক রুখে দাঁড়ালেন। জলিল বিশ্বাস করতেন, বাংলাদেশের মুক্তি ছিনিয়ে এনেছে মূলত বাংলাদেশেরই মানুষ, ভারত যা করেছে, তা ছিল সহায়তা মাত্র। আর ভারত তাও করেছিল ৮৭% মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের জনগণের জন্য দরদ উথলে উঠার কারণে নয়; বরং জন্মশত্রু পাকিস্তানকে খতম করার উদ্দেশ্যে। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের মানুষের প্রতি সামান্যতম দরদ থাকলেও, ওরা কি ওই অবস্থায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত গরিব বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুটে নিতে পারতো? এতটুকু সমতা থাকলে তারা কি পারতো সদ্যজাত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে অংকুরেই ধূলিস্যাৎ করে দিতে?

মেজর জলিল বিশ্বাস করতেন বাংলাদেশের সম্পদে বাংলাদেশের জনগণেরই একমাত্র অধিকার। অতএব, তিনি বিন্দুমাত্রও কালক্ষেপণ না করে, সেই দৃঢ়তা নিয়ে

www.pathagar.com

ভারতীয় লুটপাটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, যে দৃঢ়তা নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা চিরস্মরণীয়। এ জাতি তা স্মরণ করবে। কিন্তু যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় বাহিনীর কোনো কোনো সদস্যের আচার-আচরণ, বিশেষ করে তাদের লুটপাট গণমনে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষ প্রথমে এসব দেখেও দেখলেন না। রাজনৈতিক নেতৃবর্গের কৃতজ্ঞতার আড়ালে সব কিছু ঢাকা পড়লো যেন। প্রতিবাদ এলো খোদ মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে, মেজর (অবঃ) জলিলের কাছ থেকে। তিনি প্রতিবাদ করলেন, বিতর্ক করলেন। কিন্তু পারলেন না চারদিকে সামাল দিতে। স্বাধীনতার যোদ্ধা স্বাধীনতাই চান না, চান স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে। ফলে তাঁকে রাজবন্দি হতে হয় ১৯৭১ সালের ২৮ ডিসেম্বর সকাল ১১টায়। তাঁর নিজের কথায়, 'যশোর সেনা ছাউনির অফিসার কোয়ার্টারের একটি নির্জন বাড়িতে আমাকে সকাল এগারটায় বন্দি করা হয়। বাড়ি না যেন হানাবাড়ি। ঘুটঘুটে অন্ধকার। আশপাশে বেশ কিছু নরকঙ্কাল পড়ে আছে। ঘরের রুমে রক্তের দাগ। কোনো ধর্ষিতা বোনের এলোমেলো ছেঁড়া চুল।'

এভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনিই প্রথম রাজবন্দি। তাঁর নিজের কথায়, 'আমারই সাধের স্বাধীন বাংলায় আমিই হলাম প্রথম রাজবন্দি।'

এসব বিষয় স্বাধীনতা অর্জনের পরে তুলেছিল তুমুল ঝড়। মেজর জলিল গ্রেফতারের পর কোথায় আছেন তা দেশবাসী ও তার পরিবার-পরিজন জানতে পারেননি। আওয়ামী লীগ সরকারের নীরবতায় জনমনে সন্দিহান সৃষ্টি হলে পত্র-পত্রিকা রহস্য উদঘাটনে এগিয়ে আসে। সেই সময় মওলানা ভাসানীর সাপ্তাহিক হককথা 'মেজর জলিল সমাচার শ্বেতপত্র চাই' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে লিখে, 'চুপ চুপ করে বাংলাদেশ সরকার মেজর এম.এ. জলিলের অন্তরীণ সম্পর্কিত নানা প্রশ্নকে চেপে যাচ্ছেন। কিন্তু কি করে সম্ভব একজন দুর্বার স্বাধীনতা সংগ্রামীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলাকে ঢেকে রাখা? স্বাধীনতার ১১ দিন পর গত ২৮ ডিসেম্বর যশোর হতে মেজর জলিলের অন্তর্ধানের পর থেকেই সারা বাংলাদেশে নানা কথার কানাঘুষা চলতে থাকে। মেজর জলিল কোথায় অন্তরীণ হয়ে থাকলে, কেনইবা ইত্যাদি প্রশ্ন জনমনে জেগে উঠতে থাকে। বিশেষ করে বরিশাল, খুলনা ও যশোরে মেজর জলিলের একনিষ্ঠ ভক্তরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বরিশালে তাঁর গ্রেফতারের প্রতিবাদে রীতিমত ধর্মঘটও পালিত হয়। এমনকি রাজধানী ঢাকার দেয়ালে মেজর জলিলের গ্রেফতার কিংবা অন্তরীণকে চ্যালেঞ্জ করে নানা প্রশ্নও উত্থাপিত হয়। এই স্বাধীনচেতা মেজরের মা মোসাম্মৎ রাবেয়া খাতুন বরিশালের উজিরপুর থেকে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট একখানা স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর তরফ থেকে কোন প্রকার জবাব বা বিধান না পেয়ে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী সমীপে এক দুঃখিনী মায়ের ফরিয়াদ-এই শিরোনামে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী মুদ্রিত একটি খোলাচিঠি বিলি করেন। তাতে তিনি লিখেছেন, একদিকে তার (মেজর জলিল) বীরত্বের অমর কাহিনী আমার বুকে যেমন আশার সঞ্চার করেছে অন্যদিকে হানাদার বাহিনীর অকথ্য জিজ্ঞাসাবাদ এমনকি জলিলের মা হওয়ার অপরাধে আমার ও আমার একমাত্র ভাইয়ের উপর শারীরিক নির্যাতন তথা খান সেনাদের ভারি বুটের কাল দাগ আমাদের ততটা দুঃখ ও বেদনা দিতে পারেনি, যতটা দুঃখ আর প্রবঞ্চনা পাচ্ছি দিনের পর দিন বৈধব্য জীবনে আমার আদরের দুলালকে হারিয়ে। হতভাগিনী মা আরও লিখেছেন, ২৫ মার্চ জল্লাদ ইয়াহিয়া-টিক্কা চক্রের রক্ত চক্ষুর তথাকথিত সামরিক শাসন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঐতিহ্যবাহী বাকেরগঞ্জ জেলা সদরে বাংলাদেশ সরকারের গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বেসামরিক সরকার পরিচালনার দায়িত্ব

www.pathagar.com

গ্রহণ করে এবং হাজার হাজার পুলিশ, সামরিক বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের আপনার (শেখ মুজিব) স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকে উদ্বুদ্ধ করে অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রচণ্ড প্রতিরোধ দুর্গ গড়ে তোলে। ২২ জুলাই জল্লাদ বাহিনীর বর্বর সেনারা স্থল, জল ও অন্তরীক্ষে হামলা চালিয়ে বরিশাল সদর থেকে জলিলের বাহিনীকে হটিয়ে দিতে সমর্থ হয়.....ভারত সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা ও সহানুভূতি পেয়ে মেজর জলিল প্রথমে পশ্চিম বাংলার টারকী ও হাসনাবাদে দফতরসমূহ স্থাপন করে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক সাজে সজ্জিত করে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে বর্বর পাক সেনাদের প্রতিরোধ করার জন্য এক বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করে....শুনেছি ৯ নম্বর সেক্টরের দুর্ভেদ্য প্রহরীরা তাদের সীমান্ত এলাকার একচুল পরিমাণ পবিত্র মাটিতে হানাদার অনুপ্রবেশ করতে দেয়নি। আরো শুনেছি বহু বীরত্বের কাহিনী; জলিল মিত্র বাহিনী সমবিভ্যাহারে নিজ হাতে ট্যাঙ্ক-বাহিনী পরিচালনা করে নিয়াজীর আত্মসমর্পণের বহু আগেই খান সেনাদের সুরক্ষিত যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতন ঘটায় এবং সপ্তাহধিককাল সশস্ত্র যুদ্ধের পর দক্ষিণ বাংলার সদর দফতর দখল করে।'

মেজর জলিলের মার শেষোক্ত বক্তব্যেই গোটা রহস্যটির রেফারেন্স নিহিত। স্বাধীনচেতা এই মেজরের অপ্রত্যাশিত বীরত্ব ও সাফল্যই তাঁকে ভারতীয় বাহিনীর কোপদৃষ্টিতে ফেলে। তখন থেকেই মেজরকে কোন ছুতায় আটক করবার পাঁয়তারা করা হচ্ছিল। স্নায়ু সংঘর্ষটি চরমে পৌঁছল যখন মেজর জলিল ভারতীয় বাহিনীর জিনিসপত্র সংগ্রহ অভিযানে প্রতিবাদ করে বসলেন। একথা সর্বজন বিদিত যে, গোটা বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনী বিশেষ করে ঘড়ি, ট্রানজিস্টার, রেডিও, টেপরেকর্ডার, ফ্রিজ, ক্যামেরা ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে। রাজধানী ঢাকা দখল করার পর কমপক্ষে সপ্তাহ দুই দিবালোকে তারা অনেক কামের মধ্যে পছন্দসই দ্রব্যাদি যা ভারতের খোলাবাজারে সস্তায় কিনতে পাওয়া যায় না, সংগ্রহ করায় অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে দাবি করা হয়েছে যে, পরম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মেজর জলিল ভারতীয় বাহিনীর এহেন লোভাতুর অভিযানে বাধা সৃষ্টি করায় তাঁকে অন্যায় অভিযোগে গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় বহুল আলোচিত হবার উপক্রম হলে প্রায় আড়াই মাস চুপচাপ থাকার পর সরকার মেজর জলিলের গ্রেফতারের কথা স্বীকার করে তাঁর বিচার হবে বলে ঘোষণা করেন। মেজর জলিল বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর কিংবা আইন-শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন বলে প্রমাণিত হলে তাকে সমুচিত শাস্তি দেয়া হোক-যে কোন সচেতন নাগরিক তা দাবি করবেন। কিন্তু এর আগে তিনি নিশ্চয়ই ভেবে দেখবেন, দুঃসাহসী ত্যাগী এই স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্যি সত্যিই অপরাধ বলতে কোথায়, কেন এবং কতটুকু করেছেন। তাঁর কাজে এমনকি গলদ হয়ে গেল যে, স্বাধীনতার জন্য নিরলস সংগ্রাম করেও আজ তিনি তার স্বাদ ভোগ করতে পারছেন না; বরং অনিশ্চিত জীবনের পথে ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হচ্ছেন। স্বয়ং মেজর জলিল এর জবাব জানেন কিনা জানি না। কিন্তু ভারতীয় সম্মোহনীমুক্ত বাঙালি মাত্রই সঠিক জবাব খুঁজে বেড়াবেন। সকল প্রকার প্রচার বন্ধ হয়ে যাবে, সব সন্দেহের নিরসন ঘটবে, যাবতীয় অপবাদ দূর হয়ে যাবে যদি বাংলাদেশ সরকার গোটা ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণ করে একটি শ্বেতপত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। কেননা, শত হলেও একজন সম্মানিতা মা প্রধানমন্ত্রী সমীপে ফরিয়াদ জানিয়েছেন, ...আমার জলিলকে গত ২৮ ডিসেম্বর (১৯৭১) হতে কে বা কাহারা ঢাকার পথে যশোর থেকে অন্যায়ভাবে অন্তরীণ করা সংক্রান্ত বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষাপূর্বক সমস্ত সংক্রান্তের অবসান ঘটিয়ে আমার নির্দোষ সন্তানকে মুক্ত বাংলার মুক্ত আলোকে ফিরিয়ে দিন।' *(সূত্রঃ সাপ্তাহিক হককথা, ১৬ এপ্রিল–১৯৭২)*

www.pathagar.com

সকল সন্দেহের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে অবশেষে আওয়ামী সরকার মেজর জলিলের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার কথা ঘোষণা করেন। জলিলের বিচারের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন সেনাবাহিনীর এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল কর্নেল আবু তাহের। মূলত কর্নেল তাহেরের বাসভবনের সন্নিকটে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল মেজর জলিলকে। এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কর্নেল তাহের অনুজ ড. আনোয়ার হোসেন সাপ্তাহিক সময়ের ২য় বর্ষ, ২৩ সংখ্যার একটি লেখায় উল্লেখ করেছেন, '....তাহের ভাইয়ের বাসার উল্টো দিকে সিগন্যালস মেসে রাখা হয়েছিল জলিল ভাইকে। প্রায়ই যেতাম সেখানে। জলিলের অনেক সহযোগী, অনুরাগী আসতেন। তিনি ছিলেন একজন আবেগপ্রবণ মানুষ, দুর্ধর্ষ বক্তা। মানুষকে আকৃষ্ট করার চমৎকার ব্যক্তিত্ব ছিল তার। ভারতীয় বাহিনীর অন্যায় আচরণের বিরোধিতা করে একজন সেক্টর কমান্ডারের গ্রেফতারবরণ সে সময় সেনাবাহিনী ও জনমনে বিশেষ আলোড়ন তোলে। দ্রুতই বিখ্যাত হয়ে ওঠেন জলিল ....।'

মাত্র ছয় মাসের মাথায় মুক্তিযুদ্ধের দুই বীরযোদ্ধা পরস্পরকে অভিনব অবস্থায় দেখতে পাওয়া সে সময় সর্বমহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আওয়ামী সরকার মেজর জলিলের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ভঙ্গসহ বিস্তর অভিযোগ আনয়ন করেছিলেন। সরকার যে সকল অভিযোগ ট্রাইব্যুনালের সামনে পেশ করেছিলেন তা শুধু হাস্যকরই ছিল না; বরং প্রমাণের ক্ষেত্রে সরকারি প্রক্রিয়া ছিল সাজানো এক নাটকের মতো। মেজর জলিলের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে যাকে সরকারের পক্ষ থেকে ট্রাইব্যুনালের সামনে উপস্থিত করা হয় তিনি ছিলেন স্বাধীনতার বিপক্ষের একজন ব্যক্তি ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন সুপরিচিত সহযোগী এবং খুলনায় কর্মরত সরকারি আমলা। রাজাকার এত তাড়াতাড়ি মুক্তিযোদ্ধাদের বিপরীতে স্বীয় মর্যাদা পাবে এটা তাহের বা জলিলের কাছে ছিল এক মর্মপীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা। তাহের সাক্ষীর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকার কথা জেনে তাকে ট্রাইব্যুনাল কক্ষ থেকে বের করে দেন। এভাবে কিছুদিন বিচারকার্য চলার পর এক সময়ে মেজর জলিল অভিযোগ থেকে রেহাই লাভ করেন। বিচারক হিসেবে তাহের রায়ে মন্তব্য করেন, 'ট্রাইব্যুনাল মেজর জলিলের বিরুদ্ধে প্রকৃত কোন সাক্ষী বা প্রমাণ না পাওয়ায় তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে মুক্তির নির্দেশ দিচ্ছে।'

মেজর জলিলের বিচার প্রসঙ্গে এক প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষায় ছিল, 'মেজর জলিলকে যেভাবেই হোক একটা সাজা দেবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ট্রাইব্যুনালকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। যাতে করে জলিল পরে সরকারপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে পারেন এবং ধারণা হচ্ছিল মুজিব তাকে ক্ষমাও করে দেবেন।'

ট্রাইব্যুনালের রায়ে এটাই প্রমাণিত হয়েছে সত্যিকার অর্থে দোষী সাব্যস্ত হবার মতো কোনো কাজ মেজর জলিল দ্বারা সমাধা হয়নি। তবে এটাও সত্য যে, বিচার প্রক্রিয়া প্রভাবিত হবার মতো নৈতিক সমর্থনেরও তার কমতি ছিল না। কারণ মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে ভারতীয় হস্তক্ষেপ এবং নানাবিধ কারণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে তখন ভারতবিরোধী মনোভাব ছিল প্রবল। 'শেখ মুজিবের' কাছে মাথানত করা সম্ভব ছিল না বিধায় মেজর জলিল সামরিক জীবন এখানেই সমাপ্ত করে রাজনীতিতে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন। উল্লেখ্য, মেজর জলিলই এদেশে প্রথম মুক্তিযোদ্ধা রাজবন্দি ও সেনাবাহিনীর অবসরদের মধ্যে প্রথম রাজনীতিতে আগত। ১৯৭২ সনের ৪ জুলাই তিনি মুক্তি লাভ করেন।

-o-

www.pathagar.com

স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা ও ২৫ বছরের চুক্তি

শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনের (১০ জানুয়ারি) রাতেই তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরের দিন ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি হিসেবে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, 'দেশের সরকার কাঠামো পরিবর্তন করা হলো। দেশে রাষ্ট্রপতি শাসনের পরিবর্তে সংসদীয় শাসনকাঠামোর প্রবর্তন করা হবে।'

এই ঘোষণার আলোকেই পরের দিন ১২ জানুয়ারি নিম্নবর্ণিতভাবে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয় ঃ

১.	আবু সাঈদ চৌধুরী	রাষ্ট্রপতি
২.	শেখ মুজিবুর রহমান	প্রধানমন্ত্রী
৩.	সৈয়দ নজরুল ইসলাম	মন্ত্রী
৪.	তাজউদ্দীন আহমদ	মন্ত্রী
৫.	ক্যাপ্টেন মনসুর আলী	মন্ত্রী
৬.	খন্দকার মোশতাক আহমদ	মন্ত্রী
৭.	আবুল কালাম আজাদ	মন্ত্রী
৮.	এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান	মন্ত্রী
৯.	শেখ আব্দুল আজিজ	মন্ত্রী
১০.	ইউসুফ আলী	মন্ত্রী
১১.	জহুর আহমদ চৌধুরী	মন্ত্রী
১২.	ড. কামাল হোসেন	মন্ত্রী
১৩.	শ্রী ফণিভূষণ মজুমদার	মন্ত্রী

শেখ মুজিবের সভাপতিত্বে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৩ জানুয়ারি। এই প্রথম মন্ত্রিপরিষদের সভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেমন-

১. জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বীরোচিত অংশগ্রহণকারী কৃষকদের বাঁচার সংগ্রাম, গ্রামাঞ্চলে বর্বর বাহিনীর ধ্বংসলীলা এবং লক্ষ লক্ষ লোকের গৃহহারা হওয়ার কথা চিন্তা করে ১৯৭২ সালের ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বকেয়া ও সুদসমেত কৃষিজমির সব রকম খাজনা মওকুফ করা হয়।

২. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'-গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'চল চল চল' কবিতাটি জাতীয় কুচকাওয়াজ বা রণসঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়।

৩. জাতীয় প্রতীক হিসেবে শাপলা-জাতীয় ফুল, বাঘ-জাতীয় জন্তু, দোয়েল-জাতীয় পাখি, কাঁঠাল-জাতীয় ফল হিসেবে গৃহীত হয়।

৪. এই বৈঠকে জাতীয় পতাকার নকশার সামান্য সংশোধন করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যে জাতীয় পতাকা স্থির করা হয়েছিল, তাই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা থাকবে, তবে পতাকার মধ্যবর্তী মানচিত্রটি বাদ দেয়া হবে। সেখানে থাকবে সূর্যের ন্যায় একটি রক্তপিণ্ড।

www.pathagar.com

৫. বাংলা সনের ১ তারিখ এবং অমর শহীদ দিবস হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন থাকবে।

৬. ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ দুটো দিনও সরকারি ছুটি হিসেবে গৃহীত হয়।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর শেখ মুজিব ১৪ জানুয়ারি প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে নীতি নির্ধারণী ভাষণ দেন। এই ভাষণেই তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রীয় মূল নীতির ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।'

শেখ মুজিব ভারতের পশ্চিম বাংলাবাসীদের ও সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা সফরে যান। এই সফরে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য ও বহু উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা।

শেখ মুজিবুর রহমানের আমন্ত্রণক্রমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ১৭ মার্চ বাংলাদেশে আগমন করেন। বাংলাদেশের লাখো জনতা মিত্রদেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে জানায় আন্তরিক অভ্যর্থনা। ইন্দিরা গান্ধীর আগমন উপলক্ষে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে এক সভার আয়োজন করা হয়। তৈরি করা হয় নৌকা আকৃতির বিশাল মঞ্চ। মঞ্চের নাম দেয়া হয় 'ইন্দিরা মঞ্চ'। ইন্দিরা গান্ধী এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দান করেন। এই সফরকালে দুই নেতার মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং ১৯ মার্চ উভয় দেশের মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী নামে গোলামির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিটি নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের মধ্যে মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তিচুক্তি

শান্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবোধের একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এক আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্য একযোগ সংগ্রাম, রক্তদান এবং আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার ফলশ্রুতি হিসেবে মুক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের বিজয় অভ্যুদয় ঘটিয়ে সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং উভয় রাষ্ট্রের সীমান্তকে চিরস্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্বের সীমান্ত হিসেবে রূপান্তরণর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে;

নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান প্রদর্শনের মূলনীতিসমূহের প্রতি দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল থেকে;

শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এবং সম্ভাব্য সকল প্রকারের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে স্ব স্ব দেশের অগ্রগতির জন্য;

উভয় দেশের মধ্যকার বর্তমান মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক আরো সম্প্রসারণ ও জোরদার করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে;

এশিয়া তথা বিশ্বের স্থায়ী শান্তির স্বার্থে এবং উভয় রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে পারস্পরিক মৈত্রী ও সহযোগিতা আরো সম্প্রসারিত করার বিশ্বাসী হয়ে;

বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে এবং উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্য ও সামন্তবাদের অবশেষসমূহ চূড়ান্তভাবে নির্মূল করার জন্য প্রয়াস চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে;

www.pathagar.com

আজকের বিশ্বের আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর সমাধান যে শুধুমাত্র সহযোগিতার মাধ্যমে সম্ভব, বৈরিতা ও সংঘাতের মাধ্যমে নয়-এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে;

রাষ্ট্রসংঘের সনদের নীতিমালা ও লক্ষ্যসমূহ অনুসরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পুনরুল্লেখ করে একপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও অন্যপক্ষে ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বর্তমান চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনুচ্ছেদ-এক

চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ স্ব স্ব দেশের জনগণ যে আদর্শের জন্য একযোগে সংগ্রাম এবং স্বার্থত্যাগ করেছেন, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মর্যাদার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, উভয় দেশ এবং তথাকার জনগণের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও মৈত্রী বজায় থাকবে। একে অপরের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে। চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষে উল্লেখিত নীতিমালার ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক সমতা ও সম্মানজনক নীতিসমূহের ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যকার বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সুপ্রতিবেশীসুলভ সার্বিক সহযোগিতার সম্পর্কের আরো উন্নয়ন জোরদার করবে।

অনুচ্ছেদ-দুই

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি সমতার নীতিতে আস্থাশীল থাকার আদর্শে পরিচালিত হয়ে চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ সর্বপ্রকারের উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের নিন্দা করছে এবং তাকে চূড়ান্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা পুনরুল্লেখ করছে। চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ উপরোক্ত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করার এবং উপনিবেশবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামে জনগণের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমর্থন থাকবে।

অনুচ্ছেদ-তিন

বিশ্বের উত্তেজনা প্রশমন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা মজবুত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে জোট নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি তাদের অবস্থার পুনরুল্লেখ করছে।

অনুচ্ছেদ-চার

উভয় দেশের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে চুক্তিকারী উভয়পক্ষ সকল স্তরে বৈঠক ও মত বিনিময়ের জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে।

অনুচ্ছেদ-পাঁচ

চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুবিধাজনক ও সর্বাত্মক সহযোগিতা শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করে যাবে। উভয় দেশের ক্ষমতা ও পারস্পরিক সুবিধা নীতির ভিত্তিতে বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে।

অনুচ্ছেদ-ছয়

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী অববাহিকার উন্নয়ন এবং জলবিদ্যুৎ, শক্তি ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যৌথ সমীক্ষা পরিচালনা ও যৌথ কার্যক্রম গ্রহণে চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ অভিন্ন মত পোষণ করবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-সাত

চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলার ক্ষেত্রে সম্পর্কের প্রসার করবে।

অনুচ্ছেদ-আট

দুই দেশের মধ্যকার বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনুযায়ী চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ প্রত্যেকে মর্যাদার সঙ্গে ঘোষণা করছে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না বা অংশ নেবে না। অন্যের উপর আক্রমণ থেকেও নিবৃত্ত থাকবে এবং তাদের এলাকায় এমন কোন কাজ করতে দেবে না যাতে চুক্তিকারী কোন পক্ষের ক্ষতি হতে পারে বা তা কোন পক্ষের নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অনুচ্ছেদ-নয়

কোন এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষ সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলে চুক্তিকারী প্রত্যেককে এতদুল্লেখিত তৃতীয় পক্ষকে যে কোন প্রকার সাহায্য দান থেকে বিরত থাকবে। তাছাড়া যে কোন পক্ষ আক্রান্ত হলে অথবা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়ে নিজেদের দেশের শক্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-দশ

চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ ঘোষণা করছে, এই চুক্তির পক্ষে অসামঞ্জস্য হতে পারে এমন গোপন বা প্রকাশ্য এক বা একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে উভয়ের কেউই কোন অঙ্গীকার করবে না।

অনুচ্ছেদ-এগারো

এই চুক্তি পঁচিশ বছর মেয়াদের জন্য স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তিকারী উভয়পক্ষের পারস্পরিক সম্মতিতে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে। অত্র চুক্তি সই করার দিন থেকে কার্যকরী হবে।

অনুচ্ছেদ-বারো

এই চুক্তি কোন একটির বা একাধিক অনুচ্ছেদের বাস্তবায়ন করবার সময় চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন মতপার্থক্য দেখা দিলে তা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার মনোভাবের দ্বারা শান্তিপূর্ণ আলোচনায় নিষ্পত্তি করতে হবে।

এই চুক্তি আজ ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ ঢাকায় সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত হলো

ইন্দিরা গান্ধী
প্রধানমন্ত্রী
প্রজাতন্ত্রী ভারতের পক্ষে।

শেখ মুজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে।

-০-

www.pathagar.com

জহির রায়হানের অন্তর্ধান নাকি হত্যাকাণ্ড?

এদেশের চলচ্চিত্র জগতে জহির রায়হানই সর্বপ্রথম ইংরেজি ও রঙিন ছবি নির্মাণ করেন। তিনি ছিলেন এদেশের সিনেমা স্কোপ ছবির প্রথম নির্মাতা। এছাড়া তিনি লিখেছেন অসংখ্য গল্প-উপন্যাস। 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের জন্য জহির রায়হান ১৯৬৪ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার পান। তৎকালীন জনপ্রিয় ইংরেজি সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ও সাহিত্য পত্রিকা মাসিক প্রবাহ-এর সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবেও তাঁর ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো। বহুমুখী প্রতিভার এই বিস্ময়কর অধিকারী জহির রায়হান আজও বেঁচে থাকলে হয়তো আরেক সত্যজিৎ রায় বা তারও উপরের এক জ্যোতিষ্ক হয়ে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করতে পারতেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতার অল্প পরেই ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি জহির রায়হান হঠাৎ হারিয়ে যান। দুপুরে বাসায় ফিরবেন বলে গেলেও আর কোন দিন ফিরলেন না। জহিরের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা বিরাট ট্রাজেডী ও রহস্য। আজো এই রহস্য হয়নি উদ্‌ঘাটিত।

জহির রায়হানের অন্তর্ধান নাকি হত্যাকাণ্ড? প্রসঙ্গে বেশ লেখালেখি হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় তার স্ত্রী সুমিতা ও শালিকা ববিতার সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। জহির রায়হানের স্ত্রী ও প্রবীণ অভিনেত্রী সুমিতা মনে করেন, জহিরকে পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে বলে প্রচার চালিয়ে প্রকৃত ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে। আর শ্যালিকা ও চিত্র নায়িকা ববিতা জোর দিয়ে বলেছেন, যুদ্ধের সময়ে কলকাতায় অনেকের কাণ্ডকীর্তি জহির জানতেন। এগুলো যাতে ফাঁস না হয়ে পড়ে, সে জন্যই তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে। ঘনিষ্ঠজনদের আরো কেউ বক্তব্য দিয়েছেন তাঁর হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। *(সূত্রঃ সাপ্তাহিক নতুনপত্র, ১৬ ফেব্রুয়ারি-১৯৯৯)*

জহিরের মতো একজন বিখ্যাত ব্যক্তি অকস্মাৎ নিখোঁজ হয়ে গেলেও শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। তাদের কাছে এটা নেহায়েত দুর্ঘটনা গোছের ব্যাপার যার জন্য দুঃখ প্রকাশ করার বেশি কিছু থাকে না। আওয়ামী লীগসহ অনেকেই তখন বলেছেন, জহির খুব সম্ভবত পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগী অবাঙালিদের হাতে নিহত বা গুম হয়েছেন। ঐ সময়ের বাহ্যিক প্রেক্ষাপটে এটা বিশ্বাসযোগ্য। মনে হয়েছে প্রথম দিকে কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো, ততই এই বিশ্বাসে চীড় ধরেছে। জহিরের রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ভারতপন্থী ছিল না। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারত সরকারের আপত্তি ছিল এমন দৃশ্যও তিনি প্রামাণ্য চলচ্চিত্রে অন্তর্ভুক্ত করেন। শুধু তাই নয়, ঢাকায় ফিরে 'যুদ্ধের ন'মাস ওপারে কে কী করেছে সব ফাঁস করে দেবো' বলে ঘোষণা দিয়েছেলেন। তার অন্তর্ধান রহস্য উদ্‌ঘাটনে মুজিব সরকারের সিরিয়াসনেসের অভাব সচেতন মানুষের নজর এড়ায়নি।

বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, ঘটনার দিন জহির রায়হান থানায় তাঁর যে গাড়িটা রেখে সেনাবাহিনীর লোকের সাথে ভাইয়ের খোঁজে গিয়েছিলেন সে গাড়িটি পরদিন সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের কাছে পাওয়া যায়। এর তালা ছিল ভাঙা। অর্থাৎ স্বাধীনতার পরপরই বিরাজমান পরিস্থিতিতে রাজধানীর একটি থানার চত্বর থেকে, পুলিশের নাকের ডগায় গাড়িটির তালা ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন কারা এমন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী

www.pathagar.com

হতে পারে, তা সহজেই বোধগম্য। এই গাড়িসমেত যে দু'যুবক ধরা পড়েছিল তাদের সূত্র ধরে এগুলে জহিরকে নিখোঁজ হবার ব্যাপারে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যেতো। কিন্তু তা করা হয়নি। যুবক দু'টি আটক থাকার কথাও জানা যায় না। ঘটনার বিবরণ একটু পূর্ব থেকেই দিতে হবে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে 'লেট দেয়ার বি লাইট' চলচ্চিত্রের কাজ অসমাপ্ত রেখে ২১ এপ্রিল কুমিল্লা হয়ে ভারতে চলে যান জহির রায়হান। সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ক্যামেরা হল তাঁর অস্ত্র। চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির ও চিত্রনায়ক অরুণ রায়কে নিয়ে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ টিম গঠন করেন। পরিচালনা করেন দু'টি কালজয়ী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'স্টপ জেনোসাইড' ও 'এ স্টেজ ইন বর্ণ'। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই দুই চলচ্চিত্র বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সংগ্রামকে পরিচিত করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। এছাড়া এ সময় তিনি আরও দু'টি প্রামাণ্য চিত্র প্রযোজনা করেন। 'লিবারেশন ফাইটারস' পরিচালনা করেন আলমগীর কবীর এবং 'ইনোসেন্ট মিলিয়ন' পরিচালনা করেন বাবুল চৌধুরী। মুক্তিযুদ্ধের বহু দুর্লভ দৃশ্য তিনি ক্যামেরাবন্দি করেন। দুঃখের বিষয় মুজিবনগর সরকার তার প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতো। ভারত সরকারও তার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। কারণ রাজনৈতিক মতাদর্শ। তিনি প্রথম জীবন থেকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

আওয়ামী লীগ ও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অংশগ্রহণের উদ্যমকে উৎসাহ প্রদান দূরের কথা, রীতিমত বাধা প্রদান করা হত। 'স্টপ জেনোসাইড' নির্মাণকালে অনেক সেক্টরে তাঁকে শুটিংয়ের জন্য প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা, পরিশ্রম ও ইচ্ছায় প্রামাণ্য চিত্রটি সমাপ্ত হলেও ভারতীয় সেন্সর বোর্ডে তা আটকে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। বহু তদ্বিরের পর ছাড়পত্র পাওয়া যায়। 'স্টপ জেনোসাইড'-এর সেন্সর সনদপত্র যোগাড় করতে তাকে দিল্লী পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। 'এ স্টেজ ইন বর্ণ' নির্মাণকালে ভারতে গৃহবন্দি মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রথমে অনুমতি দেয়া হয়নি। যাহোক শেষ পর্যন্ত সাক্ষাৎকার চিত্রায়িত হলেও ভারতীয় সেন্সরবোর্ড তা কেটে বাদ দেয়। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে লন্ডনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ এবং বিমান টিকিট হাতে পেলেও তাকে লন্ডন ও মস্কো যেতে দেয়া হয়নি। *(সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২০ জানুয়ারি-২০০৩)*

বাংলাদেশ স্বাধীন হলে জহির রায়হান ১৭ ডিসেম্বর ঢাকায় ফিরে আসেন। ফিরে এসেই শুনেন তার বড় ভাই শহীদুল্লাহ কায়সার ১৪ ডিসেম্বর থেকে নিখোঁজ। বড় ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারের নিখোঁজ ও বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের ঘটনাবলী তাকে বিচলিত করে। এসব ঘটনা তার পূর্বেকার রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে দেয়। তিনি নিয়মিত নামায-রোযা করতে শুরু করেন। পীর-আউলিয়ার মাজারকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে থাকেন। এমনকি আজমীর শরীফ পর্যন্ত গমন করতে থাকেন। তার উদ্যোগে বেসরকারি বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডসহ অন্যান্য ঘটনার প্রচুর প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ভারতের মাটিতে আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন হোটেলে বিলাসবহুল ও আমোদ-ফূর্তিময় জীবন যাপনের প্রামাণ্য দলিল জহির রায়হান ক্যামেরাবন্দি করেন।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ এমপি মরহুম এম. এ. মোহাইমেন লিখেছেন, '৮নং থিয়েটার রোডে তাজউদ্দিন সাহেবের নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত সিকিউরিটি অফিসার একদিন আমাকে বলেছিলেন আপনাদের প্রধানমন্ত্রী একজন অদ্ভুত মানুষ। ইনি মদ খান না, পান, সিগারেট খান না, মেয়ে বান্ধবী নিয়ে ঘোরাফেরা করেন না, যা আপনাদের নেতৃস্থানীয় নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ একটু বেশি রকম করে থাকেন।' *(সূত্রঃ এম.এ. মোহাইমেন, ঢাকা-আগরতলা-মুজিবনগর, পাইওনীয়ার পাবলিকেশন্স, ঢাকা পৃষ্ঠা-৯৭-৯৮)*

কলকাতার বিলাসবহুল হোটেলে মেয়ে নিয়ে পড়ে থাকা শুধু নয়, রাজনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষ আওয়ামী আদর্শে বিশ্বাসহীন বাঙালিদের নির্মূল করার ষড়যন্ত্র প্রভৃতির প্রামাণ্য দলিল জহির রায়হান সংগ্রহ করেন। ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে জড়িত প্রচুর প্রভাবশালী লোকের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি ঢাকা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জহির রায়হান ঘোষণা দেন, 'বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের পেছনে নীলনকশা উদ্‌ঘাটনসহ মুক্তিযুদ্ধের সময়ের অনেক গোপন ঘটনার নথিপত্র, প্রামাণ্য দলিল তার কাছে আছে, যা প্রকাশ করলে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই নেয়া অনেক নেতার কুকীর্তি ফাঁস হয়ে পড়বে। আগামী ৩০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় এই প্রেসক্লাবে ফিল্ম শো প্রমাণ করে দেবে কার কি চরিত্র ছিল।'

৩০ জানুয়ারি সকালে কায়েতটুলী বাসায় টেলিফোন আসে শহীদুল্লাহ কায়সার মিরপুর ১২ নং সেকশনে আছেন। টেলিফোন পেয়ে জহির রায়হান দু'টো গাড়ি নিয়ে মিরপুরে রওয়ানা দেন। তার সাথে ছিলেন ছোট ভাই মরহুম জাকারিয়া হাবিব, চাচাত ভাই শাহরিয়ার কবির, বাবুল (সুচন্দার ভাই), আব্দুল হক, (পান্না কায়সারের ভাই), নিজাম ও পারভেজ। মিরপুর ২নং সেকশনে মিরপুর থানায় পৌঁছলে সেখানে অবস্থানরত ভারতীয় সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর (ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে জহির রায়হানের টয়োটা গাড়ি (ঢাকা-ক ৯৭৭১) সহ তাকে থাকতে বলে অন্যদের ফেরত পাঠিয়ে দেন। ঐখানে তখন উপস্থিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার পান্না কায়সারের ভাই নিজামের সহপাঠী ছিলেন বলে জানা যায়। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন মিরপুর থানার দারোগা আবদুল আলীম, পুলিশ কর্মকর্তা জিয়াউল হক লোদী, করিম দারোগা, নবি চৌধুরী, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট সেলিম, নায়েক সুবেদার আব্দুল মুমিন, ওয়াহেদসহ প্রায় ৪০ জন। এই দলটি মিরপুর থানা থেকে মিরপুর ১২ নং সেকশনের দিকে যায় বলে জানা যায়। গোলা-গুলির শব্দ হয় এবং একমাত্র জহির রায়হান বাদে সবাই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

জহির রায়হানের রহস্যজনক নিখোঁজ হওয়ার সাথে সাথে তার ডায়েরী, নোটবুক, কাগজপত্রের ফাইল এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় চিত্রায়িত অব্যবহৃত মূল্যবান ফিল্ম ফুটেজসমূহ হারিয়ে যায়। সেই সাথে হারিয়ে যায় বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিটির সমস্ত প্রামাণ্য তথ্য। বেসরকারি তদন্ত কমিটি পরবর্তীকালে কোন কাজ করেনি। আত্মীয়-স্বজন ও পত্র-পত্রিকার চাপে নিখোঁজ জহির রায়হান সম্পর্কে এটি নামকাওয়াস্তে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু তদন্ত আর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। *(সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ ডিসেম্বর-২০০২)*

'জহির রায়হানের অন্তর্ধান যা ঘটেছিল সেদিন' শিরোনামে পান্না কায়সারের লেখা ছাপা হয়েছে দৈনিক ভোরের কাগজে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ সংখ্যায়। তিনি লিখেছেন, '৩০ জানুয়ারি, ১৯৭২। সেদিন সকালে একটা ফোন এলো। ফোনটা আমিই ধরেছিলাম। ওপাশ

www.pathagar.com

থেকে বললোঃ জহির সাহেব আছেন? ধরুন বলে মেজদাকে ডেকে দিলাম। ফোনে কথা বলে মেজদা সবাইকে ডেকে বললেন, বড়দার খোঁজ পাওয়া গেছে....টেলিফোনে কি কথা হলো, কার সঙ্গে কথা হলো, মেজদা এসব কিছুই বললেন না। খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি....পর দিন হাইকোর্টের কাছে মেজদার গাড়িটা পাওয়া গেল। গাড়িটা এখানে কিভাবে এলো, কিছুই জানা গেল না.....ছুটে গেলাম বঙ্গবন্ধুর কাছে। সত্যি কথা বলতে কি আমরা ভেবেছিলাম, বঙ্গবন্ধু নিজেই এ ব্যাপারে একটা উদ্যোগী ভূমিকা নেবেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তাঁর সাক্ষাৎ যখন পেলাম-দেখলাম তিনি বেশ নির্লিপ্ত। তাজউদ্দীন আহমদকে ডেকে বললেনঃ দেখতো কি করা যায়। স্বাধীন দেশে এমন একটি লোক হারিয়ে যাবে, তা কি করে হয়। আমরা মন খারাপ করে ফিরে এলাম।'

সাংবাদিক হারুনুর রশীদ খান ৩০ জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে দৈনিক লাল সবুজ পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লিখেন জহির রায়হানের ওপর। এতে তিনি বলেছেন, 'সেই যে নিখোঁজ হলেন, আজও আমাদের কাছে নিখোঁজ। রহস্যজনক ঘটনা আরো ঘটলো। জহির রায়হানের মরিস মাইনর গাড়িটি দরজা ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেল।' এর পরের প্যারার শুরু এভাবে-'মজার ঘটনাটি হলো, বঙ্গবন্ধুর সরকার থেকে আজতক কোন সরকারই জহির রায়হানকে নিহত ঘোষণা করেনি।' তিনি লিখেছেন, 'একটি অজ্ঞাত টেলিফোনে বলা হলো, আজমীর শরীফে যেতে এবং সেখানে থেকে তিনি জানতে পারবেন শহীদুল্লাহ কায়সার কোথায় আছেন। জহির রায়হান দেরি না করে সপরিবারে চলে গেলেন আজমীর শরীফ। সেখানে থেকে ফিরে এলেন খুবই খুশি মনে। কে একজন বলে দিয়েছেন, শহীদ ভাই বেঁচে আছেন, কোথায় আছেন তা তাকে ফোনে জানিয়ে দেয়া হবে। সেই কথামতো একদিন ফোনও এলো।'

জহির রায়হানের নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে তাঁর স্ত্রী সুমিতা দেবীর বক্তব্য ছিল এরূপঃ 'কলকাতায় সিনেমার টেকনিশিয়ান আর্টিস্টদের নিয়ে একটা সমিতি গঠন করেছিল জহির। জহির ছিল এই সমিতির চেয়ারম্যান, জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে ঢাকায় ফিরে প্রেসক্লাবে সে এই সমিতির পক্ষ থেকে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছিল। সেখানে তার সাথে আমার দেখা হয়। নিখোঁজ হওয়ার আগে তার সাথে আরেকবার দেখা হয়েছিল। সেদিন জহির আমাকে বলেছিল ওর বাবার বাসায় যেতে। জহির তখন থাকতো উনত্রিশ নম্বর কায়েতটুলিতে ওর মায়ের বাসায়। আমাকে সেদিনও বাসায় যেতে বলে, কারণ বড়দাকে ধরে নিয়ে যাওয়ায় তার মা অনবরত কান্নাকাটি করছিল। বাসার সবাই তখন অস্থির হয়ে আছে এই ঘটনায়। জানুয়ারির বিশ-একুশ তারিখে জহিরের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সেটাই ছিল জহিরের সাথে আমার শেষ দেখা। আমি তখন রেডিওতে একটা অনুষ্ঠান করি। নাম গ্রাম-বাংলা। রেকর্ডিং-এর পর শাহবাগে রেডিও অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। জহির গাড়িতে করে কোথাও হয়তো যাচ্ছিল। আমাকে দেখে গাড়ি থামিয়ে দিল। আমার সাথে কথা হলো। তখন জহির আমাকে বলল, ত্রিশ তারিখের মিটিং-এ এসো, দেখা হবে। এটাই ওর মুখ থেকে শোনা শেষ কথা। আমি মিটিং-এ গিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু জহির আসেনি। আমাদের আর দেখাও হয়নি। তখনও মনে হয় জহির আসবে না বলেই কি সেদিন সে আমাকে এভাবে আসতে বলেছিল। মিরপুর-মোহাম্মদপুরের ভেতরে শত্রুরা গোপনে অবস্থান করছিল। তাই আমি গাড়ি নিয়ে চলে যাই সোজা মিরপুর। শুধু সেদিনই নয়, আরো কয়েকবার গেছি সেখানে কখনো একা একা, আবার কখনো কাউকে নিয়েছি সাথে। পচা-গলা বীভৎস লাশ আমি ধরে ধরে দেখেছি। দু'হাতে উল্টেপাল্টে দেখেছি কোথাও জহিরের মুখ দেখা যায় কিনা। দুগর্ন্ধে বমি চলে আসার মত অবস্থা ছিল। কিন্তু আমি কি করবো। আমারতো জহিরের দরকার। আমার স্বামী জহির। আমার সন্তানের

www.pathagar.com

পিতা জহিরের চেহারা ঘাতকদের আঘাতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু ওর হাত-পা দেখে, শরীরের সামনের অংশ দেখেও আমি বলে দিতে পারবো এটা জহির, জহির রায়হান। জহিরকে আমি অংশ অংশ করে চিনি। তন্ন তন্ন করে পাগলের মত খুঁজেও পাইনি সেখানে। আমার বিশ্বাস, জহির মিরপুরে মারা যায়নি। ঘাতকরা তাকে অন্য কোথাও হত্যা করেছে। এ বিশ্বাস এখনো আমার আছে। জহির সেদিন বাড়ি থেকে কিভাবে কেমন করে বেরিয়ে গিয়েছিল আমি দেখিনি। কারণ আমি তখন মোহাম্মদপুরে তিন ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে আলাদা থাকি। পরে আমার ননদ জহিরের ছোট বোন ডাক্তার সুরাইয়ার কাছে বিস্তারিত শুনেছি। সেদিন সকাল আটটার দিকে জহিরের কাছে একটা ফোন আসে। ফোনটা ধরেছিল সুরাইয়া নিজে। সেদিন রফিক নামে কেউ একজন ফোন করেছিল। আমরা যে রফিককে চিনতাম, তিনি ইউসিস-এ চাকরি করতেন। তার সাথে আমারই প্রথম পরিচয় ছিল। পরে আমিই তাকে জহিরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। আজ মাঝে মাঝে মনে হয় তার সাথে জহিরের পরিচয়টা না করিয়ে দিলেও পারতাম। টেলিফোনে জহিরকে বলা হয়েছিল, আপনার বড়দা মিরপুর বারো নম্বরে বন্দি আছেন। যদি বড়দাকে বাঁচাতে চান তাহলে এক্ষুণি মিরপুর চলে যান। একমাত্র আপনি গেলেই তাকে বাঁচাতে পারবেন। অন্য কেউ যদি সেখানে যায় তাহলে আপনার বড়দার ডেডবডি আসবে বাড়িতে। জহির মায়ের চেয়ে বেশি ভালবাসতো তার ভাইকে। এরকম ঘটনা আমার জীবনে আমি কোথাও দেখিনি। তার বড়দা হারিয়ে গেছে এই ছিল তারজন্য একটা বড় ঘটনা। টেলিফোন পেয়েই জহির রায়হান প্যান্ট পরে সাথে সাথে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। আর সেই বাড়িতে ফিরে আসেনি জহির। কোথাও ফিরে আসেনি। স্বাধীনতার পরে শত্রুমুক্ত দেশে এমনভাবে একজন মানুষ নিখোঁজ হয়ে যাবে এটার অনুভূতি যে কি তা ঠিক বোঝানো যাবে না। এটা উপলব্ধির বিষয়। জহির রায়হান নিখোঁজ এই নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বেশ লেখালেখিও হলো। একদিন বড়দি অর্থাৎ জহিরের বড় বোন নাসিমা কবিরকে ডেকে নিয়ে শেখ মুজিব বললেন, জহিরের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে এরকম চিৎকার করলে তুমিও নিখোঁজ হয়ে যাবে। পরে নাসিমা আর কিছু বলেনি। টেলিফোন করেছিল যে রফিক, তাকে নিয়ে যখন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হলো। তখন তাকে নাগরিকত্ব দিয়ে পুরো পরিবারসহ আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। এই ঘটনা জহিরের নিখোঁজ হওয়ার সম্পর্কে রফিকের ভূমিকাকে আরো সন্দেহযুক্ত করে তোলে আমার কাছে। আমার একটা বিশ্বাস, জহির একদিন ফিরে আসবে আমাদের কাছে। এই বিশ্বাস আমার এখনো আছে কারণ আমিতো এমন কোনো অপরাধ করিনি যার শাস্তি আমি অথবা আমার সন্তানরা ভোগ করবে। কোনো অপরাধ করিনি বলেই তাকে তার সন্তানদের কাছে একদিন ফিরে আসতেই হবে এটা আমার বিশ্বাস। আমার ছেলেরা যখন তাদের বাবার অভাব বোধ করে তখন বেশি খারাপ লাগে। আসলে স্বাধীন দেশে তো এরকম হওয়ার কথা ছিল না। এমন হওয়া উচিতও ছিল না। শেখ সাহেবও রাজাকারদের ক্ষমা করেছেন। আজ একাত্তরের শত্রুরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তারা শাসন ক্ষমতায় বসে গেছে। আমি মনে করি পরবর্তী প্রজন্ম একাত্তরের ঘাতকদের বিচার করবেই। আমার ছেলে যদি কোনো দিন কোনো সত্যিকার রাজকারকে হত্যা করে মরেও যায়, আমি একফোঁটা চোখের জলও ফেলবো না। কোনো মায়েরই ফেলা উচিত নয়। এই স্বাধীন দেশে অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে এখন আমরা আছি। যখন এই অবস্থা দেখি শহীদের রক্তগড়া মাটিতে তখন অপ্রিয় হলেও মনে হয় স্বাধীনতার আগের অবস্থা কেনো থাকলো না এখানে। কিংবা যুদ্ধের পরে যা হওয়ার কথা ছিল সেটা কেনো হলো না। এসব দেখে-শুনে মনে হয়, কতো সুন্দর দেশে, কতো চমৎকার দেশে আমরা বাস করছি।' *(সূত্রঃ দৈনিক আজকের কাগজ, ৮ ডিসেম্বর–১৯৯৩)*

www.pathagar.com

দৈনিক আজকের কাগজ ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যায় 'জহির রায়হানের হত্যাকারী রফিক এখন কোথায়' শীর্ষক প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে 'রাহুর কবলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি' গ্রন্থে সরকার সাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছেন, 'আজকের কাগজের ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ সংখ্যায় জহির রায়হানের হত্যাকারী রফিক এখন কোথায়' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, জহির রায়হান নিখোঁজ এই নিয়ে লেখালেখি হলে একদিন বড়দি অর্থাৎ জহির রায়হানের বড় বোন নাফিসা কবীরকে ডেকে নিয়ে শেখ মুজিব বললেন, জহিরের নিখোঁজ নিয়ে এরকম চিৎকার করলে তুমিও নিখোঁজ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, জহির রায়হানের মত একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা স্বাধীনতার পর নিখোঁজ হয়েছে এটা নিয়ে চিৎকার হওয়াটাই স্বাভাবিক। জহির রায়হান তার বড় ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারকে মিরপুরে খুঁজতে গিয়ে নিখোঁজ হন। সম্ভব তাকে হত্যা করা হয়েছিল। সুতরাং তার হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে তার আত্মীয়-স্বজন সোচ্চার হতেই পারেন। কিন্তু শেখ মুজিব কেন জহির রায়হানের বড় বোনকে ডেকে নিয়ে নিখোঁজ করে ফেলার হুমকি দিলেন। কি রহস্য ছিল এর পেছনে? তাহলে কি বুদ্ধিজীবী হত্যার ব্যাপারে শেখ মুজিব এমন কিছু জানতেন, যা প্রকাশ পেলে তার নিজের কিংবা আওয়ামী লীগের জন্য ক্ষতির কারণ হত? আর কেনইবা তড়িঘড়ি করে জহির রায়হানের তথাকথিত হত্যাকারী রফিককে সপরিবারে আমেরিকা পাঠিয়ে দেয়া হল? রফিক কে ছিলেন? কি তার রাজনৈতিক পরিচয়? *(সূত্রঃ সরকার সাহাবুদ্দীন আহমদ, রাহুর কবলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১০৮)*

৯ আগস্ট ১৯৯৯ দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় জহির রায়হানের মেজো সন্তান অনল রায়হানের অভিযোগ। তিনি অভিযোগ করেন, 'জহির রায়হান নিখোঁজ হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সরকার এক ভূয়া তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটি কোন কাজ করেনি। মুক্তিযুদ্ধের প্যানপ্যানানি করে আওয়ামী লীগ সরকার আবার ক্ষমতায় এল.....মুজিব হত্যার বিচার হচ্ছে। এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ১৯৭৫ সালে। এর আগে জহির রায়হানসহ অনেক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছে। কই তাদের তো বিচার হলো না!'

৫ ফেব্রুয়ারি ২০০০ দৈনিক ইনকিলাবের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, '১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি মিরপুর যাওয়ার পর জহির রায়হান নিখোঁজ হন। জহির রায়হানের অন্তর্ধানকে হত্যাকাণ্ড হিসেবে বর্ণনা করে সেই হত্যকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব (তাদের ভাষায়) রাজাকারদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রায় মাস দেড়েক আগে গত ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে মেজর জেনারেল (অবঃ) হেলাল মোর্শেদ, মেঃ জেঃ (অবঃ) মঈন, মেঃ জেঃ (অবঃ) ইব্রাহীম প্রমুখ অফিসার বলতে চেয়েছেন যে, মিরপুরে ৩০ জানুয়ারি বিহারীদের গুলিতে তিনি নিহত হয়েছেন। কিন্তু জহির রায়হান অন্তর্ধান রহস্য ঘাঁটতে গিয়ে এমন কিছু ব্যক্তির এমন কতকগুলো চাঞ্চল্যকর তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল যেগুলো পড়ে শরীরের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। এসব তথ্য পাওয়া গেছে নিখোঁজ জহির রায়হানের প্রথম স্ত্রী সুমিতা দেবী, দ্বিতীয় স্ত্রী সুচন্দার ভগ্নী, চলচ্চিত্র নায়িকা ববিতা, জহির রায়হানের ভাবী আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য পান্না কায়সার এবং এই সময়কার সবচেয়ে বড় ঘাদানিক নেতা শাহরিয়ার কবির প্রমুখের কাছ থেকে। এছাড়াও এদের জবানীতে সত্যজিৎ রায় এবং শেখ মুজিবের যেসব উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে সেসব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জহির রায়হান ৩০ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেননি। তার পরেও বেশ কয়েকদিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। এদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি বাংলাদেশ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর বেষ্টনীর মধ্যেই ছিলেন। ঘটনা পরম্পরা পর্যালোচনা করলে তার মৃত্যুর দায়-দায়িত্ব তৎকালীন প্রশাসনকেই গ্রহণ করতে হয় এবং

www.pathagar.com

(তাদের ভাষায়) রাজাকার বা দালালদের উপর কোনভাবেই চাপানো যায় না। এই সংবাদ ভাষ্যে ইনকিলাব-এর নিজস্ব মন্তব্যের পরিবর্তে উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের উদ্ধৃতি এবং মন্তব্য ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ যখন অপপ্রচার এবং উস্কানিমূলক প্রচারণার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন তখন এসব ব্যক্তিবর্গের সেদিনের উক্তি এবং আজকের ভূমিকা মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত মানুষকে সত্যের আলোকবর্তিকা দেখাতে সাহায্য করবে।'

সেই সময়কার সরকার নিয়ন্ত্রিত সাপ্তাহিক বিচিত্রায় বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল। সংখ্যাটি ছিল ১৯৯২ সালের ১ মে। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন শাহরিয়ার কবির। তাদের সংলাপের অংশবিশেষ নিচে তুলে ধরা হলোঃ সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে সত্যজিত রায় শাহরিয়ার কবিরকে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন,

-জহিরের ব্যাপারটা কিছু জেনেছো?

-তাকে সরিয়ে ফেলার পেছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আমরা ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করে যা বুঝতে পেরেছি তাতে বলা যায় ৩০ জানুয়ারি দুর্ঘটনায় তিনি হয়তো মারা যাননি। তারপরও দীর্ঘদিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।

-স্ট্রেঞ্জ! জহিরকে বাঁচিয়ে রাখার পেছনে কারণ কি?

-সেটাই ষড়যন্ত্রের মূলসূত্র বলে ধরছি। মিরপুরে দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হলে গভীর ষড়যন্ত্র মনে করার কোনো কারণ ছিল না। আমি যতদূর জানি, বুদ্ধিজীবীদের হত্যার তদন্ত করতে গিয়ে তিনি এমন কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন যা অনেক রথী-মহারথীদের জন্যই বিপজ্জনক ছিল, যেজন্য তাকে সরিয়ে ফেলার প্রয়োজন ছিল।

১৯৯২ সালেও শাহরিয়ার কবির মনে করতেন যে, জহির রায়হানকে ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারির পরেও দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। তাহলে আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা বলুন যে, স্বাধীন বাংলাদেশে জহির রায়হানকে আটকে রাখার ক্ষমতা কাদের? বলা হচ্ছে যে, বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত করতে গিয়ে জহির রায়হানের হাতে এমন কিছু তথ্য এসেছিল যেটা রথী-মহারথীদের জন্য ছিল বিপজ্জনক। স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী সরকারের আমলে কারা ছিলেন রথী-মহারথী? যে বিপজ্জনক তথ্যের জন্য তাকে সরিয়ে ফেলার প্রয়োজন হয়েছিল। সেসব তথ্য কাদের জন্য বিপজ্জনক ছিল? তাদের ভাষায় রাজাকার এবং পাকিস্তানি দালালদের রাজনীতিতো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কারা তাহলে জহির রায়হানকে সরিয়েছে?

পান্না কায়সার জহির রায়হানের বড় ভাই পরলোকগত শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী। বাংলা ১৩৯৯, ১০ জ্যৈষ্ঠ, ইং ১৯৯২ দৈনিক বাংলার বাণীতে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'কবিতা মিলনকে মিথ্যা সান্ত্বনা।' এই নিবন্ধে তিনি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরীর স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট সেলিম সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। আলোচ্য নিবন্ধের এক স্থানে পান্না কায়সার বলেছেন, '৩০ জানুয়ারি জহির রায়হান একটি ফোন পেয়ে মিরপুর ছুটে গিয়েছিলেন। একথা বহুবার লেখা হয়েছে, বলা হয়েছে। কিন্তু বলা হয়নি সেলিমের কথা। সেলিমও নাকি সেরকমই একটি ফোন পেয়ে প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদকে না বলেই জহির রায়হানের সঙ্গে মিরপুরে ছুটে গিয়েছিলেন। তারপর দু'জনের ভাগ্য একই নিষ্ঠুর পরিণতি। দু'জনই নিখোঁজ। সেলিমের মা এ সংবাদ পেয়ে প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরীর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। সেলিম বঙ্গভবনের যে ঘরটিতে থাকতেন ইত্যবসরে সে ঘর থেকে সমস্ত কাগজপত্র, কাপড়-চোপড়

www.pathagar.com

উধাও। শহীদ সেলিমের মা অনেক কষ্ট করেও কোন রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। রহস্য রহস্যই থেকে গেল। জহির রায়হান নিখোঁজ হবার পর বুদ্ধিজীবী হত্যার কোন রকম কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। কাগজগুলোর কোন হদিসই পাওয়া গেল না। পাওয়া গেলে হয়তো পরবর্তীতে তদন্ত কমিটির অন্য কেউ কাজে লাগাতে পারতেন। শহীদ সেলিমের মায়ের মতে, বঙ্গভবনের ওর ঘর থেকে যে প্রয়োজনীয় কাগজগুলো উধাও হয়েছিল সেগুলো সম্ভবত তদন্ত কমিটির গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রই হবে। খোদ বঙ্গভবন থেকে জিনিসপত্র উধাও হয়ে যাবে তা ভাবতেও বিশ্বাস হয় না। শহীদ সেলিম বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্তের কাজে সরাসরি জড়িত ছিলেন একথা আমি আগ থেকে জানতাম না। আমি কেন আর কেউ জানে কিনা তাও জানি না। জহির রায়হান ও সেলিমের নিখোঁজ রহস্য এখন আমার কাছে আরো রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে। বুদ্ধিজীবী হত্যার যেমন ১৯৭২ সালের গুরুত্বের সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হয়নি, তেমনি জহির রায়হান নিখোঁজ রহস্যও গুরুত্বের সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করার প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করেনি। অথচ এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র। যে ষড়যন্ত্রের বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ হয়েছিল সেদিন।'

পান্না কায়সার নিজেই বলেছেন যে, খোদ বঙ্গবভবন থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র উধাও হয়ে যাবে সেটা ভাবনারও অতীত। জহির রায়হানের সাথে লেফটেন্যান্ট সেলিমও বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্তে সরাসরি জড়িত ছিলেন। এ সম্পর্কিত কাগজপত্র জহির রায়হান ও সেলিম উভয়ের কাছ থেকেই উধাও হয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রেসিডেন্টের ভবন থেকে কাগজপত্র উধাও করতে পারে কারা? রাজাকার বা পাকিস্তানপন্থীরা অবশ্যই নয়। এটা করা সম্ভব একমাত্র তাদের পক্ষে, যারা ক্ষমতার আশেপাশে ছিলেন।

'জহির রায়হানের মৃত্যু-বানোয়াট গল্প' শীর্ষক লেখায় (দৈনিক দিনকাল, ৭ ফেব্রুয়ারি–২০০০) চক্ষুমান এক স্থানে লিখেছেন, 'শাহরিয়ার কবির আর পান্না কায়সারের বক্তব্য থেকে যে বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে উঠছে, তা হচ্ছে (১) মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্বে অর্থাৎ ১৯৭১-এর ১ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর যেসব বরেণ্য বুদ্ধিজীবী ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন তাদের হত্যা রহস্য তদন্তের কাজে ব্যস্ত ছিলেন জহির রায়হান ও লেফটেন্যান্ট সেলিম, (২) তদন্তের কাজ বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল এবং তারা এমন কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, যা প্রকাশ পেলে অনেক রথী-মহারথীর মুখোশ উন্মোচিত হতো, (৩) দু'জনই অজ্ঞাত ব্যক্তির টেলিফোন পেয়ে একত্রে মিরপুর গিয়েছিলেন, সম্ভবত তদন্ত কাজে সহায়ক হবে এমন তথ্যপ্রাপ্তির প্রলোভন দেখানো হয়েছিল, (৪) দু'জনের কেউই আর ফিরে আসেননি; এদিকে বঙ্গভবন থেকেই তদন্তের কাগজপত্র উধাও হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন জাগছে, ১৯৭২ সালে লীগ সরকারের শাসনামলে বঙ্গভবন থেকে জরুরি কাগজপত্র সরিয়ে ফেলার ক্ষমতা কার ছিল? যাদের সম্পর্কে বিপজ্জনক তথ্য উদঘাটিত হয়েছিল, লীগ শাসনামলের সেই রথী-মহারথী কারা হতে পারে? নিশ্চয়ই জ্বিন-ভূতেরা নয়? এখানে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, ১৯৭২-৭৫ এর সরকার ও প্রচার মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়, রাজাকার-আলবদরদের ওপর চাপিয়ে দেয়া ছাড়া এ ব্যাপারে তেমন কোনো অনুসন্ধানই চালায়নি; জহির রায়হান নিখোঁজ রহস্যও গুরুত্বের সঙ্গে উদঘাটনের তাগিদ কেউ অনুভব করেনি। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? এ প্রসঙ্গে আরেকটু ইতিহাস টানা প্রয়োজন। শহীদুল্লাহ কায়সার, মুনীর চৌধুরী, আনম গোলাম মোস্তফা, শহীদ সাবেরসহ অনেক শহীদ বুদ্ধিজীবী মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করলেও আওয়ামী লীগের অনুসারী ছিলেন না। এরা কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এদের দৃষ্টিতে আওয়ামী লীগ ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উঠতি পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিভূ, চূড়ান্ত বিচারে শ্রম শোষক বা শ্রেণীশত্রু। ইসলামপন্থী দলগুলোর দৃষ্টিতে, আওয়ামী লীগ যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী, সুতরাং বর্জনীয়। কমিউনিস্ট সংগঠন এবং বাম বুদ্ধিজীবীরা মনে করতেন, ১৯৭১-এর সশস্ত্র

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধ একটি গণতান্ত্রিক বিপ্লব, এটি হচ্ছে, হোক, দেশটাতো স্বাধীন হোক, অতঃপর দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হবে; আওয়ামী লীগের মতো পেটিবুর্জোয়া সংগঠন দিয়ে সমাজতন্ত্র হবে না। এখানেই ছিল আওয়ামী লীগারদের ভীতি। ষাটের দশকে আ'লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ মাঝে মাঝেই লাঠি, ছুরি নিয়ে চড়াও হতো সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ধারক ছাত্র ইউনিয়নের ওপর। মুক্তিযুদ্ধকালেও আওয়ামী লীগের এই ট্রেন্ড প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। নড়াইল-ডুমুরিয়া, বরিশালের পেয়ারা বাগান, নরসিংদীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলসহ যেখানেই বামপন্থীরা নিজস্ব সংগঠন শক্তি বিস্তৃত করে বীরবিক্রমে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, সেখানেই আ'লীগের রিক্রুট করা মুক্তিযোদ্ধারা বাধা দিয়েছে, বাম মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। একই কারণে সাম্যবাদের প্রবক্তা মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। এখন সবাই উপলব্ধি করছেন, আমাদের স্বাধীনতার জন্যে নয় বরং শক্তিমান প্রতিবেশী পাকিস্তানকে ভাঙবার প্রয়োজনেই ভারত মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সহায়তা করেছিল। সে হিসেবে মুক্তিবাহিনী আর মুজিববাহিনী দুইয়ের পেছনেই ছিল র-এর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ মদদ। অর্থাৎ এক বৃন্তে দুই ফল। মুক্তিবাহিনী সরাসরি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতো। আর মুজিববাহিনী যুদ্ধের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের কথাও বলতো। আর এতেই লীগ নেতাদের রিক্রুট করা মুক্তিযোদ্ধারা মাঝে মাঝেই মুজিব বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। সমাজতন্ত্রে যাদের এতো ভীতি, বামচিন্তাকে যারা দেখতেন বিভীষিকার মতো, তারা শহীদুল্লাহ কায়সার, মুনীর চৌধুরীদের মতো বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের প্রীতির চোখে দেখবেন না, সেটাই স্বাভাবিক। তারপরও ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীনতার প্রবল আবেগ-উচ্ছ্বাসের পটভূমিতে রাজাকার আলবদর কর্তৃক বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রচারণাটি বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিল। এখন যে সবাই অবিশ্বাস করছেন, তাও নয়। কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করার ভিত্তিটা আওয়ামী লীগই নষ্ট করেছে। এর একটি প্রধান কারণ, নিখোঁজ জহির রায়হান সম্পর্কে তৎকালীন লীগ সরকারের আশ্চর্যজনক নির্লিপ্তিতা। চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান সাধারণ মানুষ ছিলেন না। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে পরিপুষ্ট এই মানুষটি ছিলেন যেমন প্রতিভাধর, তেমনি একরোখা, সংগ্রামী, ঋজু চরিত্রের। সুতরাং অন্যান্য বামপন্থী শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মতো তিনিও যে লীগ সরকারের পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন না, তা বলাই বাহুল্য। তদুপরি এই মানুষটি ভয়ঙ্কর ঝুঁকিপূর্ণ দু'টি কাজ করেছিলেন বলে জানা যায়। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ভারত-প্রবাসী লীগ নেতাদের অনেকেরই কু-কীর্তি নাকি সেলুলয়েডে এবং ডায়েরীতে বন্দি করে রেখেছিলেন। এ কারণে যেসব লীগ নেতা মুক্তিযুদ্ধের নামে ভারতে গিয়ে পাটের ব্যবসা বা চোরাচালানে ব্যস্ত ছিলেন, যারা মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে দামী হোটেলে গিয়ে ফুর্তি করেছেন, যারা বেহেড মাতাল হয়ে নর্দামার পাশে পড়ে থেকেছেন বা ভারতীয় পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়েছেন, তারা সবাই জহির রায়হানকে জ্যান্ত-বিভীষিকা জ্ঞান করতেন। কি জানি ওসব কু-কীর্তি যদি তিনি গ্রন্থাগারে লিপিবদ্ধ করেন, কিংবা সেলুলয়েডে বন্দি ছবিগুলো দিয়ে যদি ডুকমেন্টারী কিছু বানিয়ে ফেলেন, কি উপায় হবে? জহির রায়হানের দ্বিতীয় ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্তে নিয়োজিত হওয়া। এক্ষেত্রেও যে তিনি তৎকালীন রথী-মহারথীদের মুখোশ উন্মোচনের পর্যায়ে গিয়েছিলেন, শাহরিয়ার কবিরে বক্তব্য থেকে তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। উল্লেখিত বক্তব্য, মন্তব্য ও প্রাপ্ত তথ্যের সমীকরণ টানলে, এই সত্যই কি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না যে, জহির রায়হান নিখোঁজ ও হত্যার পশ্চাতে তৎকালীন লীগ সরকারের একটি প্রভাবশালী অংশের কালো হাত সক্রিয় ছিল? আরো কি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না যে, বাম বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পশ্চাতেও ওই মহলটির নেপথ্য ভূমিকা ছিল?'

-o-

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীর শিবপুর কৃষক সম্মেলন

বাংলার রাজনৈতিক জগতে মওলানা ভাসানী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংগ্রামী নেতা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে তিনি কৃষকের প্রশ্নাতীত নির্ভরশীল বন্ধু এবং নেতা। ২৯ ও ৩০ এপ্রিল, ১৯৭২ (১৬ ও ১৭ বৈশাখ) ঢাকা জেলার শিবপুরে স্বাধীনতাত্তোর প্রথম কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা-আসামের কৃষক আন্দোলনের সূচনাকারী মওলানা ভাসানী। শিবপুরে অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলন নতুন কিছু নয় এবং মওলানা ভাসানীর সমগ্র জীবনের আন্দোলনসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনাও নয়। বস্তুত, মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান উৎস এবং কৃষক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণী শক্তি ও তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কৃষক সম্মেলন। বাংলাদেশ ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি প্রদেশের (বর্তমান রাজ্যে) মানুষের জীবিকার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে কৃষিকার্য। বাংলাদেশের শতকরা ৮০ জনের বেশি লোক দারিদ্র্য পীড়িত কৃষক। তাই পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের পেছনে যেমন শ্রমিক, ভবঘুরে এবং নগর জীবনে অভ্যস্ত মানুষের অবদান রয়েছে স্বাভাবিক কারণেই প্রাচ্য-মণ্ডলে অবস্থিত বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আন্দোলনগুলোও তেমনই কৃষিজীবীদের অবদানে সমৃদ্ধ। মূলত এই দেশের সাধারণ মানুষের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও সংগ্রামগুলোর ইতিবৃত্ত একটু সচেতনভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তার অধিকাংশই হচ্ছে কৃষি সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আর নির্যাতিত, শোষিত এবং অবহেলিত কৃষক সমাজের শ্রেণী হিসেবে প্রথম আত্মসচেতনতার স্ফুরণ, নিজেদের সংগঠিত করার প্রবণতা এবং একটি সংগঠনের কাঠামোতে বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে জড়িত তিনি হচ্ছেন মওলানা ভাসানী। সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে পুরোপুরি জড়িত থেকেও একমাত্র মওলানা ভাসানীই বোধ হয় সর্বহারা কৃষককুলের সঙ্গে এতটা একাত্ম হতে পেরেছিলেন। শহরের বিলাস নিকেতনে আয়েশের জীবন কাটিয়ে তিনি পল্লীর সাধারণ মানুষের রাজনীতি করার ভড়ং করেননি-সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা এবং বাংলার সুবিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী কৃষক সমাজের একজন হয়েও তাদেরই একান্ত পরিবেশে সুখ-দুঃখের সমভাগী হিসেবে মানসিকতার লালন করে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর রাজনৈতিক মানস, প্রজ্ঞা এবং আন্দোলনের ভিত্তিভূমি।

মওলানা ভাসানীর শিবপুরে অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলন সম্পর্কে কাজী সিরাজ লিখেছেন, '.....একাত্তর সালের কথা। পঁচিশে মার্চের ভয়াল রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞে সবাই হতচকিত। প্রতিরোধের কোনো সামরিক প্রস্তুতি নেই, দিক-নির্দেশনা নেই। শেখ মুজিব স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব বরণ করে চলে গেছেন পাকিস্তানে। আওয়ামী লীগের অন্যান্য নির্বাচিত ব্যক্তিরা সবাই আক্রান্ত নিরস্ত্র দেশবাসীকে তোপের মুখে ফেলে রেখে ব্যাংক আর ট্রেজারি লুটের টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়ে গেছেন ভারতে। ২৫ মার্চ, ১৯৭১-এ পূর্ববাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক দেয়া হলো। কিন্তু প্রস্তুতি গ্রহণের আগেই হামলা শুরু হলে গেল। আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া নিজ গ্রাম শিবপুরে গড়ে তুললেন গণপ্রতিরোধ। ২৭ মার্চ কারফিউ শৈথিল্যের সুযোগ আমরাও চলে গেলাম

www.pathagar.com

মান্নান ভূঁইয়া সাহেবের ঘাঁটি এলাকা শিবপুরে। সেখানে তখন শ' শ' ছাত্র-যুবক, কৃষক-শ্রমিকের যুদ্ধ প্রস্তুতি, মাঠে চলছে সামরিক প্রশিক্ষণ। আমার প্রশিক্ষণের হাতেখড়িও মান্নান ভাই'র এলাকায় শিবপুরে। তাই এই শিবপুরের সঙ্গে আবেগের একটা সম্পর্ক তো থাকবেই। আরো কারণ আছে। সেদিন যারা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধে এক সঙ্গে ছিলাম, সবাই এখনো চিন্তা-চেতনা-বিশ্বাসে এক সঙ্গেই আছি......ষাটের দশকের শেষ দিককার ঘটনা। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর পদভারে সেদিন আরেকবার চঞ্চল হয়ে উঠেছিল এই শিবপুর। বিদ্রোহের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছিল আজকের নরসিংদী জেলার সর্বত্র। ডিক্টেটর আইয়ুব খাঁর জুলুম-নির্যাতন এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের এককেন্দ্রিক বিজাতীয় শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গ্রামের কৃষক-মজদুর-জনতাকে সম্পৃক্ত করে গণআন্দোলনকে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী ১৯৬৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর গ্রামে গ্রামে হাট হরতাল ডেকেছিলেন। মওলানার ডাকে গর্জে ওঠে শিবপুর, হাতিরদিয়াসহ আশপাশের সমগ্র অঞ্চল। হাতিরদিয়ায় সেদিন ছিল হাটবার। শহীদ আসাদের নেতৃত্বে শিবপুরের বীর কৃষকরা সমবেত হন হাতিরদিয়ায়। স্বতঃস্ফূর্ত সফল হরতাল চলাকালে আইয়ুব-মোনায়েমী পুলিশ শান্তিপ্রিয় জনতার ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে তারা। শহীদ হন চারজন কৃষক-সিদ্দিকুর রহমান, মিয়াচান্দ, চেরাগ আলী এবং হাসান আলী। ২০ জানুয়ারি শহীদ হওয়ার মাত্র ২১ দিন আগে সেই হরতালে আহত হন ছাত্রনেতা আসাদ। হত্যা-নির্যাতনের প্রতিবাদে হাতিরদিয়া-শিবপুরে জনসভার ঘোষণা দেন মওলানা ভাসানী। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। পুলিশী বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়। প্রতিবাদী জনতাকে সভাস্থলে আসতে বাধা দেয়া হয়। কিন্তু চির-বিদ্রোহী মওলানা ভাসানী পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে সভাস্থলে পৌঁছে মোনাজাত ও জালিম শাহীর বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুরু করেন। চারদিক থেকে বাঁধভাঙা জোয়ারে স্রোতের মতো ছুটে আসে মানুষ। লাখো মানুষের অপ্রতিরোধ্য সে স্রোতকে রুখবার সাহস ছিল না আইয়ুবী প্রশাসনের। স্বাধীনতার পরও কৃষকদের ওপর শুরু হয় জুলুম-বঞ্চনা। কৃষকের অবর্ণনীয় দুঃখ মোচনের জন্য আবারো মওলানা ভাসানী কৃষক সম্মেলন আহ্বান করেন শিবপুরে। অধ্যাপক জসীম উদ্দিন আহমদ সম্প্রতি এক নিবন্ধে লিখেছেন- "১৯৭২-এ শিবপুরে আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, মরহুম আবদুর রব খাঁ ও অন্যান্য কৃষক নেতা ও কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমে দু লক্ষাধিক কৃষকের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শিবপুর মুখরিত হয়ে ওঠে সারা বাংলাদেশের সংগ্রামী কৃষকদের পদচারণায়। এই সম্মেলন থেকে সারা দেশের কৃষকরা সংগ্রামের অভয়বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়, অনুপ্রাণিত হয়। বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনে সূচিত হয় নবযুগ"। *(সূত্রঃ কৃষকের পদভারে চঞ্চল শিবপুর-ভাসানী থেকে খালেদা জিয়া, দৈনিক দিনকাল, মে-১৯৯৭)*

২৯ ও ৩০ এপ্রিল, ১৯৭২ শিবপুরের কৃষক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর এই ভাষণ ইতিহাসে বাংলার কৃষক তোমরা প্রস্তুত হও! নামে সর্বাধিক পরিচিত। তিনি ২৯ এপ্রিল প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন-

দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষ, দুনিয়ার মজলুম মানুষ, দুনিয়ার নির্যাতিত মানুষ, শোষিত মানুষকে তোমরা মুক্ত করো-আমরা মুক্ত করবোই করবো। শুধু বাংলাদেশের কৃষকের জন্য আমরা কৃষক সমিতি গঠন করি নাই, শুধু বাংলাদেশের কৃষকের মুক্তির জন্য কৃষক সমিতি গঠিত হয় নাই, দুনিয়ার কৃষক, দুনিয়ার মজলুম মানুষের মুক্তির জন্য কৃষক সমিতি গঠন করা হইয়াছে। ভারতের কৃষকের দুঃখ, ইরানের কৃষকের দুঃখ, বার্মার কৃষকের দুঃখ,

www.pathagar.com

ভুটানের কৃষকের দুঃখ, কাবুলের কৃষকের দুঃখ, বাংলাদেশের কৃষকের দুঃখ এক দুঃখ। এক মানুষ, এক আত্মা, এক দেহ। মনে প্রাণে তোমরা কৃষক সমিতির কাজ করে যাবে। ভাষার দৃষ্টিকোণে আমরা বাঙালি, তবে বাংলাদেশের কৃষক সমিতি বাংলার ভৌগোলিক রেখার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিবে না। আমাদের আন্দোলন, আমাদের সংগ্রাম সারা বিশ্বের নির্যাতিত মানুষ, শোষিত মানুষ, নিপীড়িত মানুষ, কৃষক-মজুরের মুক্তির জন্য।

আজ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের জাল সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সাম্রাজ্যবাদ বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, দুনিয়ার বুক হইতে সাম্রাজ্যবাদকে খতম না করা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। দুনিয়ার পুঁজিবাদকে খতম না করা পর্যন্ত বাংলার কৃষক সমিতির সংগ্রাম চলবে। আমি আশা করি, কৃষক কর্মী ভাইয়েরা শহরকেন্দ্রিক রাজনীতি না করে ৬২ হাজার গ্রামে ছড়িয়ে পড়ুন।

আমার মা-বোনেরা, আমার ভগ্নি-ভাইয়েরা সত্যিকার কাজ করুন। বিলাসিতা বর্জন করুন। আর সব পদাঘাত করে কৃষক সমিতির সংগ্রামে নেমে পড়ুন। আজ আমাদের কাজ কৃষকদের বাড়িতে, কৃষকদের ঘরে, কৃষকদের হাঁড়ির তরকারি খেয়ে, কৃষকদের কুঁড়েঘরে বাস করে, কৃষকদের ধানের ক্ষেত্রে, কৃষকদের পাটের ক্ষেতে। কৃষক সমিতির কাজ শহরের রেস্টুরেন্টে নয়, বড় বড় হোটেলে নয়, আলীশান বাংলোতে নয়।

কৃষক কর্মী ভাইয়েরা,

গ্রামে-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ুন, চলে যান। যতদিন আমাদের লক্ষ্য সমাজতন্ত্রবাদ যে সমাজতন্ত্র সর্বরোগের মহৌষধ মকর ধ্বজরূপে কাজ করবে-সে সমাজতন্ত্রবাদ যতদিন প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন, ততদিন পর্যন্ত শহরে ফিরবেন না। বাড়ি নাই, ঘর নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, ভোগ নাই, বিলাস নাই আমাদের কাজ দুনিয়ার মজলুম মানুষের মুক্তির কাজ। তাই আপনারা কালবিলম্ব না করে সকল ইউনিয়নে কৃষক সমিতি গঠন করুন। কৃষক সমিতির রসিদের বই ঢাকায় পাবেন, যদিও আমাদের পক্ষে রসিদ দেয়া সম্ভব নয়। কারণ কৃষক সমিতির হাতে টাকা নাই। আমরা ধনিক-বণিকের সাহায্য চাইব না, পুঁজিপতিরা সাহায্য আমাদের দেবে না, কৃষক আন্দোলনে তারা কেউ সহানুভূতি দেখাবে না। কারণ, তাদের মতে দুনিয়ায় গরিব রবে না, তা হতে পারে না। ধনী কখনো গরিবের বন্ধু নয়, জালেম কখনো মজলুমের বন্ধু নয়, শোষক কখনো শোষিত মানুষের বন্ধু নয়, তারা চিরশত্রু। জাত-শত্রুকে উচ্ছেদ করতে হলে আপনাদের নিজের পায়ে নিজেদের দাঁড়াতে হবে। গ্রামে গ্রামে যান মুষ্টি চাল তুলুন। বোরো ধান, ডাল, সরিষা এক মুঠো করে ভিক্ষা করুন। কৃষক সমিতিকে নিয়ে যান ৬২ হাজার গ্রামে।

শুধু সভা-বক্তৃতা-বিবৃতির দ্বারা দেশে দেশে কৃষক সমিতি হবে না। আশা করি আমরা কৃষক কর্মী ভাইয়েরা যারা দূর-দূরান্ত হতে বহু ত্যাগ-কষ্ট সহ্য করে, বহু অর্থ ব্যয় করে আজ বৃষ্টির মধ্যে এখানে এসেছেন, তাদের উচিত গ্রামে ছড়িয়ে যাওয়া। আমাদের আর বেশি সময় নাই। মুক্তি আমাদের আসন্ন। জয় আমাদের অবধারিত। আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহর করুণায় সারা বিশ্বের কৃষক আমরা এক হবো, আল্লাহর রহমতে সারা দুনিয়ার মজলুম এক সারিতে দাঁড়িয়ে যাবো, সারা দুনিয়ার মজলুম আমরা এক হবো। দুনিয়ার কোন শক্তি নাই, দুনিয়ার কোন তাকত নাই, কৃষক সমিতির সঙ্গে মোকাবেলা করে কৃষককে বাধা দেয়। কৃষক আজ কষ্ট করে। বাংলার শতকরা ৮৫ জন কৃষক। বাংলার শতকরা ৯৫ জন কৃষক-মজুর।

www.pathagar.com

আমরা আওয়ামী লীগ সরকারকে জানিয়ে দিই-আমরা গদির জন্য লালায়িত নই, মন্ত্রিত্বকে পদাঘাত করি, প্রেসিডেন্টশীপকে পদাঘাত করি। আমরা তোমাদের গদির জন্য সংগ্রাম করি না, পার্লামেন্টারী ভোটে জয়ী হবার জন্য সংগ্রাম করি না। আমরা পারমিটের জন্য, রিলিফের টাকা লুটপাট করার জন্য, রিলিফের কম্বল দু-একখণ্ড করে চুরি করার জন্য আমরা রাজনীতি করি না। যারা রিলিফের মাল চুরি করে, আত্মসাত করে, তাদের উৎখাতের জন্য আমরা রাজনীতি করি। গভর্নমেন্ট কঠোর হস্তে দমন করে না। আজ আমার কৃষক সমিতির কর্মীদিগকে, শ্রমিকদিগের উপর নির্যাতন করা চলবে না। এদেশ শ্রমিকের দেশ, গরিবের দেশ, এদেশ কৃষকের দেশ সাবধান! গরিবের উপর জুলুম করো না। হুঁশিয়ার, যদি গরিবের ভাতে হাত দাও, গরিবের প্রতি নির্যাতন করো, তাহলে মুসলিম লীগের মতো, পাঞ্জাবি বর্বরদের মতো, পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকদের মতো খান খান করে দেব।

দেশে আজ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নেই। চোর-ডাকাত, লুচ্চা-গুণ্ডায় এদেশ ভরে গেছে। মানুষের জীবনের কোন গ্যারান্টি নাই। গভর্নমেন্ট, কৃষক সমিতিকে কঠোর হস্তে দমন না করে চোরকে, লুটপাট সমিতিকে কঠোর হস্তে দমন করো। কৃষক সমিতির কর্মীরা চুরি করে না, গুপ্ত হত্যা করে না, আল্লাহর বান্দা মানুষকে হত্যা করে না, মানুষকে প্রেম-প্রীতিভালবাসা দেয়। আমরা দেশের বিরোধীদল। সরকার ভাল কাজ করুন, আমরা সমর্থন করবো। যদি সরকার নির্যাতন চালায়, দমননীতি চালায়, অন্যায় করে, আমরা সরকারের বিরোধিতা করবো। সরকার যদি জনগণের দাবিকে প্রশ্রয় দেয়, লুটপাট সমিতিকে দমন করে-আমরা সরকারকে সাহায্য করবো। আমরা সরকারের গোলাম নই, সরকারের দাস নই, লেজুড় নই।

মস্কোপন্থী, তোমরা কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের একটা অতীত ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস ত্যাগের ইতিহাস, কোরবানীর ইতিহাস, দুঃখ-লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ইত্যাদির ইতিহাস। তোমাদের অফিসে কার্পেট বিছানো থাকে; তোমরা অবাঙালিদের সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করো। মস্কোপন্থী, সাবধান হও, সাবধান! বাঙালি হউক, অবাঙালি হউক, যে কোন দলের, যে কোন মতের, যে কোন গ্রুপের, যে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে শাস্তি দেয়া চলবে না, বিনা বিচারে কারো বাড়ি দখল করা যাবে না। সাবধান, যদি দখল করো আওয়ামী লীগ সরকার! মানুষের গাড়ি, বাড়ি, ফ্যাক্টরী দখল করে, যারা গাড়ি, বাড়ি দখল করে, গুণ্ডামি করে, তাদের বিচার নাই। গভর্নমেন্ট সমস্ত বাড়ি, সমস্ত সম্পত্তি জাতীয়করণ কর, সমস্ত কারখানা জাতীয়করণ করো, সমস্ত বীমা কোম্পানি জাতীয়করণ করো। যারা জেলে আটক আছে, তাদের বিচার করো। বিচার করে ফাঁসি দাও। তাতে কারো কোনো আপত্তি নাই। বিনা বিচারে কাউকেও আটক করা যাবে না। আমাদের বাংলাদেশে বিনা বিচারে কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। আমাদের দাবি-কৃষকের প্রতিনিধিগণকে শাসনতন্ত্রে স্থান দিতে হবে। আগামী শাসনতন্ত্রে যদি কৃষকের দাবি মঞ্জুর না হয়, সে শাসনতন্ত্র যদি কামার, কুমার, জেলে, মাঝি, তাঁতিদের কল্যাণের জন্য না হয়, মুক্তির জন্য না হয়-তাহলে সে শাসনতন্ত্র আমরা মানব না। আশা করি, সরকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ করবে।

আওয়ামী লীগ সরকার স্থিতিশীল হউক, আমাদের কোন আপত্তি নাই, শেখ মুজিবুর রহমান ১২ বৎসর প্রাইম মিনিস্টার থাকুক কোন আপত্তি নাই। কিন্তু কৃষকের দাবি, শ্রমিকের প্রাণের দাবি, পিয়নের প্রাণের দাবি, খানসামার প্রাণের দাবি সমাজতন্ত্র বাদ দিলে

www.pathagar.com

চলবে না। সমস্ত বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি, যে কোন বিদেশি পুঁজি ভারত হোক, জাপান হোক, চীন হোক, রাশিয়া হোক, আমেরিকা হোক সকল বিদেশি পুঁজি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বিদেশি পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে সরকারের অধীনে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য জাতীয় স্বার্থে গড়ে তুলতে হবে। বেকার সমস্যায় আজ দেশের ৮০ লাখ লোক বেকার। শিক্ষিত বেকার, অশিক্ষিত বেকার, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বেকার, জেলে বেকার, লোহার অভাবে কামার কাজ করতে পারে না, সুতার অভাবে তাঁতি কাজ করতে পারে না, কাঠের অভাবে সূত্রধর কাজ করতে পারে না। আজ অভাব এক নয়, দুই নয়, হাজার হাজার। আজ কেরোসিনের দাম তিন টাকা হতে ১২ টাকা, চাউলের দাম ৮২ টাকা, চিনির দাম ৬ টাকা, তিন টাকার লুঙ্গির কাপড় দশ টাকা, মেয়েদের তাঁতের কাপড় আজ ১৫/২০ টাকা। সমস্ত দিন কৃষক, ক্ষেত মজুর মাটি কেটে দেড় টাকা পাওনা। গভর্নমেন্ট শুধু সিএসপির চাকরির ব্যবস্থা করলে হবে না, শুধু এমসিএদেরকে বেশি টাকা দিয়ে ভরণপোষণ করলে চলবে না, সমানভাবে কৃষককে দাও, মজুরকে দাও। তিন কোটি মানুষের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে বর্বর সৈন্যরা- আজ বৃষ্টির দিনে মজুরেরা আজ পর্যন্ত মুক্ত আকাশের নীচে তারা বাস করে। এক কোটি হিন্দু শরণার্থী, মুসলমান শরণার্থী-যারা হিন্দুস্থানে গিয়েছিল, তারা ফিরে আসলে গভর্নমেন্ট পুনর্বাসনের জন্য টাকা দিয়েছে ত্রিশ কোটি। ত্রিশ টাকা, চল্লিশ টাকা, Maximum একশত টাকা দিয়ে একখানা বেড়াও হয় না। গভর্নমেন্ট ঠাট্টা মস্কারী বাদ দাও। বর্ষা আসার আগে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করো। না হলে মুজিবুর, তুমি বৃষ্টির মধ্যে ময়দানে থাকো, ভাসানী থাকবে, কৃষক থাকবে সবাই থাকবে। বেগুন খিচুড়ি রেঁধে মুজিবুর তুমি খাও, মোশতাক খাও, তাজউদ্দীন খাও, ভাসানী খাও, কৃষক কর্মীরা খাও।

আওয়ামী লীগের কর্মীরা,

সকল দলের, সকল মতের মানুষ যদি খিচুড়ি খায়, ডাল সিদ্ধ করে খায়, কারো কোন আপত্তি থাকবে না। কেউ পোলাও খাবে, কেউ কচুরিপানা খাবে, তা হবে না। বাংলার মানুষ স্বাধিকার পেয়েছে। বড় লোকের মেয়েরা কেরোলিনের শাড়ি পড়বে আর কৃষকের মেয়েরা ছেঁড়া তাঁত পড়ে থাকবে; তা হবে না। সকলে শোষিত মানুষ, সকলে নিপীড়িত মানুষ, শুধু মুখে প্রচার করলে চলবে না, শুধু ঈদের জামাতে কোলাকুলি করলে চলবে না, খোদার ঘরে গিয়ে গণতন্ত্র পালন করলে চলবে না। সব মানুষ সমান। মানুষের মধ্যে শোষণের স্থান নাই। মানুষের দাবি পূরণ করো। আল্লাহ সহায় হবে, ভগবান সহায় হবে, ঈশ্বর সহায় হবে। গভর্নমেন্ট এইভাবে রাজ্য চালালে চলবে না। আজ স্বাধীনতা লাভ হয়েছে সকল স্তরের, সকল দলের, সকল গ্রুপের, সকল মতের, সকল ধর্মের মানুষের জন্য।

আজ-যারা মুক্তি বাহিনীর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, পাঞ্জাবি সৈন্যদের নিয়ে বর্বর অত্যাচার করেছে, প্রাণ হাতে নিয়ে যারা কামান ধরে নাই-তারাই আজ দেশের কর্তা, হর্তা, বিধাতা। আর যারা পালিয়ে হিন্দুস্থানে যায় নাই, যারা মুক্তিবাহিনীকে দুবেলা খাবার দিয়েছেন, গোয়ালঘরে স্থান দিয়েছেন, ঘরের কোণায় স্থান দিয়েছেন-পাঞ্জাবি সৈন্যরা বলতো, দেখো তোমরা যদি মুক্তিকে ঘরে স্থান দাও, বাড়ি জ্বালিয়ে দেব, তোমাদের মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করবো-এদেশের কৃষক স্বাধীনতাকে এতই ভালবাসে, প্রাণের চেয়ে প্রিয় মনে করে সে মুক্তিবাহিনীকে ঘরের কোণায় লুকিয়ে রেখে বলেছে-'নাই নাই নাই।' গোয়ালঘরে লুকিয়ে রেখে বলেছে, 'নাই নাই, নাই।' নিজেরা না খেয়ে, ছেলে-মেয়েদের উপবাস রেখে

www.pathagar.com

মুক্তিবাহিনীকে খাবার দিয়েছে। যে মুক্তিরা শরীরের রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে, সেই মুক্তিদের আজ মিলিশিয়া চাকরি হয় না। আর বর্বর সৈন্যদের ব্যভিচারে, গুনাহগারীতে আজ আমার দুই লক্ষ মা-বোন গর্ভবতী হয়েছে। এই গর্ভবতী মাদের কি অবস্থা হবে, হে পুঁজিপতি, তোমরা যদি মানুষের প্রতি মনুষ্যত্ব দেখাইতে চাও, এসব গর্ববতী মেয়েদের সসম্মানে গ্রহণ করো। কথায়-বার্তায় কথা বলো ফেরেশতার মতো। কাজ করে, শয়তানের মতো! আর সমাজতন্ত্রের কথা কয়!! আজো চার মাস হয় নাই; তিনতলা, পাঁচতলা দালান কি করে হয়েছে? তোমরা কি জানো না, সমাজতন্ত্র হলে কারো নিজস্ব বাড়ি থাকবে না? পকেটও থাকবে না। পকেটমারও থাকবে না। পকেট যদি থাকে, পকেটে ঘড়ি থাকে, পকেটে ফাউন্টেনপেন থাকে, পকেটে মাল থাকে, পকেটে টাকা থাকে। আর যদি আইন করে দেওয়া যায়-এদেশের মানুষ হিন্দু হও, মুসলমান হও, শিক্ষিত হও, অশিক্ষিত হও, কৃষক-মজুর বর্গাদার হও, ক্ষেতমজুর হও, পকেট রাখতে পারবে না। তাহলে পকেটমার থাকবে না। পকেট ব্যক্তিগত মালিকানা যতদিন থাকবে, চুরি থাকবে, ডাকাতি থাকবে, গুণ্ডামী থাকবে, লুচ্ছামী থাকবে। শোষণ থাকবে। চোরাকারবারী থাকবে।

যেদিন থেকে দুনিয়ার বুক হতে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ হবে সেদিন হতে মানুষ ব্যক্তিগত চিন্তা করবে না, সমষ্টিগতভাবে চিন্তা করবে। সবার চিন্তা করবে, সারা বিশ্বের জন্য চিন্তা করবে। আমি বেশি বলতে পারি না-আমার বয়স ৯০ বৎসর। আপনাদের মতো জোয়ান না! দাঁত নাই। কথা ভুল হয়ে যায়-বুঝা যায় না। যাই হোক আমি শেষ বলিঃ আমরা আগামীকাল কৃষক জনসভা করব-ঝড় হোক, বাদল হোক। আমরা সংগ্রামে নেমেছি-তুফানের সাথে সংগ্রাম করব, বৃষ্টির সাথে সংগ্রাম করব, জালেমের সাথে সংগ্রাম করব। শোষকের সাথে সংগ্রাম করব। আর ২৮ ও ২৯ শে মে কৃষক-শ্রমিক সম্মেলন হবে। কৃষক-শ্রমিক এক না হলে, এক অঙ্গ, এক সহোদর না হলে, এক হয়ে যদি না লড়ি আমাদের মুক্তি আসবে না। আগামী ২৮ ও ২৯ শে মে টঙ্গীতে বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিক মৈত্রী সম্মেলন হবে। এটা হবে কৃষক ও শ্রমিক ভাইদের মিলিতভাবে।

কৃষক-শ্রমিক ভায়েরা যে যেখানে থাক প্রচার করো, বলতে থাক, 'চলো চলো টঙ্গী চলো।' আমাদের টাকা নাই, পয়সা নাই, প্রচার করার কিছুই নাই। খবরের কাগজ পুঁজিপতিদের; সাংবাদিকেরা কিছু লিখলে চাকরি যাবার সম্ভাবনা আছে। তাই আমাদের নিজের কাজ নিজে করতে হবে। যদি আমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাবলম্বী হতে না পারি তাহলে সংগ্রাম সফল করতে পারব না। গ্রামে-গ্রামে, পথে-ঘাটে সবখানে গিয়ে প্রচার করুন-'টঙ্গীতে চলো, নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য। সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করার জন্য। রাস্তা পাবার জন্য, পথ আবিষ্কার করার জন্য, দুনিয়ার জালেমকে ধ্বংস করার জন্য।' আজ ভিয়েতনামের কৃষক সমিতির কর্মকর্তারা যে 'তার' দিয়েছে, সহানুভূতি দেখিয়েছে, তারজন্য জানাই আমি তাঁদের প্রতি অভিনন্দন, মোবারকবাদ। আর হিন্দুস্থান গভর্নমেন্ট, গণতান্ত্রিক সরকার! মোজাফফর আহমদের মতো দরদী, নির্ভীক সংগ্রামী পুরুষ, বীর সেনাপতি শুধু পাক-ভারত বা বাংলাদেশে নেই বললে সত্যের অপলাপ হবে, তার মতো পুরুষ আফ্রো-এশিয়াতে নাই। এহেন বীরকে ইন্দিরা সরকার পাসপোর্ট না দিয়ে, পারমিট না দিয়ে গণতন্ত্রের প্রতি পদাঘাত করেছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করি। আব্দুল্লাহ রসুলসহ অন্যান্যকে না আসতে দিয়ে মানুষের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে। অন্যান্য প্রগতিশীল কর্মীকে না আসতে দিয়ে হিন্দুস্থান সরকার গণতন্ত্রের মাথায়

www.pathagar.com

পদাঘাত করেছে। আমরা কৃষকদের কোন ভৌগোলিক সীমা নাই। সারা বিশ্বের মজুর এক হও এই পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ খতম করার জন্য।

আমার কৃষক-শ্রমিক ভায়েরা,

আমার মা-বোনেরা কষ্ট স্বীকার করে দলে দলে এই সভায় যোগদান করেছে; এই অঞ্চলের কৃষকেরা এই সম্মেলনে সর্বতোভাবে আন্তরিক সাহায্য করেছে, আমি তাদের মোবারকবাদ জানাই। আমি স্বেচ্ছাসেবকগণকে মোবারকবাদ জানাই। এই অঞ্চলের যুবকেরা সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে, প্রচার চালিয়েছে, আমি জানাই তাদেরকে মোবারকবাদ। একবার জোরদার স্বরে বলুন-

আজাদ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
স্বাধীন বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ।

(সূত্রঃ বাংলার কৃষক তোমরা প্রস্তুত হও, প্রকাশকঃ শ্রী মনীন্দ্র মহাজন, মে ১৯৭২-চট্টগ্রাম)

-০-

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক হককথা পত্রিকার উপর নিপীড়ন

মওলানা ভাসানী দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করে মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতের সাথে যে ৭ টি গোপন চুক্তি হয়েছে এবং পাকিস্তানি শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতীয় শাসক-শোষকদের অবাধ মৃগয়ার ক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে, লীগ-রক্ষীবাহিনীর হাতে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের জীবনহানি ও অত্যাচার নিপীড়ন চলছে এর বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন এবং ঐক্যবদ্ধ করতে চাইলেন। এজন্য প্রয়োজন ছিল একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকা। মওলানা ভাসানীর পৃষ্টপোষকতায় সাপ্তাহিক হককথা ওই দুর্দিনে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। মুজিবী সরকারের ক্রমবর্ধমান অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে হককথা আগাগোড়া ছিল প্রতিবাদমুখর। ১৯৭২ সালে ষাট হাজার থেকে সত্তর হাজার হককথা প্রকাশিত হওয়ার পর নিমেষে শেষ হয়ে যেত। দু'টাকার পত্রিকা দশটাকাতেও বিক্রি হত। সদ্য স্বাধীন দেশে কোন পত্রিকার এমন জনপ্রিয়তা ওই সময় এদেশের রেকর্ড সৃষ্টিকারী এবং দুর্লভ। মানুষ হককথাকে তাদের মুখপত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ফলে এর কণ্ঠরোধ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠে মুজিব সরকার। প্রতিমুহূর্তে গ্রেফতার, অত্যাচার এবং প্রাণ হারানোর আশঙ্কা নিয়ে হককথা বের করতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। এদিকে সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয় হককথা। হককথার আয়ের একমাত্র উৎস হয়ে দাঁড়ায় এর পাঠক।

মফঃস্বলের জেলা শহর টাঙ্গাইল থেকে প্রতি সপ্তাহে খবর সংগ্রহ, লেখা তৈরি, হাতে কম্পোজ করা, প্রেসের বিদ্যুৎ বিভ্রাট এড়িয়ে প্রুফ দেখে প্রতি সপ্তাহে হককথা ছাপানো, বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার চিঠি পড়া, সেগুলো থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ এবং উপাত্ত গ্রহণ এবং বাস্তবতা যাচাই করা এবং রাজধানী ঢাকাসহ দেশব্যাপী বিতরণের ব্যবস্থা করা দুরূহ হলেও কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতার জন্য তা সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছিল।

হককথা প্রকাশিত হয় ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ। প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক মওলানা ভাসানী হককথার সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করেন সৈয়দ ইরফানুল বারীর উপর। প্রথম সংখ্যায় 'হককথা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'হককথা বলবার নিশ্চিত সম্ভাবনা নিয়ে হককথা বের হলো। এতো আল্লাহর অসীম করুণা। বলিষ্ঠ কারণে সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা এবার মানুষের খেদমত করে যেতে পারবে, এ ভরসা আমাদের রইল। মফঃস্বলের কাগজ নিঃসন্দেহে প্রয়োজনের চেয়ে কথাটা মিটায় বেশি। অন্তত পাঠক মহল তাই আশা করে থাকেন। হককথার লক্ষ্য আন্তরিকতার সাথে দুটাই মিটিয়ে দেয়া। সমাজের সকল স্তরের রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গতিশীল রূপরেখা তুলে ধরে সে প্রয়োজনের পরিচ্ছেদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়। তদুপরি গ্রামীণ পরিবেশে পালিত সরল ভাষ্যকার-লেখকদের প্রাণবন্ত সখটাও জুড়ে দিতে চায়। সব মিলে মানুষের দরবারে হককথা পরিবেশ ও যুগের হক আদায় করতে বদ্ধপরিকর। হককথা কতদূর হককথা বলতে পারবে এও একটি প্রশ্ন। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখা নিশ্চয়ই বাচালতা বৈ কিছু নয়। আমরাও সে বিষয়ে সজাগ। সাংবাদিকতার জগতে নির্ভীক ও স্পষ্টভাষী বলতে যা বোঝায় আমরা তাই হতে যাচ্ছি কিনা পাঠকবর্গই এর জবাব দিবেন। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতি হিসেবে আমরা যে হিম্মত পেয়েছি তার পরশ নিশ্চয়ই এতে

www.pathagar.com

লাগবে। আবার নবীন দেশে প্রাচীন সমস্যা যে প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি করবে, তার ছোঁয়াও আমাদের লাগবে। সব মিলে, আমরা বাস্তবানুগ হককথা বলবার প্রয়াসী, সৌখিন কলবাজিতে নেই। তাই লেখক ও পাঠক মহলে হককথা একটি স্থান করে নিবার আশা রেখে, অবশ্য কার মুখপত্র হিসেবে আজকের দুনিয়ায় তা একটি বড় প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। এর জবাব হককথা নতুন লেখক-পাঠকের জন্যে জন্মে রয়েছে। আজ মানুষের মুক্তির যুগ। বিপ্লবের হাওয়া বইছে। কে জানে, মুখপত্রটির সকল সমঝদার কেবল ন্যায় ও সাধুতাকেই ভালবাসে কিনা, শুধু বিপ্লবের পথকেই মুক্তির নিশানা মনে করে কিনা।'

শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইলের ঠিকানায় হককথার ডিক্লারেশন নেয়া হয়েছিল। প্রথম থেকেই এটি ছাপানোর সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন কবি বুলবুল খান মাহবুব। সদর সড়ক, টাঙ্গাইলে অবস্থিত কল্লোল প্রেস থেকেই মুদ্রিত হতে থাকে হককথা। প্রথম সংখ্যাতেই আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করা হয়। বলা হয়, 'গণবিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র কায়েমের নজীর নেই, তবে-'। মন্ত্রী-এমসিএদের দুনীর্তির কথা 'ইহা কি সত্য?' কলামের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় প্রথম সংখ্যা থেকেই। ধর্মপ্রাণ মানুষকে 'মুরিদের দরবার' কলামের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে সাম্য, শান্তি, মুক্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। হককথার প্রথম সংখ্যা হতেই মোহাম্মদ হোসেন 'মুরিদের দরবার' বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। এ সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। ফরিদ উদ্দিন খান তখন সূর্যসেন হলে থেকে অর্থনীতিতে অধ্যয়ন করতেন। অধ্যাপক মুমিন চৌধুরী তখন ইকবাল হলের প্রভোস্ট ছিলেন। তাদের প্রচেষ্টায় সূর্যসেন হলে মোহাম্মদ হোসেনের সীট হয়েছিল। মুরিদের দরবারে মোহাম্মদ হোসেনের প্রথম নিবন্ধের শিরোনাম ছিল 'স্রষ্টার ইচ্ছাই চরম ইচ্ছা'। লেখাটি শেষ হয়েছিল দ্বিতীয় সংখ্যায়। পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে 'সভ্যতার অন্তরালে', 'মনের আনন্দ', 'তাসাউফের সাধনা', 'ভাসানীর বিশ্বাস', 'পীর কাহিনী', 'শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে', 'ভাসানী চরিত', 'দার্শনিকের দৃষ্টিতে ইসলামী সমাজতন্ত্র'-এরূপ আরও অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক শাহ আহমদ রেজার পত্রিকায় হাতেখড়ি এখানেই। কল্কি সমাচার লিখতেন শামসুল আরেফিন। প্রুফ দেখার ব্যাপারে এস এম রেজা সবসময় নিজে থেকে সহায়তা করছেন। আতিকুর রহমান সালু সংগ্রহ করেছেন অনেক টাটকা খবর। কয়েকটি সংখ্যায় লেখা তৈরি এবং অন্যান্য বিষয়ে খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ এবং সিনিয়র সাংবাদিক আব্দুর রহিম আজাদ এবং নাজিম উদ্দিন মোস্তান দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন। বুলবুল খান মাহবুব কল্লোল মুদ্রায়ণের মালিক হিসেবে প্রকাশনার তদারকি ছাড়াও সবগুলো কাজে জড়িত থেকেছেন। বুলবুল খান মাহবুবের নিজের বক্তব্য এভাবে- 'সারাদিন পরিশ্রমের পর প্রেস সংলগ্ন বাসায় নিজ রুমে সবেমাত্র শয্যা গ্রহণ করেছি। বিছানায় শুয়েই মাত্র দশ গজ দূরে প্রেসের ঘর থেকে ভেসে আসছে মেশিনের শব্দ। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল, যা ছিল ওই সময় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে অথবা বিশ্রী শব্দ করে মেশিনের মোটর বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শয্যাত্যাগ এবং ক্লান্ত শরীর নিয়ে প্রেস ঘরে দৌড়। মাঘ মাসের শীতের রাতে সবেমাত্র শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে উষ্ণলেপের নীচে সামান্য তন্দ্রার মত এসেছে, এমন সময় দরজায় খটখট আওয়াজের সঙ্গে সৈয়দ ইরফানুল বারীর কণ্ঠ। বুলবুল ভাই, খুবই জরুরি ব্যাপার, একটু আসতে হয়। আমার স্ত্রী তাহমিনা মাহবুব রেবা রাতে দোকান বন্ধ হয়ে গেলে চা বানিয়ে দিয়েছে বারবার। অন্য সহযোগিতা

www.pathagar.com

তো ছিলই। সিগারেটের সঙ্গে চুন-খর ছাড়া মিষ্টি জর্দার পান খাবার অভ্যাস ছিল। প্রেসের লেখার টেবিলে চা, পান, সিগারেটের আয়োজন রেখেই বারী ভাই আমাকে ডেকে এনেছেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে লিখতে হবে এবং আজ রাতের মধ্যে লেখা শেষ করে কম্পোজে দিতে হবে। বসে গেছি দুজনে। এ সময় হুজুর ব্যতীত হককথার কথা কল্পনাও করা যায় না। কত রাত কেটে গেছে এমনি করে। সারারাত প্রেসে কাজ চলছে। দশ-বারোজন কম্পোজিটর, তিন-চারজন মেশিনম্যান এবং আমরা দু'তিনজন। মেইন রোডে অবস্থিত কল্লোল মুদ্রায়ণে হককথার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের জন্য বরাদ্দ রুমে বসে লেখার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে রাস্তায় দাঁড়াতাম মধ্যরাতের ঘুমন্ত টাঙ্গাইলের চেহারা দেখতে দেখতে গল্প করার জন্য। বিতরণ বিভাগে পত্রিকা গুণে প্যাকেট করে ঠিকানা লেখা, ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের কাজে আব্দুল মতীন, বাহার, খোস মাসুদ নিয়োজিত ছিল। সহায়তা করেছে চট্টগ্রামের মাহবুব আলম। আমার প্রেসের ম্যানেজার কাম-কম্পোজে দক্ষ প্রেস কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা দাইন্যার আব্দুর রহমান, ইজ্জত আলী, মন্টুসহ অন্যান্য কর্মচারীও হককথার কাজ করতে করতে হককথা পরিবারভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। মওলানা ভাসানী বটগাছের মত ছায়া দিয়ে আছেন আর তখন টাঙ্গাইলে আমার প্রভাবও কিছুটা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই হুমকি-ধমকি খুব সফল হতে পারেনি। তবু চক্রান্ত হয়েছে বহুবার। একদিন হুজুর সন্তোষে ডেকে পাঠালেন। বুলবুল, হককথা তোমার প্রেস থেকে বের হচ্ছে, তবু আমি তোমার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন নই। তুমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলে। ন্যাপ, শ্রমিক ফেডারেশন এবং কৃষক সমিতির তুমি নেতা। ছাত্ররাও তোমার নেতৃত্ব মানে। আর কাদরীর (কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম) সাথেও তোমার ভাল সম্পর্ক। তোমাকে কেউ ঘাটাবে না। আমার চিন্তা বারীকে নিয়ে (সৈয়দ ইরফানুল বারী)। মাঝে মাঝে অনেক রাত করে শহর থেকে তিনমাইল দূরে সন্তোষে ফেরে। তুমি এখন থেকে রাতে টাঙ্গাইলে ওকে রেখে দিও। যদি ফিরতেই হয় তবে তুমি নিজে কাগমারী পুল পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দিও। জ্বী-আচ্ছা। আর একজন মানুষের কথা বলতেই হয় আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল লতীফ সিদ্দিকী এবং মুক্তিযুদ্ধের জীবন্ত কিংবদন্তী আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তমের পিতা মরহুম আব্দুল আলী সিদ্দিকী ছিলেন হককথার ভক্ত পাঠক। তিনি হককথার সঙ্গে আমার নিবিড় সংশ্লিষ্টতার কারণে আমার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। প্রায়ই রাত ১১-১২টার দিকে ফোন করে আমি বাড়ি ফিরেছি কিনা সে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন। দু'চারটে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পেয়েছি উনার কাছে। আমার জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য আমার স্ত্রীকে উপদেশ দিয়েছেন বহুবার। কি করলে পত্রিকা আরও ভাল হবে সে সম্পর্কেও মতামত জানাতেন তিনি.....।' *(সূত্রঃ হক-কথার দিনরাত্রি এবং আমরা ক'জন, বুলবুল খান মাহবুব, দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ নভেম্বর-২০০২)*

সাপ্তাহিক হককথার প্রথম চার সংখ্যার প্রিন্টার্স লাইনে মুদ্রিত হয়েছে কল্লোল প্রেসের নাম। পঞ্চম সংখ্যা থেকে আইন অনুযায়ী শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইলের নাম চলে আসে প্রিন্টার্স লাইনে। যদিও মুদ্রণ কাজটি চলতে থাকে কল্লোলেই। সম্পূর্ণ হ্যান্ড কম্পোজে বিন্যাস করা হককথা ঢাকায় মুদ্রণের জন্য স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাপা হত কল্লোলের হাফ ডিমাই ও সিঙ্গেল ডিমাই প্রেসে।

১৯৭২ সালের ২০ জুন মঙ্গলবার টাঙ্গাইলের কল্লোল প্রেসে কর্মরত অবস্থায় পুলিশ গ্রেফতার করে সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে টাঙ্গাইল

www.pathagar.com

এবং ঢাকাসহ সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। এই প্রথমবারের মত, স্বাধীন বাংলাদেশে সত্য প্রকাশের দায়ে একজন সম্পাদককে গ্রেফতার করে ঝুলিয়ে দেয়া হয় মিথ্যা মামলায়। ২৩ জুন প্রকাশিত হককথার সপ্তদশ সংখ্যায় লীড নিউজ হয়, 'মুজিববাদী গণতন্ত্রের নগ্ন হামলাঃ হককথা সম্পাদক গ্রেফতার।' বলা হয়-

'সভা ও মিছিলে বিক্ষোভ প্রতিবাদ
উচ্ছেদ করো ফ্যাসিবাদী বুনিয়াদ
পদাঘাতে ভাঙো শোষকের কারাগার
হককথা আজ প্রত্যেক জনতার।

সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণিত করে, স্বাধীন দেশে বাক-স্বাধীনতার কণ্ঠ রোধের নির্লজ্জ প্রয়াসের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বাংলাদেশ সরকার তার পুলিশ বাহিনী দিয়ে সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক জনাব সৈয়দ ইরফানুল বারীকে গত ২০শে জুন মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে বারোটার সময় বিনা গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় প্রচণ্ড ধাপ্পাবাজীর মধ্য দিয়ে গ্রেপ্তার করেছে। জনাব ইরফানুল বারী যখন সম্পাদনার কাজে ছাপাখানার কার্যালয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন জনৈক উর্ধ্বতন অফিসার পুলিশ বাহিনীসহ উপস্থিত হয়ে জানায় যে, জেলা প্রশাসক তাঁর সাথে আলাপ করতে চান। অফিসারটির সাথে জনাব বারী জীপে চড়ে চলে যাওয়ার পর খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জেলা প্রশাসক ঐদিন সরকারি কাজে টাঙ্গাইলের বাইরে গেছেন। মুখে গণতন্ত্রের বড় বড় বুলি কপচালেও বর্তমান সরকার অন্যতম গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নির্লজ্জ হামলা চালিয়ে সম্পূর্ণ পাকিস্তানি কায়দায় জনাব ইরফানুল বারীকে গ্রেপ্তার করেছে।'

একই সংখ্যার উপসম্পাদকীয়তে বলা হলো-

'সংবাদপত্রের উপর হামলা, হককথা সম্পাদককে আকস্মিকভাবে গ্রেপ্তার করে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর নগ্ন হামলার থাবা বিস্তার করেছেন। সার্বিক মুক্তি এবং স্বাধীনতার আকাজ্ক্ষাতেই এদেশের তিরিশ লাখ বীর সন্তান অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন। অথচ, তাদেরই লাশ মাড়িয়ে ক্ষমতায় অভিষিক্ত হবার ছয় মাসের মধ্যেই সংবাদপত্র ও শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার হরণ করে বর্তমান সরকার নির্লজ্জের মতো তার সকল অঙ্গীকার জলাঞ্জলি দিয়েছেন। হককথা ক্ষমতা দখল বা কারো দালালির লালসা থেকে উৎসারিত হয়নি। ঘুষখোর, চোরাকারবারী, লুটপাট সমিতি, দালাল রাজনীতিবিদ, স্বৈরাচারী আমলা, মন্ত্রী ও সরকার এবং সকল চেহারার শোষকদের কবল থেকে জনতাকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই হককথার বলিষ্ঠ ভূমিকা। হককথা বিরোধিতা না করলে লুটপাট আর চোরাকারবার দেশ ও সরকারের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতো। রুশ-ভারতসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণবাদীরা বাংলাদেশের জনতাকে গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করার যে চক্রান্তে মেতে উঠছে, হককথা তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলে স্বাধীনতাকে সাচ্চা অর্থে অর্থবহ করে তোলার প্রচেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে। সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে গড়েছে প্রতিরোধের দৃঢ় প্রাচীর। তাই হককথা এদেশের নির্যাতিত প্রতিটি জনতার বলিষ্ঠ সমর্থন পেয়েছে। শিল্প কারখানা নিয়ন্ত্রণের চোরগলিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ সংবাদপত্রকে আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত করার এবং সাংবাদিকদের ফরমায়েশের জোয়ালে বন্দি করার যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে হককথা তার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। পাকিস্তানি সরকারগুলোর মতো বর্তমান সরকারও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নস্যাতের নেশায় মেতে উঠেছে। কিছুদিন আগে সাপ্তাহিক গণশক্তি অফিসে তালা ঝুলিয়ে

www.pathagar.com

সম্পাদক ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এবার গ্রেপ্তার করা হলো হককথার সম্পাদককে। এই গ্রেপ্তারের মধ্যদিয়ে সরকার জনগণের পরিপূর্ণ সার্বভৌমত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষাকে গলাটিপে হত্যা করলেন। হককথার সম্পাদককে অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তিদান এবং সংবাদপত্র ও শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানিয়ে সরকারকে আমরা শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতেরও অন্তরীক্ষে দৃষ্টি রেখে কর্মপন্থা স্থির করতে অনুরোধ করছি। জনতার প্রতি আমাদের আবেদন, দমননীতি এবং গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠুন।'

সৈয়দ ইরফানুল বারীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ভাসানী প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত পৃথক পৃথক তারবার্তায় হককথা সম্পাদকের অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি দাবি করেন। কোনো অভিযোগ বা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা না দেখিয়ে সম্পাদকের এই পুলিশী গ্রেপ্তারকে অগণতান্ত্রিক ও বে-আইনী আখ্যা দিয়ে ভাসানী বলেন, 'শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার হরণের পর সরকার জনমতের বাহন সংবাদপত্রের উপর জঘন্য হামলা শুরু করেছে।' এর মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে তিনি সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সংগ্রামী জনতার প্রতি আহ্বান জানান। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দেশে শান্তি আনার আহ্বান জানিয়ে মওলানা বলেন, 'দমননীতি চালিয়ে দেশে শান্তি আনা যাবে না; বরং বাংলাদেশ দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হবে। জনাব ইরফানুল বারীকে কোনো মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে অত্যাচার না চালিয়ে অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি দেয়ার জন্য মওলানা ভাসানী সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান। *(সূত্রঃ সাপ্তাহিক হককথা, ২৩ জুন–১৯৭২)*

২১ জুন টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসককে জানানো হয়, মওলানা ভাসানী স্বয়ং আজ থেকে হককথার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। ২৩ জুন সংখ্যা থেকেই ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে মওলানার নাম প্রকাশিত হতে থাকে। ইরফানুল বারীকে গ্রেফতারের পর সরকার এবার চড়াও হয় বুলবুল খান মাহবুবের উপর। তিনিও শিকার হন সরকারি হেনস্থা ও পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের। সরকারি ক্রোধের অন্যতম কারণ ছিল, ইরফানুল বারী গ্রেফতারের পর তিনি এর নেপথ্যের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন এবং প্রকাশনার গতি অব্যাহত রাখেন।

বুলবুল খান মাহবুব লিখেছেন, '......পত্রিকার জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে তখন হঠাৎ করেই একদিন সম্পাদক ইরফানুল বারী গ্রেফতার হয়ে গেলেন। আমি বাইরে একটা কাজ সেরে প্রেসে ফিরে শুনলাম, পুলিশ আমার প্রেস থেকে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। সৈয়দ ইরফানুল বারী সার্বক্ষণিকভাবে হককথার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। সম্পাদনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক দায়দায়িত্বও পালন করতেন তিনি। এত সার্কুলেশন থাকলেও বিজ্ঞাপন জুটত না খুব বেশি। তাই অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ছিল সবসময়ই। কাগজ কেনা, কর্মচারীদের ওভারটাইমসহ বেতন ও আনুষঙ্গিক খরচ প্রায়ই বাকি থাকত। তবু একটা টিম স্পিরিট ছিল বলে সবাই হাসিমুখে সব কষ্ট স্বীকার করে নিয়ে হককথার কাজে জড়িত থেকেছে। বারী ভাই গ্রেফতার হয়ে গেলে কর্মচারীদের হাজার হাজার টাকা বেতন ও ওভারটাইম বাকি পড়ে গেল। দেখা দিল কাগজ সংকট। আমরা এবারও টিম স্পিরিট দিয়েই সব মোকাবিলা করলাম। আমার বিপদটা ছিল অন্য জায়গায়। প্রেসের মালিক হিসেবে হাজার হাজার টাকা দেনার নীচে পড়ে গেলাম আমি। পত্রিকা চালাতেই হবে। কাগজের দাম এবং কর্মচারীদের বকেয়ার পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। প্রেস বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। মওলানা ভাসানী হুজুর অবস্থাটা বুঝলেন। তিনি একটি চিঠি লিখে

www.pathagar.com

পাঠালেন আমার কাছে। কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য খরচ তিনি এখন সরাসরি দেবেন। আমার প্রেসের ঘরভাড়া, টাইপ, মেশিন ভাড়া এবং বিদ্যুৎ খরচ বাবদ মাসে চৌদ্দশত টাকা তিনি আমাকে দেবেন। যাক অন্তত কর্মচারীদের বেতনের বোঝা আমাকে বইতে হইবে না। মোহাম্মদ হোসেনের টাঙ্গাইল- সন্তোষ দৌড়াদৌড়ি এবার বেড়ে গেল। হককথার চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আবার এল নতুন ধরনের আক্রমণ। হককথার ডিক্লারেশন ছিল সন্তোষের শান্তি প্রেসের নামে। শান্তি প্রেস থেকে ছাপানোর মত টাইপ এবং প্রিন্টিং মেশিন ছিল না। কল্লোল প্রেসের ব্যাপারে আইবি পুলিশ এবার আমার উপর মনস্তাত্ত্বিক অপারেশন চালাল। দীর্ঘক্ষণ প্রশ্ন এবং জেরার পর আমাকে কাবু করতে না পেরে রণেভঙ্গ দিল ওরা। প্রতি মুহূর্তে গ্রেফতারের আশঙ্কা থাকলেও পত্রিকা ছাপানো বন্ধ থাকল না একদিনের জন্যও। পাশাপাশি হককথা সম্পাদকের মুক্তির জন্য দেয়াল লিখন, বিবৃতি প্রকাশ এবং প্রতিবাদ সভার আয়োজন করতে হচ্ছে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। সরকারের দমননীতিও জোরদার হচ্ছে দেশব্যাপী। ইরফানুল বারী গ্রেফতার হওয়ায় আমাদের কাজের চাপ যেমন বেড়েছে, তেমনি সংবাদ সংগ্রহ এবং হককথা প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতিও পরিবর্তন করতে হচ্ছিল মাঝে-মাঝেই। এবার আমরা আরও সচেতনভাবে সবকিছু করতে লাগলাম। হুজুর এবার ডাকলেন না। হঠাৎ করে নিজেই একদিন চলে এলেন আমার বাসায়। প্রেসে কিছুক্ষণ থেকে ভেতরের ঘরে বসলেন। বুলবুল, এবার হয়ত তোমার উপরও বিপদ নেমে আসতে পারে। তোমার প্রেস বন্ধ করে দিয়ে তোমাকে ওরা গ্রেফতার করতে পারে। শান্তি প্রেসে কম্পোজ করে কল্লোল প্রেসে ফ্লাইং ইম্প্রেশনের কথা বললেও ওরা এখন ছাড়বে না। একটু থেমে বললেন, তোমার গ্রেফতার হওয়া চলবে না। টাঙ্গাইলের রাজনীতির ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য তোমাকে মুক্ত থাকতে হবে। আমি ঠিক করেছি অসুবিধা হলেও ঢাকা থেকেই পত্রিকা বের করতে হবে। ঠিক আছে হুজুর আপনি যা বলবেন তাই হবে। তোমরা এখন থেকে লিখবে, ঢাকার মোস্তান, আজাদ ওরা আছে। মোহাম্মদ হোসেন এখন থেকে লেখা নিয়ে যাবে এবং ঢাকার লেখা সংগ্রহ করে প্রেসে দেবে। তাই হবে হুজুর। হককথা ঢাকায় চলে গেল। এর কয়েক মাস পর বন্ধ হয়ে গেল। '

হককথার সম্পাদক গ্রেফতার হওয়ার পর মওলানা ভাসানীর অসংখ্য শিক্ষিত ভক্ত-অনুরাগী থাকা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টি মোহাম্মদ হোসেনের উপর নিপতিত হয়। তাই হককথাকে ঢাকা থেকে মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে এর পরিচালনা ও সকল যোগাযোগের দায়িত্ব মোহাম্মদ হোসেনের উপর বর্তায়। টাঙ্গাইল-ঢাকা যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠেন মোহাম্মদ হোসেন। ঢাকা থেকেও লেখা সংগ্রহের দায়িত্ব পড়ে তারই ওপর। বাহারুল ইসলামের মাধ্যমে মওলানা ভাসানী সংবাদ পেয়ে মোহাম্মদ হোসেন সন্তোষ গিয়ে হককথা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ হোসেন এ সময় ভেবেছিলেন তার বুঝি আর এম.এ পাস করা হবে না। কারণ ভাসানীর ইচ্ছাতে তিনি এম.এ ভর্তি হয়েছিলেন আবার তাঁরই ইচ্ছাতেই আবার সন্তোষে ফিরে যেতে হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ হোসেন নিজেই লিখেছেন, 'সংবাদ পাওয়ার পরের দিন বিছানাপত্র, বই-পুস্তক বেঁধে সন্তোষ রওনা হলাম। ফরিদ ভাই কারণ কি জানতে চাইলে শুধু জানালাম, মওলানা ভাসানী হুজুর জরুরি তলব করেছেন-আবার আসব ইনশাআল্লাহ। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি বটে কিন্তু পড়াশুনার জন্য নয়, হককথা ছাপানোর ব্যাপারে সহযোগিতা প্রাপ্তির জন্য বন্ধুর সন্ধানে। অবশ্য হুজুরের ইন্তেকালের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর হতে পরবর্তীতে শিক্ষার উপর ডিপ্লোমা ডিগ্রি গ্রহণ করেছিলাম।

www.pathagar.com

ফরিদ উদ্দিন খান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুমিন চৌধুরীর সহায়তা নিয়েছি। এ সময় ২/৩টি সংখ্যা রহিম আজাদের সহযোগিতায় বের করি। তিনি তখন দৈনিক আজাদ পত্রিকায় কাজ করতেন। তিনি অপারগতা প্রকাশ করায় বাবুবাজার দিল আরাম হোটেলের মালিক আব্দুর রশিদ সাহেবের প্রেস থেকে পত্রিকাটি বের করার ব্যবস্থা করি। হোটেল দিল আরামের মালিক ছিলেন টাঙ্গাইলের অধিবাসী। টাঙ্গাইলে তার রশিদিয়া লাইব্রেরী নামে তখন পর্যন্তও একটি লাইব্রেরী ছিল। তার বড় ছেলে আব্দুর রকীব প্রেস চালানোর দায়িত্বে ছিলেন। আব্দুর রকীব সাহেব উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। তিনি আমাকে আন্তরিকভাবে হককথা ছাপানোর ব্যাপারে সহযোগিতা করতেন। তাদের অটো প্রিন্টিং প্রেস ছিল, কম্পোজ সেকশন ছিল দু'টো, একটা দ্বিতীয় তলায়, অপরটি গ্রাউন্ড ফ্লোরে। তিনি হককথার কম্পোজের কাজ সব দ্বিতীয় তলায় করার ব্যবস্থা করলেন। সহসাই যেন কেউ জানতে না পারে। আর হককথা ছাপা হত রাত ১০টার পর। রাতেই পত্রিকা ভাঁজ এবং প্যাকেট করে রাখা হত। নির্দিষ্ট দুটো ঠেলাগাড়িতে সকাল ৬টার মধ্যে পত্রিকা উঠিয়ে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেয়া হত। ঠেলাগাড়ি পৌঁছে যেত দৈনিক বাংলার মোড় থেকে একটু দক্ষিণে হকার এসোসিয়েশন অফিসে। সেখানে হকার এসোসিয়েশনের সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন বিভিন্ন এলাকার মধ্যে ১ লাখ ৩০ হাজার পত্রিকা বিতরণ করে দিতেন। সে এক এলাহী কাণ্ড। হুজুর এ সময় হককথার সার্বিক বিষয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য হককথার গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি একটি আবেদন জানিয়ে পত্রিকায় একটি বিবৃতি দেন। আজকের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তখন নাম ছিল ইসলামিক একাডেমী। এ একাডেমীর ডাইরেক্টর ছিলেন অধ্যাপক গফুর ও অধ্যাপক শাহেদ আলী এবং মওলানা এমদাদ আলীও একাডেমীতে কাজ করতেন। ফরিদ উদ্দিন খান তাহাদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। মওলানা ভাসানী হুজুরের নির্দেশে আমি যে হককথা বের করছি এ কথা যেন তাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হল। পরবর্তীতে তাদের সহযোগিতা যখন নিতাম এবং সে মোতাবেক যখন হককথা বের হত, তখন তাদের বিশ্বাস আমার প্রতি দৃঢ়তর হয়। এ সময় অধ্যাপক মুমিন চৌধুরী আমাকে নিয়ে মাঝে মধ্যে অধ্যক্ষ দেওয়া মোহাম্মদ আজরফ ও পীর দুদু মিয়া প্রমুখের কাছে নিয়ে যেতেন এবং দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আমাকে সাবধানে থাকতে হত। আমি যে হককথা ছাপানোর দায়িত্বে আছি এ কথা প্রকাশ হলে ভয়াবহ বিপদ ছিল। থাকার সমস্যা ছিল। ঢাকায় নতুন এসেছি, তেমন পরিচিত ব্যক্তিও নেই। রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীদের বাড়িতে থাকতে হুজুর নিষেধ করেছেন। সব জানতে পেরে অধ্যাপক মুমিন চৌধুরী ইকবাল হলে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখানে থেকে কয়েক সপ্তাহ হককথা বের করলাম। অতঃপর হুজুর ঢাকায় এলে নাজিম উদ্দিন মোস্তানের ছোট ভাই নাঈমের সাথে আমার পরিচয় হয়। নাজিম উদ্দিন মোস্তান পাকবাহিনীর অত্যাচারের সময় কিছুদিন সন্তোষে হুজুরের আশ্রয়ে ছিলেন। সেই সূত্রে তার সাথে পরিচয়। যাক নাঈম তখন সোহ্‌রাওয়ার্দী কলেজে পড়ে, সে খুব বেপরোয়া ধরনের ছেলে ছিল। তার প্রেসের কম্পোজের কাজ জানা ছিল। সে দক্ষিণ মৈশণ্ডিতে আমাকে একটি ছোট কক্ষ ভাড়া করে দেয়। আমি ইকবাল হল থেকে চলে আসি দক্ষিণ মৈশণ্ডিতে। নাজিম মোস্তান সেই এলাকাতেই থাকতেন। নাঈম তার ভাইয়ের সাথেই থাকত। তবে প্রায় সারাক্ষণ আমার সাথেই থাকত। দক্ষিণ মৈশণ্ডি হতে প্রতিদিন বাবুবাজার মোড়ে অবস্থিত প্রেসে যাওয়া কোন দিন সন্ধ্যায় আবার কখনও রাতে যাতায়াত রোমাঞ্চকরই ছিল বটে। তবে ইকবাল হলে অত্যন্ত অশান্ত পরিবেশে আমাকে থাকতে হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন প্রায় প্রতিদিনই ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ চলত। এ সময় নাজিম উদ্দিন মোস্তান যতদূর মনে পড়ে দৈনিক সংবাদে কাজ করতেন। তাকে ধরলাম

www.pathagar.com

তিনি যেন পত্রিকায় ফার্স্ট লীড, সেকেন্ড লীড এবং হুজুরের নির্দেশিত সম্পাদকীয় কলাম লিখে দেন। তিনি রাজি হলেন। কিন্তু শর্ত হল কেউ যেন জানতে না পারে। তিনি এমন ব্যক্তি যে, কারও কাছে গল্পচ্ছলেও বোধহয় হককথায় যে তিনি কাজ করছেন এ কথা কাউকে বলেননি। আজ যদি এ বিষয়ে আমি কলম না ধরতাম তাহলে তার কথা অনুহ্যই থেকে যেতো। ইরফানুল বারীর গ্রেফতারের পর হতে প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তার লেখা ছাপা হত। হককথা বের করার ক্ষেত্রে তার অবদান অপরিসীম, যা আমি ব্যতীত আর কেউ জানে না। চট্টগ্রামের ক্যাপ্টেন শামসুল ইসলাম খুব সম্ভব ন্যাপের ট্রেজারার ছিলেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে ঢাকা এসে আমার কাছে থেকে কয়েক কপি হককথা নিয়ে যেতেন। তিনি চট্টগ্রামের জন্য ৩০ হাজার হককথা ছাপাতেন। হককথার গ্রাহক ছিল প্রচুর, গ্রামে-গঞ্জে ডাকযোগে হককথা পাঠাতে হত। মোঃ রওশন আলী হিসাব বিভাগে, বাহারুল ইসলাম, আব্দুল মতিন এরা দু'জন সার্কুলেশন ম্যানেজারের কাজ করত। তারা সন্তোষে থেকে হুজুরের নির্দেশে বিভিন্ন জায়গায় পত্রিকা পাঠাত। নকিম উদ্দিন বেপারীর ছেলে খোশ মাহমুদও এসময় তাদের সাথে কাজ করত। গোয়ালপাড়ার বাথুয়াজানির কাজিম উদ্দিন ও ভুরুঙ্গামারীর মোঃ ইউনুছ আলী এ কাজে সন্তোষে কিছুদিন ছিল। ফরিদপুরের জাফর ভাই ফরিদপুরের জন্য পত্রিকা নিতেন। এ সময় ইস্রাফিল নামে একটি ছেলেও পত্রিকা বিক্রির কাজ করত। ফরিদপুরের আরো একজন জাফর নামে লোক ছিল। তাকে আমরা তোতলা জাফর বলতাম। সৈয়দ ইরফানুল বারী সাহেবের সাথে চট্টগ্রামের মাহবুবুল আলম ভাইও সন্তোষে থেকে কিছুদিন হককথায় কাজ করেছেন। বিচারপতি নূরুল ইসলামের শ্যালক জানে আলম চৌধুরী হককথা মানিকগঞ্জে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করতেন। খঃ সাইদুল আলম জাহাঙ্গীরও মাঝে মাঝে এ পত্রিকায় লিখেছেন। টাঙ্গাইলের শাহ আহমদ রেজা ও অধ্যাপক শামসুল আরেফীন সাহেব কিছুদিন সন্তোষে থেকে হককথায় কাজ করেছেন। হুজুর প্রতিসংখ্যা পত্রিকা বের হওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা যাতে আরো জনগণের জন্য আকর্ষণীয় হয় আরো আওয়ামী লীগের গোপন কারসাজির কথা দেশের মানুষের কাছে ফাঁস করে দেয়া হয়, ঘুষ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চোরাকারবারের কথা প্রকাশ হয় তজ্জন্য তাগিদ দিতেন। আমরা তাই করার চেষ্টা করতাম। নাজিম উদ্দিন মোস্তান ভাইকে তাগিদ দিতাম। সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা হতে ঘুষ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও চোরাকারবারের সংবাদ ডাকযোগে আসত। আমি সেগুলো বাছাই করে পত্রিকায় ছাপাতাম। এ সময় হককথা কোথা থেকে কিভাবে বের হচ্ছে তা দেখার জন্য ডিআইবি ও পুলিশী তল্লাশি চলছিল। এককথা টাঙ্গাইলের সন্তোষের শান্তি প্রেস হতে বের হয় এটাই সবাই জানত। কিন্তু ঢাকা আসে-কিভাবে এটার জন্য পুলিশ মরিয়া হয়ে সোর্স খুঁজছিল........।' *(সূত্রঃ মওলানা ভাসানীর হককথা, মোহাম্মদ হোসেন, দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ নভেম্বর-২০০২)*

প্রিন্টার্স লাইনে শান্তি প্রেসের নাম ছাপা হলেও, এত বড় কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করা যে ছোট মুদ্রণালয়টির পক্ষে সম্ভব না তা পুলিশ বুঝে গিয়েছিল। কাজটি ঢাকা থেকে হচ্ছে। কিন্তু কোন প্রেসে? কুল-কিনারা পাচ্ছিল না পুলিশ। এর মধ্যে ঢাকা থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিলে, পুলিশ রশিদিয়া প্রিন্টিং প্রেসের নাম জেনে যায়। প্রথম সংখ্যার থেকেই হককথার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮। পঞ্চম সংখ্যা ছাপা হয় ১০ পৃষ্ঠা। হককথার সাইজ ছিল ট্যাবলয়েড, ১৭ ইঞ্চি-১১ ইঞ্চি। নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছাপা হত হককথা।

হককথার চাঁদার হার ছিল বার্ষিক (সডাক) নয় টাকা, ষান্মাষিক (সডাক) পাঁচ টাকা। প্রথম চার সংখ্যার মূল্য ছিল পনের পয়সা। পঞ্চম সংখ্যা থেকে মূল্য নির্ধারিত হয় বিশ

www.pathagar.com

পয়সা। ১৪তম সংখ্যা থেকে মূল্য স্থির হয় পঁচিশ পয়সা। মওলানা ভাসানীর জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংখ্যা অর্থাৎ ৩১তম সংখ্যার মূল্য ছিল চল্লিশ পয়সা।

হককথা সম্পাদককে গ্রেপ্তারের মিথ্যে কারণ ব্যাখ্যা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রেরিত তারবার্তার জবাবে মওলানা ভাসানী ২৫ জুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর প্রেরিত তারবার্তায় বলেন, 'আপনার তারবার্তার জন্য ধন্যবাদ। দেশ স্বাধীন হবার বেশ কিছুদিন পর সৈয়দ ইরফানুল বারীকে সম্পাদক মনোনীত করে জেলা প্রশাসনের কাছে হককথার ডিক্লারেশন চেয়ে দরখাস্ত করলে তিনি বলেছিলেন সম্পাদকের বাল্যজীবন থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান না করে ডিক্লারেশন দেয়া সম্ভব নয়। সৈয়দ ইরফানুল বারীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ না পাওয়ায় জেলা প্রশাসক পরবর্তীকালে ডিক্লারেশন দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, যে আই বি অফিসাররা তাকে আদর্শ চরিত্রের লোক বলে সরকারের কাছে রিপোর্ট করেছিলেন, সেই অফিসারদের উপর নির্ভর করেই মিথ্যে অভিযোগে সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সরকারি রিপোর্টের উপর নির্ভর করে পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠী এককালে শেরে বাংলা ফজলুল হককে বিশ্বাসঘাতক, গাদ্দার বলে অভিহিত করেছিল, তারাই পরবর্তীকালে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ দিয়েছিল। সরকারের শুভদৃষ্টিতে পড়লে শয়তানও ফেরেশতা হয়, অন্যদিকে কোপানলে পড়লে ফেরেশতাও শয়তানে পরিণত হয়। আপনার প্রতি আমার অনুরোধ, হককথার ডিক্লারেশনের পূর্বে আই,বি, প্রদত্ত রিপোর্ট তদন্ত করে সঙ্গত সিদ্ধান্ত নিন।'

সাপ্তাহিক হককথার ৩০ জুন সংখ্যায় 'কেন হককথা সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হলো' শীর্ষক প্রতিবেদনে সরকারের গোমর ফাঁস করে দেয়া হলো। বলা হলো, 'প্রচণ্ড ধাপ্পাবাজীর মধ্য দিয়ে হককথা সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে গ্রেপ্তারের পর সংবাদপত্র ও শ্রমিকের অধিকার হরণকারী জুলুমবাজ সরকার এক হাস্যকর নাটকের অবতারণা করেছেন। বিদেশি লুটেরাদের এজেন্ট ও ফ্যাসিবাদী উচ্চাশী ক্ষমতাসীনদের মনে ত্রাস সৃষ্টিকারী সাপ্তাহিক হককথার উপর আঘাত হানার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পাদককে গ্রেপ্তার করার পর সরকার অলীক কেচ্ছা শুনিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করবার জন্য বলেছেন, দালাল হিসেবে দালাল আদেশবলে জনাব ইরফানুল বারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হককথা সম্পাদকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ২০ জুন প্রেরিত তারবার্তায় অবিলম্বে জনাব ইরফানুল বারীর ি র্তে মুক্তি দাবি করলে সরকার তড়িঘড়ি করে যা পেরেছে, তাই খাড়া করে বলেছেন, জনাব ইরফানুল বারী নাকি দখলদার আমলে দালালি করেছেন এবং এন.এস.এফ ইত্যাদির সাথে জড়িত ছিলেন। থলের বিড়াল তাদের কিঞ্চিত বেরিয়ে পড়েছে মওলানা ভাসানীর প্রতিবাদ তারবার্তার উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নানের প্রেরিত তারবার্তায়। মান্নান সাহেবের তারবার্তায় অলীক কেচ্ছার ফাঁকে বেফাঁসে হয়ত বলে ফেলা হয়েছে, হককথার মাধ্যমে জনতাকে উত্তেজিত করার অভিযোগও জনাব বারীর বিরুদ্ধে রয়েছে। সরকার যে কেচ্ছা শুনাচ্ছেন, তা হলোঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী মোনায়েম আমলের কুখ্যাত ছাত্র প্রতিষ্ঠান এনএসএফ-এর জঘন্য পাণ্ডা, পয়গামের মত কুখ্যাত কাগজে তিনি চাকরি করেছেন, মোনায়েম পুত্রের সাথে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং যুদ্ধের নয় মাসে তিনি সেনাবাহিনীর দালালি করেছেন। শুধু তাই নয়, এখানে মওলানা ভাসানীর পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছেন। মওলানা ভাসানী বোধহয় লোকটির আসল রূপ অবগত নন এবং হককথার মাধ্যমে জনতাকে উত্তেজিত করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি সরকার তদন্ত করে দেখছেন-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উত্তরের সারবস্তু

www.pathagar.com

হচ্ছে এই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ উত্তরের জবাবে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আরেকটি তারবার্তা পাঠিয়েছেন। তাতে তড়িঘড়ি বানানো সরকারি কেচ্ছাখানা ভুণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে। মওলানা বলেছেন, ক্ষমতাসীন জুলুমবাজ সরকারের কোপানলে পড়লে শয়তান ফেরেস্তা বনে যায়, তাতে ফেরেস্তা শয়তান বলে আখ্যা দানের এই চেষ্টা মোটেও বিস্ময়কর নয়। তারবার্তায় মওলানা ভাসানী উল্লেখ করেছেন, স্বাধীনতার দুমাস পর হককথা প্রকাশের জন্য ডিক্লারেশনের ব্যাপারে আবেদন করা হলে, সেই ডিক্লারেশনেই সৈয়দ ইরফানুল বারীকে সম্পাদক করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। টাঙ্গাইলের ডিসিকে ডিক্লারেশনটি তাড়াতাড়ি করে দেবার অনুরোধ জানানো হলে তিনি স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রচলিত বিধানের কথা তুলে বলেছিলেন, প্রস্তাবিত সম্পাদকের স্কুল জীবন থেকে ১৯৭২ সাল অবধি প্রতিটি বিষয় তদন্ত না করে ডিক্লারেশন দেয়ার উপায় নেই। স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীন স্পেশাল ব্রাঞ্চ, গোয়েন্দা বিভাগ, পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁর বাড়ি, তাঁর কর্মক্ষেত্র সর্বত্র পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষে রিপোর্ট দিলে তারই ভিত্তিতে পত্রিকায় তাকে সম্পাদক করা ও পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়। সে রিপোর্টে ইরফানুল বারীকে আদর্শ চরিত্রের বলে মন্তব্য করা হয়েছিল। কিন্তু হককথা ১৬ সংখ্যা প্রকাশের পরই আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তিটি সর্বাত্মক দালালে পরিণত হলেন এটা কেমন কথা? তিনি দালাল হলে বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডিক্লারেশন দিয়েছিল কেন? গোমর এইখানেই। দালালির কথাটা শ্রেফ কেচ্ছা। কেননা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যেও বলা হয়েছে জনাব ইরফানুল বারীর ব্যাপারে তদন্ত চলছে। অর্থাৎ দালালি তিনি করেছেন কিনা, এ বিষয়ে নিজেরাও তারা নিশ্চিত নয়। আটকানোর দরকার, তাই ক্ষমতার বহর দেখিয়ে জেলে পাঠানো হয়েছে। নাহলে তিনি মওলানা ভাসানীর নির্দেশে ঘুষ-দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি, চোরাকারবার, দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী, এমসিএ, সরকারি কর্মচারী এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রুশ-ভারতসহ অন্যান্য বিদেশি চক্রান্তের প্রতিবাদে যে দেশপ্রেমিকতার নজির স্থাপন করেছিলেন, তার ফলে স্বার্থবাদীদের সব খায়েশই নস্যাত হয়ে যেতো। মওলানা ভাসানী তারবার্তায় বর্তমান ক্ষমতাসীনদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, পাকিস্তানের প্রথম আমলেও এমনি খেলাই চলতো। যে শেরে বাংলা ফজলুল হককে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল সেই সরকারই পরে তাকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেছে। ক্ষমতাসীন জালেম সরকারের কোপানলে পড়লে ফেরেস্তা শয়তান না হয়ে আর যায় কোথায়? ১৯৬৯ সাল থেকেই মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে জনাব ইরফানুল বারী কাজ করে এসেছেন। যুদ্ধের নয়মাসে তিনি মওলানার নির্দেশে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা-টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ এবং আসামসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে অনেক দুঃসাহসিক দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। তাই এসব আজগুবি কেচ্ছা-কাহিনী স্থগিত রেখে অবিলম্বে হককথা সম্পাদককে মুক্তি দেয়ার জন্য মওলানা ভাসানী দাবি করেছেন।'

১৪ জুলাই 'দেশের সংগ্রামী ভাই-বোনদের প্রতি আমার (মওলানা ভাসানী) অনুরোধ' শীর্ষক একটি ছোট আবেদন প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক হককথায়। মওলানা ভাসানী আবেদনে বলেন, 'সাপ্তাহিক হককথার সম্পাদক গ্রেপ্তার হওয়ায় আমি যারপরনাই অসুবিধায় পড়িয়াছি। বহু এজেন্ট এখনো বাকি টাকা পরিশোধ করে নাই। নিজের প্রেস না থাকায় এবং সরকারের দমননীতির ভয়ে অন্য কেহও হককথা ছাপাইতে রাজি না হওয়ার দরুন অসুবিধা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় আপনারা প্রতি জেলা হইতে যদি অন্তত দুই হাজার করিয়া অর্থ সাহায্য করিতেন তাহা হইলে আমি একটি ডবল ডিমাই সাইজের মেশিন এবং প্রয়োজনীয় টাইপপত্র ক্রয় করিয়া স্বাধীনভাবে হককথা ছাপাইয়া শহরের মত

www.pathagar.com

গ্রামে গ্রামেও পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি। এজেন্টরা বিল পরিশোধ করিলে এবং আর্থিক টানাটানি হইতে রেহাই মিলিলে আপনাদের সমুদয় অর্থ ইনশাআল্লাহ ফেরত দিয়া দিব। আশা করি হককথাকে নিজের পত্রিকা ভাবিয়া সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিবেন। বিজ্ঞাপন ব্যতীত সংবাদপত্র চালানো সম্ভব নহে। আপনারা হককথার জন্য বিজ্ঞাপন পাঠাইলেও উপকৃত হইব।'

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২, ৩০ তম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর প্রেসের উপর নেমে আসে সরকারি খড়গ। সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবের সরকার বাতিল করে দেয় হককথার ডিক্লারেশন। ৩০ তম সংখ্যা ছিল সাপ্তাহিক হককথার শেষ সংখ্যা। এই সংখ্যায় প্রথম লীড ছিল, 'ঠক কে তাজুদ্দিন সাহেব-জনগণ-নয় আপনারা? সেই গোপন ৭টি চুক্তি'। এ সংখ্যার প্রথম পাতায় আরও সংবাদ ছিল, 'হুঁশিয়ার গুণ্ডা শাহী', 'লুটপাট সমিতির বিচার না করলে জনগণ শায়েস্তা শুরু করবে ভারত-রাশিয়ার কবর রচনা করে। বরিশালের জনসমুদ্রে জননেতা মওলানা ভাসানীর ঘোষণা'। আরো সংবাদ শিরোনাম ছিল, 'ও আদেশ সবার জন্য নয়', 'অর্থনৈতিক চিরদাসত্বের বন্ধনঃ বাংলাদেশ মাথা তুলতে পারবে না', 'আসুন আমরা মরা মানুষের হাড় দিয়ে আরেকটি ইন্দিরা মঞ্চ গড়ি', 'মওলানা ভাসানীর উত্তরবঙ্গ সফরঃ প্রমাণ করো ভারত এদেশে ছারখার করছে না' ইত্যাদি। 'হককথার কণ্ঠস্বর' শীর্ষক সর্বশেষ সম্পাদকীয়তে বলা হলো, 'হককথার কণ্ঠস্বর রোধ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার আর ভারতপ্রেমিক মস্কোওয়ালাদের চাপে তাঁবেদার সরকার ও ভারতের ক্রীড়ানকরা উঠে পড়ে লেগেছে। হককথা পত্রিকা বন্ধ হতে পারে কিন্তু হককথা চিরসত্য কথার মৃত্যু হবে না। বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠ মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী হককথা ইতিপূর্বে আরও তিনবার বন্ধ হয়েছিল। পাকিস্তান আমলে যে সরকারগুলি হককথার কণ্ঠ চেপে ধরেছিল, জনগণও তাদের লাথি দিয়ে উৎখাত করেছে ক্ষমতার আসন থেকে। এবার হককথা বন্ধ করার চক্রান্তে যারা সফল হবে, জনতার দরবারে তাদের বিচার হবে। রায় ব্যতিক্রম হবার কিছু সম্ভাবনা নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে হককথা এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে জনগণের মণিকোঠরে স্থান নিয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্য দেশী-বিদেশি চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠছে হককথা। অতি বাস্তব সত্য ঘটনাবলী সাহসিকতার সাথে জনগণের কাছে তুলে ধরে এ পত্রিকা এদেশের রাজনৈতিক সাংবাদিকতার ইতিহাসে সংযোজন করেছে নয়া অধ্যায়। এ দেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে প্রচার সংখ্যার সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে হককথা অর্জন করেছে সীমাহীন জনপ্রিয়তা। হককথা তাই পত্রিকা নয় হককথা একটি আন্দোলন। প্রচণ্ড শক্তিধর আন্দোলন। গণভিত্তিক সাংবাদিকতার আদর্শ হককথা। কমপক্ষে পনের হাজার সংবাদদাতা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে হককথার সাথে করেছেন সহযোগিতা। হককথা পত্রিকা অভিজাত সংবাদপত্র পাঠক-এর মান্ধাতার শ্রেণীচক্র ভেঙ্গেছে। এদেশের মুটে, মুজুর, কিষাণ, শ্রমিক, রিকশাওয়ালা, কামার-কুমার, তাঁতি, জেলে, ছাত্র-শিক্ষক, অধ্যাপক সবার কাছে হয়েছে সমাদৃত। হককথা তাই এদেশের প্রথম গণপত্রিকা। অতীতে পূর্ব পর্যায়ের প্রকাশনাকালে এবং বর্তমানে চতুর্থ প্রকাশনা মেয়াদে হককথা জনগণের স্বাধীনতার গণঅধিকারের বলিষ্ঠ প্রবক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। দেশীয় শাসকগোষ্ঠী যখন দেশের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য বিদেশি শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে বসে তখনকার দুঃখজনক পরিস্থিতিতে জনগণ হয়ে পড়ে বিস্ময়াবিষ্ট, হতাশ এবং নিরুপায়। বাংলাদেশের জনগণের এই নিরুপায় অবস্থায় হককথা বলিষ্ঠ আশ্বাস নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সোচ্চার কণ্ঠস্বর নিয়ে। এই পত্রিকাকে বন্ধ করে

www.pathagar.com

দেবার জন্য সরকারের অত্যুৎসাহী মহলের লম্ফঝম্ফ জনগণের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে সরকার তা ভালভাবে জানেন। জনগণকে পুনরায় নিরুপায় অবস্থায় ফেলবার জন্য এবং সে সুযোগে দেশ ও জনতাকে নিয়ে ইচ্ছামত ফুটবল খেলবার ইচ্ছা নিয়েই ভারতের সরকারি ও বেসরকারি তাঁবেদাররা চেষ্টা চালাচ্ছে। হককথা বন্ধ করার পাপে পাপী অতীতের সরকারগুলোর গণবিরোধী চক্রান্তের পরিণতি কি হয়েছিল বর্তমানের ক্ষমতাসীনরা তা ভেবে দেখবেন এবং জনগণের উপর, তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর আঘাত হানা থেকে বিরত থাকবেন, এটাই একমাত্র সময়োচিত সুবুদ্ধি হতে পারে। সৎ পরামর্শ অপেক্ষা ভারতের চাপ ও ভারতপ্রেমিক মস্কোওয়ালাদের চাপ যদি বড় হয়ে থাকে, তবে-আজ এ মুহূর্তে হককথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিতে চায়, দেশের উপর টেনে আনা পরাধীনতার আলো অমানিশা টুটিয়ে জনগণ সত্যিকার স্বাধীনতার সুপ্রভাত অচিরেই হাজির করবে। সেদিন আবার খুব বেশি দূরে নয়, এ মাটি এ জনতা, থাকবে না শুধু ভারতের ঐসব ক্রীড়নক, কেনা গোলামরা যারা জনগণের অকৃত্রিম বান্ধব হককথাকে বন্ধ করে দিয়েছিল। সেদিন তাদের দেখা যাবে ইতিহাসের গলিত আস্তাকুঁড়ের অতলে।'

সংখ্যাটি বের হলে ১৫ পয়সার হককথা ১০ টাকা করে হকাররা বিক্রি করেছে। এ সময় আব্দুর রকীব ও মোহাম্মদ হোসেন হককথা ঢাকা থেকেই প্রকাশের অনুমতি নেয়ার কথা গভীরভাবে ভেবেছিলেন। এ কারণে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে মওলানা ভাসানীকে দিয়ে দরখাস্ত ঢাকার ডিসি বরাবর করেছিলেন আব্দুর রকীব ও মোহাম্মদ হোসেন। রশীদিয়া প্রিন্টিং প্রেস হতে হককথা ছাপার আবেদনপত্র ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট পৌঁছানোর পরের দিন সন্ধ্যায় বাবুবাজার রশিদীয়া প্রিন্টিং প্রেস অফিসে ঢাকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে চিঠি আসে এই মর্মে যে, "বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, সাপ্তাহিক হককথা রশিদীয়া প্রিন্টিং প্রেস থেকে প্রতি সপ্তাহে শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইলের নামে ছাপা হচ্ছে, এই নোটিশ প্রাপ্তির পর আপনার প্রেস হতে হককথা ছাপা হলে আপনার প্রেসের ডিক্লারেশন বাতিল করা হবে।"

এই চিঠি পাওয়ার পরবর্তী সংখ্যা হককথা ছাপা গেল না। সরকার এতই ক্ষুব্ধ হলেন যে, হককথার ডিক্লারেশন পর্যন্ত বাতিল করে দিলেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ পর্যন্ত মোট ৩০টি সংখ্যা 'হককথা' একটানা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। সে সময় হককথার সাথে আরও দু'টি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মুখপত্র' ও 'স্পোকম্যান' প্রকাশনা বন্ধ করে দেয় সরকার। সারাদেশ প্রতিবাদমুখর হল। ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ পল্টনে আয়োজিত ঐতিহাসিক প্রতিবাদ সমাবেশে বৃদ্ধ জননেতা মওলানা ভাসানী বললেন, 'হককথা শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতির কথা প্রকাশ করিত বলিয়াই তাহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। হককথা বন্ধ করিয়া সত্য বলা বন্ধ করা যাইবে না। আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করা যাইবে না। আমি থানায় থানায় কনফারেন্স করিয়া হককথার চাইতে বেশি কাজ করিব। আমি সরকারকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি, বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় সৈন্য অবস্থান করিতেছে, এই কথা পারিলে অস্বীকার কর।'

এরপর তিনি 'ভাসানীর হককথা' নামে তিন সংখ্যা বুলেটিন বের করলেন। অতঃপর 'ভাসানীর জেহাদ' নামে তিন সংখ্যা বুলেটিন বের করলেন। তৎপরবর্তীতে 'বাংলা খুৎবা' (১২ আশ্বিন ৩ কার্তিক ১৩৭৯,), 'ভাসানীর নছিয়ত' প্রভৃতি নামে বুলেটিন বের করলেন।

২৭ অক্টোবর, ১৯৭২ '১ নং বুলেটিন, (ভারত শোষিত বাংলাদেশের মানুষের মুখপত্র) সত্যকথা, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক প্রকাশিত, শুভেচ্ছা মূল্য ২৫ পয়সা,

www.pathagar.com

প্রকাশ পেল। 'হককথা বন্ধ হলো কেন?' প্রতিবেদনে বলা হলো, 'জনগণের প্রিয় হককথার উপর ভারতের গোলাম তাঁবেদার সরকার চরম আঘাত হেনেছে। হককথা বন্ধ করে দিয়ে ফ্যাসিস্ট সরকার নিজেদের ও তার প্রভু ভারত-রাশিয়ার গোপন কীর্তিকলাপ ফাঁস হয়ে পড়ার আশঙ্কা রোধ করতে চেয়েছে। জনগণকে ভারতের চির দাসত্বে আবদ্ধ করার পথে হককথা বাধা দিয়েছিল বলেই এই সরকার হককথাকে বরদাশ করতে পারেনি। হককথার অপরাধ, হককথা ভারতের সাথে এই তাঁবেদার সরকারের ৭টি গোপন চুক্তির কথা জনগণের নিকট ফাঁস করে দিয়েছে, হককথা এদেশে ভারতীয় সৈন্যদের উপস্থিতির কথা জনগণকে জানিয়ে দিয়েছে, ভারত কার স্বার্থে এখানে এসেছে হককথা সে কথা জনগণকে জানিয়ে দিয়েছে। অনশন বন্দি জনতার প্রতি হককথা ডাক দিয়েছে সচেতন হয়ে সংগ্রামী হয়ে বাঁচার জন্য। হককথা এদেশের তথা সারা আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার নির্যাতিত, উৎপীড়িত অধিকার বঞ্চিত মানুষকে তাদের অধিকার আদায় ও মুক্তির পথে অকুতোভয় অগ্রসর হতে আহ্বান করেছিল। হককথা হককথা বলে ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্ট সরকারের লুটপাট সমিতির মন্ত্রী-মেম্বার সাহেবানদের দুর্নীতি, কূটনীতি, স্বজন পোষণ নীতির উচ্ছেদকল্পে বিশেষভাবে সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন করে তুলেছিল। দেশকে বিদেশি শক্তির কাছে বিক্রি করে দিয়ে এই কেনা গোলামরা আজ বাংলাদেশের ক্ষমতার মসনদে বসে দেশপ্রেমের বড়াই করছে। দেশের জনগণকে বিদেশিদের পদানত রাখার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে এই জালেমরা দেখাচ্ছে জনদরদ। এদেশের হাজার কোটি টাকার সম্পদ তারা প্রভুদের পায়ে তুলে দিয়ে দেশকে ফতুর করে এরা দেশ দরদীর পরিচয় দিচ্ছে। দুর্নীতি শত পল্লবে বিকশিত হওয়ার পর এরা চুনোপুঁটিকে শাস্তি দিয়ে ইলেকশনের খেয়াপার হতে চাইছে। এই ভণ্ডদের মুখোশ খুলে ধরে এদের অতীত ও বর্তমান অপকীর্তি ফাঁস করে দিয়ে জনগণের কণ্ঠস্বর হককথা এদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। আর তখনই এই ফ্যাসিস্ট সরকার সকল আইন-কানুনকে পা দিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে সম্পূর্ণ বেআইনী পন্থায় হককথাকে বন্ধ করে দিয়েছে। হককথার মত কয়েকটি কাগজ বন্ধ করে দিয়ে এরা এখন সুখের স্বর্গে বাস করতে চাইছে। এরা জনগণকে অন্ধকারে রেখে এখন এদেশকে ভারতের সাথে মিলিয়ে ফেলার চক্রান্ত শুরু করেছে। এদেশ আজ আলাদা নেই। এদেশের নেই আলাদা অর্থনীতি। ভারতের হুকুমে, ভারতের ফরমায়েশে, ভারতের কেনা গোলামরা এদেশকে চালাচ্ছে! আর এই বিশ্বাসঘাতকদের মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশকে বানাতে চাইছে আর একটি কাশ্মীর। গণপ্রতিরোধ গড়ে না উঠলে সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশের ভারতের লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠবে। বাংলাদেশের প্রকৃত জনগণ হয়ে পড়বে সংখ্যালঘু। এদেশে এই ষড়যন্ত্র আজ পুরোদমে চলছে। বাংলাদেশ রাইফেলস্ বাহিনীর মধ্যে এরা শতকরা ৩০ জন ভারতীয়কে ভর্তি করেছে। উক্ত বাহিনীর অফিসাররা সবাই ভারতীয়। রক্ষীবাহিনী বস্তুত ভারতীয় বাহিনী। এদের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালি নওজোয়ানরা রুখে দাঁড়াবে বলেই এরা পাকিস্তানে আটক ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের ফিরিয়ে আনছে না। এদেশে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যারা আছে, ভারত এবং তার এদেশীয় কেনা গোলামরা তাদের মেরে ফেলতে চাইছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে সম্প্রতি যে সংঘর্ষ ঘটে গেছে তাতে বিপুলসংখ্যক ভারতীয় সৈন্য দেশপ্রেমিক বাঙালি সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেককে হত্যা করেছে। বাঙালি সৈন্যরা এই স্বৈরাচারী সরকারের নিকট তার বিচার পায়নি; বরং ভারতের নির্দেশে এই ইন্দিরাপ্রেমিক কেনা গোলামরা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অনেক জনপ্রিয় পদস্থ অফিসারকে কারাগারে বন্দি করেছে। ভারতীয় দস্যুরা সীমান্তের খুঁটি উপড়িয়ে তাতার বাহিনীর মত ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের ভূমি গ্রাস করেছে এবং দখলকৃত এলাকায় ভারতীয় লোকদের

www.pathagar.com

বসতি করে দিচ্ছে। শেখ মুজিব সরকার তাতে বাধা দিচ্ছে না। কারণ এরা ৭টি দলিলে স্বাক্ষর করে এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সব কিছু বিকিয়ে দিয়ে এসেছে ভারতের কাছে। হককথা এসব ফাঁস করে দেওয়ায় এদের রাজনৈতিক আয়ু ফুরিয়ে আসছিল। ভারতের সম্প্রসারণবাদের মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে তুলছিল হককথা। তাই হককথাকে এরা বন্ধ করে দিয়ে তাদের দুর্নীতির দুরভিসন্ধিমূলক পথের বাধাকে অপসারণ করেছে। কারণদর্শাও নোটিশ জারি করেছে এরা সম্পূর্ণ ধাপ্পাবাজী হিসেবে। হককথা সময় চাইলে ওরা কোন উত্তর না দিয়ে আইয়ুব আমলের প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স এ্যাক্ট প্রয়োগে হককথা বন্ধ করে দিয়েছে। হককথা কারণ দর্শাও নোটিশের পুঙ্খানুপুঙ্খ যুক্তিপূর্ণ অকাট্য সত্য ব্যাখ্যা, বিচার-বিশ্লেষণসহ উত্তর দিয়েছে। তাঁবেদার সরকার অন্য কোন উপায় না পাইয়া হককথা বেআইনীভাবে বন্ধ করে দিয়ে যে জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে তার নজির ইতিহাসে নেই। গত কয়েক মাস ধরে এরা এমনকি স্বয়ং শেখ মুজিব বলে আসছিলেন যে, আইয়ুবী আমলে এই কুখ্যাত অর্ডিন্যান্স বাংলাদেশে প্রয়োগ করা হবে না, কিন্তু এরা আবার সেই অর্ডিন্যান্স ব্যবহার করলো হককথা বন্ধ করে দেবার জন্য। নিয়মতান্ত্রিক পথ ছেড়ে এই তাঁবেদার সরকার নিজেই অনিয়মতান্ত্রিক পথ ধরেছে। গণশক্তি অফিসে পুলিশ দিয়ে এরা ঝুলিয়েছে তালা। এই সরকারের পয়সা খাওয়া গুণ্ডারা মুখপত্র, স্পোকম্যান পত্রিকার অফিস সম্পদ জবরদখল করে নিয়েছে। এই জালেমরা হককথা সম্পাদক ইরফানুল বারীসহ অনেক সাংবাদিককে বিনা বিচারে কারাগারে আটক রেখেছে। এই ফ্যাসিস্টশাহী ভারতের পরিকল্পনানুযায়ী মুসলিম হত্যা ও বামপন্থী হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। তার জ্বলন্ত প্রমাণ মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজের জনৈক ছাত্র খলিলুর রহমান ও ন্যাপের সিরাজুল ইসলামের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর হাতে এবং ভারতের পোষ্য রক্ষীবাহিনীদের হাতে এ দেশের মা-বোনদের আবার লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে। যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চট্টগ্রামের হোটেলের ঘটনা বহন করেছে। ভারতের শোষণে আজ বাংলাদেশের জনগণের শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, অধিকার হারিয়ে ভাগ্যাহত বাঙালিরা আবার পরিণত হয়েছে পরাধীন জাতিতে। এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী এই দাসখত লিখে দিয়ে আসা ক্ষমতাসীন লোকেরা। এদের সাথে সহযোগিতা করেছে বি-টীম মণি-মোজাফফর-এর দল। হককথা বন্ধ করে দিলেও এসব পাপ ঢেকে রাখতে পারবে না গুণ্ডাশাহী। জনগণ এদের সকল জারিজুরি ফাঁস করে দেবে। আর জনগণ নির্মমভাবেই এদের বিচার করবে। হককথা জনতার হৃদয়ে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। হককথার মৃত্যু নেই।'

আওয়ামী লীগের পতনের পর মওলানা ভাসানী আর বেশিদিন জীবিত রইলেন না। ইতোমধ্যে হককথার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। মওলানা ভাসানীর জীবদ্দশায় আর মাত্র একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় হককথার ২৭ আগস্ট ১৯৭৬, ৫ম বর্ষ ৩১তম সংখ্যা হিসেবে। এ সংখ্যার মূল্য ধরা হয় চল্লিশ পয়সা। মওলানা ভাসানী ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। মওলানা ভাসানীর মৃত্যুর পর বছর দুই পরে আবারও হককথা প্রকাশের উদ্যোগ নেন অধ্যক্ষ মাসুদ খান, ব্যারিস্টার বজলুস সাত্তার, মাহবুবুল আলম চাষী, বুলবুল খান মাহবুব, আব্দুর রহিম আজাদ, সৈয়দ ইরফানুল বারী, মোহাম্মদ হোসেনসহ ক'জন। ফলে ১৯৭৮ সালের ৭ মে, ১২ মে এবং সর্বশেষ ২ জুন-এই তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২ জুনের সংখ্যাই সম্ভবত এ পর্যন্ত প্রকাশিত হককথার শেষ সংখ্যা। মাত্র কয়েক সংখ্যা বের হওয়ার পর আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জন্য পত্রিকাটি আবার বন্ধ হয়ে যায়। অধ্যক্ষ মাসুদ খান ও ব্যারিস্টার বজলুস সাত্তার সন্তোষ থেকে চলে যান। তাদের যাওয়ার পর থেকে অধ্যাবধি পত্রিকাটি আর বের হয়নি।

www.pathagar.com

১৯৭২ সালে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে মওলানা ভাসানী

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দেশে যখনই দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সেটা উঠেছে দেশের অভাব-অভিযোগের সুযোগ নিয়েই। আর তা হয়েছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়ই। শেখ মুজিবের শাসনে একটা স্থায়ী কায়েমী স্বার্থবাদী দল গড়ে ওঠে। পাকিস্তানের জাঁদরেল শাসক আইয়ুব শাহীর শাসন দিবসে পল্লী উন্নয়নের নামে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি হাতে নিয়ে এর জন্য বরাদ্দকৃত সমস্ত অর্থই তিনি তখন বিডিদের হাতে তুলে দেন। বিডিদের হাতে এ টাকাটা সরাসরি সরকারি তহবিল থেকে আসত না। আসত এস.ডিও এবং সিও-এর হাতে ঘুরে। বিডিদের কাজের তদারক করার ভার ছিল সুপারভাইজারদের উপর। কিছুদিন পর তারা সবাই এক ঘরের লোক হয়ে যায়। এ সুযোগ অচিরেই পল্লী উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রামে গ্রামে দুর্নীতি উন্নয়নের কর্মসূচিতে পরিণত হয়ে যায়। ফলে দুর্নীতি তখন গ্রামের মাটিতে জন্ম নিয়ে শহর- বন্দর ঘুরে সোজা উপরের তলায় চড়ে আস্তে আস্তে বেশ সেয়ানা হয়ে উঠে। শেষের দিকে আইয়ুব খান ছিলেন এসব সেয়ানা দুর্নীতিবাজ চাটুকারদেরই একচেটিয়া প্রেসিডেন্ট। মুজিব সরকারের আমলেও আইয়ুবের মতো সমাজে দুর্নীতি প্রবেশ করে। বিদেশিদের পাঠানো বিভিন্ন রকমের রিলিফ দ্রব্য ও সাহায্য বিতরণ না করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের বুভুক্ষু মানুষের বুকের উপর পা দিয়ে করা হয় দুর্নীতি।

মুজিব সরকারের আমলে এক সময়ের একজন সাধারণ কর্মী যিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে পর্যন্তও শহরের ফুটপাতে বসে তৈল-নুন বেচে খেতেন স্বাধীন হওয়ার পর সামান্য ওয়ার্ড চেয়ারম্যান হয়ে রিলিফ দ্রব্য বিতরণের সুযোগ পেয়ে মাত্র কদিনের মধ্যেই তাকে দেখা যায় রীতিমত বিত্তবান সেজে নিজ গাড়িতে করে বুক ফুলিয়ে শহরময় ঘুরে বেড়াতে। শহর ও শহরতলীর একজন আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন চেয়ারম্যান যাকে স্বাধীন হওয়ার আগে মুদী দোকানে দেনা শোধ করার ভয়ে লুকিয়ে বেড়াতে দেখা গেছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাত্র ক'দিনের মধ্যেই তাকে দেখা যায় জীপ গাড়ি কিনে বাড়িতে প্রাসাদ বানিয়ে ক্রমে ক্রমে আশপাশের পাড়াসুদ্ধ কিনে ফেলার চেষ্টা করতে। আওয়ামী লীগের একজন ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীপ্রধান যে সামান্য চাকরি করে শহরে একটা একচালা ঘরের ভাড়াও ঠিকমত যোগাতে পারত না, তাকে দেখা যায় পাকা বাড়িতে থেকে রাস্তায় স্বীয় দামী জীপ হাঁকিয়ে চলতে। ইউনিয়নের এক জনসাধারণ কর্মকর্তাকেও দেখা যায় নিজের কেনা ট্যাক্সীতে করে চলাফেরা করতে। শত্রু সম্পত্তি হিসেবে পরিচিত পরিত্যক্ত ছোটখাট কল-কারখানা ও দোকানপাট দখল করে আওয়ামীরা রাতারাতি অনেক কিছুর মালিক হয়েছে। সরকার মনোনীত এক শ্রেণীর প্রশাসনকে দেখা যায়, কলকারখানা চালাবার নামে নানা রকমের দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে স্বনামে-বেনামে লাখ লাখ টাকার মালিক হতে। *(সূত্রঃ আওয়ামী লীগের ভরাডুবি কেন? এ,কে, এম, সিরাজুল ইসলাম, জুলাই-১৯৭৯)*

মুক্তিযুদ্ধের সময় চালের মণ ছিল ৪০ টাকার নিচে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম সালেই মণ দাঁড়ায় ৫০ টাকায়। পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে তা গিয়ে পৌঁছে ৮০ টাকায়। তখনকার সরকারি হিসেবে বাংলাদেশের বছরে চালের প্রয়োজন ছিল এক কোটি ত্রিশ লাখ টন।

www.pathagar.com

তন্মধ্যে এক কোটি টন দেশেই উৎপন্ন হতো, অবশিষ্ট ত্রিশ লাখ টন বিদেশি থেকে আমদানি করা হতো। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে লাখ লাখ লোক নিহত হয়। তা সত্ত্বেও শীতোত্তর ধানের পুরো মওসুমেই ঘাটতি দেখা যায়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী তা ছিল আশি লাখ টন। এর ফলে খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য হু হু করে বেড়ে যায়। সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষের কাছে অর্থসম্পদ সীমিত থাকায় সাধারণ থেকে বিত্তশালীকে পর্যন্ত সকল প্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় করতে বেগ পেতে হয়। এরূপ ঘাটতি সৃষ্টি করে দেশকে মহাবিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য এক শ্রেণীর অসৎ ব্যবসায়ী, কালোবাজারী, মজুতদার, চোরাকারবারী, জনবিরোধী মুষ্টিমেয় লোককেই দায়ী করা হয়, তখন অহরহ অভিযোগ পাওয়া যায় যে, এরা সরকারি দলের কিছু সদস্যের বিশেষ মদদপুষ্ট। তাই এদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস করেননি, জাতীয় নেতৃবৃন্দ দেশের আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বহুবার দাবি করেছেন। এসব সমস্যা সরকারের সামনে তুলে ধরার পরও কোন প্রতিকার হয়নি। ফলে মহাদুর্ভিক্ষ ছিল আসন্ন।

মওলানা ভাসানী আসন্ন মহাদুর্ভিক্ষের আগাম বাণী শুনিয়ে ১৯৭২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক হককথার উদ্বোধনী সংখ্যায় ন্যাপ ও কৃষক সমিতির সেচ্ছাসেবক বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বিবৃতিতে দুর্ভিক্ষ রোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন "…..আমার সহিত আপনারা নিশ্চয়ই একমত হইবেন যে, এক শ্রেণীর দুস্কৃতকারী মুজিব বাহিনী কিংবা মুক্তিবাহিনী বলিয়া পরিচয় দিয়া সারা বাংলাদেশে যে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছে ইহার আশু প্রতিকার না হইলে অচিরেই ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে। আর ছয় মাস যদি এইভাবে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, বিনাবিচারে পাইকারি হত্যা, ভয় প্রদর্শন করিয়া অর্থ আদায় ইত্যাদি সমাজবিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক জঘন্য কাজ চলিতে থাকে তবে আগামী ২৫ বছরেও দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সরকার ও জনগণ কাহারও পক্ষে মোটেই সম্ভবপর হইবে না। ইতিমধ্যে আমি সরকার ও জনসাধারণের নিকট আকুল আবেদন জানাইয়াছি-রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কালবিলম্ব না করিয়া এসব কঠোর-হস্তে দমন করুন। যাহারা সত্যিই সত্যিই শত্রুর সহিত লড়াই করিয়া দেশ স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে তাহারা এইরূপ জঘন্য কাজ করিবে, ইহা আমি মোটেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, যাহারা চিরকাল দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে তাহারাই এইরূপ জঘন্য কাজ করিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তাই কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতি আমার আহ্বান যে কোন মতের কিংবা যে কোন শ্রেণীর মানুষ এই অশান্তির বীজ বপন করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে দেশীয় অস্ত্র যথাঃ লাঠি, সুড়কি, বল্লম, ফালা ইত্যাদি লইয়া জনতার সংগ্রাম আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হউন। মনে রাখিবেন জনতার শক্তির সামনে এটম বোমাও কিছু নহে। আপনাদের দরকার শুধু সৎ সাহস ও একতার। কৃষক সমিতির সদস্যদের প্রতি আমার জরুরি আবেদন, যেখানে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এখনও গড়িয়া উঠে নাই, সত্বর তাহা গঠন করুন এবং সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন……।"

২৬ ফেব্রুয়ারি সন্তোষে অনুষ্ঠিত কৃষক সমিতির কর্মী সম্মেলনে ভাষণ দানকালে মওলানা ভাসানী এক জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করেন-"রক্তের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তা কার জন্য? জোতদার, মহাজন, ঘুষখোর আমলাদের না সর্বহারা কৃষক-মজুরদের জন্য? সরকার ও তার মোসাহেবদের কার্যকলাপে বিগত দুই মাসে আর যাহাই ফুটিয়া উঠুক না কেন অন্তত কৃষক-মজুরদের নিমিত্ত স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে নাই।"

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী বলেন, "বাংলাদেশে শতকরা ৯০ জনেরও বেশি হলো কৃষক, শ্রমিক, জেলে, মাঝি, তাঁতি প্রভৃতি শ্রেণীর সর্বহারা মানুষ। এই স্বাধীনতা যদি তাদের কল্যাণ সাধন না করে দুর্নীতি, অবিচার, শোষণ অব্যাহত থাকে তবে তারা গণবিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে কৃষক-মজুর রাজ কায়েম করবে।" তিনি বলেন, "যারা ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছে, যারা সর্বস্ব হারিয়েও স্বাধীনতার পথে রক্ত দিয়েছে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে অশুভ শক্তিকে উৎখাতও করতে পারে।" মওলানা ভাসানী বলেন, "কাঁটাযুক্ত লাগাম না থাকলে ঘোড়ার গতিকে ঠিক রাখা যায় না। ঘোড়-সওয়ার জনগণ আর তার চাবুক গণশক্তির প্রতীক। গণপ্রতিনিধিদেরকেও ঠিক তেমনি গণশক্তির শাসনে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে।" সমাজের অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরে মওলানা ভাসানী বলেন, "আজ মানুষ রোগ যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করতে চায়, শিক্ষার অভাবে পশুর মতো জীবন কাটায়, অভাব-অনটনে অখাদ্য-কুখাদ্য খায়, মরে গেলে কলা-পাতায় কাফন পায়, অথচ সেই মানুষই ধান-পাটের উৎপাদন বাড়ায়, রাস্তা-ঘাট থেকে সুইপারেরও পর্যন্ত ট্যাক্স দেয়। ঠিক এমনি অবস্থায় দেশের সম্পদ চোরাচালান হয়ে যাচ্ছে, ভূয়া মুক্তিবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক সেজে সর্বহারা মানুষের উপর জুলুম করা হচ্ছে। আজ তাই দরকার কৃষক-মজুরের একতার। শুয়র যেমন মক্কার-বাংলার নির্বিশেষে হারাম ঠিক তেমনি শোষকের চরিত্র বাঙালি-অবাঙালি সবারই সমান। তাই স্বাধীনতা পেয়ে উৎফুল্ল হলে চলবে না, শুধু গর্ব করলে চলবে না; স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকল প্রকার অবিচার, শোষণ বন্ধ করে জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে।"

এমতাবস্থায় মওলানা ভাসানী আহ্বান জানান, 'সর্বত্র কৃষক সমিতি গঠন করো। সকল শ্রেণীর সমিতি আছে, কিন্তু কৃষকদের শ্রেণীভিত্তিক সত্যিকারের কোন সংগঠন নাই। সভা-সমিতি করে আজ কৃষককেই বাঁচার পথ বাতলিয়ে নিতে হবে। চোরাচালান বন্ধের জন্য সরকারকে শুধু সীমান্ত প্রহরী রাখলেই চলবে না, জনগণের সহযোগিতাও গ্রহণ করতে হবে। শুধু উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নসিহত করলেই চলবে না, কৃষককে ন্যায্যমূল্য দান করতে হবে। আর যদি সরকার এসব মনোযোগ দান না করে সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে প্রশ্রয় প্রদান করেন, কৃষকের বাঁচার সংস্থান না করেন, গ্রামের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে কর্মসূচি গ্রহণ না করেন তবে বাংলাদেশের সর্বত্র ভূখা মিছিল বের হয়ে পড়বে।" মওলানা ভাসানী সরকারকে সাবধান করে ঘোষণা করেন, "পলাশীর যুদ্ধের পর এবার বাঙালি যুদ্ধ শিখেছে, মরতে জেনেছে তাই জনগণকে ক্ষেপিয়ে লাভ নেই। পাগলা কুকুর ক্ষিপ্ত হলে একাই কতজনের সর্বনাশ সাধন করে। ঠিক তেমনি মানুষও পাগল হলে শিকলকে ভয় পায় না-ক্রোধে ফেটে পড়ে।" তিনি বলেন, 'জনমত ছাড়া কোন শাসক টিকতে পারেনি। ফেরাউন, নমরুদ, রাবণ, এজিদ যেমন টিকতে পারেনি-ইয়াহিয়াও তেমনি ধ্বংস হয়েছে। ইতিহাস থেকে সরকারকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাই অতি সত্বর দেশে আইন-শৃঙ্খলা কায়েম করে জুলুম বন্ধ করা উচিত। তা না হলে আওয়ামী লীগ সরকারকেও সেই পরিণতি ভোগ করতে হবে.....'।

৩ মার্চ, ১৯৭২ সাপ্তাহিক হককথায় প্রকাশিত 'রুখে দাঁড়ান' শীর্ষক প্রতিবেদন পড়লেই অনুভব করা সম্ভব দেশের অবস্থা কত করুণ ছিল। হককথার প্রতিবেদনে বলা হয়, "চোরাচালান দেশকে ফতুর করে দিলঃ বাংলাদেশকে ফতুর করতে আরো বাকি রয়েছে কি, আমরা ভেবে পাই না। পাক সরকার ২৩ বৎসর যাবত লুণ্ঠন করে এই দেশকে ভিখারী করতে পারেনি। কিন্তু নয়টি মাসে একে আর সোনার বাংলা রাখেনি। পোড়া মাটি আর বিরান ভাণ্ডার ছাড়া আমাদের আজ কিছুই নেই। আফসোস এতেও বাংলার কপালে

www.pathagar.com

দুঃখ ঘুচল না। স্বাধীনতার পর বিধ্বস্ত বাংলা থেকে হাজার হাজার মণ ধান, চাল, পাট, সরিষা, কলাই, শত শত খাসী, মুরগী, ডিম, মাছ ইত্যাদি সব ভারতে ও বার্মায় চলে যাচ্ছে। ট্রাকের পর ট্রাক বোঝাই করে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকেও মালামাল কিনে নেয়া হচ্ছে। এ কাণ্ড ভারত-বার্মার সরকারের মতো সুহৃদ সরকারের পক্ষে বরদাস্ত করা হবে, আমরা তা বিশ্বাস করি না। উভয় দেশের অসাধু ব্যবসায়ীরা এই ভয়ঙ্কর কাজে লিপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশের সরকার হয়তো তা নজরে নিয়েও গুরুত্ব দিচ্ছেন না, নয়তো বাধা দানের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছেন। সীমান্তে আমাদের প্রহরী নেই সত্য কিন্তু বন্ধু দেশ ভারতে রয়েছে। আর আমাদের স্বঘোষিত প্রহরী অনেক দাঁড়িয়েও গেছে। তারা কপট কিংবা ভূয়া মুক্তিবাহিনী! দু'পয়সা কামাই করাই তাদের কাজ। এদিকে কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিদেশে পাচার করে 'জাতীয়তাবাদের পরাকাষ্ঠা' প্রদর্শন করছে। স্বাধীন হবার আগে যখন ব্যবসা-বাণিজ্য এক রকম অচল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখনও ধান, চাল, মশলা, তরি-তরকারি, কাপড়, ঔষধ ইত্যাদির মূল্য এত অধিক ছিল না। যদিও যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়নি কিন্তু স্বাধীনতা পেয়ে সবার মনে একটি স্বতঃস্ফূর্ত কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। এর মধ্যে কেন বাজারে জিনিসপত্রের এত অভাব, কেনই বা এত দুর্মূল্য? অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো অবাধ চোরাচালান। একটি হিসেবে আমরা পেয়েছি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, হালুয়াঘাট, রংপুর এই কয়টি এলাকা থেকে প্রকাশ্যে মালামাল নিয়ে দৈনিক গড়পড়তা ২৫টি ভারতীয় ও ১০টি বার্মীজ ট্রাক সীমান্তের ওপারে চলে যাচ্ছে। প্রতিটি ট্রাক এক এক যাত্রায় বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য, তরি-তরকারি ও মাছ নিয়ে যাচ্ছে। আবার রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, যশোর এবং খুলনা থেকে প্রতিদিন গড়পড়তায় ৩০ ট্রাক জিনিসপত্র চোরাচালান হচ্ছে। খুলনার দক্ষিণাংশ ও বরিশাল জেলায় লঞ্চযোগে চোরাচালানের কারবার চলছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ট্রাকগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সদর শহরে চলে আসে এবং খোশ হালতে বোঝাই হয়ে ফিরে যায়। মজার ব্যাপার প্রায়শ বাংলাদেশ বেতারে ঘোষণা করা হয়, ভারত আমাদেরকে সেই কত সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যোগে-বিয়োগে যে বিয়োগই হচ্ছে এর হিসাব আমরা কেউ করে দেখছি না।"

১০ মার্চ প্রদত্ত বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী উল্লেখ করেন, "এই জীবনে কত মিছিল দেখিয়াছি। মানুষ আদর্শের জন্য মিছিল করে। মানুষ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া দুর্নীতিবিরোধী মিছিলে সামিল হয়। সব মিছিলের জবাব বক্তৃতায় দেওয়া যায়। কিন্তু ভুখা মিছিলে ভাত ছাড়া আর কোন জবাব নেই। সেই মিছিলে যে ক্ষুধার আগুন জ্বলে তাহা 'জমজমের' পানিও নিভাইতে পারে না। স্বাধীনতার পর বাংলার গ্রামেগঞ্জে অভুক্ত জনতা ভিড় জমাইতেছে। খবর পাইয়াছে, রিলিফের টাকা আসিতেছে। আঠারটি জেলার খাবার বাদই দিলাম। টাঙ্গাইলের রিলিফে টাকা আসা-যাওয়ায়ও কাজ হয় না, তিন টাকা রোজে যেখানে কামলা খাটাইতে নেই, টাকা পাঁচসিকায় সেই কাজ উদ্ধার করা হইতেছে। এর মধ্যেও রয়েছে ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাচারিতা। জনগণের নির্বাচিত সরকারের আমলেও যদি এমনটি হয় তবে এদেশের কৃষক, মজুর, জেলে, মাঝি, তাঁতি, কামার, কুমার কোথায় যাইবে, তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। ইংরেজ আমলে জমিদার-মহাজন, খান বাহাদুর রায় সাহেবরা যাহা করিয়াছেন, মেম্বার, অফিসার ও তমঘাধারীরা তাহাই করিয়াছেন। আমি সংগ্রাম করিয়াছি তাহাদের বিরুদ্ধে সেই মানুষের জন্য যারা আজও ভুখা মিছিলে ধুঁকিয়া মরে। সংগ্রামের ফলে শোষণের কায়দা বদলিয়েছে মাত্র কিন্তু শোষণ দূর হয় নাই। ঠিক তেমনি শোষিতের

www.pathagar.com

সংগ্রাম রূপান্তরিত হইয়া প্রত্যক্ষ মোকাবিলার রূপ ধারণ করিয়াছে। ১৩৪৯ সালের (বাংলা) দুর্ভিক্ষ দেখিয়াছি। কলকাতার ফুটপাতে কত কঙ্কালসার দেহ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। কিন্তু খাবার দোকানে লুট হইবার তেমন কোন খবর শুনিতে পাই নাই। সরকারের স্মরণ রাখা উচিত, মানুষের সেই ক্ষুধা থাকিলেও সেদিনের সমাজ চরিত্র নাই। মানুষ এখন বুঝিতে পারিয়াছে, সর্বনাশা দুর্ভিক্ষেও এমন একটি শ্রেণী থাকে যাহাদের খাওয়া-পরার কোন অসুবিধা হয় না। এখন হইতে দুর্ভিক্ষ ঠেকাইবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে ১৩৪৯ সনের পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে এক নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অরাজকতা দেখা দিবে। সরকারের উচিত ভুখা মিছিলে রক্ত না ঝরিয়ে প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য সাহায্যে অভুক্ত জনতাকে ক্ষিপ্ত না করিয়া সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পরিস্থিতি আয়ত্তে লাইয়া আসা।' *(সূত্রঃ সাপ্তাহিক হককথা, ১০ মার্চ-১৯৭২)*

মওলানা ভাসানী মার্চের প্রথম থেকে দেশব্যাপী সাংগঠনিক সফরের সময় চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করেন আসন্ন মহাদুর্ভিক্ষ কেউ ঠেকাতে পারবে না। ১৭ মার্চ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিটি ছিল এরূপঃ

হুঁশিয়ার পরিস্থিতি ঘোলাটে করবেন না-ভাসানী

আজ যখন দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা, বসন্তের প্রকোপ, অন্ন-বস্ত্রহীনের মিছিল তখন রাজনৈতিক কোন্দল সৃষ্টি করে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করা রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামান্তর। বাংলার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, পুনর্গঠন কর্মসূচি ব্যাহত হয় এমন যে কোন প্রকার উদ্যোগকে সকল শক্তি দিয়ে রুখতে হবে। যে মহলই পাঁয়তারা করুন না কেন শুরুতেই তাদের মুখোশ উন্মোচন করে জনতার আদালতে তাদের বিচার হওয়া উচিত। স্বাধীনতার পর থেকেই মনোযোগের সাথে আমি লক্ষ্য করে আসছি যে, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কৃষক সমিতির জনপ্রিয়তাকে বরদাশত করতে না পেরে প্রগতিবাদী বলে পরিচিত মহলবিশেষ নানা কৌশলে আমার দল দুটোর সাংগঠনিক গতিধারাকে প্রতিহত করার ফন্দি আঁটছেন। শুধু রাজনৈতিক কূটকৌশলই যদি তারা অবলম্বন করতেন তবে হয়ত দেশের নিরীহ জনসাধারণ শিকার হয়ে পড়ত না। কিন্তু তাদের ঔদ্ধত্য এতই বেড়ে গেছে যে, শান্তি ও শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করে হলেও তারা চায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কৃষক সমিতির অপ্রতিরোধ্য গতিকে রুখে দাঁড়াতে। তারা সরকারি কর্তৃপক্ষের উপর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি করে আমাদের কর্মীদেরকে হয়রানি কিংবা জেলে আটক করাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমাদের বিশিষ্ট কয়েকজন কর্মীকে গুম করে তারা সুকৌশলে গা বাঁচাবার চেষ্টা করছে। দেশপ্রেমিকদের নামে নানাবিধ মিথ্যা অভিযোগ ও কুৎসা রটিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবার প্রয়াস তারা চালাচ্ছে। আমি শুধু ধৈর্যের সাথে নিরীক্ষণ করছি আর কর্মীদের প্রতি সহনশীল ও বাস্তবে দেশপ্রেমিক হবার নির্দেশ দিচ্ছি। সরকারি কর্তৃপক্ষের অপারগতা লক্ষ্য করেও আমি সরকারকে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে সময় দিতে চাই। আর সরকার ও বিশেষ মহল উভয়েই যদি মনে করে বসেন, এই উদারতা আমাদের দুর্বলতা কিংবা এর সুযোগ গ্রহণ করা তাদের জন্য বাঞ্ছনীয়, তবে আমি আজ হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত থাকতে চাই-মানুষের দুঃখ-কষ্টকে সম্বল করে রাজনীতি করবেন না, তাহলে হতাশাগ্রস্ত জনমত বিক্ষোভে ফেটে পড়বে আর ভয়াবহ দিনগুলোরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। *(সূত্রঃ সাপ্তাহিক হককথা, ১৭ মার্চ-১৯৭২)*

www.pathagar.com

অসংখ্য কেলেঙ্কারীর পরও রিলিফ বিতরণের নামে বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্যকে নিয়ে যে অমানবিক ছিনিমিনি খেলার পালা চলে, তার মধ্য দিয়েই মুজিব সরকারের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যায়। ৭ এপ্রিল সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামান আওয়ামী লীগ ও তার সর্ব-কর্ম সমর্থক ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে বিরোধীদল বর্জিত সরকারি সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেও পরবর্তীতে রিলিফ বিতরণের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের একচেটিয়া নেতৃত্বই বজায় রাখা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে রিলিফ কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার ঘটনা তখন আর অভিযোগের পর্যায়ে ছিল না, প্রমাণিত সত্যে পরিণত হয়। আইয়ুব খানের বি.ডি চেয়ারম্যান কেনার পন্থাতেই মুজিব সরকারও রিলিফ কর্মকর্তা পদে নিজস্ব লোক নিয়োগ করে চরম স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন দেখায়। বহু স্থানে পাকবাহিনীর অত্যাচারী দালালদেরকেও কর্মকর্তা পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। ফলে সারাদেশে রিলিফের নামে চলে ব্যাপক কারচুপি আর আত্মসাতের পালা। মুজিব সরকারের রিলিফ কেলেঙ্কারী এমন এক ন্যক্কারজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, শুধু নিরপেক্ষ পত্রিকাগুলোতেই নয়, সরকারি পত্র-পত্রিকাতেও সেসব বিচিত্র কাহিনী প্রকাশিত হয়।

অপরদিকে বরিশাল, মুন্সিগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় দু'একটি ভুখা মিছিল বের হয়। খাদ্য সমস্যার ব্যাপারে ভাসানী একা নয়, অন্যান্য বিরোধীদলও প্রতিশ্রুতির ভাণ্ডার বন্ধ করে বাস্তবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সরকারকে সতর্ক করে দেন। এমনকি সরকারের ভিতরের বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিরাও এ ব্যাপারে তীব্র ভর্ৎসনা জ্ঞাপন করেন। সাথে সাথে সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বি-টিম সমর্থিত বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নও হয়ে ওঠে বেশ তৎপর। এই দুটি সংগঠন 'দশদফা কর্মসূচির ভিত্তিতে দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলুন' শীর্ষক দাবি প্রণয়নের মাধ্যমে চার পৃষ্ঠার এক প্রচারপত্র প্রকাশ করে। এ প্রচারপত্রে ডাকসুর ভিপি ও ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম মুকুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক নূর উল আলম লেনিন, ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক এম.এ. রশিদ ও যুগ্ম সম্পাদক রাশেদুল হাসান স্বাক্ষর করেছিলেন। এই প্রচারপত্রের এক অংশে বলা হয়েছিল, "......দেশে আজ এক চরম খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কার্যকরী হচ্ছে না। যেটুকু খাদ্য দেশে আছে সুষ্ঠুভাবে জনগণের কাছে পৌছানো যাচ্ছে না। পারমিটবাজ, লাইসেন্সধারী অসাধু ব্যবসায়ীরা, প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে মুনাফার পাহাড় গড়ছে।"

সে সময় আরো যে সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠন সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলো তাদের মধ্যে ছিল জাতীয় লীগ, জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবির, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ জনমুক্তি পার্টি, পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (দু'টি গ্রুপ), ফরওয়ার্ড স্টুডেন্ট ব্লক, বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজবাদী ছাত্র জোট, বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন (তিনটি গ্রুপ), ইয়থ ফ্রন্ট ফর ন্যাশনাল লিবারেশন, সংগ্রামী ছাত্রসমাজ, বাংলাদেশ চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী সমিতি, বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলার মজদুর ফেডারেশন, বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন প্রভৃতি।

www.pathagar.com

সে সময় ঝিনাইদহের শ্রীকালী কিঙ্কর মিন্টু সম্পাদিত সাপ্তাহিক জনমত পত্রিকার বরাত দিয়ে আজাদ সুলতান সম্পাদিত গণবাণী এপ্রিল সংখ্যায় 'আত্মহত্যা ঃ তাড়না কিসের প্রেম না ক্ষুধা?' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'ঝিনাইদহ থানার ৬নং শিকারপুর ইউনিয়নের মান্দাবাড়িয়া গ্রামের জনৈক ভোলাই মণ্ডলের স্ত্রী নূরজাহান এবং হরিণাকুণ্ড গ্রামের জনৈক রফিউদ্দীনের ১৮ বছর বয়স্কা অষ্টাদশী স্ত্রী জোহরা খাতুন বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। ঝিনাইদহ মহকুমার শৈলকুপা থানার নগিরাট গ্রামের জনৈক নগরবাসী ১০ নং হাটফাজিলপুর ইউনিয়নের বাঘিনী গ্রামের জনৈকা অঞ্জলিবালা, রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ১১ নং শাহবাজপুর ইউনিয়নের শেখরা গ্রামের শতীসচন্দ্র মণ্ডল, আলমডাঙ্গা গ্রামের আজাহার শেখ মৃত্যুবরণ করেছে। ঝিনাইদহ মহকুমার ৬টি থানার বিভিন্ন পল্লীতে বসবাসকারী মানুষের আত্মহননের যে খবর দেওয়া গেল তা হিসাব করলে দেখা যায়, প্রতি ২ দিন অর্থাৎ ৪৮ ঘণ্টা অন্তর একজন করে মানুষ আত্মহত্যা করে চলেছে। ১৯৭২ সালের ৫ জানুয়ারি থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ৭৪ দিনে এই মহকুমার পল্লী গ্রাম থেকে ২৪ জন মহিলা ও ১৪ জন পুরুষ মোট ৩৮ জন ভাগ্যবিড়ম্বিত নর-নারী গলায় দড়ি দিয়ে বা বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে। যারা আত্মহত্যা করেছে বলে জানা গেছে তারা হলো ঃ ঝিনাইদহ থানার নুরজাহান বিবি, আমেনা খাতুন, আবরণ নেছা, রুপয়া খাতুন, কুলসুম নেছা, নুরুল ইসলাম, মন্দি বিবি, মরিয়ম খাতুন, সাহারা খাতুন, আব্দুল খালেক, গোলাম সোবহান, আকবর আলী, অজিত কুমার বিশ্বাস, ফুলমতি, সুফিয়া বেগম, সুরমা নেছা, ওরিন্নেছা, আজিমুদ্দিন, কালেমুন্নেছা, মতিরন নেছা, আনোয়ার বিশ্বাস, আলেয়া খাতুন, হরিণাকুণ্ডু থানায় সায়েদ আলী মণ্ডল, জহুরা খাতুন, সাহারা বানু, মকবুল হোসেন, ভোলা কারী, সালেহা খাতুন, এলাহি দফাদার, শিপাবালা সেন, খোদাবক্স, সুরত আলী। চাঁদপুর থানায় মাসুদা খাতুন, শোনাভান বিবি, খেলাফত মণ্ডল, পূর্ণিমা বালা ও কালিগঞ্জ থানায় আকবর আলী মোল্লা। এই সকল মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে এদের কেউই প্রেমের তাড়নায় আত্মহত্যা করেনি অভাব-অনটন, রোগ-ব্যাধি, ক্ষুধার তাড়নায় এরা জীবনের অবসান ঘটিয়েছে।'

১৭মার্চ সাপ্তাহিক হককথায় 'এবার মিষ্টি আলু'-শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বাংলাদেশে চোরাচালান বন্ধ হয়নি। হবেই বা কি করে! সম্পদ যে আমাদের অঢেল। আমন ধান যা জন্মেছিল দু'মাসের পাচারে এক রকম শেষ হয়ে আছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, ভারত থেকে রাজশাহী, দিনাজপুর, মোমেনশাহী প্রভৃতি জেলার বড় বড় বাজারে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ এসে পৌঁছেই ঘোষণা করে দেন-'বাজার দরের চেয়ে দু'টাকা বেশি হারে সব ধান, চাল কেনা হয়ে গেল। নিজ নিজ টাকা বুঝে নিয়ে যান।' সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক বোঝাই হয়। আজ-কাল ভারতীয় ট্রাকে নম্বরও থাকে না। আমাদের সীমান্তেতো প্রহরী নেই। তাদের এলাকায় রয়েছে কিন্তু সেলামির রেওয়াজটা সেখানেও জনপ্রিয়। আশ্চর্য! উভয় দেশের সরকার ও জনগণ মৃত সৈনিকের অভিনয় করে যাচ্ছেন। কিছুদিন হলো আমাদের খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন, মিলিটারীর অত্যাচারে চাষী খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে পারেনি। তাই আজ এত দুর্ভিক্ষ। কিন্তু বেদখলের নয়মাসে তো জিনিসপত্রের দাম এত বেড়ে যায়নি। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের মতে এবার ধান যা জন্মেছিল পাচার না হলে খুব বড়জোর আজ মণ দর ৪০ টাকা হত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাংলাদেশের চর এলাকার লক্ষ লক্ষ পরিবার এক বেলা শুধু মাসকলাই ভেজে খেয়ে কাটিয়ে দেয়। এবার মাসকলাইয়ের ফলন এত ভাল হয়েছিল যে, আজকাল এর বাজার দর মণ প্রতি ২০/৩০ টাকা থাকার

www.pathagar.com

কথা। কিন্তু চোরাচালান গ্রামবাংলাকে ফতুর করে দিয়েছে। বর্তমানে মাসকলাই ৫৫/৬০ টাকা মণ দরে কেনাবেচা হচ্ছে। এটা ভাগ্যের পরিহাস বৈ কিছু নয়। বাংলার জনগণকে এবার আমরা আর একটি খাদ্যদ্রব্যের চোরাচালান সম্পর্কে সজাগ করে দিতে চাই। আউশ ধান জন্মের পূর্ব পর্যন্ত গ্রামের লক্ষ লক্ষ পরিবার মিষ্টি আলু খেয়ে দিনাতিপাত করে থাকে। এবার এই আলু বেশ ভাল জন্মেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই আসাম থেকে বিড়ির পাতা, বাঁশ, ছন নিয়ে নৌকা আসা শুরু করেছে। তারা মিষ্টি আলু চায়। গ্রামের হাটে এই আলু ৭/৮ টাকা মণ দরে বিক্রি হয়ে থাকে। চোরাচালান জমে উঠলেই তা ১৬/১৭ টাকায় উঠে গরিবের নাগালের বাইরে চলে যাবে। তাও যদি না ঠেকানো যায়, না খেতে পেয়ে লক্ষ লক্ষ লোক মরে যাবে। যে পার্টি এক সময় চালের দর মণ প্রতি পঞ্চাশ টাকা শুনলেই দুর্ভিক্ষাবস্থা ঘোষণা করত, জনগণের অনাহারে রাজনৈতিক চেতনা ফিরে পেত, গ্রাম-গঞ্জে মহামারীর পদধ্বনি শুনতে পেত সেই দলের শাসনামলেই বাংলাদেশের বাজারে চালের নিম্নতম দর মণ প্রতি ষাট টাকা, সেই দেশেই শহরে শহরে ভুখা মিছিল, বসন্ত রোগের মহামারী। আজ তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমগুলোতে জরুরি অবস্থা ঘোষণার কথা বলা হয় না। যদিও মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি মহকুমায় লোকজন না খেতে পেয়ে মারা যাবার উপক্রম হয়েছে। সেই একই ধারা-দুর্ভিক্ষের খবর, মহামারীর গ্রাস সব চেপে যেতে হবে। এসবে কর্তারা বিড়ম্বনা বোধ করেন।

২ এপ্রিল ঢাকা মহানগর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির আহবায়ক জনাব মুজিবুর রহমান চিশতীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় মওলানা ভাসানী সরকারের উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। সেদিন ঘনঘটা আবহাওয়ায় তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে। স্বাধীনতার পর পল্টনে মওলানা ভাসানীর এই ছিল প্রথম জনসভা। ঢাকাবাসী ছাড়াও নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল প্রভৃতি এলাকা থেকে মিছিল করে আসা জনতায় ময়দানটি যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বিকেল সোয়া ৪ টায় কৃষক-শ্রমিকের সর্বকালের নয়নমণি মওলানা ভাসানী মাইকের সামনে দাঁড়ান। অসংখ্য লাল পতাকা, মুহুর্মুহু শ্লোগান আর উদ্বেল জনতার প্রাণঢালা ভালবাসায় সিক্ত হয়ে যখন বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠ সোচ্চারে বক্তৃতা শুরু করলেন, চৈতালী বিকালের আকাশ ভাঙ্গা শিলাবৃষ্টি লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে হতাশ করে ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য করল। মাত্র ৭ মিনিটের মধ্যে জনসভার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ৭ মিনিটেই মওলানা ভাসানী অনেক কথা বলেছিলেন। ২ এপ্রিলের বক্তৃতাই মওলানা ভাসানী সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সংক্ষিপ্ততম বক্তৃতা।

বিপুল করতালি ও মুহুর্মুহু শ্লোগানের মধ্যে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী বলেন, "বাংলাদেশের মানুষ বৃটিশের গোলামিকে বরদাস্ত করে নাই, পিণ্ডির জিঞ্জির ছিন্ন করে যে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে এ বাংলার বীর জনগণ আমরা হিন্দুস্থান, রাশিয়া, চীন অথবা আমেরিকার গোলামি স্বীকার করবো না, করবো না, করবো না।" তিনি বলেন, "আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের বীর জনগণ এবং সরকার সাহায্য করেছে সেজন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ আছি, থাকবো। এ সাহায্যের প্রতিদান আমরা প্রয়োজনে অন্যভাবে অবশ্যই দেবো। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছে একথা বলে যদি বাংলার মানুষকে আবার গোলামির বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায় তবে তা আমরা মেনে নেব না।"

মওলানা ভাসানী দৃঢ় আশাবাদ প্রকাশ করে বলেন, "বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা আর রক্তদানের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা বাংলাদেশের জনগণ প্রয়োজন হলে বুকের শেষ

www.pathagar.com

রক্তবিন্দু দিয়ে অক্ষুণ্ন রাখবে।" মওলানা ভাসানী বলেন, "আমাদের এই স্বাধীনতা পাহাড়-পর্বত বা একখণ্ড ভূমির স্বাধীনতা নয়। এ স্বাধীনতাকে মেহনতি মানুষের স্বাধীনতায় পরিণত করতে হবে।" তিনি বলেন, "অনেক রক্ত, আর অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে লুটপাটকারী আর পারমিট শিকারীদের দ্বারা ধ্বংস হতে দেব না।" আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে লুটপাটের অভিযোগ করে মজলুম জননেতা বলেন, 'লুটপাট সমিতি সারা দেশে প্রতিযোগিতা করে লুটপাট চালাচ্ছে।" গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কায়েমের ওয়াদা পালনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে লুটপাট সমিতিকে কঠোর হস্তে দমনের আহ্বান জানান।

মওলানা ভাসানী বলেন, "সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমরা আওয়ামী লীগের সরকারকে সাহায্য করবো। অনেকে লুটপাট সমিতি করে সারাদেশে প্রতিযোগিতা করে অপরের সম্পত্তি আত্মসাত করছে।" তিনি বলেন, "আওয়ামী লীগের ভেতরের এই আবর্জনা সাফ করতে হবে। তাই আমরা তাদের সমালোচনাও করবো। বিরোধীদল হিসেবে গঠনমূলক সমালোচনা করবো। তাদের সংশোধন করতে চেষ্টা করবো। যদি তারা এতেও সংশোধিত না হয় তবে তাদের কপালে দুঃখ আছে।" তিনি বলেন, "স্বাধীনতার পূর্বে আওয়ামী লীগের যেসব লোকের থাকবার জন্য টিনের ঘরও ছিল না, তারা আজ বড় বড় বাড়ি-গাড়ির মালিক। তারা আজ অন্যের কল-কারখানা, দালানকোঠা ও ব্যাংক নিজের নামে লিখিয়ে নেয়ার জন্য তৎপর।"

শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী বলেন, "মুজিব, তোমার পপুলারিটি ভাঙিয়ে আওয়ামী লীগের একদল লোক বাড়ি, গাড়ি ও ব্যাংকের মালিক হবার চেষ্টা করছে। তুমি এদের দমন কর। তা না হলে তোমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তুমি লুটপাট সমিতির কার্যকলাপ বন্ধ করে মানুষকে খেতে পরতে দাও-অন্যথায় তোমার সমস্ত জনপ্রিয়তা ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে।"

মওলানা ভাসানী বলেন, "আওয়ামী লীগের লুটপাট সমিতির মাধ্যমে স্বাধীনতা আমরা ধ্বংস হতে দেব না। গ্রামে গ্রামে ন্যাপ সংগঠিত করে এবার দুস্কৃতকারীদের প্রতিরোধ করবো।" তিনি বলেন, "এদেশের সংগ্রামী জনতা সংগ্রাম করেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করেছে। পাঞ্জাবি শোষকদের ধ্বংস করেছে, এই সংগ্রামী জনতাই এরপর স্বাধীনতার শত্রু এই পারমিট শিকারীদের সুযোগ সন্ধানীদের উৎখাত করে ছাড়বে।"

দেশের খাদ্য পরিস্থিতি ও চালের অগ্নিমূল্যের উল্লেখ করে ন্যাপপ্রধান দুর্ভিক্ষের গ্রাস থেকে লাখ লাখ মানুষকে বাঁচাবার জন্য মুজিবের প্রতি আহ্বান জানান। মওলানা ভাসানী প্রশাসন যন্ত্রের আমূল সংস্কার দাবি করেন। তিনি বলেন, "মেহনতি মানুষের রক্তে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। মেহনতি মানুষ কারো গোলামি মেনে নেবে না।" তিনি বলেন, "স্বাধীনতা গুটি কয়েক লোকের ছেলেখেলা নয়।" রাবিশগুলি পরিষ্কার করে প্রশাসন যন্ত্রের পুনর্গঠন না করলে বৃহত্তর জনতা স্বাধীনতার ফল লাভ থেকে বঞ্চিত হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। মওলানা ভাসানী এক পর্যায়ে বলেন যে, "আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য রোধ, সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন এবং শাসনতন্ত্রে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা না হলে দেশে আগুন জ্বলে উঠবে। কেউ তা ঠেকাতে পারবে না।"

৯ এপ্রিল ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভায় 'মানব না, মানব না' শ্লোগান দিয়ে বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠ মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, "শাসনতন্ত্রে কৃষক-

www.pathagar.com

মজুরদের বাঁচার দাবি, বাক-স্বাধীনতা এবং সকল শ্রেণীর মানুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে তা মানবই না।" মওলানা ভাসানী অভিমত প্রকাশ করেন যে, সকল শ্রেণীর প্রতিনিধির পরামর্শে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করলেই ভাল হতো। তবে গণ্ডগোল না পাকিয়ে প্রথমে দেখতে হবে তাতে কি আছে না আছে। সুদীর্ঘ ভাষণের এক পর্যায়ে মওলানা ভাসানী প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, "জনসাধারণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে-৬ দফার জন্য, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইনগত কাঠামোর মধ্যে। স্বাধীনতার প্রশ্নে এই ভোট কেউ তাদের দেয়নি। দলমত নির্বিশেষে ৩০ লক্ষ বাঙালির জীবনের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা এসেছে। আওয়ামী লীগের একার কোন অধিকার নেই-এই দেশের শাসনতন্ত্র রচনা করার। যদিও আমরা আওয়ামী লীগের সরকার গঠনে আপত্তি করি নাই। তাই এমসিএরা আজ তোমরা হোমড়া-চোমড়া বনে গেছে।" মওলানা ভাসানী জিজ্ঞাসার সুরে বলেন, "তোমরা কোন এমসিএ? পাকিস্তানের মানুষ তোমাদের বানিয়েছে। তোমাদের এখনো রেখেছি-এই বেশি। যদি পরিষদ সদস্যগণ কৃষক-শ্রমিক সর্বহারা মেহনতি জনগণের দাবি পূরণ না করে, জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে জনগণ যে ভোট দিয়েছে গলায় গামছা লাগিয়ে সেই ভোট ফেরত নেবে।"

জনসভা চলাকালে শ্লোগান উঠে 'বিনা বিচারে হত্যা করা চলবে না', 'বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করা চলবে না', 'তোমরা খাবে-আমরা খাব না-তা হবে না তা হবে না', 'কেউ খাবে আর কেউ খাবে না তা হবে না তা হবে না', 'সমস্ত দেশপ্রেমিক রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', 'মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারীদের শাস্তি চাই', 'স্বাধীনতা আনলো কারা-কৃষক শ্রমিক সর্বহারা', 'তোমার নেতা আমার নেতা-মওলানা ভাসানী', 'স্বাধীনতার প্রধান প্রবক্তা-মওলানা ভাসানী জিন্দাবাদ', 'কৃষক শ্রমিকদের নয়নমণি মওলানা ভাসানী জিন্দাবাদ', 'সমাজতন্ত্রের নামে লুটপাট করা চলবে না।' 'বিনা ক্ষতিপূরণে শিল্প কারখানা জাতীয়করণ কর', 'চোরাচালানী, চোরাকারবারীদের খতম কর', 'কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েম কর', 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি জিন্দাবাদ', 'খাঁটি সমাজতন্ত্র কায়েম কর।'

মওলানা ভাসানী গগন বিদারী শ্লোগানের মধ্যে ঘোষণা করেন, শাসনতন্ত্রে গণমানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন না ঘটলে অন্য কেউ এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করলেও অন্তত তিনি সে শাসনতন্ত্র মানবেন না। 'এজন্যে গুলি খাওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত আছি।' তিনি সমস্ত শক্তি দিয়ে বলেন, "মুজিব, তোমার যেমনি গুলি করে হত্যা করার ক্ষমতা আছে-তেমনি গুলি খেয়ে মরার অধিকার আমারও আছে।"

শেখ মুজিব নক্সালপন্থীদের দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, "নক্সালপন্থী কারো গায়ে লেখা থাকে না। এ ধরনের ঘোষণা গণতন্ত্রের বরখেলাপ। গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী অপরাধীদের গ্রেপ্তার কর, বিচার কর এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দাও, তাতে কারো কোন আপত্তি থাকবে না। কিন্তু বিনা বিচারে কাহাকেও গুলি করে হত্যা করা চলবে না।" শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকারদানসহ তাদের সকল সমস্যা অবিলম্বে দূর করার জন্য তিনি সরকারের কাছে দাবি জানান। মওলানা ভাসানী বলেন, আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের জন্য ওয়াদাবদ্ধ। তবে তিনি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন যে, কথা ও শ্লোগানের মাধ্যমে নয়-সমাজতন্ত্র আসবে বিপ্লবের মাধ্যমে। মওলানা ভাসানী সংবাদপত্রের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দাবি করেন। তিনি বলেন, সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হলে-তারা দেশের সঠিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে পারবেন।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী বলেন, "একটি ন্যাশনাল কনভেনশন ডেকে সকলের মতামত নিয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা উচিত ছিল। কিন্তু সরকার তা করেনি।" তিনি বলেন, "পরিষদে যে একদলীয় শাসনতন্ত্র প্রণীত হতে যাচ্ছে, তাতে কৃষক-শ্রমিক সর্বহারা মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং খাঁটি সমাজতন্ত্রের নিশ্চয়তা থাকতে হবে।" তিনি শাসনতন্ত্রের প্রতিটি লাইন বিশ্লেষণ করার জন্য শিক্ষিত সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি এই সভায় পুনরায় বিশেষ জোর দিয়ে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষায় অর্জিত এই স্বাধীনতাকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করার জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "মরে যাব কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষা করব। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এতো রক্ত পৃথিবীতে কেউ দেয়নি। পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে স্বাধীনতার জন্যে দু'লক্ষ নারীকে সতীত্ব বর্জন করতে হয়নি।" সরকারকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান ও স্বীয় সহযোগিতার আশ্বাস দান করেন।

মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'আওয়ামী লীগের ইতিহাস নির্যাতন এবং দুঃখের ইতিহাস। কেবল ক্ষমতায় যাবার জন্য তখন আওয়ামী লীগ করিনি। দেশের মাটিতে সৎ সরকার গঠন করার জন্য আমরা আওয়ামী লীগ করেছিলাম। নাপাকের ডিপো হইতে পাকিস্তানকে উদ্ধার করার জন্য আওয়ামী লীগ করেছিলাম।" পাকিস্তানের নির্যাতনের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, বিখ্যাত সাহিত্যিক মুজতবা আলীর মত ব্যক্তি পাকিস্তানে বসবাস করতে পারে নাই, তাহাকে কমিউনিস্ট বলিয়া নির্যাতন করেছে, ড. কুদরত-ই-খুদার মতো পাক-ভারতের রত্ন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কোন মূল্য পাকিস্তানে ছিল না। অথচ নাজিমুদ্দিন, শাহাবুদ্দিন যাহাদের পেট চিড়িলে একখানা ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট পাওয়া যেত না-তাহারাই ছিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, গভর্নর, দন্ডমুণ্ডের কর্তা। লিয়াকত আলী, নূরুল আমীনরা কোন মতেই বিরোধীদল সহ্য করতে পারত না। তাই তারা আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতাদের ভারতের লালায়িত কুকুর বলে আখ্যায়িত করেছিল। নির্যাতন চালিয়েছিল। কিভাবে মুসলিম লীগের গুণ্ডা দিয়ে-আর্মানীটোলার জনসভা, পল্টনের জনসভা ভেঙ্গে দিয়েছিল তার নির্মম ইতিহাস বর্ণনা করে শেখ মুজিবুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, তার মধ্যে যেন লিয়াকত আলী, নূরুল আমীনের স্বভাব, মনোভাব দেখা না দেয়-তারা কখনও বিরোধীদল গঠন করতে দিতে চাইত না, বিরোধীদল সহ্য করত না।

তিনি লন্ডনের গণতন্ত্র ও ইতালির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, শক্তিশালী বিরোধীদল ছাড়া গণতন্ত্র কখনও স্থায়ী হতে পারে না। বিরোধীদল আওয়ামী লীগ গঠন করার করুণ ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আজকের বন্যা নিয়ন্ত্রণমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ, আজকের প্রধানমন্ত্রী, দুই আনার মুড়ি খেয়েও আওয়ামী লীগ করেছে।" প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "আজ শেখ মুজিবকে বাদ দিলে আওয়ামী লীগের কি দাম আছে?"

মওলানা ভাসানী প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন যে, "যদি দেশে সত্যিই গণতন্ত্র কায়েম করতে চাও তাহলে শক্তিশালী বিরোধীদল গড়তে দাও, কঠোর সমালোচনার সুযোগ দাও।"

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহারী মওলানা ভাসানী বলেন যে, সংবাপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া গণতন্ত্র অসম্ভব। প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে সরকার পরোক্ষভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হাত দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। সংবাপত্রের

www.pathagar.com

নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দানের দাবি জানিয়ে মওলানা বলেন, গঠনমূলক লেখার মাধ্যমে সংবাদপত্রই দেশে কৃষি ও শিল্প বিপ্লবের শিখা জ্বালিয়ে তুলতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রশাসকদের সংবাদপত্র থেকে ডেকে বলে দাও, এটা ছেপে দাও, ওটা ছেপে নাও, এটা কি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা? সংবাদপত্রে জাতীয় সম্পদকে বৃদ্ধি ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মানুষের মনে বিপ্লবের শিখা জ্বালায়। আর সমাজতন্ত্র ছাড়া গরিবের কোন দুঃখই মোচন হবে না। সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া গণতন্ত্র অসম্ভব।

মওলানা ভাসানী বলেন, "মুজিব তুমি ১২ বৎসর প্রধানমন্ত্রী থাক, আপত্তি নেই, কিন্তু চোর, বদমাশ, লুটপাট সমিতির সদস্য নিয়ে একদিনও থাকতে পারবে না। চোরাকারবারী, কালোবাজারী, ঘুষখোর অফিসারদের কঠোর হস্তে দমন না করলে নিশ্চিত গণঅসন্তোষ দেখা দিবে।" নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম কমানো না হলে দেশে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে মজুদদার ব্যবসায়ী এবং নতুন লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীদের গণবিরোধী ভূমিকা দমন করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

দেশে চোরাকারবার ও খাদ্য পাচার হচ্ছে না বলে খাদ্যমন্ত্রী যে উক্তি করেছেন, তার প্রতিবাদ করে মওলানা ভাসানী বলেন, "মাড়োয়ারীরা বাংলাদেশ থেকে সমানে খাদ্য পাচার করে নিচ্ছে। তারা রিলিফের নাম করে গাড়ি এনে খাদ্যদ্রব্য বোঝাই করে ফিরে যাচ্ছে।" এই সকল চোরাকারবারীদের, মাড়োয়ারীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন, "পশ্চিম বাংলাকে তোমরা শোষণ করেছ, কিন্তু বাংলার মাটিতে তোমাদের চোরাকারবারী ব্যবসা চলতে দেয়া হবে না।" তিনি বলেন, "চোরাকারবারীরা বাংলাদেশ এবং ভারত উভয়েরই দুশমন। মুজিব, তুমি চোরাচালানী বন্ধ কর। তুমি যদি না পার তবে ভাসানী বাঁশের লাঠি দিয়ে এদের শেষ করবে।"

মওলানা ভাসানী বলেন, "পাকবাহিনীর সাথে যোগসাজশকারী দালালদের জনগণ কোনদিনই ক্ষমা করবে না।" তিনি বলেন, "সম্প্রতি কিছু দেশদ্রোহী দালাল আওয়ামী লীগে ভিড়ে ভাল মানুষ সাজার চেষ্টা করছে।" এই দুর্নীতিপরায়ণ সদস্যদের বের করে দিয়ে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উপদেশ দেন। অন্যথায় তারা শেখ সাহেবের প্রভূত ক্ষতি সাধন করতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, "আওয়ামী লীগ দালালদের ক্ষমা করলেও সাড়ে সাত কোটি বাংলার মানুষ দালালের ক্ষমা করবে না।" তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব দালাল ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরকে অবিলম্বে শাস্তি দেবারও দাবি জানান। শেখ মুজিবকে উদ্দেশ্য করে মওলানা ভাসানী বলেন, "যারা দুই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে তাদের কথা তুমি জানতে না পারো তুমি জেলে ছিলে, আমি ভাসানী জানতে না পারি, কিন্তু এদেশের গ্রামের মানুষ ভাল জানে।" তিনি কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের কল্যাণের জন্য খাঁটি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "গণপরিষদ সদস্যদের বাড়িতে দালান উঠবে আর কৃষক শ্রমিক বাস্তুহারাদের কুঁড়েঘরও থাকবে না তা কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না।" তিনি বলেন, "আল্লাহর হুকুম-লাহু মা ফিস সামাওয়াতে ওমা ফিল আরদ-আসমান জমিন এ বিশ্বে যা কিছু আছে সকলের একমাত্র মালিক আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং আল্লাহর বান্দা হিসেবে এদেশের পরিমিত সম্পদ আমরা সবাই সমানভাবে ভোগ করবো।" তিনি জনগণকে স্নো, পাউডার, লিপস্টিক ইত্যাদি বিলাস দ্রব্য বর্জন করে দেশের সকল মানুষের সুখ-দুঃখ সমানভাবে ভাগ করে নেয়ার উপদেশ দেন।

www.pathagar.com

বর্তমান সরকারের জাতীয়করণ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন, "তাতে পুঁজিপতি শোষণের হ্রাস পাবে না। কলকারখানা কেনাবেচা করলে তাতে জাতীয়করণ হয় না। বিনা ক্ষতিপূরণে বিনা মূল্যে সকল শিল্প-কারখানা বাজেয়াপ্ত করে জাতীয়করণ করতে হবে। মুজিব, তোমার সরকারের নিকট আমার অনুরোধ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য ঠিক কর। আড়াই টাকা সের কেরোসিন। আজ যদি ভাতের অভাবে মানুষ গুদাম লুট করে? জিনিসের অভাবে দোকান লুট করে তা হলে কি করবে? তোমার (মুজিব) মুক্তিবাহিনী কত দোকান লুট করেছে, কি করেছ তাদের?"

বিভিন্ন জায়গায় যারা ব্যাংক লুট করেছে মওলানা ভাসানী তাদের সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানান। তিনি বলেন, "একমাত্র বগুড়া ট্রেজারী থেকেই ১৪ কোটি টাকা লুট হয়েছে।" সেই সব লুণ্ঠিত টাকা তিনি সরকারকে উদ্ধার করতে বলেন।

মওলানা ভাসানী বলেন, "এখন দেশ ভাগবাঁটোয়ারার অরাজকতা চলছে। যাদের ঘরে ভাত ছিল না, তাদের বাড়িতে দালান উঠেছে। দালান যদি করতে হয় তোমার এমসিএদের জন্য নয় প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য কর। সমাজতন্ত্রে সকলের সমান হোক। খেতে হয় সকলে সমান খাবে।" এই সময় জনগণ "কেউ খাবে আর কেউ খাবে না তা হবে না-তা হবে না' এই শ্লোগানে ফেটে পড়ে।"

বৈদেশিক সাহায্য প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী বলেন, "দেশের সীমিত সম্পদ নিয়ে দেশকে গড়ে তোলার উচিত। ভিক্ষা ভালো নয়, ভিক্ষা আল্লাহও পছন্দ করেন না। প্রয়োজন হলে এক বেলা খাব, একদিন পর একদিন খাব তবুও সাহায্যের জন্য কারো কাছে যেয়ো না-সে দেশ রাশিয়া, আমেরিকা অথবা চীনই হউক না কেন? সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা যে ১০ পয়সা দিয়ে ৭০ পয়সার (সওয়াব) সুদ আদায় করবে তার কোন সাহায্য আমরা চাই না।" স্বাধীনতার একমাত্র গ্যারান্টি আত্মনির্ভরশীল হওয়ার উপর বিশেষ জোর দিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন যে, "কলার ক্ষার ব্যবহার করবো-তবুও পচা ভারতীয় সাবান ও অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহার করবো না।"

মওলানা ভাসানী সকলের প্রতি সংযত কথাবার্তা বলার আহ্বান জানান। মুজিবকে উদ্দেশ্য করে মওলানা ভাসানী বলেন, "মুজিবুর তুমি-কথা সামলিয়ে বল। তুমি এখন মুজিব ভাই নও, তুমি এখন বাঙালি জাতির পিতা, এখন আর তুমি ছাত্রলীগ কর্মী নও। প্রধানমন্ত্রীর কথার দাম আছে। পাগলামি করলে চলবে না। নক্সাল দেখলেই গুলি এটা ভাসানী বলতে পারে-সে প্ল্যাটফর্মের বক্তা। তোমার মুখে যা-তা কথা সাজে না। সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা তুমি। কারো গায়ে কি লেখা আছে? কি করে বুঝবে কে নক্সাল? গ্রেপ্তার কর, শাস্তি দাও, প্রাণদণ্ড দাও, কিন্তু দেখামাত্র গুলি করার কথা বললে চলবে না। এটা হলে বড় বিপদ হবে। আজ দালালির কথা বলে, নক্সাল বলে যাকে তাকে ধরা হচ্ছে-দালালরা আজ তোমার দলেই ভরেছে। দালাল দল সাবধান। আওয়ামী লীগ ক্ষমা করলেও রাষ্ট্রদ্রোহী দালালদের এদেশের মানুষ ক্ষমা করবে না।"

মওলানা ভাসানী বলেন, "প্রাণের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা রক্ষা করবো। শুধু আওয়ামী লীগ, মতিয়া গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়ন, আর মস্কোপন্থী কমিউনিস্টরা এদেশের স্বাধীনতা আনেনি।" তিনি বলেন, "এদের স্বাধীনতার সার্টিফিকেট দেয়া বন্ধ করুন। কারণ, স্বাধীনতা এনেছে দেশের আপামর জনগণ। এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আওয়ামী লীগের বাবার জমিদারী নয়, ভাসানী ন্যাপের দাদার তালুকদারী নয়। খবরদার মুজিব, পক্ষপাতিত্বমূলক কথা বলো না। তুমি কেবল আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী নও, তুমি

www.pathagar.com

ন্যাপেরও প্রধানমন্ত্রী, তুমি দেবেন সিকদারেরও প্রধানমন্ত্রী, তুমি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী। কোন সম্প্রদায় বা কোন গোষ্ঠীর নও। জনগণই সবচেয়ে ভাল জানে স্বাধীনতায় কার কতটুকু অবদান রয়েছে।"

জাতীয়করণ সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন, 'জাতীয়করণ করা হয়েছে না ধোঁকাবাজী? জাতীয়করণের নামে কেনা-বেচা চলছে; সব সাবার হয়ে যাচ্ছে! যদি পার-সত্যিকারের সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাও তবে ক্ষতিপূরণ বাদ দিয়ে জাতীয়করণ কর। ক্ষতিপূরণ পেলে আবার শিল্পপতিরা একটা ছেড়ে অন্য মিল করবে। এতে পুঁজিবাদ খতম হবে না।

মওলানা ভাসানী পাকিস্তানে আটককৃত ৫ লক্ষ বাঙালিকে অবিলম্বে ফেরত দেওয়ার জন্যে ভুট্টোর কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, "পাকিস্তানে আটককৃত বাঙালিরা কোন দোষ করেনি। তারা পাকিস্তানে হত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ এবং ধর্ষণ করেনি। বাঙালিরা পাকিস্তানের যুদ্ধবন্দিদের মতো তারা অপরাধী নয়। যুদ্ধবন্দিদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।" তিনি বলেন, "যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে।" নির্দোষ বাঙালিদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বিশ্বের মানবতাবাদী শান্তিকামী মানুষের কাছে পাকিস্তানের উপর চাপ প্রয়োগের জন্য মওলানা ভাসানী আকুল আবেদন জানিয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে বন্ধু রাষ্ট্র ভারত সরকারকে উদ্যোগ নিতে আবেদন জানান।

'অচল নোট' প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী বলেন যে, "স্বাধীনতার যুদ্ধকালে পাকিস্তান সরকার ৫০০ টাকার ও ১০০ টাকার নোট জমা দেওয়ার হুকুম করেছিলেন। তখন স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ টাকা জমা না দেওয়ার জন্য বলেন। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে অনেকেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশমত টাকা জমা না দিয়ে রেখে দেয়। স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার স্বল্প সময়ের নোটিশ প্রদান করে টাকা জমা নেয়। যার ফলে আজও অনেকেই অচল টাকা জমা দেওয়ার সুযোগ পায় নাই। যারাও বা টাকা জমা দিয়েছে তাদের অনেকে আজ পর্যন্ত সেই টাকাও ফেরত পায় নাই। টাকার অভাবে বাংলার জনগণ না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। আগে ছেঁড়া নোট স্টেট ব্যাংকে জমা দিয়ে বদল করে আনা যেত আজকাল দেখা যাচ্ছে রাস্তাঘাটে, হাটে-বাজারে, অবাধে ছেঁড়া নোটের-সেই সব অচল নোটের কারবার চলছে।" মওলানা ভাসানী সরকারের কাছে জানতে চান-কি করে এইভাবে আর কতদিন গরিব মানুষ ঠকানোর কারবার চলবে? অনতিবিলম্বে এ সম্পর্কে সরকারকে এর ব্যবস্থা করতে হবে বলে মওলানা ভাসানী দাবি করেন। সব বাঙালিই দালাল নয়। অবাঙালিদের সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন, "সব অবাঙালিই দালাল নয়। যাহারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দাও কিন্তু নিরপরাধ লোকদিগকে হয়রানি কর না।"

৯ এপ্রিল ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর এই বিরাট জনসভায় প্রস্তাব পাঠ করেন ন্যাপের ঢাকা শহর কমিটির সদস্য আজাদ সুলতান। জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহে বলা হয়-

(১) এই সভা গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ করিতেছে যে, পাকিস্তানে আটক পাঁচ লক্ষ বাঙালির উপর চরম নির্যাতন শুরু হইয়াছে। উক্ত ব্যাপারে এই মুহূর্তে কোন সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে যে কোন মুহূর্তে ইহাদের চরম ক্ষতিসাধন হইতে পারে। অদ্যকার এই সভা অবিলম্বে পাকিস্তানসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে আটক বাঙালিদের দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাইতেছে।

www.pathagar.com

(২) এই সভা গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, চোরাচালানী, রিলিফ চুরি ও নানা প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার অপরাধে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রগতিশীল কৃষক শ্রমিক ও ছাত্র কর্মীদের অপহরণ, মারপিট, মামলা দায়ের, গ্রেপ্তার করা হইতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনতার আন্দোলনে অগ্রণী এই সকল কর্মীদের রাজাকার বা নক্সাল বলিয়া চিহ্নিত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইতিমধ্যে রংপুরের কালিগঞ্জ, ময়মনসিংহের গফরগাঁও, খুলনা ও বরিশাল জেলায় ব্যাপকহারে ন্যাপ নেতা ও কর্মী,, কৃষক সমিতি ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং গ্রেফতার করার হুমকি দেওয়া হইতেছে। এই সভা অবিলম্বে তাদের মুক্তি ও সকল প্রকার দমনমূলক কার্যকলাপ বন্ধের জোর দাবি জানাইতেছে।

(৩) এই সভা বিনা বিচারে আটক করা বা হত্যার হুমকির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অবিলম্বে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তির জোর দাবি জানাইতেছে।

(৪) এই সভা গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে বাজারে জিনিস থাকা সত্ত্বেও চাল, ডাল, তেল, নুন, সাবান, কেরোসিন তেল ইত্যাদির মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এই সভা মনে করে যে, স্বাধীনতা-উত্তর যুগে অসাধু ব্যবসায়ী এবং নতুন পারমিট লাইসেন্সধারী নয়া ব্যবসায়ীরা জনগণের এই দুর্গতির জন্য দায়ী। এই সভা অবিলম্বে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম কমানোর জন্য আশু সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণের এবং সর্বত্র ন্যায্যমূল্যের দোকান, রেশনিং ব্যবস্থা চালুর জোর দাবি জানাইতেছে।

(৫) এই সভা শিল্পক্ষেত্রে বন্ধ মিল চালু, পাটকলসমূহে লে-অফ প্রত্যাহার এবং শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া মানিয়া লওয়ার জোর দাবি জানাইতেছে। এই সভা শ্রমিক অসন্তোষের ব্যাপারে পুলিশি গুলিবর্ষণ ও হয়রানির জোর প্রতিবাদ জানাইতেছে।

(৬) এই সভা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করার যে কোন প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জোর ঘোষণা করিতেছে এবং সাংবাদিকদের প্রতি হুমকি, হয়রানির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। *(সূত্রঃ গণবাণী-এপ্রিল ১৯৭২, সম্পাদক আজাদ সুলতান। সহকারী সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর)*

১৪ এপ্রিল সন্তোষে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দেশের ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় সংগঠকদের সভায় তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। দলীয়প্রধান মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত প্রস্তাবে সংবিধানে জনগণের সর্বপ্রকার মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশা বিশেষত শ্রমিক-কৃষকদের সংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সার্থক প্রতিফলন করার আহ্বান জানানো হয়। সভায় গৃহীত অপর প্রস্তাবে বলা হয়, 'সংবিধান হবে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক। সকল ধর্ম মতের অনুসারী বাঙালি-অবাঙালি-নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার পায়, সেজন্য শাসনতন্ত্রে নিশ্চয়তা থাকতে হবে।' সভায় জাতীয় উৎপাদনে অংশগ্রহণ করার জন্য শ্রমিক-কৃষক সকল মেহনতি মানুষ যাতে পূর্ণাঙ্গ কর্মসংস্থান পায় এবং উৎপাদনলব্ধ সম্পদ যাতে শ্রম অনুসারে সুষমভাবে বণ্টন করা হয় তার ব্যবস্থা করার জন্যেও আবেদন জানানো হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, 'দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে ন্যাপ বর্তমান সংবিধান প্রণয়নের জন্যে সকল রাজনৈতিক দল, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, যুবক বুদ্ধিজীবী, মহিলা, সকল পেশা ও সংগঠনের মতামত নিয়ে সংবিধান প্রণয়নের আহ্বান

www.pathagar.com

জানানো হয়।' সংবিধানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন করতে ব্যর্থ হলে ন্যাপ সংবিধান গ্রহণ করবে না বলেও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সভায় গণপরিষদে বিবেচনার জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষ থেকে জাতীয় সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি সংবিধান সাব কমিটি গঠন করা হয়। দলীয় কর্মসূচি ও গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য সভায় অপর একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। ন্যাপ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বাজেয়াপ্ত না করা পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মনির্ভরশীল জাতীয় অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে না বলে অভিমত প্রকাশ করে। সভায় খাঁটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয়করণের সুষ্ঠু নীতি অনুসরণের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। দেশে বিরাজিত খাদ্য সংকট এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্যে সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ব্যবসায়ীদের মুনাফার হার কমিয়ে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। সভায় ভিয়েতনামের বীর জনতার প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে মার্কিন বোমাবর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয়। ন্যাপ এবং কৃষক সমিতি মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বর্তমানেও তাঁরই নেতৃত্বে দুটো প্রতিষ্ঠানই পরিচালিত হচ্ছে বলে মতামত প্রকাশ করে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও শ্রী মণি সিংকে ন্যাপ ও কৃষক সমিতির নাম ব্যবহার না করার আহ্বান জানানো হয়। দেশে রিলিফ বণ্টনে দুর্নীতিতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে এই হীন কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের দাবি জানানো হয়। সভায় বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির সমালোচনা করে সীমান্তের ১৬ কিলোমিটারের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল সম্পর্কিত ধারাটি প্রত্যাহার করার আহ্বান জানানো হয়। সভায় রাজনৈতিক, ছাত্রকর্মী ও তাঁতিদের উপর দুর্বৃত্তদের বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং এ ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি বিধানের দাবিও জানানো হয়।

১৯৭২ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা বাংলাদেশের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ তখন কচু-ঘেচু, কলাগাছের কাঞ্জন প্রভৃতি অখাদ্য, কুখ্যাদ্য খেয়ে অসুখে ভুগে অহরহ মারা যায়। এমনি একটি মৃত্যু ঘটে টাঙ্গাইল থানাধীন হুগড়া গ্রামে। হাবেল নামের এই লোকটি দীর্ঘদিন কলাগাছের কাঞ্জন খেয়ে জীবনধারণ করছিল ফলে জুন মাসের প্রথম দিকে তার বুকে ভীষণ যন্ত্রণার শুরু হয় এবং পরিণতিতে তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর সময় সে স্ত্রী এবং পাঁচটি অসহায় সন্তান রেখে যায়। তারাও পরে অনাহারে দিন কাটায়। ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা থানাধীন গওরাসিয়া গ্রামের অমলচন্দ্র দাস অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করে। রেশন তুলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে সে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে। সে দুটি নাবালক সন্তান এবং স্ত্রী রেখে যায়। সিলেটের কুলাউড়া থানাধীন গইনকা গ্রামের দুটি তরুণ রইস আলী (১৪) এবং সাজিদ উল্লাহ (১১) অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। এরা তিন দিন অনাহারে থাকার পর ক্ষুধার যন্ত্রণায় চতুর্থ দিনে কাঁচা কাঁঠাল খেতে বাধ্য হয়। সাথে সাথে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ থানাধীন উত্তর চৈতা গ্রামের দিন মজুর আব্দুল গফুরও অনাহারে মারা যায়, এই এলাকার অন্যান্য অধিবাসীর মতো সেও সরকারের খয়রাতি সাহায্যের উপর নির্ভর করতো। কিন্তু স্থানীয় কর্মকর্তারা খয়রাতি সাহায্য দানের পরিবর্তে আত্মসাত করতেই বেশি ব্যস্ত থাকায় জনগণের সাহায্য পেতে প্রায় এক সপ্তাহ দেরী হয়ে যায়। কয়েকদিন যাবৎ অভুক্ত আব্দুল গফুর তাই ক্ষুধার দারুণ যন্ত্রণায় প্রাণ হারায়।

www.pathagar.com

রিলিফে দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি এবং আত্মসাতের অভিযোগ ১৯৭২ সালের মধ্যভাগে অহরহ প্রমাণিত হয়। আত্মসাত করতে গিয়ে ধরা পড়ে আওয়ামী লীগ মনোনীত রিলিফ কমিটির বহু মেম্বার-চেয়ারম্যান জনতার হাতে প্রহৃত হয়, তাদের ফটো এমনকি সরকারি পত্র-পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়। সারাদেশে আওয়ামী লীগের ছায়াতলে থেকে যারা রিলিফ কমিটির মাতব্বরী করছে তাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনেরও বেশি দুর্নীতি ও চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি। কেননা, তাহলে তো আওয়ামী লীগের জনসেবার খোলস খোলাসা হয়ে পড়বে। ১৬ জুন, ১৯৭২ সাপ্তাহিক হককথায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, 'রাজশাহী জেলার ভদ্রগ্রামের রিলিফ কর্মকর্তারা রিলিফ গ্রহীতাদের আঙুলের ছাপ নিয়ে সরকারি কাগজপত্রে দাখিল করলেও ২৪ শত টাকার মধ্যে মাত্র ৯ শত টাকা বিতরণ করে বাকি সমস্ত টাকাই আত্মসাত করেছে। এই এলাকার শতকরা ৫৫ জনই রিলিফ পাননি। তাছাড়া সাড়ে পঁচিশ টাকা দরে বিক্রয়ের জন্য সরকার প্রদত্ত ২৫০ মণ ধানও এই রিলিফ কমিটি ৩০ টাকা মণ দরে বিক্রি করে সমস্ত অর্থ আত্মসাত করেছে। ময়মনসিংহের পরাণগঞ্জ ও সিরতা ইউনিয়ন রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান মিথ্যা আঙুলের ছাপ দেখিয়ে প্রচুর অর্থ আত্মসাত করা ছাড়াও ২ শত টাকা সাহায্য দেয়ার অঙ্গীকার করে জনগণের স্বাক্ষর নিয়ে মাত্র ২০ টাকা করে দিয়ে বাকি অর্থ আত্মসাত করেছে। টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানাধীন ৭ নং হরিপুর ওয়ার্ডের জনগণের জন্য প্রদত্ত ১৪টি কম্বলের মধ্যে রিলিফ কমিটির কর্মকর্তারাই ১২টি মেরে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই কমিটির চেয়ারম্যান শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে পাকবাহিনীর দালালি করেছে। গোপালপুরের অর্জুনা ইউনিয়নের একটিমাত্র বাড়ি যুদ্ধের সময় পোড়া হলেও রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান সরকারের কাছ থেকে চার হাজার টাকা আদায় করে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত চেয়ারম্যানের সাহায্যে সম্পূর্ণ অর্থ আত্মসাত করেছে। ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানাধীন পাঁচপাড়ার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাটি কাটার জন্য টেস্ট রিলিফের ৬ শত টাকা থেকে মাত্র ৫০ টাকার মাটি কাটিয়ে পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান বাকি সমস্ত অর্থ আত্মসাত করেছে। ঐ গ্রামেই আরেকজন কর্মকর্তা একটি খাল খননের জন্য প্রদত্ত ১২ শত টাকার মাত্র ১৮০ টাকা খরচ করে বাকি অর্থ পকেটে ভরেছে। এরা উভয়েই জনৈক এমসিএ'র সহোদর ভাই। ঢাকা জেলার ফতুল্লা ইউনিয়নের দুর্গত জনগণের জন্যে প্রদত্ত কয়েকশত বান টিনের একটিও কাউকে না দিয়ে রিলিফ কমিটির কর্মকর্তারা নিজেদের বাড়িতে উঠিয়ে রেখেছে। জনতার প্রবল দাবির ফলে অবশ্য তারা জানিয়েছে যে, সেগুলো সরকারকে ফেরত দেয়া হবে। অথচ, এই এলাকার মানুষ অসংখ্য ঘর এখনো উঠাতে পারেনি। ঝিনাইদহ মহকুমায় শৈলকুপা থানার ২ নং ইউনিয়নের রিলিফ কর্মকর্তারা জনগণকে বঞ্চিত করে ৫ বস্তা গম আত্মসাতের সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে। বিক্ষুব্ধ জনগণ পরে রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী এবং জনৈক সদস্যের গলায় জুতার মালা পড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে সারা এলাকা প্রদক্ষিণ করে। কালিহাতী থানার ১০ নং কোকডোহরা ইউনিয়নের পাকবাহিনী কর্তৃক পোড়াবাড়ির সংখ্যা সাড়ে তিনশতাধিক না হলেও কর্মকর্তারা সাত শতের হিসাব দেখিয়ে সরকারের কাছ থেকে ৫১ হাজার টাকা আদায় করেছে। বাড়িপ্রতি মাত্র ১ শত টাকা দিয়ে রিলিফ কর্মকর্তারা বাকি প্রায় ২০ হাজার টাকা গায়েব করেছে। তারা আবার জনপ্রতি ৭০ টাকা দিয়ে জনগণের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে ১০০ টাকা প্রাপ্তির টিপসই নিয়েছে। যশোরের মাইজদী কোর্টের জনৈক এমসিএ'র ভাই স্কুল শিক্ষক ছাত্রদের জন্য প্রদত্ত পাউডার দুধ আত্মসাত করে বাজারে বিক্রি করে

www.pathagar.com

দেয়ার সময় জনতার হাতে ধরা পড়লে তাকে বেদম প্রহার করা হয়। পরে পুলিশ তাকে রক্ষা করে। ঢাকা জেলার টঙ্গীবাড়ীর জনৈক আওয়ামী লীগ কর্মকর্তা তার বিশেষ ক্ষমতাবলে মার্কিন দূতাবাস থেকে কয়েক দফায় ঐ এলাকার জনসাধারণের জন্য গাড়ি, ধুতি, গেঞ্জী, পাউডার দুধ প্রভৃতি এনে তার নিজস্ব দু'টি লোকের মাধ্যমে খোলাবাজারে বিক্রি করে দিয়েছে।'

হককথায় রিলিফ সংক্রান্ত কয়েকটি মাত্র কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হবার পর থেকে আরো অসংখ্য অভিযোগ এবং নজীর সচেতন মানুষ দ্বারা হককথার অফিসে প্রেরিত হয়। তার মধ্যে কয়েকটি ছিলঃ বরিশাল জেলার হিজলা থানার জনগণ খাদ্যাভাবে চরম দুর্দশায় দিন কাটালেও রিলিফ কমিটির কর্মকর্তারা একের পর এক দুর্নীতি ও আত্মসাতের পালা চালিয়ে যায়। জুন মাসেই একটি হিন্দুর মৃত্যু হলে তার শ্রাদ্ধের জন্য দু'শ টাকা টেস্ট রিলিফের অর্থ থেকে দান করে স্থানীয় চেয়ারম্যান ধর্মনিরপেক্ষতার মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এদিকে এই কমিটির আরেক মেম্বার রিলিফের মাল চুরির সময় জনতার হাতে ধরা পড়ে বেদম মার খেয়েছেন। কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম থানার খায়েরপুর রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান আইয়ুবী বি.ডি মেম্বার তো ছিলেনই, পাকবাহিনীর আমলেও যথেষ্ট দালালি করেছেন। এর বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অভিযোগ জানালেও স্থানীয় এমসিএ সাহেবের আশীর্বাদে তিনি বেশ কিছুদিন চেয়ারম্যান হিসেবে মাল আত্মসাত করতে পেরেছেন। পরে খোদ রিলিফ কমিটিরই অধিকাংশ সদস্য তার অপসারণ দাবি করলে তাকে পদচ্যুত করা হলেও তার মাতব্বরী যথারীতি ছিল। অভিযোগ থাকার পরও তাকে ঐ এমসিএসটির নির্দেশে ৪৫ মণ গম এবং কয়েকশত টেস্ট রিলিফের টাকা দেয়া হয়েছিল। এর কিছুটা নিজের প্রিয়জনদের মধ্যে বিলি করে বাকি সবই তিনি আত্মসাত করেছেন। গ্রামের রাস্তা তৈরির জন্য তাকে যে অর্থ দেয়া হয়েছিল, তাও তিনি মেরে দিয়েছেন। বরিশাল জেলার ঝালকাঠি বাসন্ডার ওয়ার্ড মেম্বারের জামাতা একবান রিলিফের ঢেউটিন বাজারে বিক্রি করার সময় ছাত্রদের হাতে ধরা পড়েন। ঐ টিন তার বিধ্বস্ত মন্দিরের জন্য দেয়া হয়েছিল। অথচ, এরা শ্বশুর-জামাতা উভয়েই স্থানীয় মুসলিম লীগের পান্ডা ইসহাক খলিফার সাথে একযোগে পাকবাহিনীর দালালি করে কিছু হারানোর বদলে প্রচুর কামিয়েছেন। মেম্বার মহাশয় জাল টিপসই নিয়ে ইতোমধ্যেই প্রচুর অর্থ পকেটে ভরেছেন। তাছাড়া, অসংখ্য দিনমজুরকে দিয়ে কাজ করিয়ে তিনি তাদের পারিশ্রমিক দেননি। নিজের এলাকায় তিনি ভাড়াটে গুণ্ডার সাহায্যে এমন ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন যে, তার অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না। শেরপুরের জনৈক রিলিফ কর্মকর্তা ২০ মণ রিলিফের চাল আত্মসাৎ করে তা ভালোভাবে ছাঁটার জন্য স্থানীয় একটি চাউলের কলে নিয়ে গেলে জনতার হাতে ধরা পড়ে যান। জনতার দাবিতে ও,সি সাহেব চাল আটক করলেও আত্মসাতকারী কর্মকর্তাটিকে চেয়েও দেখেননি। কেননা, গণদুশমন এই রিলিফ কমিটির কর্মকর্তাটি স্থানীয় একজন এমসিএ'র ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। *(সূত্রঃ সাপ্তাহিক হককথা, ২৩ জুন-১৯৭২)*

জুন মাসের শেষের দিকে প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সিলেটবাসীর প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে অসুস্থ জননেতা মওলানা ভাসানী সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বন্যা কবলিত সিলেটের সমগ্র অঞ্চলকে অবিলম্বে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণার জন্য সরকারের নিকট দাবি জানান। ভয়াবহ বন্যায় ২ শত লোকের শোচনীয় মৃত্যু ও বিস্তীর্ণ জনপদে অপরিমেয় সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার মর্মান্তিক সংবাদে মওলানা ভাসানী যারপরনাই ব্যথিত হন। তিনি বলেন, অসুস্থতা হেতু বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে আমার বিলম্ব হবে।

www.pathagar.com

নিহত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। বন্যা কবলিত অঞ্চলের দুর্গত মরণাপন্ন জনগণের সাহায্যার্থে সরকারের নিকট সকল প্রকার সাহায্য দ্রব্য অবিলম্বে পৌঁছে দেবার জন্য তিনি দেশবাসী ও বিদেশি দানবীরদের অনুরোধ জানান।

আগস্ট মাসের প্রথম দিকে তেজগাঁও থানার মাতুয়াইল গ্রামে রিলিফের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে এলএমজি ও স্টেনগানে সুসজ্জিত দুইদল মুজিববাদীর মধ্যে এক সংঘর্ষ বাঁধে। উক্ত গ্রামের এম.সি.এর একনিষ্ঠ ভক্ত রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান ও এম.সি.এর ছোট তরফের মধ্যে ৮০ বান টিন, ৪ বস্তা চিনি ও বিগত ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাহায্যের টাকার ভাগবাঁটোয়ারাকে কেন্দ্র করেই ঘটনার সূত্রপাত হয় এবং গ্রামের মুজিববাদীগণ দুইদলে বিভক্ত হয়ে হাতাহাতি, লাঠালাঠি এবং এক পর্যায়ে পিস্তলের গুলি ছুঁড়াছুঁড়ি শুরু করে। পরের দিন রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান দলবলসহ মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিপক্ষ দলের বাড়ি ঘেরাও করে প্রকাশ্য দিবালোকে এলোপাথারি গুলি ছুঁড়তে থাকে। পরিণতিতে কাসেম নামক একজন নিরীহ গ্রামবাসী আহত হয়। গ্রামবাসী ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে চেয়ারম্যান সদলবলে রণে ভঙ্গ দেন। পুলিশ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে চেয়ারম্যান ও তার কতিপয় সাঙ্গপাঙ্গকে পুলিশী হেফাজতে রাখে। কিন্তু পরে এম.সি.এর বদৌলতে তারা পুলিশী হেফাজত থেকে শুধু ছাড়াই পায়নি পরে বহালতবিয়তে অস্ত্র কাঁধে নিয়ে বেড়ায়। এ রকম পরিস্থিতিতে জনতার চাপে এমসিএ এলাকায় জনসভা আহ্বান করে সবাইকে অস্ত্র জমা দেওয়ার আহ্বান জানালে মুজিববাদী আঃ মতিন তার কাছে একটি স্টেনগান জমা দেন। *(সূত্রঃ সাপ্তাহিক হককথা, ৪ আগস্ট–১৯৭২)*

১১ আগস্ট এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী বলেন, 'রাজশাহী জেলার পোরশা থানার অন্তর্গত খোর্দ্দ হরিপুর প্রকাশে চুলিয়াপাড়া ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের নিরীহ জনসাধারণ বিশেষ করিয়া বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক কর্মীগণের উপর পুলিশী জুলুম ও অত্যাচারের মাত্রা পাক আমলকেও হার মানিয়েছে। ঘটনায় জানা যায়, ২/৩দিন অনাহারের জ্বালায় ছেলে-মেয়েরা অতিস্ট হয়ে উঠলে উক্ত চুলিয়াপাড়া সাকিমের সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত গদাই মাল নামক এক ব্যক্তি উক্ত গ্রামের হাজী চান্যতুল্লা মণ্ডলের গাছ হইতে একটি কাঁঠাল লইয়া অনাহারক্লিষ্ট ছেলে-মেয়েদের খাওয়াইলে পরে হাজী সাহেবের হুকুমে তাহার মুক্তিফৌজ নামধারী এক নাতী গদাই মালকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটাইতে পিটাইতে মারিয়া ফেলে। তৎসম্পর্কে থানায় খবর দেওয়া সত্ত্বেও থানা কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় উত্তেজিত জনতার হাতে হাজী সাহেবের মৃত্যু হয়। আমি জানিতে পারিলাম যে, উল্লেখিত ঘটনার পর স্থানীয় এমসিএ পুলিশ বাহিনীসহ তথায় যান এবং ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ঐ এলাকার সন্ত্রাসের রাজত্ব বিস্তার করিতে ব্রতী হন। উক্ত এসসিএ'র সহযোগিতায় পুলিশ বাহিনী ঐ এলাকার বহু নিরীহ লোককে বিশেষ করিয়া বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদিগকে গ্রেফতার করিতেছে। ভয় প্রদর্শন করিয়া এবং অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়ের খবরও পাওয়া যাইতেছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বহু লোক প্রাণহানি ও অত্যাচারের ভয়ে চাষাবাদের কার্য ফেলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র পালাইয়া গিয়াছে। আমি সরকার ও সরকারিবাহিনীর অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি এবং অবিলম্বে অত্যাচার বন্ধ করার জন্য সরকারকে আহ্বান জানাইতেছি।' *(সূত্রঃ সাপ্তাহিক হককথা, ১১ আগস্ট–১৯৭২)*

১৯ আগস্ট মওলানা ভাসানী রাজবাড়ী যাবার পথে আরিচা ঘাটে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। মওলানা ভাসানী বলেন, পাকিস্তানি শাসক ও শোষকগোষ্ঠী গত ২৩

www.pathagar.com

বছরে বাংলাদেশকে শোষণ করে যে পরিমাণ সোনা-রূপা, চান্দি-মালামাল পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করেছে তারচেয়ে বেশি সম্পদ হিন্দুস্থান সরকারের সৈন্যবাহিনী ও মাড়োয়ারী শোষকেরা গত ৯ মাসে হিন্দুস্থানে নিয়েছে। তিনি বলেন, এক শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক ও অর্থলোভী লোক আওয়ামী লীগের নাম ভাঙিয়ে বহু অর্থ যোগাড় করেছে- বাড়ি-গাড়ি, টেলিভিশন ও গ্রামে জমি ক্রয় করে রাতারাতি বড়লোক সেজেছে। অন্যদিকে যারা বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তারাই অন্নাভাবে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হয়েছে। তদুপরি গ্রামবাংলায় চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, গুপ্ত হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি সমাজবিরোধী কাজ অহরহ ঘটছে-মানুষের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই। তিনি বলেন যে, সরকারের লালবাহিনী, রক্ষীবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও অন্যান্য সাদা-কালো বাহিনীরা এসব সমাজবিরোধীদের শায়েস্তা করতে পারছে না। সমাজের ঘুষখোর, চোর, টাউট, গুণ্ডাদের জব্দ করার কোন যোগ্য ব্যবস্থা নেই। মওলানা ভাসানী জোর দিয়ে বলেন, ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে প্রতি গ্রামে, ইউনিয়নে, থানায়, মহকুমায় ও জেলায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলুন, কৃষক-মজুর, কামার-কুমার, তাঁতি, মাঝি, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, জনতা সর্বশ্রেণীর ভাই-বোনেরা একত্রিত হয়ে ৩ সেপ্টেম্বর হতে ভুখা মিছিল বের করে জনসভা করুন, মন্ত্রী, মেম্বার, এমসিএ এবং থানা, মহকুমা ও জেলা প্রশাসকের নিকট উপস্থিত হয়ে আওয়াজ তুলুন ১০ টাকা মণ দরে আটা, ২০ টাকা মণ দরে চাল দিতে হবে, স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বরের পূর্বে সরিষার তেল, কেরোসিন, কাপড়, চিনি, গুড়, মসলা, লবণ ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যে দরে বিক্রয় হতো সেই দাম দিতে হবে। মওলানা ঘোষণা করেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মের স্বাধীনতাকে খর্ব করা চলবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের শতকরা ৮৬ ভাগ লোক ধর্মভীরু মুসলমানদের দাবি রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার দিন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, অফিস-আদালত বন্ধের ঘোষণা করতে হবে। কৃষককুলকে রক্ষার জন্য পাটের সর্বনিম্নমূল্য ১২০ টাকা ধার্য করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। মওলানা ভাসানী বলেন যে, প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ হিন্দুস্থানী নাগরিক বাংলাদেশে অবাধে যাতায়াত করায় এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য এখানে বসবাস করায় বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর দারুণ চাপ পড়েছে। তাই তিনি বিনা পাসপোর্টে যাতে কেউ বাংলাদেশে আসতে না পারে তার সুষ্ঠু ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছেন। মওলানা ভাসানী আরো উল্লেখ করেন যে, ইদানীং পশ্চিমবাংলা ও আসামের লক্ষ লক্ষ হিন্দু- মুসলমান বাংলাদেশ দরদী হয়ে উঠেছেন। তাদের সত্যি যদি বাংলাদেশের প্রতি প্রীতি ও দরদ থাকে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে যদি একাত্মতা বোধ করে তারা বাংলাদেশে বসবাস করতে চায় তাহলে তাদেরকে দিল্লীর মোহ এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে কলকাতাসহ ১৫টি জেলা বাংলাদেশের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত করতে হবে।'

অপরদিকে রাজবাড়ীর বিশাল জনসমুদ্রে ভাষণ দিতে গিয়ে মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক-মজুর ও সকল শ্রেণীর মেহনতি দরিদ্র মানুষের করুণ অবস্থা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আজ বাংলার মানুষ হা-অন্ন, হা-অন্ন করে মরছে। তিনি বলেন, সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে জনতার দাবি আদায়ের মাধ্যম এই বিপুল গণজমায়েতকে ভেঙ্গে দিতে পারেন-লাল বাহিনী, রক্ষীবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ইত্যাদি হাজারো রকমের বাহিনী দ্বারা মজলুম মানুষের মুক্তি সংগ্রামের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারেন কিন্তু আজ মানুষের পেটের ভাত নেই, পরনের কাপড় নেই, দুর্নীতির কবলে

www.pathagar.com

পতিত মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, লোভ-লালসার শিকার হয়ে বর্তমান শাসকচক্র জনতার এই দুঃখ-দৈন্যকে উপেক্ষা করে চলছে। তাই দুর্নীতির এই কঠিন নাগপাশ ছিন্ন করতে মজলুম মানুষ আজ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। মওলানা ভাসানী জোর দিয়ে বলেন, এধরনের সরকারের দমননীতি কেন, দুনিয়ার কোন শক্তিই সংগ্রামের পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। তিনি উল্লেখ করেন, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দুই শ্রেণীর মানুষ-একদল শোষক আর একদল শোষিত মজলুম মানুষ-একশ্রেণী ধনী ও সবল আর এক শ্রেণী গরিব ও দুর্বল। যারা ধনী তারাই শাসক, সম্ভ্রান্ত, তারাই মন্ত্রী, মেম্বার, এমসিএ হয়ে দেশের ক্ষমতার গদি আঁকড়ে ধরে দরিদ্রদেরকে শোষণ ও কুশাসনের যাঁতাকলে ফেলে নিষ্পেষিত করছে। দুনিয়ার মেহনতি গরিব মানুষের ডাকে ধনীরা কোন দিন সাড়া দেয়নি। বারবার আবেদন-নিবেদন করে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে এসেছে। তাই সাম্রাজ্যবাদী শোষকগোষ্ঠীর নিকট আমাদের কোন আপোস বা মীমাংসা নেই-তাদের মূলোচ্ছেদ ঘটানোই আমাদের কাম্য। মওলানা ভাসানী বলেন, বাংলাদেশের ৬২ হাজার গ্রামের দরিদ্র কৃষক-মজুর ও সর্বশ্রেণীর মেহনতি মানুষ চেয়েছিল খেয়েপরে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মোটা ভাত ও কাপড়। মুজিব সরকার তাদের ভোটেই নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় সমাসীন। কিন্তু এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নেওয়া হয়েছিল মুজিব তা পালন করতে পারেনি। আজ বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়েছে। সর্বত্রই দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া নেমে এসেছে। চালের দাম ১১০ টাকা থেকে ১২০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। জীবনধারণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসের দামও মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। গ্রামের মানুষ শহরের মানুষের মত রেশন পায় না। তারা এখন মৃত্যুর মুখোমুখি। সরকার সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করে এইসব করুণ সংবাদ প্রকাশে বাধা দিচ্ছে। চোরাকারবার অবাধগতিতে চলছে। তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। চোরাকারবারী বন্ধ করতে না পারলে দেশের খাদ্য সঙ্কট আরও তীব্র হতে তীব্রতর হতে বাধ্য। আজ যে দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশে দেখা দিয়েছে একে প্রতিরোধ করতে না পারলে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ অখণ্ড বাংলায় যেরূপ লাখ লাখ মানুষ অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে শুকিয়ে মরেছে এবার তারচেয়ে বেশি লোক মারা যাবে। এই ভয়াবহ পরিণতির কবল থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে দেশে ফিরে এসে ন্যাশনাল কনফারেন্সের আহ্বান করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, শেখ মুজিব তুমি দেশে ফিরে এসে ন্যাশনাল কনফারেন্স ডাকলে মিলেমিশে এই দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করি.......।

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে মওলানা ভাসানী দেশে একটি ভয়াবহ আসন্ন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে, সরকার অনতিবিলম্বে তা প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে এক কোটি লোক না খেয়ে মারা যাবে। দুর্ভিক্ষের মারাত্মক পরিণতি থেকে জাতিকে রক্ষার জন্য তিনি বর্তমান সরকার ভেঙ্গে অবিলম্বে সর্বদলীয় ভিত্তিতে একটি সরকার গঠনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, 'এই ব্যবস্থা কার্যকরী করা হলে বাংলাদেশকে সীমাহীন সমস্যার কবল থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।' তিনি উল্লেখ করেন, 'আগামী মাঘমাসের পূর্বে কৃষকের ঘরে রবিশস্য উঠার কোনো প্রকার সম্ভাবনা নেই। এ বৎসরে পানির অভাবে অথবা পলি পড়ায় আমন ধানের ক্ষতি হয়েছে খুব তাই বাংলার ঘরে ঘরে আজ যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তার ভয়াবহ পরিণতি মারাত্মক আকার ধারণ করবে।'

www.pathagar.com

১ সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক হককথার প্রতিবেদনের বিবরণ ছিল এভাবে-‘(১) কোলকাতা থাকাকালে বাংলাদেশ সরকারের হাতে সঞ্চিত অর্থের ব্যয়ের হিসাব দেখাও, (২) ভারত কর্তৃক লুণ্ঠিত ২৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ ফিরিয়ে আনার কি ব্যবস্থা হয়েছে, (৩) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেবার জন্য দায়ী ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে কি?, (৪) চট্টগ্রাম বন্দরে সমুদ্র এলাকায় রাশিয়া ভূ-মধ্যসাগরের উপকূলের মত গোপন সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলছে কেন?, (৫) চালনা বন্দর আমেরিকার কাছে পত্তন দেয়া হচ্ছে কেন?, (৬) ৫ হাজার মানুষ অনাহারে মরলো কেন?, (৭) ৫০ হাজার নিরপরাধ মানুষকে মুজিববাদ কায়েমের নামে হত্যা করা হলো কেন?, (৮) সীমান্ত বাণিজ্যের নামে সীমান্ত এলাকায় ১০ মাইল করে দেশের ৫৪০০০ বর্গমাইল আয়তনের চার ভাগের এক ভাগ ১৪০০০ বর্গমাইল ভারতের মুখ গহ্বরে তুলে দেয়া হলো কেন?, (৯) কোন অধিকারে তাজউদ্দীন সরকার বাংলাদেশের মুদ্রামান কমিয়েছে?, (১০) বাংলাদেশের টাকার মান ভারতীয় টাকার অর্ধেক পৌছাল কেন?, (১১) রাশিয়া, পাকিস্তান আমলের পাওনা বাংলাদেশের ঘাড়ে পা রেখে আদায় করলো কেন?, (১২) জাতীয় শিপিং কর্পোরেশনের কাঁধে ভারতের পছন্দসই লোক চেপেছে কেন?, (১৩) বাংলার দূত নামক জাহাজে ভূত চেপে চতুর্থ ইঞ্জিনিয়ার বাঙালি তরুণের মাথার উপর ইঞ্জিনের টুকরা খসিয়ে ফেললো-ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার কি এর জন্য দায়ী নয়?, (১৪) বাংলাদেশ থেকে চুরি করে নেয়া তিনটি জাহাজ ভারত থেকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না কেন?, (১৫) ডাকোটা বিমান দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ভারতীয়দের শাস্তি হলো না কেন?, (১৬) বাংলাদেশ বিমানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কারা চালাচ্ছে, মন্ত্রী তা খুলে বললেন না কেন?, (১৭) সেনাবাহিনী পঙ্গু কেন?, (১৮) খাদ্য আন্দোলন দমনের জন্য আবার ভারতীয় সৈন্য আমদানি করা হয়েছে কেন?, (১৯) পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বত্যবাসী নিরীহ মানুষদের কেন হত্যা করা হলো?, (২০) রাজশাহীতে কেন বহু গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, (২১) বাংলাদেশে কেন ২৫ হাজার ভারতীয় গুপ্তচর চড়ে বেড়াচ্ছে?, (২২) কেন মেঘালয় সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশের সীমান্ত খুঁটি তুলে ফেলেছে?, (২৩) ৬ মাসের খাদ্য মজুত আছে বলে সরকার ভাঁওতা দিল কেন?, (২৪) আজ দুর্ভিক্ষ লেগেছে, এর জন্য দায়ী কে?, (২৫) ১২০ টাকা মণ দরে চাউল কিনে খাবার সামর্থ্য এদেশের শতকরা ক'জন মানুষের আছে?, (২৬) কাফনের অভাবে বিনা কাপড়ে লাশ দাফন হচ্ছে কেন?, (২৭) মানুষ নিজেদের সন্তান বিক্রি করছে, আত্মহত্যা করছে, অনাহারের তাড়নায় সোনার সংসার জ্বলে ছাই হচ্ছে, এর জন্য দায়ী কি সরকার নন?, (২৮) বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র আগস্টে দেবার কথা কি ছিল না?, (২৯) গণপরিষদ নামীয় বস্তুটির কি অধিকার আছে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের-যার অধিকাংশ সদস্য জনতার আদালতে দুর্নীতিবাজ বলে আখ্যায়িত?, (৩০) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন চক্রান্ত জোটে বাংলাদেশ অংশ নিচ্ছে কেন? (৩১) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি কি স্বতন্ত্র কিছু নেই। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে দেশের সর্বনাশ করা হচ্ছে কেন?, (৩২) সরকারি দলের জেলা থেকে ইউনিয়ন কাঠামো অবধি নেতার মধ্যে শতকরা ৩০/৪০ জন লোক পাক আমলের দালাল কেন?, (৩৩) পাটের নিম্নতম দর ঘোষণা না করে কেন হাজার হাজার মণ পাট ভারতে পাচার করা হলো?, (৩৪) চালের মণ ১২০ টাকায় পৌছালো কেন?’

৩ সেপ্টেম্বর মওলানা ভাসানীর আহবানে দেশব্যাপী ভুখা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক হককথার ‘আগামী রবিবার ৩রা সেপ্টেম্বর ভুখা মিছিল, নিপীড়িত

www.pathagar.com

ভাগ্যাহত অনশনবন্দি জাগো'-শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'কালঘুম ভেঙ্গে জাগতে হবে আজ। ডাক এসেছে বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠের কাছ থেকে। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসের কবলে পতিত প্রিয় মাতৃভূমির ততোধিক প্রিয় সাতকোটি মানুষকে মহামৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার ডাক এসেছে। স্বাধীনতার স্বর্ণ উপকূল থেকে আমাদের আজ সীমাহীন লাঞ্ছনা ও দুর্গতি, অনাহার ও বুভুক্ষার সীমানায় টেনে নিয়ে চলেছে কাপালিককুল। মৃত মানুষের বুকের উপর বসে শয়তানের আরাধনায় ধ্যানকারী কাপালিকের মত যারা বাংলার ৩০ লাখ মানুষের আত্মবলিদানকে কাজে লাগিয়ে গদিতে আরোহণ করেছে তারাই আজ আটমাসে প্রভু ভারতের হাতে দেশের সম্পদাবলী সমর্পণ করে, লুটপাট সমিতি, চোরাকারবার, চোরাচালানকে প্রশ্রয় দিয়ে, অবাধে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে এদেশে এসে স্থায়িভাবে বসতি করতে এবং অস্থায়িভাবে সামরিক অবস্থানের পর বেসুমার খাদ্যসামগ্রী, সম্পদাবলী নিয়ে সীমান্ত পার হতে দিচ্ছে। এর পরিণতিতে বাংলার বুকে আজ দুর্ভিক্ষ। এ দুর্ভিক্ষের যূপকাষ্ঠে বাংলার অসহায় মাটির মানুষদের হত্যার ষড়যন্ত্র রুখতে ডাক এসেছে আজ। এ ডাকে সাড়া দিয়ে আগামী রবিবার দেশব্যাপী সংগঠিত হবে ভুখা মিছিল, ঘেরাও অভিযান অন্নের দাবিতে। অন্নের দোহাই দিয়ে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের সাথে আরও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার সরকারি চক্রান্তের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিপন্নকারী দুর্নীতিপরায়ণ শাসনব্যবস্থা ও রাঘববোয়ালদের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামের সূচনা হিসেবে শুরু হচ্ছে এ আন্দোলন। এ আন্দোলনের পুরোধা হচ্ছেন, জনগণের অদম্য সাহসী সৈনিক, বাংলার মেহনতি মানুষের নয়নমণি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তাঁর এ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছে ১৭টি রাজনৈতিক, কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র সংগঠন। আগামী রবিবার দেশের সর্বত্র শহর, বন্দর, গঞ্জ, গ্রাম জনগণকে মিছিল করে সরকারি আস্তানা, থানা, এসডি ও সিও, এমসিএদের ঘেরাও করার আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে গণমুক্তি সংগ্রামের প্রারম্ভ কর্মসূচি। যেখান থেকে ১৯৬৮ এর ৬ ডিসেম্বর আন্দোলন শুরু করে মওলানা ভাসানী ভেঙে দিয়েছিলেন ডিক্টেটর আইয়ুবের তখতে তাউস, সৃষ্টি করেছিলেন এমন এক পরিস্থিতি যে পর্যায়ে ষড়যন্ত্র মামলায় আটক মুজিব মুক্তি লাভ করেছিল। বহু আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ঢাকার পল্টন ময়দানে আগামী জনসভা করবেন, ১৯৬৮ এর ৬ ডিসেম্বরের মতই জনসভা থেকে ভুখা মিছিল নিয়ে তিনি ঘেরাও করবেন (সাবেক গভর্নর হাউস)। শহরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিস সাজিয়ে, পত্রিকায় প্রেস রিলিজের কাগজ পাঠিয়ে রাজনীতি করেন, শ্রমিক, কৃষকের সাথে একাত্ম হয়ে কলকারখানা, ক্ষেত-খামারে যেসব সংগঠন মানুষের বাঁচার দাবিকে, গণমুক্তি দাবিকে বিশ্বাসের অঙ্গীভূতি করে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে আসছে, তারাও এগিয়ে এসেছে মহীরূহরূপ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সংগঠিত সর্বদলীয় খাদ্য সংগ্রাম কমিটির আন্দোলনের সমর্থনে। স্বাধীনতার পর থেকে ক্ষমতাসীনদের বারবার সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমতাসীনদের বারবার সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নিবৃত্ত হয়নি। মোজাফফরের দল ও মণি সিং-এর দলহীন কেন্দ্রীয় কমিটিও সরকারি দলের সাথে একযোগে জনগণের স্বার্থ ও অধিকারকে জলাঞ্জলি দিয়ে চালিয়েছে নির্লজ্জ দালালি। বাংলাদেশের পূর্ব বুক শূন্য করে দেবার আন্তর্জাতিক লুটপাট সমিতির স্থানীয় সহযোগী সেজে এরা যে অপরাধ করেছে, জনতার আদালতে অদূর ভবিষ্যতেই বিচার হবে। জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে শাদ্দাদী তখতে তাউসে এবং তার আশেপাশে যারা ভিড় জমিয়েছে তারা ছাড়া দেশের আপামর জনসাধারণ, অনাহারক্লিষ্ট কৃষক-শ্রমিক জীবনের দুর্ভোগ দিশেহারা মধ্যবিত্ত মেহনতি

www.pathagar.com

কর্মচারী, গরিব পিতা-মাতার সন্তান ছাত্রসমাজ, সমাজতন্ত্রের নামে যে কোন ভাঁওতাবাজী রুখবার শপথে উজ্জীবিত তরুণ সমাজ এগিয়ে এসেছেন আজ নিজেদের মৌলিক অধিকার ও বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করতে। বিধ্বস্ত দেশে কিছু নেই নেই চিৎকার জুড়ে ক্ষমতাসীনদের আর তাদের গণবিরোধী সহযোগীরা এ আটমাসে নিজেদের মোটা ভুঁড়িকে করেছে আরও স্ফীত। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে যে শ্রমিক-কৃষক রক্ত দিয়েছে, আজ তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এই জুলমবাজরা বাড়াচ্ছে নিজেদের ব্যাংক ব্যালেন্স, সুখ, বিলাস ও ভৈবব। স্বাধীনতার সুফল আর বিপুল সম্ভাবনাকে এরা নিজেরা লুটেপুটে শেষ করেছে এবং তুলে দিয়েছে নিজের প্রভুর হাতে। আজ শ্মশানে পরিণত এদেশকে নিয়ে তারা শুরু করেছে নয়া চক্রান্ত। বিক্ষুব্ধ জনগণকে বাগে রাখার জন্য তারা বাংলাদেশের বুকে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ ঘাঁটি বসাতে চাইছে, যেন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ফাঁকে ফাঁকে এই তাঁবেদার সরকারকে টিকিয়ে রাখতে পারে তখতে তাউসে। এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা সংহত করা, জনগণের বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করা, কৃষক-শ্রমিকের ভাত-কাপড়ের সমস্যা ঘুচানো, চালের দাম ৩ টাকা, আটা ১০ টাকায় কমিয়ে আনার দাবি নিয়ে আজ জনগণের লড়াই শুরু হয়েছে। মওলানা ভাসানী ক্ষমতাসীনদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমি এখনও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। অথচ জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য যে সোনার ছেলেরা বাবা-মার কোল, সুখের জীবন সব বিসর্জন দিয়ে কৃষক-শ্রমিকের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করছে, তাদের উপর মুজিব সরকারের অত্যাচারের স্টীমরোলার চলছে, ঐসব তরুণদের হত্যা করা হচ্ছে নির্বিচারে। মুজিববাদের নামে এযাবত ৩০ হাজারের বেশি লোক হত্যা করা হয়েছে। মওলানা ভাসানী হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, ঐসব তরুণরা অস্ত্রের বলে গণবিপ্লব ঘটিয়ে সাচ্চা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। আজ যদি তাদের উপর, শ্রমিক-কৃষকের উপর মুজিবী ফ্যাসিবাদ বন্ধ না হয়, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন যদি মুজিব সরকারের চৈতন্য না ঘটায় তবে এদেশে সংঘটিত হবে প্রচণ্ড শক্তিশালী সশস্ত্র গণবিপ্লব। মওলানা ভাসানী আহ্বান জানিয়েছেন, শেষবারের মত বলছি জনগণের কাছে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমতা চাও। লুটেরাদের ঠেকাও। লুটপাট সমিতি ভেঙ্গে দাও। জনগণের কাছ থেকে নেওয়া প্রতিটি পয়সার হিসাব দাও। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে ঠেকাও। ঠেকাও রুশ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে। আমরা কারো গোলাম হয়ে বাঁচতে চাই না। বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠের এ বজ্রকঠিন পথনির্দেশ অনুসরণ করে আগামী রবিবার সারা দেশে জাগবে অনশনবন্দি জনতা, ভাগ্যাহত লাঞ্ছিত মানুষ নেমে আসবে রাজপথে। আকাশ, বাতাস প্রকম্পিত করে সোচ্চার বাঁচার দাবি। জনতার রুদ্ররোষ থেকে রেহাই নেই জালেম শাসকের।'

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ সাপ্তাহিক হককথায় 'আসুন আমরা মরা মানুষের হাড় দিয়ে আরেকটি ইন্দিরা মঞ্চ গড়ি'-শীর্ষক আরেকটি সংবাদে বলা হয়, 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে, এটা কেউ অস্বীকার করছে না। ভারতীয় সেনারা মেঘালয় সীমান্তে ঘাঁটি ও খুঁটি উপড়াবার পর, ভারতপ্রেমিক মণি সিং-এর এককালের রাজনৈতিক আস্তানা ময়মনসিংহের দুর্গাপুর থেকে ভারতীয় সৈন্যদের ছত্রছায়ায় ভারতীয় লোকেরা ধান কেটে জবরদস্তী নিয়ে যাওয়ার পর, রাজশাহী সীমান্তের ওপারে অভ্যন্তর ভাগে সব কেনাকাটির পর মাড়োয়ারী ভারতীয়রা জমির ধান ফসল জমিতেই কিনতে শুরু করেছে। সারা বাংলাদেশে ভূক্ত ভবিষ্যৎ ইয়াবড় হা করে ভারত গিলে ফেলেছে-এর পরও যদি মৈত্রী

www.pathagar.com

ষোলকলায় পূর্ণ না হয়ে থাকে কখন হবে। অবশ্য আওয়ামী লীগ এবং তাদের সর্বনাশের সাথী মণি-মোজাফফরদের মতে এ পূর্ণতা পূর্ণিমা-আলো ঝলমল স্বপ্নিল পরিবেশ এনে দিয়েছে। আমাদের মতে এ পূর্ণতা এনেছে ঘনঘোর অন্ধকার, এ পূর্ণতা অমাবস্যার। বাংলা-ভারত মৈত্রীর আলোর প্লাবন যারা দেখেছে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকালে তাদের উপলব্ধির কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। ক্ষেতজিরাত করে যে আওয়ামী লীগ নেতারা সংসার চালাতো, টানা-হেঁচড়ার মধ্যে তাদের আজ গাড়ি-বাড়ি হয়েছে। মণি সিং কমিউনিস্ট দলের যেসব নেতা ভারতে গিয়েছিল পালিয়ে এখন শহরের অভিজাত এলাকায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভ্যালভেট সজ্জিত বেহেশতী অফিস করেছে। নিজেদের হাই সোসাইটি মার্ক সন্তানদের সদলবলে মস্কো পাঠাচ্ছে উচ্চ শিক্ষার্থে। (ভাবখানা এই এদেশে পড়াশুনা আর থাকা মনুষ্য সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়, থাকতে পারে ইতর জনেরা) মোজাফফর দলের নেতারা গাড়ি চাপছেন, তাদের বগলদাবা 'শান্তি'র পায়রা এখন তাদের সুখের পায়রা করে তুলেছে। ভারতের অধীনতামূলক মিত্রতার দালালির বদৌলতেই তাদের এই প্রাপ্তি। তারা এ মৈত্রীকে বেহেশতী মেওয়া না বলবেন তো বলবেন কে? অথচ জনগণের কাছে এ মৈত্রীর অর্থ ভিন্ন। তারা দেখলো পাকিস্তানি বর্বরদের কোণঠাসা করে ফেলবার পর সবার আগে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, তারপর বাঙালি ফৌজ, তারপর মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের এগিয়ে দিয়ে ১০০ মাইল পেছন থেকে অতি নিরাপদে কামান দাগতে দাগতে ভারতীয় সৈন্যরা এসে ঢুকলো বাংলাদেশে। মুক্তিপাগল বাঙালি তরুণরা মরণপণ লড়াই করছিল যখন, তখন ভারতীয় ফৌজ পাক সেনাদের বাঙ্কারগুলোতে জড়ো করা টাকা-পয়সা, অস্ত্র-স্বর্ণালংকার ট্রাকে পুরে ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে সারাদেশ ভারতীয় সেনাবাহিনী কেনাকাটার উৎসব শুরু করলো বাঙ্কার থেকে লুট করা পাকিস্তানিদের টাকা দিয়ে। এরপর ক্রমাগত চললো বাংলাদেশে যানবাহন, অস্ত্র, অর্থ মূল্যবান ধাতু, মূল্যবান বস্ত্র, জিনিসপত্র ভারতে পাচার করার লুটতরাজ। একটানে ৪ হাজার কোটি টাকার অস্ত্র, ১০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ পার হয়ে গেলো সীমান্তের ওপারে। এরপর মৈত্রীর বাণী নিয়ে এলো ভারতীয় মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা। হলো আরেক দফা লুণ্ঠন। তারপর শুরু হলো ভারত সরকারের দ্বারা সংগঠিত ব্যবসায়ী দস্যুদলের নিয়মিত লুণ্ঠন। এ মৈত্রী আমাদের গরিব জনগণকে অনেক কিছু দিয়েছে, দিয়েছে ১ টাকার চাল সোয়া টাকা হবার আশীর্বাদ, ৪ টাকার লুঙ্গি বারো টাকা হবার খেদমত, আট আনার মাছ দু'টাকা হবার সেবা। এদেশের সরল মানুষদের প্রয়োজন অনেক কম। মোটা ভাত, মোটা কাপড় আর মৃত্যুর পর একটু শেষকৃত্য এই তারা চেয়েছে। কিন্তু ভারতীয় বন্ধুত্বের অভিশাপ তাদের এই সামান্য চাহিদাটুকুকেই করে তুলেছে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নের মতো। মুজিব-ইন্দিরা সরকার মিলে ইন্দিরা মঞ্চ নির্মাণ করেছে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে। কিন্তু সারা লৌহ কঠিন ঢাকার নিচে কোটি কোটি মানুষ নিস্পিষ্ট হয়ে মরণ চিৎকার ছাড়ছে, গলায় দড়ি দিয়ে মরছে। তাদের হাড় দিয়ে একটা আশ্চর্য ইন্দিরা মঞ্চ তৈরি করা হলো ভারতীয় মৈত্রীর আসল অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠতো। জনগণ যদি এই মৈত্রীর পূর্ণতাকে ঘনঘোর অমাবস্যা বলে ভাবে, তাহলে তাদের দোষ দিয়ে লাভ কি?'

-০-

www.pathagar.com

জাসদ ও সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন

শেখ মুজিবের অদক্ষতার জন্য দলীয় কোন্দলকে অগ্রাহ্য করে তার প্রাণশক্তি মুক্তিযুদ্ধের সময় কথিত চার খলিফা আ.স.ম আব্দুর রব, নূরে আলম জিকু, শাহজাহান সিরাজ ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যান। রব-সিরাজের নেতৃত্বে এক অংশ ১৯৭২-এর ৩১ অক্টোবর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠনের মাধ্যমে শেখ মুজিবের ছায়াতল ছেড়ে দেন। ষাটের দশকের ডানপন্থীরা পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামো টিকিয়ে রেখে ক্ষমতাসীন হতে চাইতেন। বামপন্থীরা চাইতেন পাকিস্তানের পরিসরে সমাজতন্ত্র। এ সময় ছাত্রলীগের মধ্যে পূর্ববাংলা স্বাধীন করার জন্য গড়ে ওঠে গোপন সাংগঠনিক প্রক্রিয়া নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের উদ্যোগে গঠিত হওয়া শ্রমিক লীগ, ছাত্রলীগের মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। স্বাধীনতা আন্দোলনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া নির্ধারণ, জাতীয় পতাকা তৈরি ও উত্তোলন, জয় বাংলা বাহিনী গঠন ও শ্লোগান নির্ধারণ, স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, বিএলএফ গঠনসহ স্বাধীনতা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সংগঠিত করেছে নিউক্লিয়াস। স্বাধীন বাংলাদেশে নিউক্লিয়াসপন্থীরা মনে করেন অসম্পূর্ণ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সম্পূর্ণ করা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সমাজতন্ত্রের আন্দোলনকে এক সাথে পরিচালিত করতে হবে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সচেতন স্রষ্টা সংগঠিত নিউক্লিয়াসপন্থীরাই তাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গঠন করার প্রত্যয়ে জাসদ গঠন করেন।

আ.স.ম রব ১৯৭২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে লক্ষাধিক লোকের এক বিশাল জনসভায় বলেছিলেন, 'মুজিব তুমি বলেছিলে স্বাধীনতার পর এদেশে কোনো লোক না খেয়ে মরবে না। কিন্তু আজ খাদ্যের অভাবে লোক মারা যাচ্ছে।' তিনি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, কালোবাজারীসহ অনেক অভিযোগ আনয়ন করেন। তিনি আরো বলেন, 'একদিকে বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে অন্যদিকে হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করে জেলে ঢুকানো হচ্ছে ও তাদের ওপর চালানো হচ্ছে অমানুষিক অত্যাচার। পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকার চালাচ্ছে দমন-নীতি। তিনি উল্লেখ করেন, 'পাকিস্তানিদের তুলনায় আওয়ামী লীগ সরকার বেশি দুর্নীতিবাজ।' তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে লক্ষ্য করে বলেন, "আজ তুমি আমাদের গ্রেফতার করছ, আমাদের ওপর সব ধরনের সন্ত্রাস চালাচ্ছ, আমাদের অস্ত্রের ভয় দেখাচ্ছ, তুমি জান না কিভাবে অস্ত্র চালাতে হয়। কিন্তু আমরা জানি অস্ত্র কেমন।" তিনি দুর্নীতিবাজ মন্ত্রিসভা ও দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তাদের বরখাস্তের আহ্বান জানান। তিনি শেখ মুজিবকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তুমি আমাদের সেনাবাহিনীর ভয় দেখাচ্ছ কিন্তু তারা জনগণের দিকে গুলি চালাবে না কিন্তু তুমি যদি বেশি চাপাচাপি করো তাহলে সেনাবাহিনী তোমার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিবে।"

১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সাত সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটির নাম ঘোষিত হয়। কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ৯ নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর এম এ জলিল ও স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য ও ডাকসুর সহ-সভাপতি আ স ম আব্দুর রব। সদস্য ছিলেন ছাত্রনেতা শাহজাহান সিরাজ, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী বিধান কৃষ্ণ সেন ও

www.pathagar.com

সুলতান উদ্দিন আহমেদ, নূরে আলম জিকু এবং রহমত আলী। ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যেই রহমত আলী জাসদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু জাসদ থেমে থাকেনি। শেখ মুজিবুর রহমানের পর্বত প্রমাণ জনপ্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জ করে এগিয়ে যায় তরুণেরা। বুকের রক্ত ঢেলে আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দুর্বার আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাসীনদের গদি টলায়মান হয়ে উঠে।

জাসদ প্রতিষ্ঠার পর আওয়ামী লীগের কোন্দলে জর্জরিত বিশেষ করে তরুণ শ্রেণী জাসদে যোগদান করে যা শেখ মুজিবের কাছে ছিল অকল্পনীয় বাস্তবতা। অচিরেই জাসদ জাতীয় রাজনীতিতে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে শেখ মুজিবের কর্মীসহ হাজার হাজার কর্মী বাহিনীর এ সংগঠনের পতাকাতলে আবির্ভাব ঘটে। এতে শঙ্কিত হয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জাসদ কর্মী নিধনে তৎপর হয়ে উঠলে উভয় দলের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধ শুরু হয়। সূত্রপাতকৃত যুদ্ধের উভয়পক্ষের অনেক কর্মী নিহত হন। এই নিহত হওয়ার ঘটনাও শেখ মুজিব বুঝতে পুরোপুরি অক্ষম ছিলেন। তিনি কখনো অনুধাবন করার চেষ্টা করেননি যেন আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল নেতৃত্বের কোন্দলই এই বন্দুক যুদ্ধের ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝেছিলেন যখন দেশের প্রশাসনিক অবকাঠামো সম্পূর্ণ অস্ত্রবাজদের কবলে জিম্মি হয়ে গিয়েছিল, চাঁদাবাদ, নারী ধর্ষণকারী, বাটপারদের ইত্যকার কর্মকাণ্ডে দেশের মানুষ শাসক বদলের জন্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছিল।

জাসদ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মুজিবের নিধনযজ্ঞের শিকার হয়েছিলেন ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানাধীন নবাবগঞ্জ হাইস্কুলের শিক্ষক বীর মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিকুর রহমান খান। সিদ্দিক মাস্টারের অপরাধ ছিল, তিনি জাসদ সংগঠন গড়ার জন্য সাংগঠনিক কাজ করেছিলেন। সিদ্দিক ছিলেন কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির তিনি ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য। নামাযের প্রস্তুতি নেয়ার সময় তাকে খুন করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে সিদ্দিক মাস্টার হাইস্কুলের হোস্টেলে বারান্দায় বসে ওযু করছিলেন। ঠিক সেই সময় তার উপর স্টেনগানের ব্রাশফায়ার হয়। ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। মুজিব সরকারের বিভিন্ন অন্যায়-অপকর্মের বিরুদ্ধে তিনি ওই এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাদের একত্রিত করেন। ফলে তিনি স্থানীয় এমসিএ'র রোষানলে পড়েন। একবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। জামিনে মুক্তি পান। এরপর থেকে তাকে বারবার খুন করার হুমকি দেয়া হয়। নিহত হওয়ার পর দিন তার লাশ ঢাকায় আনা হয়। সিদ্দিক মাস্টারের খুনের কোনো মামলা হয়নি।

জাসদে দলের (আওয়ামী লীগ) এক অংশ চলে গেলেও আওয়ামী লীগের কোন্দল আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যখন মুজিব এক জনসভায় বলে ওঠেন, "সৌদির বাদশা পেয়েছেন সোনার খনি-আর আমি পেয়েছি চোরের খনি।" তার এই উক্তিতে কোন্দলপন্থী ও ক্ষমতালিপ্সু পন্থীদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, নেতা সবকিছু জেনে গেছেন। তাইতো তারা নিজ অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য তোড়জোর শুরু করেন। এই তোড়জোরে যারা চূড়ান্ত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন তাদের মধ্যে কোরবান আলী ও শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনের কোন্দলের পরিণতিতে মুন্সীগঞ্জে হত্যা, পাল্টা হত্যা, কালো আজিজ ও জহুর আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে চট্টগ্রামে বারবার কর্মী বাহিনীর সংঘাত, আব্দুল মালেক উকিল ও নূরুল হকের নেতৃত্ব নিয়ে নোয়াখালীতে সংঘাত, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে ও ক্ষমতায় সংঘাতে কুমিল্লা (বর্তমান চাঁদপুরসহ) দেশের প্রতিটি স্থানে নেতৃত্ব ও ক্ষমতার সংঘাতে কত অসহায় মানুষের জীবনপাত ঘটে।

www.pathagar.com

শুধু নেতারা নয় খোদ মন্ত্রীরাও দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে পড়েন। অনেক মন্ত্রী বলগাহীন ভাষ্য দিয়ে মওলানা ভাসানীকে আক্রমণ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য টাঙ্গাইলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মান্নান। তিনি টাঙ্গাইলের প্রতিটি জনসভায় মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে কটাক্ষমূলক বক্তব্য করতেন। এমনকি অন্যান্য নেতারাও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পথ অনুসরণ করে ন্যক্কারজনক কায়দায় বক্তৃতা-বিবৃতি দিতেন যা সুস্থ মানুষের পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যেতো। মওলানা ভাসানী একবার উত্তেজিত হয়ে কটাক্ষ শুরু করার গুরু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর টাঙ্গাইলের বাসভবন পুড়িয়ে দেয়ার ঘোষণা দিলে মন্ত্রী অবস্থা বেগতিক দেখে মওলানার প্রিয়পাত্র শেখ মুজিবকে ঘটনার বিবরণ অবগত করেন। শেখ মুজিব কোন কিছু পরামর্শ না দিয়ে ব্যাপারটিকে তেমন আমল দেননি। এই আমল না দেয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ তার জনৈক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট মন্তব্য করেছিলেন, 'মান্নান সাহেব যাতে মওলানা ভাসানীর ধাক্কায় মুচড়ে পড়েন শেখ সাহেব তা চান।'

এ থেকে বুঝা যায় যে, পুরো নাটকের পেছনে ছিল শেখ মুজিব কর্তৃক তার বেয়াড়া সহকর্মীদের অদ্ভুদ কায়দায় শায়েস্তা করার কৌশল। অর্থাৎ তিনি নিজে কিছু না বলে অন্যকে দিয়ে বলানো। অবশেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজের বল্গাহীন ভাষ্যের জন্য মওলানা ভাসানীর বাড়িতে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে এ যাত্রা রক্ষা পান।

মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে এই সময় আওয়ামী লীগ নেতাদের বিষোদগারের প্রথম কারণ ছিল তাঁর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের অগ্রযাত্রা। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন নিয়ে ১৯৭২-এর প্রথম থেকেই বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছিল। অবশেষে ৩১ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে 'কৃষক শ্রমিক মৈত্রী সমাবেশে' উপস্থাপনের জন্য একটি দাবিনামার খসড়া তৈরি হয়। খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ২৯ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ন্যাপের দফতরে বিরোধী রাজনৈতিক দল, গণ ও শ্রেণী গঠনের সাথে এক সর্বদলীয় বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত সভায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ১৫ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কাজী জাফর আহমদ, ৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত ও দফতর সম্পাদক আজাদ সুলতান কর্তৃক প্রচারিত ইতিহাস সচেতন পাঠকদের জন্য সেই ঘোষণাপত্রের হুবহু বিবরণ নিম্নে উপস্থাপিত হলো ঃ

লক্ষ লক্ষ মানুষের চরম ত্যাগের ফলে অর্জিত বাংলাদেশের জনসাধারণ আজ আবার নতুন করে সন্মুখীন হয়েছে এমন এক শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতনের যার নজির দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে জনগণকে করা হচ্ছে পঙ্গু ও অধিকারবিহীন। এত রক্তদানের পর দেশী ও বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতার দরুন বাংলাদেশের সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি। এই অসহনীয় যন্ত্রণা হতে এদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে মুক্ত করেই আমরা নিম্নলিখিত রাজনৈতিক দল এবং দেশী সংগঠনগুলি নিম্নলিখিত ১৫ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগ্রামী জনতার এক অপ্রতিরোধ্য সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য ঐকমত্যে পৌঁছেছি ও একটি যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেছি। এই যুক্ত সংগ্রাম পরিষদে যোগদানকারী প্রত্যেক রাজনৈতিক দল হতে দু'জন ও গণ এবং শ্রেণী সংগঠন হতে একজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছে। আমাদের কর্মসূচি নিম্নরূপ-

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ঃ

১। ক) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত তথাকথিত মৈত্রীচুক্তির নামে ২৫ বছর মেয়াদী সামরিক চুক্তি বাতিল করতে হবে।

www.pathagar.com

খ) বিদেশের সঙ্গে সম্পাদিত সকল প্রকার গোপন চুক্তি অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে।

গ) বাংলাদেশ হতে ভারতের শোষকগোষ্ঠীর সর্বপ্রকার সামরিক কর্তৃত্বের অবসান করতে হবে।

ঘ) সাম্রাজ্যবাদী বিশেষ করে আমেরিকান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল প্রকার অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

ঙ) বাংলাদেশ হতে ভারতীয় সৈন্য ও রুশ নৌবাহিনী অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে।

২। ক) বেসামরিক বাহিনীসমূহ যথাক্রমে লাল বাহিনী, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, সবুজ বাহিনী ইত্যাদি বাহিনীকে বে-আইনী ঘোষণা করতে হবে ও বে-আইনীভাবে অস্ত্রসজ্জিত আওয়ামী লীগ কর্মীদের নিরস্ত্র করতে হবে।

খ) জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে নিষিদ্ধ করতে হবে।

গ) প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে বিদেশি প্রভাবমুক্ত স্বাধীন জাতির উপযোগী একটি জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করতে হবে।

৩। ক) ৩১ ডিসেম্বরের পর থেকে দালাল আইনের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

খ) বিরোধীদলীয় কর্মীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সরকার দালাল আইনে ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইনে, নক্সাল দমনের অজুহাতে, ডাকাতির অজুহাতে বা অনুরূপ মিথ্যা অজুহাতে যে অসংখ্য বানোয়াট মামলা রুজু করেছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

গ) প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৫০ ধারা প্রত্যাহার করতে হবে।

ঘ) নির্বাচনের পূর্বে সকল দেশপ্রেমিক রাজবন্দিদের মুক্তি প্রদান করতে হবে।

৪। ক) আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও টাউটগণ ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারি প্রশাসনযন্ত্রকে কুক্ষিগত করে, ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে, দলীয় স্বার্থে কাজ করতে বাধ্য করে চরম দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে দেশব্যাপী যে চরম নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে অবিলম্বে তার অবসান করতে হবে।

খ) সরকারি কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক বিধি অনুযায়ী পরিসংক্রান্ত ব্যাপারে আইনের আশ্রয়গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

। ক) আইয়ুবী আমলের প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশনস্ অর্ডিন্যান্স অবিলম্বে বাতিল করে সংবাদপত্র প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।

খ) বিরোধীদলীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি প্রদান করতে হবে,

গ) সরকারি কালা-কানুন বলে সরকারি আদেশে বন্ধ হককথা, গণশক্তি, মুখপত্র, লালপতাকা ও স্পোকসম্যান পত্রিকা পুনঃপ্রকাশে অধিকার দিতে হবে।

ঘ) মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতারকৃত হককথা, মুখপত্র ও স্পোকসম্যান-এর সম্পাদকদের মুক্তিদান করতে হবে এবং গণশক্তির সম্পাদক ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের উপর জারিকৃত হুলিয়া প্রত্যাহার করতে হবে।

ঙ) বাংলাদেশের সকল সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবিলম্বে সরকারি আয়ত্ত ও কর্তৃত্বাধীন থেকে মুক্ত করে সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনে আওয়ামী লীগের ও সরকারের একদলীয় প্রচার বন্ধ করে সকল রাজনৈতিক দলের মতামত প্রকাশ ও সংবাদ প্রচারের সমান সুযোগ দান করতে হবে।

www.pathagar.com

৬। লাইসেন্স পারমিটের অসাধু ব্যবসা, সম্পদ পাচার, চোরাচালান, মজুতদারী, মুনাফাখোরী, দুর্নীতি ও অযোগ্যতার অবসান করে চাল, গম ও বস্ত্রসহ নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসমূহের মূল্যকে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

৭। ক) রিলিফ কমিটি, রেডক্রস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমস্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে একদলীয় প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে সর্বদলীয় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা বন্ধ করতে হবে।

৮। ক) বেকারদের কর্মসংস্থান করতে হবে অন্যথায় তাদের বেকার ভাতা প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

খ) বাস্তুহারাদের উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) বিগত স্বাধীনতা যুদ্ধে যাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে করতে হবে।

৯। ক) বিভিন্ন অসদুপায়ে ধন-সম্পদ কুক্ষিগত, পারমিট ব্যবস্থা, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের অসংখ্য ব্যাংক ও ট্রেজারী হতে কয়েকশত কোটি টাকা, সোনা-রূপা বিদেশে পাচার ইত্যাদির হিসাব প্রকাশ করতে হবে এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন ও বোর্ড নিয়োগ করতে হবে।

খ) আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের সকল সম্পত্তির হিসাব সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে এবং জনসমক্ষে তা প্রকাশ করতে হবে।

১০। বিদেশি লগ্নী, পুঁজি ও বিদেশি মালিকানাধীন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

১১। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ঐতিহাসিক ১১ দফার উল্লেখিত ছাত্রসমাজের দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে হবে।

১২। ক) মহাজনী ঋণ বাতিল করে স্বল্পসুদে দীর্ঘ মেয়াদী সরকারি ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বন্ধকী জমি মহাজনের হাত থেকে কৃষকদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে।

খ) বর্তমানে মুদ্রামান হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাট, আখ, তামাক ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের ন্যায্যমূল্য ধার্য করতে হবে। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তিন মণ চালের দামের সমান ছিল এক মণ পাটের দাম। বর্তমানে তিন মণ পাট বিক্রি করে এক মণ চাল খরিদ করতে হয়। এই দুরবস্থার অবসান করতে হবে।

গ) শহর ও গ্রামাঞ্চলের পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

ঘ) জল সেচের পাম্পিং মেশিন বাবদ যে ঋণ দেয়া হয়েছে তা ফেরত নেয়া চলবে না।

ঙ) সারের দাম কমাতে হবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে।

চ) ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের বিনামূল্যে জমি দিতে হবে।

১৩। ক) নয়া শ্রমনীতি বাতিল করে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার ও ধর্মঘট করার অধিকার দিতে হবে এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত অর্থনীতি নির্ধারক কমিটি গঠন করতে হবে এবং উক্ত কমিটি দ্বারা অর্থনীতি প্রণয়ন করতে হবে।

www.pathagar.com

খ) শ্রমিকদের জন্য মাসিক ৩০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।
গ) রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পে নীতি ও ব্যবস্থাপনা শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা করতে হবে।
ঘ) রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প নীতি ও ব্যবস্থাপনা এমন বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে যাতে প্রয়োজনবোধে শ্রমিকরা পরিবর্তন করে নতুন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে।

১৪। পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ফেরত আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫। একদলীয় শাসনতন্ত্র বাতিল করতে হবে, বর্তমান অযোগ্য ও ব্যর্থ সরকারের পদত্যাগ করতে হবে এবং সর্বদলীয় সরকার গঠন করতে হবে।

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের অন্তর্ভুক্ত দলসমূহ ঃ

(১) বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
(২) বাংলাদেশ জাতীয় লীগ
(৩) বাংলা জাতীয় লীগ
(৪) বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী)
(৫) বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি
(৬) শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী পার্টি
(৭) বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন
(৮) বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন
(৯) বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন
(১০) ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক
(১১) বাংলা ছাত্রলীগ
(১২) বাংলাদেশ কৃষক সমিতি
(১৩) বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন
(১৪) বাংলা মজদুর ফেডারেশন
(১৫) বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক পরিষদ
(১৬) সমাজবাদী ছাত্র জোট
(১৭) গণতান্ত্রিক যুবলীগ
(১৮) বাংলাদেশ সোশালিস্ট পার্টি
(১৯) নিখিল বাংলা জোয়ান কর্মী শিবির
(২০) নিখিল বঙ্গ ঈমাম ও মুসল্লী কমিটি
(২১) পাকিস্তানে আটক বাঙালি উদ্ধার সমিতি
(২২) ক্রান্তি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান
(২৩) উন্মেষ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ
(২৪) সৃজনী লেখক ও শিল্পগোষ্ঠী
(২৫) গণশিল্পগোষ্ঠী।

শেখ মুজিব দলীয় ও ক্ষমতার কোন্দল কোন কিছুকেই ঠেকাতে না পেরে অবশেষে আত্মীয়-স্বজনদের দলীয় ও ক্ষমতা অংশীদারিত্ব দেয়া শুরু করেন। ১৯৭২-এর ১১ নভেম্বর শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠা হয়। মনি সদ্য গঠিত দলের রাজনীতিতে পদার্পণের পর মুজিবের কাছে সবার চেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত

www.pathagar.com

হন। তার গ্রহণযোগ্যতা শেখ মুজিবের কাছে এতই প্রখর রূপ লাভ করে যার দরুন মন্ত্রিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে অনেককে তার দুয়ারে ধরনা দিতে হয়েছে। শেখ মুজিবের আরেক আত্মীয় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব সৈয়দ হোসেনের ভয়ে প্রশাসনের বড় বড় কর্তারা সব সময় সন্ত্রস্ত থাকতো। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব সলিমুজ্জামান ছিলেন শেখ মুজিবের আত্মীয়। তার প্রতাপে স্বাধীন সংবাদপত্র শিল্পের অবস্থা হয়ে উঠেছিল শোচনীয়। আর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর শেখ মুজিবের পুত্র শেখ কামালের সশস্ত্র পদভারে হয়ে উঠতো প্রকম্পিত। এমনিভাবে দলের বিভিন্ন পর্যায়ে শেখ মুজিবের আত্মীয়-স্বজনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই অবস্থার দরুন নেতৃত্বের কোন্দলে ছাত্রলীগ পুনরায় আক্রান্ত হয়। এই কোন্দলের ফলশ্রুতিতে মহসিন হলে এক রাতে সংঘটিত হয় ৯টি হত্যাকাণ্ড। অর্থাৎ কোন্দল সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নেয়।

www.pathagar.com

মুজিব শাসনামলে ছাত্রহত্যা

১ জানুয়ারি, ১৯৭৩ স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ছাত্রদের রক্ত দিয়ে লেখা হয় একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের প্রথম পর্ব। পাকিস্তানি শাসকশ্রেণীর কয়েকজন কর্ণধার তথা নূরুল আমীন, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খানের মতো পিশাচ নেতাদের ঠ্যাঙানো নীতি অনুসরণ করে স্বাধীনতা উত্তরকালে শেখ মুজিব সরকারও ছাত্রদের পুলিশ দিয়ে হত্যা করিয়ে জাতির কাছে স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৭১-এর ৭ মার্চ শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণের এক পর্যায়ে তৎকালীন বিভিন্ন আন্দোলনে ছাত্রদের হত্যা করার বিপক্ষে জোরালো হুঙ্কার প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তারই শাসনামলে ছাত্রদের হত্যা করার বিরুদ্ধে তিনি টু-শব্দটুকু করার ইচ্ছা করেননি।

সরকার সমর্থিত ন্যাপ (মোজাফফর)-এর ছাত্র সংগঠনরূপে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের অবস্থান ছিল জাতীয় রাজনীতিতে। সেই সময় ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বিমানে গুলিবর্ষণের মাধ্যমে একটি হামলা পরিচালনা করে। তাদের এই বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে ছাত্র ইউনিয়ন ১ জানুয়ারি 'ভিয়েতনাম দিবস' পালনের ডাক দেয়। এ উপলক্ষে তারা এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। শান্তিপূর্ণ, যুদ্ধবিরোধী মিছিলটি প্রেসক্লাবের বিপরীত দিকে অবস্থিত তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্র তথ্য সার্ভিস (ইউসিস) দফতরের সামনে এসেই বেশ উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পূর্ব নিয়মানুযায়ী বিক্ষুব্ধ কোনো স্থানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পুলিশকে প্রথমে ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে হয়, তারপরও যদি অবস্থা নিয়ন্ত্রণে না আসে তবে বাধ্য হয়ে চারদিকে গুলি ছুঁড়তে হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের পুলিশ তা করার আবশ্যকতা অনুধাবন করেনি। তারা বিনা উস্কানিতে ছাত্র মিছিলে গুলি চালিয়ে হত্যা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মতিউল ইসলাম ও মীর্জা কাদেরুল ইসলামকে, আহত করে সাতজনকে। পুলিশ ছাত্রদের ওপরই শুধু গুলিবর্ষণ করেনি বরং প্রেসক্লাবেও গুলিবর্ষণ করে। তাদের এই দৃশ্যে স্তম্ভিত সাংবাদিক সমাজ ক্যামেরাবন্দি করতে চাইলে পুলিশ ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙে ফেলে, শেখ মুজিবের ভাগ্নে যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনি সম্পাদিত দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকার ফটোগ্রাফার রফিকুর রহমানকে আহত করে। এই ঘটনার পর এক বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাংবাদিকরা দেখা করে এর প্রতিবাদ জানায়।

ছাত্রমিছিলে গুলিবর্ষণ ও সাংবাদিক সমাজের ওপর পরিচালিত হামলার পর সমস্ত ঢাকার দোকান-পাট আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। জনতা তাদের প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় ছাত্রদ্বয়ের লাশে রক্তে-রঞ্জিত রাজপথের কিছু অংশ ইট দিয়ে ঘেরাও-এর মাধ্যমে। অসংখ্য মানুষ একবার লাশগুলো দেখতে প্রেসক্লাবের সামনে জড়ো হয়। সারা ঢাকার অলিতে-গলিতে জনতা মৌন মিছিল নিয়ে বের হয়। মওলানা ভাসানী তখন সন্তোষে বিশ্রামরত ছিলেন। 'কৃষক-শ্রমিক মৈত্রী সমাবেশ' শেষ করে বেশ ক্লান্ত ছিলেন তিনি। কিন্তু এ ঘটনা শোনার পর ক্লান্তিকে দূরে ঠেলে দিয়ে বিবেকসম্পন্ন মানুষ হিসেবে তিনি কলম হাতে তুলে নেন। রাত বারটায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী তিনি ৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, কেন্দ্রীয় দফতরের ঠিকানা সম্বলিত প্যাডে নিজ হাতে এক বিবৃতি লিখে ন্যাপের দফতর সম্পাদক আজাদ সুলতান বরাবর প্রেরণ করেন যাতে যথাশিগগিরই এটি সংবাদপত্রে পাঠানো হয়।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীর লিখিত ও আজাদ সুলতান কর্তৃক সংবাদপত্রে প্রেরিত বিবৃতির হুবহু বিবরণ ছিল নিম্নরূপঃ

গতকল্য ৩১ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে সভা করার পর আমি সন্তোষ চলিয়া আসিয়াছি। গত রাতে আমার মোটেই ঘুম হয়নি। অত্যধিক বুক জ্বালা করার দরুন আমি বিশেষ অসুস্থ বোধ করিতেছে। এইমাত্র আমার অন্যতম সহকর্মী যশোরের আলমগীর ছিদ্দিকীর নিকট হইতে শুনিতে পাইলাম ঢাকার বুকে কতিপয় খ্যাতনামা সাংবাদিক, ছাত্র-জনতা ও ন্যাপ কর্মীদের ওপর টিয়ার গ্যাস বা অন্য কোনো হুঁশিয়ারী ব্যতিরেকে বাংলাদেশের স্বৈরাচারী সরকার গুলি করার নির্দেশ দিয়ে সাংবাদিক ও জনসাধারণকে পাইকারিভাবে হতাহত করিয়াছে। এই মর্মান্তিক সংবাদে যারপরনাই ব্যথিত হইয়া কিভাবে প্রতিবাদ করিব তার ভাষা আমার জানা নাই। শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সরকারকে আমি হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি যে, জালিয়ানবাগে ডায়ারের গুলিতে পৃথিবীর অন্যতম শক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন হইয়াছে। গুলিস্তানে নিঃসহায় নিরপরাধ জনতার ওপর গুলি চালাইয়া আইয়ুব শাহী খতম হইয়াছে। বাংলার অসংখ্য মানুষকে হত্যা করার ফলে সশস্ত্র শক্তিতে বলীয়ান টিক্কা খান বাংলাদেশ হইতে চিরদিনের তরে বিতাড়িত হইয়াছে। এবার মুজিবুর ও তার সহকর্মী দস্যুদের পালা। সরকারের এ ধরনের কার্যকলাপের ফলে সারাদেশব্যাপী যে বিক্ষোভের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে তাহা নিভানো বাংলাদেশ সরকার ও তাহার মুজিব হিন্দুস্থান সরকার, পৃথিবীর নিকৃষ্টতম সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা এবং সংশোধনবাদী রাশিয়ার পক্ষে মোটেই সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না।

২ জানুয়ারি ছাত্রহত্যা ও সাংবাদিক সমাজের ওপর হামলার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ব্যতীত সকল রাজনৈতিক দলের আহবানে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন শেষে বিকেলে পল্টনের জনসভায় ছাত্র ইউনিয়নের রাজনৈতিক সংগঠন মোজাফফর ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ ভট্টাচার্য সরকারের পদত্যাগের দাবি করেন। অধ্যাপক মোজাফফর বলেন, 'আওয়ামী লীগের ছাত্রহত্যা ইয়াহিয়া-মোনেম স্বৈরাচারী সরকারের কার্যকলাপের নামান্তর। আমরা দেশবাসীর দাবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আশু পদত্যাগ দাবি করছি।' তিনি বলেন, 'নূরুল আমীন সরকারের ভাগ্যে যে পরিণতি ঘটেছিল, শেখ মুজিবের সরকারের ভাগ্যেও সেই পরিণতি অনিবার্য।' প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যেও মোজাফফর আহমদ বলেন, '.......আপনি ভাত দিতে পারবেন না, তবে কিল মারার গোসাই কেন? চোখ থাকতে দেখছেন না, কান থাকতে শুনছেন না কেনো? দুর্নীতিবাজ এমসিএ, আড়তদার, মজুতদার, মুনাফাখোর দুর্নীতিবাজ দালাল কর্মচারীর শাস্তি দেয়া হয়নি কেন? শুধুমাত্র কয়েকটি ভালো ভালো কথা ও ঘোষণা ছাড়া সত্যিকারভাবে জনগণ কি পেয়েছে?' সেদিনের জনসভার ভাষণে মতিয়া চৌধুরী বলেন, 'বাইশ পরিবারের বদলে ২২শ' পরিবার গড়ে তোলা হচ্ছে।'

অন্যদিকে জাসদ আহূত বায়তুল মোকাররমের জনসভায় সাধারণ সম্পাদক আ.স.ম আব্দুর রব বলেন, 'বর্তমান সরকারের গদিতে থাকার কোনো অধিকার নাই। নিক্সন সরকারকে খুশি করতে গুলি চালানো হয়েছে।' ডাকসু ভিপি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থনদানকারী কেউ বাংলার মাটিতে থাকতে পারবে না।' ঐদিন শেখ মুজিব বরিশালের এক জনসভায় বলেন, 'আসন্ন সাধারণ নির্বাচন বানচাল করার জন্য এক শ্রেণীর লোক গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করছে।'

www.pathagar.com

৩ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত এক সভায় ইউনিয়নের নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ঘোষণা করেন, 'দরকার হলে আরো রক্ত দেবো তবু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় সরকারকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র কায়েম করবোই।' ঐ সভায় সেলিম ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন এবং সদস্যপদ বই থেকে সংশ্লিষ্ট পাতাটি জনসভায় ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলেন। ১৯৭২ সালের ৬ মে এই ছাত্রনেতাই শেখ মুজিবুর রহমানকে ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ দেয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। জনাব সেলিম ডাকসুর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রত্যাহার করে সাবধান করে দেন যে, 'সংবাদপত্র, টিভি ও বেতারে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে আগে আর 'জাতির পিতা' ও 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি ব্যবহার করা চলবে না।' তিনি বাড়িতে ও দোকানে টানানো শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি নামিয়ে ফেলার আহ্বান জানান। (উল্লেখ্য, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হতে অব্যাহতি পাওয়ার পর ১৯৬৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান করেন তৎকালীন ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমদ)

ঐদিনই বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিং বলেন, 'বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ অযোগ্য।'

৩ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মুজিববাদী ছাত্রলীগ আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় ছাত্রলীগ সভাপতি শেখ শহীদুল ইসলাম 'বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অশোভনীয় উক্তি উচ্চারণের জন্য' ন্যাপ (মোজাফফর) ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের আগামী ৭ জানুয়ারির মধ্যে জনতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বলেন। তিনি বলেন, 'যদি ক্ষমা না চাওয়া হয় তাহলে জনতা ৭ জানুয়ারির পর থেকে বাংলার মাটিতে ন্যাপ (মোজাফফর) ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কোনো জনসভা অনুষ্ঠিত হতে দেবো না।' ঐ সভায়ই শেখ শহীদ বলেন, 'যেসব লোক মন্ত্রী হবার খায়েশ এবং সর্বদলীয় সরকার গঠনের জন্য সরকারের কাছে শতবার তোষামোদ করেছেন, তারা এবং তাদের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আজ গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অশোভন উক্তি করছে।' তিনি ঘোষণা করেন যে, 'আজ বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) থেকে যে পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর নামের পূর্ণ মর্যাদা দেবে না সংগ্রামী জনতা বাংলার মাটিতে সেই পত্রিকার অস্তিত্ব রাখবে না।' তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুকে ডাকসুর আজীবন সদস্য করা হয়েছে ডাকসুর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল কুদ্দুস মাখনের নেতৃত্বে। সুতরাং সেখানে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা অন্য কারও নেই। বর্তমান ডাকসু যেহেতু ছাত্রসমাজের মতবিরোধী কাজ করছে এবং তাদের আস্থা ও ভালাবাসা হারিয়েছে, তাই এই ডাকসু বাতিল।'

ছাত্রনেতারা এই তৎপরতাকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। ইতিমধ্যে ডাকসু অফিসও তছনছ করে ফেলা হয়।

অন্যদিকে সরকারি পত্রিকা দৈনিক বাংলা 'আদর্শ শাস্তি দিতে হবে'- শিরোনামে প্রথম পাতায় এক সম্পাদকীয়তে লেখেঃ গত সোমবার ঢাকার রাজপথে ঝরে পড়েছে আমাদের প্রাণের চেয়ে দু'টি প্রিয় জীবন। বাংলাদেশের সংগ্রামী ছাত্রসমাজের প্রদীপ্ত দু'টি শিখা। তারা প্রতিবাদ করেছিলেন ভিয়েতনামে মার্কিন বর্বরতার বিরুদ্ধে। ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের সামনে। বিক্ষোভ মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করলো পুলিশ। চিরকালের মতো নিভে গেলো অমূল্য দু'টি প্রাণ। গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হলেন আরো সাত

www.pathagar.com

জন। এদের একজন সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফার। এই ক্ষতির পরিমাপ আমাদের জানা নেই। জানা নেই কেমন করে কি ভাষায় শোক প্রকাশ করবো আমরা। কিভাবে সান্ত্বনা দেবো নিহতের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন এবং শোকার্ত ছাত্রসমাজকে। আমরা শোকে জর্জরিত। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট আমাদের প্রাণের মর্মমূল। স্তম্ভিত এবং হতচকিত আমরা বিস্ময়ে। এত বড় একটি মর্মান্তিক ঘটনা কি করে ঘটতে পারলো স্বাধীনতা-উত্তর পটভূমিতে এ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এত শোকের মধ্যেও আমাদের নতুন শোকের আঘাত সইতে হবে, কি করে তা বিশ্বাস করা সম্ভব? *(সূত্রঃ দৈনিক বাংলা, ৩ জানুয়ারি–১৯৭৩)*

ঐদিনই বাংলার বাণীতে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, শেখ মুজিবের ছবি নামিয়ে ফেলার দায়ে এক ব্যক্তির কান কেটে দেয়া হয়েছে। পরদিন ঐ পত্রিকা খবর দেয় যে, একই কারণে রংপুরে দু'ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

'আদর্শ শাস্তি দিতে হবে' সম্পাদকীয় লেখার দায়ে সরকার দৈনিক বাংলার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি কবি হাসান হাফিজুর রহমান এবং সম্পাদক আব্দুল তোয়াব খানকে ৫ জানুয়ারি পত্রিকা থেকে সরিয়ে দেয়।

৫ জানুয়ারি পল্টনে আয়োজিত মুজিববাদী ছাত্রলীগের জনসভায় শ্লোগান দেয়া হয়ঃ 'রব-ভাসানী-মোজাফফর বাংলায় তিন মীর জাফর।'

৬ জানুয়ারি গোপালগঞ্জের এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'স্বার্থান্বেষী মহল নির্বাচনের প্রাক্কালে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে ও আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্র করছে। চরম দুঃখের দিনগুলোতে এসব লোককে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারা নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। দেশের উন্নয়নের জন্য যাতে বিদেশ থেকে কোন সাহায্য না আসতে পারে সেই উদ্দেশ্যে, ওরা বিশ্বে বাঙালি জাতির মান মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করছে।'

৬ জানুয়ারি অধ্যাপক মোজাফফর আকস্মিকভাবে সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করে ৭ জানুয়ারি প্রস্তাবিত জনসভা বাতিল ঘোষণা করেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি স্বীকার করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি খুবই শঙ্কিত। ঐ সংবাদ সম্মেলনে তিনি ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করে মওলানা ভাসানীকে শেখ মুজিবের দালাল হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি তার দলকে সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থাশীল বলে দাবি করেন এবং গণতান্ত্রিক আচরণ নিশ্চিত করার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানান। তবে তিনি সংবাদ সম্মেলনে ভিয়েতনামের প্রশ্ন তোলেননি, সরকারের বিরুদ্ধে কোনো জোরালো বক্তব্য প্রদানে বিরত থাকেন। তিনি সরকারের পদত্যাগের পূর্ব দাবি ও ছাত্রহত্যা সম্পর্কেও মতামত ব্যক্ত করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। একই দিনে কমিউনিস্ট পার্টির (মণি সিং) সাধারণ সম্পাদক বারীন দত্ত ওরফে আব্দুস সালাম সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী, চীন ও পাকিস্তানি চরেরা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টায় দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে।' উল্লেখ্য, সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে তিনি বলেন, 'কোনো প্রশ্ন করবেন না-যা বলি তা শুনে যান।'

আসলে মোজাফফর ন্যাপের আব্দুস সালামের সংবাদ সম্মেলন ছিল সরকারের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি অঘোষিত প্রয়াস। উক্ত সংবাদ সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার পরে তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে আলাপচারিতার মাধ্যমে সরকারের সাথে লিয়াজোঁ রক্ষার ব্যাপারে ভূমিকা রাখার চেষ্টা চালান। পূর্বে তারা অঘোষিতভাবে সরকারের সাথে

www.pathagar.com

সম্পর্ক করতে চাইলেও ২২ জানুয়ারি ন্যাপের (মোজাফফর) অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তাদের পূর্ব বিরোধ মিটিয়ে নেন। অধ্যাপক মোজাফফর তার বক্তব্য ও তৎপরতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে আসেন। একই দিনে কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিং) আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে সরকারের প্রতি সমর্থন জানান। উল্লেখ্য, তাদের এই সমঝোতার পর থেকে তারা আওয়ামী লীগের বি-টীম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এবং শহীদ মতিউল-কাদেরের বিচারের দাবিকে সমাধিস্থলে কবর দেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্রহত্যা সংঘটিত হওয়ার পর মুজিব বা তার সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টাঙ্গাইলের আব্দুল মান্নান কোনো বিবৃতি বা মতামত প্রদান করেননি। শুধু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রেকর্ডপত্রের খাতিরে একটি প্রেসনোট সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগোচরে এনেছিলেন। তাও সে প্রেসনোটে ঘটনা তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ ছিল। যে কমিটির দায়িত্ব ছিল কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে পুলিশ শান্তিপূর্ণ ছাত্র মিছিলে গুলিবর্ষণ এবং হামলা করেছিল। বড়ই অনুতাপের বিষয়, বড়ই লজ্জার বিষয়, বড়ই ঘৃণার বিষয় যে, ঘটনা তদন্তের জন্য কমিটির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল, দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির সুপারিশ করার মতো ক্ষমতা তাদের ছিল না। সে তদন্ত কমিটি সরকারের কাছে কি রিপোর্ট প্রদান করেছিল জনতা আজ অবধি জানতে পারেনি।

www.pathagar.com

সংসদ নির্বাচনে ভাসানীর তৎপরতা ও সরকারি সন্ত্রাস

১৯৭২ সালে তৎকালীন গণপরিষদের নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূলত সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে নির্বাচনী প্রস্তুতি ও প্রচারণার হিড়িক পড়ে যায়। আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি প্রবণতার বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য প্রদানের সুযোগ করে দেয় এই নির্বাচনী প্রস্তুতি ও প্রচারণা। সে সময় মওলানা ভাসানীর মতো তেজোদৃপ্ত নেতাকে নির্বাচনী প্রস্তুতি ও প্রচারণা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে করা হয় অক্লান্ত প্রচেষ্টা আর সেই প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগের সাথে যোগ দেয় ন্যাপ (মোজাফফর) ও সিপিবি (মণি সিং) মতো আওয়ামী বি-টিম দল। মওলানা ভাসানী তাদের এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দাবানলের দাহ ছড়িয়ে দেন দেশের সর্বত্র। সাপ্তাহিক হককথার ডিক্লারেশন বাতিল হওয়ার পর প্রকাশিত বুলেটিন 'সত্যকথার' ২৭ অক্টোবর, ১৯৭২ সংখ্যায় প্রদত্ত এক বাণীতে মওলানা ভাসানী বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষকে হিন্দুস্থানসহ তামাম সাম্রাজ্যবাদী ছোবল থেকে রক্ষা করার জন্য ন্যাপ আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। নির্বাচনে ভারতবাদীদের রাজ খতম করার জন্য দুর্বার গণজাগরণ সৃষ্টি করুন। দেশের সর্বত্র আজ ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী-চাকুরে-ছোট ব্যবসায়ী সকলেই ভারতের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা ও বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। সারাদেশময় এই বিক্ষোভের আগুন যে কোন মুহূর্তে জ্বলে উঠতে পারে। তাই আজ এই বিক্ষোভকে সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শত্রুর বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে হবে। এই পবিত্র উদ্দেশ্য সামনে রেখে দেশের প্রতিটি জায়গায়, প্রতিটি পাড়া, গ্রাম, থানা-শহর, প্রত্যেক কৃষক ও শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও চাকরিজীবীদের এলাকায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কৃষক সমিতির শাখা গঠন করুন। আগামী নির্বাচনে ভারতবাদীদের কবর রচনা করুন।'

১ জানুয়ারির ছাত্র হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দেশব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াকে আওয়ামী লীগ নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত বলে অভিহিত করতে থাকে। ২০ জানুয়ারি নবগঠিত যুবলীগের সভায় 'বিরোধীদের নির্মূল করার' সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন সম্পর্কে লীগ নেতারা বলতে শুরু করেন যে, এই নির্বাচন হবে মুজিববাদের ওপর ম্যান্ডেট।

১৯৭৩-এর ৭ মার্চ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ধার্য হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন ৫ ফেব্রুয়ারি মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ সময়সীমা বেঁধে দেয়। সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে তিনটি ধারার জন্ম হয়। এই তিনটি ধারা ছিল-

॥১॥ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ।

॥২॥ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সাত দলীয় ঐক্যজোট।

॥৩॥ ন্যাপ মোজাফফর-সিপিবির মণি সিং-এর নেতৃত্বে দুই দলীয় ঐক্যজোট।

এর মধ্যে প্রথমটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য ৩০০ আসনে প্রার্থী, দ্বিতীয়টি ১৭০ আসনে প্রার্থী এবং তৃতীয়টি (২২৪+৪) ২৮৮ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে। তাছাড়া নবগঠিত জাসদ ২৩৭, বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ৮, বাংলা জাতীয় লীগ, কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী দল, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী), স্বতন্ত্র ১২০, বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠন কিছু কিছু আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে। তখন আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ভারতের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তিকে শুধু বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে থাকে।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী যখন ঘোষণা করেন তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন তখনই আওয়ামী লীগ ও তার বি-টিম দল একই নম্বরে ভারতে ছাপকৃত নোট দিয়ে জনগণ ও ন্যাপ নেতাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তাদের এই ধরনের হীন মনোভাবের বহিঃপ্রকাশে মওলানা ভাসানী তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। হাজার হাজার একই নম্বরের নোট তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থাপনের মাধ্যমে জনগণের গোচরে আনেন। সরকারকে তিনি আহ্বান জানান তা বাতিলের কিন্তু সরকার তাতে কোন সাড়া না দেয়ায় ১৯৭৩ সালের প্রথম দিকে মওলানা ভাসানী জনগণের উদ্দেশ্যে জাল নোটের ছবিসম্বলিত এক প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। ন্যাপের দপ্তর সম্পাদক আজাদ সুলতান কর্তৃক প্রকাশিত ও রাশেদ খান মেনন কর্তৃক প্রচারিত এ প্রচারপত্রে বলেন-

বাংলাদেশের নোট জাল করেছে কারা?

বাংলার মানুষ জানতে চায় দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছি। স্বাধীনতার প্রথম দিকেই আমাদের দেশে আজকের বিরাজমান অবস্থা ছিল না। জিনিসপত্রের মূল্য আজকের মতো সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে ছিল না। কিন্তু এতো আশা-ভরসা নিয়ে দেশকে স্বাধীন করিবার পর কি কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম পাঁচ-সাতগুণ বাড়িয়া গেলো? ইহার পিছনে কি কোন কারণ নাই? নিশ্চয়ই আছে। সকলেরই জানা আছে, বাংলাদেশের নোট প্রথমে ভারতে ছাপা হইয়াছিল। ভারত সরকার নিজ দায়িত্বে তাহা করিয়াছে। কিন্তু সাথে সাথে তাহারা আর একটি কাজ করিয়াছে। তাহা হইল ভারতে ছাপানো বাংলাদেশের দুইশত কোটি টাকার নোটের সঙ্গে তাহারা আরো কয়েকশত কোটি টাকার জাল নোট বাংলাদেশের বাজারে ছাড়িয়াছে। তাহার একটি প্রামাণ্য চিত্র উপরে দেয়া গেল। (মূল প্রচারপত্রে একটি জাল টাকার প্রামাণ্য চিত্র ছিল)। একই নম্বরের দুইখানা এক টাকার নোট। ফলে এক টাকার জিনিসের দাম হইয়াছে পাঁচ-সাত টাকা। তাছাড়া সরকারি দলের নানা তেলেসমাতি তো আছেই। আমরা মনে করি যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের বাজারে ভারতের এই জাল নোট থাকিবে ততদিন কিছুতেই জিনিসপত্রের মূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করা সম্ভব হইবে না। আর জাল নোট বন্ধ করার একমাত্র উপায় হইতেছে ভারতে ছাপানো নোট বাতিল করিয়া দেওয়া। কিন্তু ভারতের আজ্ঞাবহ বাংলাদেশের বর্তমান পুতুল সরকার তাহা করিবে না। অথচ তাহা আজ বাংলার জনগণের জীবনে এক সর্বগ্রাসী সংকট সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি স্বাধীনতার প্রথম হইতেই ভারতীয় কারসাজি এবং ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করিয়া আসিতেছে। এইজন্য ন্যাপের বহু নেতা ও কর্মীকে নানাভাবে হয়রানি করা হইতেছে। কিন্তু তবু ন্যাপ তার লক্ষ্যপথ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। আসন্ন নির্বাচনে ভারতের জাল নোট বাতিলসহ বাংলাদেশকে সকল প্রকার ভারতীয় ষড়যন্ত্রের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিয়া জয়যুক্ত করুন। দেশকে ভারতের হাত থেকে রক্ষা করুন। নিজে বাঁচুন এবং বাংলার মানুষকে বাঁচান।

২ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতা জিল্লুর রহমান বলেন, 'নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মুজিববাদের ওপর রায় চাইবে।' ২০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। তাতেও তারা মুজিববাদের পক্ষে রায় চায়। কিন্তু সে প্রশ্ন অমীমাংসিতই ছিল যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেও সংবিধান প্রণয়ন করেও মুজিববাদ প্রতিষ্ঠায় বাধা কোথায় ছিল।

www.pathagar.com

ফলে এই মুজিববাদের শ্লোগান কেবল শ্লোগান হিসেবেই ব্যবহার করতে থাকে আওয়ামী লীগ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন'-শীর্ষক একটি প্রচারপত্রের লাখ লাখ কপি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিয়েছিল। সেখানে পশ্চিমাদের বৈরী মনোভাবের সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছিল। সেই প্রচারপত্রের অনুকরণে মওলানা ভাসানীর ন্যাপ 'সোনার বাংলা মহাশ্মশান কেন?' শীর্ষক প্রচারপত্র প্রকাশের মাধ্যমে গদীনসীন আওয়ামী লীগ সরকারের কার্যের ধারা বিবরণীর বর্ণনা দিয়েছিল। ন্যাপের প্রচার সম্পাদক রাশেদ খান মেনন কর্তৃক প্রকাশিত প্রচারপত্রে বলা হয়েছিল-

(১) চালের বাজারে আগুন কেন? লুটপাট সমিতি, কালোবাজারী ও মুনাফাখোরীরা লাখ লাখ মণ চাল ভারতে পাচার করেছে বলে।

(২) টাকার দাম কমলো কেন? ভারতের টাকশালে ছাপানো দুইশত কোটি টাকার অতিরিক্ত নোট বাংলাদেশে চালু হলো বলে।

(৩) বাংলাদেশে সোনার দাম বাড়লো কেন? পাকবাহিনীর লুট করা সোনাদানা ভারতীয় বাহিনী লুট করেছে বলে।

(৪) তাঁতিরা সুতা পায় না কেন? সুতার পারমিট আওয়ামী লীগ নেতাদের মামু-ভাগ্নেরা ব্ল্যাকে বিক্রি করেছে বলে। তাঁতশিল্প ধ্বংস করে বাংলাদেশকে ভারতীয় কাপড়ের একচেটিয়া বাজার করবার ষড়যন্ত্র চলছে বলে।

(৫) বাংলাদেশের পাট ব্যবসার হেড অফিস ভারতে কেন? পাট ব্যবসার হেড অফিস ভারতে থাকলে ভারতের শোষক-পুঁজিপতিরা বিশ্বের বাজারে পাট ব্যবসার মুনাফার টাকা আত্মসাৎ করতে পারবে বলে।

(৬) শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করা হয় না কেন? বাংলাদেশ সরকার গোপন চুক্তি অরক্ষিত ভারত সরকারকে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে না তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে, কারণ শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে উঠলে দেশপ্রেমিক সেনারা ভারত-রাশিয়া-আমেরিকার প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে।

(৭) রক্ষীবাহিনীর পোশাক ভারতীয় বাহিনীর মতো কেন? গণআন্দোলন দমন করার জন্য রক্ষীবাহিনীর আড়ালে ভারতীয় বাহিনী আমদানি করার জন্য।

(৮) বাংলাদেশের কলকারখানা ধ্বংসের পথে কেন? বাংলাদেশকে ভারত ও পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদের পণ্যের বাজারে পরিণত করার জন্য।

(৯) রিলিফের মাল চুরি করেছে কারা? আওয়ামী লীগের মামু-ভাগ্নেরা।

(১০) ভাসানীর হককথা, গণশক্তি, মুখপত্র, স্পোকসম্যান ও লাল পতাকা বন্ধ হলো কেন? ভারত-বাংলাদেশ গোপন চুক্তি প্রকাশ করে বলে, এমসিএদের তথা লুটপাট সমিতির দুর্নীতির কথা প্রকাশ করে বলে, মুজিববাদী গুণ্ডাদের গুম, খুন, হাইজ্যাক ও নির্যাতনের কাহিনী প্রকাশ করে বলে, কৃষক শ্রমিক জনতার দাবিকে তুলে ধরে বলে।'

৫ ফেব্রুয়ারি ছিল মনোনয়নপত্র জমাদানের সর্বশেষ সময়। ঐদিন সদ্য স্বাধীন দেশের ইতিহাসে সংযোজিত হয় গণতন্ত্র ধ্বংসের একটি লেবেল। সন্ধ্যায় মনোনয়নপত্র বাছাই করার পর নির্বাচন কমিশন বলাতে বলা হয়, পাঁচজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় তারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে বিবেচিত হবে। এই পাঁচজন প্রার্থী ছিলেন-

www.pathagar.com

১. শেখ মুজিবুর রহমান দুটি আসনে;
২. সোহ্‌রাব হোসেন;
৩. তোফায়েল আহমদ;
৪. মোতাহার উদ্দিন;
৫. কে.এম. ওবায়দুর রহমান।

পাঁচজন প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন দেখা গেল সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান, মনোরঞ্জন ধর, জিল্লুর রহমান এবং রফিক উদ্দিন ভূঞার বিরুদ্ধেও কোনো প্রার্থী নেই। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করার প্রেক্ষাপটে সকল রাজনৈতিক দলে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও নিন্দার ভাষা ব্যবহৃত হয়।

ক্ষমতাসীন দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাতিষ্ঠনিক সুবিধা নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার অব্যাহত রাখলেও বিরোধীদলগুলোর বিশেষ করে ভাসানী ন্যাপ ও জাসদের জনসভাগুলোতে প্রচুর লোক সমাগম হচ্ছিল-যা বাংলাদেশের নির্বাচনে জনপ্রিয়তার একটি মূল মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। শেখ মুজিব এবং তার মন্ত্রীরা ত্রাণকার্যের জন্য ব্যবহার্য হেলিকপ্টার নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করলেও বিরোধীদলগুলো ক্রমশ জোর সমর্থন পেতে থাকে। ফলে নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসতে থাকে, আওয়ামী লীগের প্রার্থী ও সমর্থকরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তার সমর্থকদের প্রতি ততই অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে থাকে।

এদিকে নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে কারো কারো এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হয়। এর আগে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন, এমন সহকর্মীদের সঙ্গে জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতায় নেমে তারা নিজেদের বিপুল জনপ্রিয়তা প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। এবারও প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্বাচন থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্য সেই একই ধরনের পন্থা অবলম্বন করা হয় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই বলপ্রয়োগ করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করানো হয়। বিরোধীদলগুলো এ নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায় ও ক্ষমতাসীন দলের এহেন আচরণকে ফ্যাসিস্ট মনোভাবের পরিচায়ক বলে অভিযোগ উত্থাপিত করে। জাসদ মনোনয়নপত্র পেশ করার জন্য নতুন তারিখ স্থির করার দাবি জানায়। অন্য দলগুলোর পক্ষ থেকেও একই দাবি উত্থাপন করা হয়। নির্বাচনের দিন কি ঘটতে পারে, এ নিয়ে তারা আগাম আশঙ্কা প্রকাশ করতে থাকেন। বায়তুল মোকাররম চত্বরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় জাসদের আ.স.ম. আব্দুর রব ঘোষণা করেন যে, 'বিদ্যমান পরিস্থিতি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূলে নয়, কারণ সরকার ভীতি প্রদর্শনের পন্থা বেছে নিয়েছেন।' তিনি অভিযোগ করেন যে, জাসদের অনেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র পেশ করতে দেয়া হয়নি এবং সরকার সেক্ষেত্রে সামান্য সৌজন্যবোধও প্রদর্শন করেননি। তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও প্রশ্ন উত্থাপন করে তার পদত্যাগ দাবি করেন।

মওলানা ভাসানী নির্বাচনের তিন সপ্তাহ পূর্বে নওগাঁয় কৃষক সম্মেলনের দিন ১১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত 'সরকারের ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হন'-শীর্ষক এক প্রচারপত্রে বলেন-

'সরকারের অত্যাচার-নির্যাতন সর্বকালের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। দেশবাসীর সকল আবেদন, দাবি, হুঁশিয়ারীকে উপেক্ষা করিয়া সরকার ও সরকারদলীয় পাণ্ডারা যে তাণ্ডব শুরু

www.pathagar.com

করিয়াছে তাহা পশ্চিমবাংলার ইন্দিরা কংগ্রেস পরিচালিত সন্ত্রাসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সরকার অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বারবার ঘোষণা করিলেও নির্বাচনী কার্যক্রমের প্রথমেই যে খেলা শুরু হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা বোধগম্য নহে। ইন্দিরা সরকারের নির্দেশে ও কায়দায় এই সরকার গণতন্ত্রের যে সামান্য অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাও কবর দিতে যাইতেছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে সম্প্রতিঃ

(১) চট্টগ্রামে রাতের অন্ধকারে নিরীহ শ্রমিক বস্তির উপর আক্রমণ চালাইয়া সরকার সমর্থিত শ্রমিক সংগঠনের গুণ্ডারা চার শতাধিক শ্রমিক হত্যা ও তাহাদের ঘরবাড়ি পোড়াইয়া দিয়াছে। ৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের বারবকুণ্ডে আর আর জুট ও টেক্সটাইল মিলে এক নারকীয় হত্যাকাণ্ডে শত শত শ্রমিক নিহত হয়। তখন খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকাসহ দেশের নানা শিল্প এলাকায় সরকারি শ্রমিক ইউনিয়নের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়া গিয়াছিল।

(২) ভোলায় বিরোধীদলের সভা পণ্ড করার জন্য লঞ্চে আগমনকারী নেতৃবৃন্দের উপর গুলি চালাইয়া তাহাদের ভোলায় নামিতে দেওয়া হয় নাই।

(৩) রংপুরের মিঠাপুকুর থানার লোহানীপাড়াকে রক্ষীবাহিনী মর্টার সেল নিক্ষেপ করিয়া ধূলিস্যাৎ করিয়া দিয়াছে।

(৪) কালিগঞ্জ থানার (রংপুর) কৃষকনেতা মঞ্জুর চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হইয়াছে ও আদিতমারীর বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে রক্ষীবাহিনীর তাণ্ডবলীলা চলিতেছে।

(৫) ঝালকাঠিতে রক্ষীবাহিনী পাইকারি গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা ও বন্দিদের পিটাইয়া হত্যা করিতেছে।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা ঘোষিত হইলেওঃ

(ক) ভোলায় তিনটি আসনের প্রার্থী ডাঃ আজাহারকে বলপূর্বক মনোনয়ন দিতে দেওয়া হয় নাই-অথচ রেডিও, পত্রিকায় ঘোষণা করা হইতেছে যে, প্রধানমন্ত্রী ও তাহার দলের লোকেরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

(খ) ভোলার অপর আসনে ন্যাপপ্রার্থী আবু মোহাম্মদ নূরুল্লাহর কাগজপত্র ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে মনোনয়ন প্রত্যাহারের চাপ দেওয়া হইয়াছে। তিনি উহা অস্বীকার করিয়া বরিশালে পালাইয়া আসিলে বরিশালেও তাহাকে গুম করার চেষ্টা করা হয়।

(গ) ফরিদপুর-নগরকান্দা আসনে ন্যাপ প্রার্থীকে বলপূর্বক আটকাইয়া রাখিয়া আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

(ঘ) যশোরে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত মন্ত্রী সোহরাব হোসেনের বিরুদ্ধে ন্যাপ প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে দেওয়া হয় নাই। ঢাকার মুন্সিগঞ্জে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে।

(ঙ) সর্বত্র ন্যাপ ও অন্যান্য বিরোধীদলীয় প্রার্থীদের নির্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য অস্ত্রের দ্বারা জীবননাশের ভয় দেখানো, এমনকি গ্রেফতার করা হইতেছে।

(চ) বিরোধীদলের কর্মী ও সাধারণ ভোটারদের কলাবরেটর আইন ও ডাকাতি মামলায় জড়িত করার জন্য অস্ত্র লইয়া হামলা, গুম ও খুন করার ভয় দেখানো হইতেছে।

সংবাদপত্রে এই সকল খবর প্রকাশ করা হয় না। রেডিওতে সরকারদলীয় খবর ছাড়া অন্য কোনো খবর বলা হয় না। আকাশবাণী কলকাতা, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকাও তাহাদের প্রচারে লিপ্ত। রিলিফের প্লেন, গাড়ি, দ্রব্যাদি সকলই সরকারি নির্বাচনী প্রচারে লাগানো হইয়াছে। এই অত্যাচার-জুলুম, নির্বাচনের নামে প্রহসন চলিতে থাকিলে বাংলাদেশের মানুষের ভবিষ্যৎ কি তাহা স্পষ্ট। ফ্যাসিবাদ কায়েম অনিবার্য। বাংলাদেশ হইবে আরেকটি ভিয়েতনাম। আর আমেরিকা, ভারত, রাশিয়া বাংলাদেশকে ভিয়েতনামই

www.pathagar.com

করিতে চায় এবং তাহাদের নির্দেশেই আওয়ামী লীগ সরকার এই করিতেছে। তাই গোলামি হইতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা, অন্যায় ও জুলুম প্রতিরোধ ও শ্রমিক কৃষক রাজ কায়েম করিতে হইলে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে আগাইয়া আসিতে হইবে।'

নির্বাচনের প্রস্তুতিকালীন সময়েই স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শহীদ মিনারের পবিত্রতা ভূলুণ্ঠিত হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকেই শহীদ মিনারে ভিড় জমতে শুরু হয় মানুষের। রাত ১১টার পর থেকে অসংখ্য নারী-পুরুষের মিলনমেলায় পরিণত হয় গোটা এলাকা। এদের সঙ্গে এক শ্রেণীর সুযোগসন্ধানী মানুষও সমবেত হয়। সেবার শহীদ মিনারের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে না নেওয়ায় অন্ধকারে শহীদ মিনারে এই লঙ্কাকাণ্ড ঘটে। রাত ১২টা এক মিনিটে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার মিছিলটি যখন মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করছিল তখন বাঁ পাশের কোণায় দু'জন যুবতী যুবকদের হাতে লাঞ্ছিত হয়। সবচেয়ে জঘন্য ঘটনা ঘটে ভোর চারটা থেকে সাড়ে চারটার মধ্যে। এ সময়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক প্রভাতফেরী শহীদ মিনারে উপস্থিত হয়। ফুল দেওয়ার জন্য নারী ও পুরুষদের কোন পৃথক লাইনের ব্যবস্থা না থাকায় বেদীর ওপর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সে সময় মিনারে সামান্য প্রদীপসদৃশ্য যে আলোর ব্যবস্থা ছিল তাও ভেসপাযোগে আগত কয়েকজন তরুণ শহীদ মিনারে উপস্থিত হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিভে যায়। তারপরই সূচনা হয় কলঙ্কজনক এক অধ্যায়ের। সেই তরুণরা বিশেষ কায়দায় কয়েকজন মেয়েকে মূল মিছিল থেকে আলাদা করে মিনারের পাদদেশে নিয়ে আসে। সেই লাঞ্ছিত তরুণীদের পরনের কাপড়-চোপড়ও তারা ছিঁড়ে ফেলে। ঘটনার সময় ১৭ ও ২২ বছর বয়স্ক দুজন তরুণী নিখোঁজ হয়ে যায়। পরে তাদের নিগৃহীত ও অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। নারিন্দা এলাকা থেকে আগত এক কিশোরীকে অর্ধ চৈতন্য অবস্থায় বাড়ি পাঠিয়ে দেয় উপস্থিত জনতা। ২১ ফেব্রুয়ারি এ ধরনের ঘটনা যখন মিনার প্রাঙ্গণে ঘটছিল তখন শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। তখনও গোটা এলাকা জুড়ে উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ধাক্কাধাক্কির ফলে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে। পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়, পবিত্র শহীদ মিনারের আশেপাশে গাঁজার আসরও জমিয়ে বসেছিল একদল তরুণ। তাদের উন্মাতাল নৃত্য এবং 'দম মারো দম' ফিল্মি গান এই দিনটির পবিত্রতা ভূলুণ্ঠিত করেছিল।

২৩ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা প্রথম পৃষ্ঠায় যে বিস্তারিত রিপোর্ট ছেপেছিল তা নিরীহতম অংশ হচ্ছে এরূপঃ "একুশে ফেব্রুয়ারী, '৭৩ সাল। যে শ্রদ্ধা, যে পূত-পবিত্র অনুভূতি, মন লইয়া রাজধানীর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা শহীদ মিনারে সেইদিন সমবেত হইয়াছিল, এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল তরুণের জঘন্য কার্যকলাপ শুধু সেই মনকে ভারাক্রান্তই করে নাই শহীদ মিনারের পবিত্র বেদীকে, অমর একুশের পুণ্যময় স্মৃতি দিবসকে মসিলিপ্ত করিয়াছে। মেয়েদের ওপর বারবার হামলা হইয়াছে, অনেক মহিলার নিরাপত্তা, সম্ভবত ইজ্জত বিনষ্ট হইয়াছে, দুইটি তরুণীকে শহীদ মিনারের পাদদেশ হইতে হাইজ্যাক করিয়া লাঞ্ছিত করার পর অর্ধচেতন অবস্থায় হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সামগ্রিক অবস্থাদৃষ্টে বারবার সকলের মনকে নাড়া দিয়েছে একটিমাত্র প্রশ্ন, আইন-শৃঙ্খলা, সভ্যতা, শালীনতা যেখানে এক শ্রেণীর তরুণের মুষ্টির মধ্যে, যেখানে শহীদ মিনারের পবিত্র পাদপীঠে স্মৃতির তর্পণের পরিবর্তে নোংরামি চলে সেখানে শহীদ দিবস পালনের সার্থকতা

www.pathagar.com

কোথায়। এই দিবসের পবিত্রতাকে এক শ্রেণীর পশুর কুরুচিসম্পন্ন তরুণের অনলে নিক্ষিপ্ত হইতে দিয়া মহান একুশকে অপমানিত করার মধ্যে কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে।”

শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ অপবিত্র হওয়ার ঘটনার তদন্ত হয়নি। কারণ যারা ঘটনা ঘটিয়েছিল বলে শোনা যায়, সেই তরুণদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বললে জিভ টেনে ফেলার হুমকি ছিল।

সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মওলানা ভাসানীর ন্যাপ একটি গানের প্রচারপত্র প্রকাশ করেছিল। ন্যাপের দফতর সম্পাদক আজাদ সুলতান কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রচার সম্পাদক রাশেদ খান মেনন, ৮৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা, কর্তৃক প্রচারিত এ প্রচারপত্রের হুবহু বিবরণ ছিল নিম্নরূপ-

মুক্তি যদি পেতে চাও
ধানের শীষে ভোট দাও।
পেটের জ্বালা মিটবে কিসে
ভোট দিলে ভাই ধানের শীষে।
সবাই ভোট দিওরে ধানের মার্কা দেখিয়া
ধানের ভাত খাইব সবাই সর্বহারাদের লইয়া
ধানের শীষে ভোট দিওরে........।
ধানের পার্টি ধান খাঁটি ধান সবার মূল
ধানের মার্কায় ভোট দিবেন কেউ করবেন না ভুল
ধানে ভোট দিওরে ......।
হাল ছিঁড়েছে পাল ছিঁড়েছে নৌকার মাঝি নাই
মেঘনার চড়ে ঠেকেছে নৌকা ঠেলবার মানুষ নাই।
ধানে ভোট দিওরে ....।
আষাঢ় মাসের ঝড় বন্যায় নৌকা ডুবে যাবে
আর ধানের শীষে বাংলাদেশে সোনার ধান হবে
ধানে ভোট দিওরে ....।
আল্লার বান্দা নবীর উম্মত কুরআনে কয় সমান
শোষণ করা মহাপাপ ভাই সমাজতন্ত্রে সম্মান
ধানে ভোট দিওরে ....।
শ্রমিক লীগ আর মণি সিং স্বার্থবাদের মতো
শ্রমিকের বিশ্বাসঘাতক করবে তারা কত
ধানে ভোট দিওরে ....।
বাংলাদেশে আছেরে ভাই দালাল আর একজন
মীরজাফরের বন্ধুরে ভাই মোজাফফর তার নাম
ধানে ভোট দিওরে ....।
আওয়ামী লীগের রাজনীতি ভাই সুবিধাবাদের নীতি
পুঁজিবাদের গোষ্ঠী তোরা শোষণ করেই খাবে
ধানে ভোট দিওরে ....।
মুজিববাদের পুঁজিবাদ ভাই শোষণবাদ তার সাথে
মুক্তির শপথ নিও ভাই ভাসানীর ঐ পথে

www.pathagar.com

ধানে ভোট দিওরে .....।
গণভবন আর রাজভবন ভাই সাহেব লোকের বাস
মানুষ কাটাইয়া খায় তারা হাজারে হাজার
ধানে ভোট দিওরে ....।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা পেলনা কেউ হাতে
স্বাধীনতা রাশিয়াতে, চীনে, ভিয়েতনামে
ধানে ভোট দিওরে ....।
নিক্সনের নীতি মুজিব চলবে না, বাংলাদেশ
ইন্দিরাপন্থী ছাড়তে হবে সর্বহারার মতে
ধানে ভোট দিওরে ....।
জাতির পিতা ভাসানী ভাই গরিবের বন্ধু
ধানের শীষ তার লাল সালাম কৃষকের দরদী
ধানে ভোট দিওরে ....।
বুধবারের দিন ভোট হবে ভাই ফাল্গুনের তেইশে
ফুলের মালা পড়াবেন সবে ধানের শীষে
ধানে ভোট দিওরে ....।

নির্বাচন সম্পর্কে ভারতের কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'মস্কোপন্থী' সাপ্তাহিক 'সপ্তাহ'-র ২৩ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার পর্যালোচনা রিপোর্টে বলা হয়, 'শেখ মুজিব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে "ভাবী বঙ্গবন্ধু" হওয়ার হাস্যকর প্রত্যাশা অনেক প্রার্থীর কাছেই একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রার্থী জোর-জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগ করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পার হয়ে গেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু ছাড়া যে দশজন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন তাদের অনেকের নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু কিছু বিরোধীদল যে আপত্তি তুলেছেন তার কোন কোন অভিযোগ যে একেবারে ভিত্তিহীন নয় একথা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। হঠকারিতা যেমন ভয়াবহ তেমনি এই বলপ্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শনও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের পক্ষে যে ভয়াবহ ও বিপজ্জনক তা অস্বীকার করে লাভ নেই ..।

মোজাফফর ন্যাপ নেত্রী মতিয়া চৌধুরী ৩ মার্চ ঢাকার এক জনসভায় বলেন, 'গত এক বছরে অবাধ লুটতরাজ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি আর রিলিফ চুরির বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করে আওয়ামী লীগ এবার বঙ্গবন্ধুকে একমাত্র পুঁজি করে জনতার কাছে ভোট চাইতে এসেছে। একদিকে মুখে গণতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে অন্যদিকে আজও "সামনে আছে জোর লড়াই বঙ্গবন্ধু অস্ত্র চাই" বলে আওয়ামী লীগ কর্মীরা ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে চলেছে। এর নাম কি গণতন্ত্র?' ৪ মার্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অভিযোগ করে যে, 'ক্ষমতাসীন দল ত্রাস সৃষ্টি করে নিয়ন্ত্রিত দল ও একদলীয় শাসন কায়েমের চেষ্টা করছে।'

৫ মার্চ দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, 'নিশ্চিত ভরাডুবি জেনে বেসামাল মুজিববাদীরা গতকাল রোববার (৪ মার্চ) সন্ধ্যায় আবার তারাবো বাজারে ন্যাপের নির্বাচনী প্রচার মিছিলের ওপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য ১৫ থেকে ২০ রাউন্ড স্টেনগান ও পিস্তলের গুলি ছোঁড়ে। তারা স্থানীয় ন্যাপ ও ছাত্রী ইউনিয়ন অফিসের মূল্যবান কাগজপত্র, পোস্টার, আসবাবপত্র লুটপাট ও তছনছ করে এবং ন্যাপ ও

www.pathagar.com

ছাত্র ইউনিয়ন অফিসসহ দু'টি কুঁড়েঘরের প্রতীক (উল্লেখ্য, ন্যাপ-মোজাফরের নির্বাচনী প্রতীক ছিল কুঁড়েঘর) অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। মুজিববাদীরা জনৈক ন্যাপ কর্মীর দোকানও লুট করে এবং কর্মচারীদের মারধর করে। ঐ কেন্দ্রে নির্বাচনে 'সংবাদ' পত্রিকার মালিক-সম্পাদক আহমেদুল কবিরও ন্যাপের একজন প্রার্থী ছিলেন।'

৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। একজন প্রার্থীর মৃত্যুর ফলে এবং ১১টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার ফলে ২৮৮ আসনে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল পাঁচটা থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ফলাফল ঢাকার কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুমে আসতে থাকে। সেখানে কর্মরত ছিলেন শত শত সাংবাদিক ও নির্বাচন কমিশন কর্মকর্তাবৃন্দ। রাতে টেলিভিশনে নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ফলাফলে জানা গেল, ন্যাপ-ভাসানীর ডঃ আলীম আল রাজী, আব্দুর রহমান, মশিয়ুর রহমান যাদু মিয়া (জেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন), রাশেদ খান মেনন এবং সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, জাসদের শাহজাহান সিরাজ, মোঃ আব্দুল জলিল এবং আব্দুস সাত্তার, ন্যাপ (মোজাফফর) অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং মোশতাক আহমেদ চৌধুরী, জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান বিপুল ভোটে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। টেলিভিশনে ফলাফল প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে রাত দশটার দিকে সরকারের সর্বোচ্চ জায়গা থেকে টেলিফোনের পর টেলিফোনে নির্দেশ আসতে থাকে তাঁদের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখার জন্য।

এ সম্পর্কে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ তাঁর সারা জাগানো 'শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, '......আওয়ামী লীগ নির্বাচনে ষড়যন্ত্র ও ভীতি প্রদর্শনের পন্থা গ্রহণ করে। দলীয় নেতাকে খুশি করতে গিয়ে এক একজন আওয়ামী লীগ নেতা ভোট সংগ্রহের যুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। নিদারুণ রোষ ও অসহিষ্ণুতার কাছে পদানত আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করতে থাকেন যে, দেশ শাসন করার অধিকার তাদের ছাড়া আর কারও নেই। কাজেই নিজ নিজ এলাকায় নির্বাচনযুদ্ধে তারা গণতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণের কথা বিস্মৃত হয়ে বেপরোয়াভাবে ভোট কারচুপি করে দেখাতে চান যে, তার এলাকায় বাস্তবে বিরোধী রাজনীতির কোন অস্তিত্ব নেই। এ সময় সম্পূর্ণ সরকারি প্রশাসনযন্ত্র ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণে, দৈনিক সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের মতো সংবাদ মাধ্যমসমূহ, সরকারি যানবাহন সরকারের প্রচারণার কাজে নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে সকল রকমের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নির্বাচনে বিজয় সুনিশ্চিত জেনেও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ছিলেন দুর্বিনীত, রোষায়ত, অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ এবং নির্বাচনে যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে তারা প্রচেষ্টার কোনো ঘাটতি দেখাননি.....একথা সত্য যে, বিদ্যমান অবস্থায় তাদের যদি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও দেয়া হতো, তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আসতে পারতো না। কিন্তু এর পরেও তারা যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, তাতে জনমনে ত্রাসের সঞ্চার ঘটে এবং ক্ষমতাসীন দলকে এর জন্য অনেক অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বলাবাহুল্য, আওয়ামী লীগের এই মনোভাব নির্বাচনী প্রচারণার গোটা সময় জুড়ে অব্যাহত ছিল এবং নির্বাচনের দিনে তা চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয়। এ ধরনের প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও প্রায় দুই ডজন আসনে বিরোধীদলীয় প্রার্থী নিশ্চিত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যান। ভোট গণনা শুরু হবার পর কোনো কোনো আসনে স্থানীয় অফিসাররা বিরোধীদলীয় প্রার্থীকে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত বলে ঘোষণাও করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের বিজয়ী

www.pathagar.com

হতে দেওয়া হয়নি। বিরোধীদলীয় নেতাদের মধ্যে টাঙ্গাইলের ন্যাপ ভাসানীর ডঃ আলীম আল রাজী ক্ষমতাসীন মন্ত্রী আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে, জাসদের শাহজাহান সিরাজ আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে, ভাসানী ন্যাপের আব্দুর রহমান মীর্জা তোফাজ্জল হোসেনের বিরুদ্ধে, বাকেরগঞ্জ জাসদের মেজর (অবঃ) জলিল আব্দুল মান্নান ও হরনাথ বাইন-এর বিরুদ্ধে (দু'টি আসনে), ভাসানী ন্যাপের রাশেদ খান মেনন ফজলুল হক ও নূরুল ইসলাম মঞ্জুরের বিরুদ্ধে (দু'টি আসনে), সিলেটে ভাসানী ন্যাপের সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত মন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদের বিরুদ্ধে, কুমিল্লার ন্যাপ (মোজাফফর)-এর অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ক্যাপ্টেন সুজাত আলীর বিরুদ্ধে এবং ভাসানী ন্যাপের মোশতাক আহমদ চৌধুরী এম সিদ্দিকের বিরুদ্ধে বিপুল ভোটে অগ্রগামী ছিলেন। এদের মধ্যে এম.এ. জলিল, শাহজাহান সিরাজ এবং মোশতাক আহমেদ চৌধুরীর নাম টেলিভিশনে বিজয়ী বলে ঘোষণাও করা হয়। এছাড়া আরো কয়েকজন বিরোধীদলীয় প্রার্থী নূরুদ্দিন জাহিদ (জাসদ) কুমিল্লা-৭ আসনে, মোখতার আহমদ (জাসদ) চট্টগ্রাম-১৫ আসনে, এ.কে.এম. হাম্মাদ চৌধুরী (স্বতন্ত্র) নোয়াখালী-১৩ আসনে, নুরুল ইসলাম মাস্টার (জাসদ) নোয়াখালী-৭ আসনে, মোঃ ঈসমাঈল মিয়া (জাসদ) নোয়াখালী-৫ আসনে, আব্দুর রশীদ (স্বতন্ত্র) কুমিল্লা-৯ আসনে, মর্তুজা হোসেন মোল্লা (স্বতন্ত্র) কুমিল্লা-৮ আসনে, ফজলুল হক খোন্দকার (স্বতন্ত্র) ঢাকা-২৪ আসনে, হারুনুর রশিদ ময়মনসিংহ-৪ আসনে, এস.এম.এ সবুর (ন্যাপ-ভাসানী) খুলনা-৩ আসনে এবং আহসান আহমেদ (ন্যাপ-ভাসানী) রংপুর-২ আসনে ভোট গণনায় আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের খুবই কাছাকাছি ছিলেন। তাঁরা এবং আরো প্রায় একডজন বিরোধী প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, নির্বাচনে কারচুপি না হলে এবং আওয়ামী লীগ অসৎ পন্থা অবলম্বন না করলে নিজেদের নির্বাচনী এলাকা থেকে তারা বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করতেন......কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতারা পুরো ঘটনাকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। বিশেষ করে বিশিষ্ট নেতাদের নির্বাচনে পাস করিয়ে আনা ছিল তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দলের নেতারা যুক্তি দেখান যে, আতাউর রহমান খান, মশিয়ুর রহমান, এম.এ. জলিল, শাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন, ডঃ আলীম আল রাজী, মোজাফফর আহমদ, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত প্রমুখ যদি নির্বাচনে জয়লাভ করেন, তা শুধুমাত্র দলের ওপর প্রত্যক্ষ হুমকিই সৃষ্টি করবে না, 'জাতির পিতার' জন্যও তা হবে অবমাননাকর। 'বঙ্গবন্ধু' জীবিত থাকাকালে এবং তিনি দল ও সরকারের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে এ ধরনের পরিস্থিতি তাদের কাছে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। নির্বাচনে যদি উপরোক্ত নেতৃবৃন্দ জয়ী হন তাহলে তা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতাই প্রমাণ করতো এবং পক্ষান্তরে, বিরোধী দলের চূড়ান্ত বিজয় বলেই প্রতিভাত হতো। তাছাড়া বিরোধীদলে এঁরা জিতে এলে সংসদে তাঁদের মুখোমুখি হওয়াও আওয়ামী লীগের পক্ষে কঠিন হতো। আওয়ামী লীগ আরো মনে করে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করে বিরোধীদলগুলোর কয়েকজন নেতা দুর্নাম কুড়িয়েছেন। সাধারণ নির্বাচনে তারাও জয়লাভ করলে তা তো স্বাধীনতার ধারাবিরোধী। তারা মনে করেন, নির্বাচনে গুরুত্ববিহীন কিছুসংখ্যক বিরোধী নেতা জয়লাভ করলে তাতে তেমন কিছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু বিশিষ্ট বিরোধী নেতারা জিতে যাবেন-তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিশেষ করে আব্দুল মান্নান ও আব্দুস সামাদ আজাদের মতো মন্ত্রী পরাজিত হলে তা হতো আওয়ামী লীগের জন্য এক ধরনের বিপর্যয়....বেতার ও টেলিভিশনে নির্বাচনের ফলাফল

www.pathagar.com

প্রচার শুরু হতেই আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তৎপর হয়ে ওঠেন। যখন তারা দেখতে পান যে, আওয়ামী লীগের কয়েকজন প্রথম সারির নেতা বিরোধী কয়েকজন নেতার কাছে পরাজিত হতে চলেছেন, তখন তাদের মাথায় বজ্রাঘাত ঘটে। নির্বাচন নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্বাহ্নে গঠিত কেন্দ্রীয় প্রচার কমিটিকে স্তব্ধ করে দিয়ে গণভবনের একটি কন্ট্রোল রুম নির্বাচন পরিচালনা ও কৌশল পরিনির্ণয়ের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে। যখন পরাজয়ের সম্মুখীন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ব্যাকুলকণ্ঠে বারবার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কন্ট্রোল রুমে আবেদন জানাতে থাকেন, তখন গোটা প্রশাসনযন্ত্র ও রক্ষীবাহিনী বিপন্ন নেতাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। ভোট গণনা ও ফলাফলের প্রবণতা যখন কয়েকজন বিরোধী নেতার সুনিশ্চিত জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছিল, তখন অন্ততপক্ষে ছয়টি নির্বাচনী এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে হেলিকপ্টার পাঠানো হয়। তারা সমস্ত ব্যালট বক্স ছিনিয়ে নেয় এবং পূর্বেই ব্যালট পেপার ভর্তি বাক্স সেগুলোর পরিবর্তে নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোতে রেখে আসে......।'

নির্বাচন সম্পর্কে দৈনিক সংবাদ, দৈনিক গণকণ্ঠের প্রতিবেদন সন্ত্রাস, গুণ্ডামী, নির্যাতন, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, পোলিং এজেন্ট প্রহৃত, অপহৃত, খুন প্রভৃতি খবর দেয়। ৮ মার্চের দৈনিক সংবাদ-এর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কয়েকটি খবরের শিরোনাম ছিল-

সিলেট-১ কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাই;
পটুয়াখালীতে ব্যালট পেপার ছিনতাই;
ঘটনাস্থল চট্টগ্রামঃ ৩১ খানা ব্যালট পেপারসহ ২ ব্যক্তি গ্রেফতার;
ধামরাইতে রক্ষীবাহিনী সন্ত্রাস চালিয়েছেঃ আমেনা;
ঢাকা শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রসহ দেশের নানা স্থানে বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে।
নির্বাচন দারুণ অবাধ হয়েছে, একজনে একাধিক ভোট অবাধে দিতে পেরেছে;
জাসদ-এর দু'জন হাইজ্যাক;
ঢাকায় একটি কেন্দ্রে সংঘর্ষ, একটি কেন্দ্রে গুলি;
পটিয়ার ভোট সশস্ত্র লোকেরাই দিয়েছে?;
কুমিল্লা শহরে ব্যাপক সন্ত্রাসঃ নির্বাচন প্রহসনে পরিণত;
কালিগঞ্জেও সন্ত্রাস চলছে;
রাজশাহীর ভোটকেন্দ্রে সন্ত্রাস, 'ভোটনাট্যের দু'টি দৃশ্য প্রভৃতি।

চূড়ান্ত নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেল ক্ষমতাসীন দল ৯৩.৩ শতাংশ অর্থাৎ ২৯৩ আসন, অন্য ৭টি আসনে বাংলাদেশ জাতীয় লীগের প্রধান ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক চীপ মিনিস্টার আতাউর রহমান খান, রাজশাহী-২ থেকে জাসদের প্রার্থী ময়েন উদ্দিন আহমেদ মানিক, জাসদের আব্দুস সাত্তার, চাঁদপুর থেকে নির্বাচিত স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল্লাহ সরকার (পরবর্তীতে তিনি জাসদে যোগ দেন), ব্যারিস্টার মোঃ সালাহ উদ্দিন (পরে তিনি ভাসানী ন্যাপে যোগ দেন), চাউ খোয়াই রোয়াজা এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বিজয়ী হন। ১,৮৪,৬৫,০০০ টি ভোট পড়ে। ৫৫ শতাংশ ভোটের মধ্যে ভাসানী ন্যাপের প্রার্থী ১০, ০২,৭৭৭টি ভোট পান। জাসদ এবং মোজাফফর ন্যাপও ভাল ভোট পায়। মোজাফফর ন্যাপের কয়েকজন যোগ্য প্রার্থী অনেক ভোট পেলেও সুপরিকল্পিতভাবে তাদের পরাজয়বরণ করানো হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাদে অন্যত্র যারা নির্বাচিত হন তাদের প্রতি সরকারি দল বিশেষ মনোযোগ না দেওয়ায় তারা ভাগ্যচক্রে উত্তীর্ণ হন, কারচুপির বন্যায় ভেসে যাননি।

www.pathagar.com

নির্বাচনী সন্ত্রাস ও কারচুপি সম্পর্কে আবু জাফর মোস্তফা সাদেক লিখেছেন '.....৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচনে "ঢাকার একটি কেন্দ্রে সংঘর্ষ, জাসদের দুই জন হাইজ্যাক', ধামরাইতে রক্ষীবাহিনী সন্ত্রাস চালিয়েছে, কালিগঞ্জেও সন্ত্রাস চলছে, সিলেট-১ কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, পটুয়াখালীতে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, কুমিল্লা শহরে ব্যাপক সন্ত্রাস, নির্বাচন প্রহসনে পরিণত, রাজশাহী ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাস ইত্যাদি'র" মধ্য দিয়ে মুজিব সরকার ক্ষমতাসীন হয়। ভোটের পর অনেকটা প্রকাশ্যেই শুরু হয় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী/ জয় বাংলা বাহিনী/লাল বাহিনী/ আওয়ামী যুবলীগসহ বিভিন্ন বেসামরিক ও আধা সামরিক, যথাঃ রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের বিরোধীদলীয় কর্মী গুম, ব্যাংক ডাকাতি, লুট, খুন, নারী হাইজ্যাক ও ধর্ষণের এক বিভীষিকাময় রাজত্ব।' (বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন, পৃষ্ঠা. ৭৫)

৮ মার্চ নির্বাচনে কারচুপি ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সমস্ত দেশে প্রতিক্রিয়া ও সমালোচনার ঝড় ওঠে। নির্বাচনের দিন প্রদত্ত 'বাংলাদেশে কোন বিরোধীদল নেই' প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তির প্রতিবাদে সকল রাজনৈতিক দল ক্ষোভে ফেটে পড়ে। মওলানা ভাসানী তখন পিজিতে চিকিৎসাধীন। তাঁর অনুপস্থিতিতে দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ রাজী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, '.....প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তির মাধ্যমেই সহজে অনুমান করা সম্ভব যে, নির্বাচনে কিভাবে ভয়ভীতি, সন্ত্রাস ও কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন প্রার্থীদের বিজয়ী করা হয়েছে.....লালবাগ-রমনা আসনে প্রতি মিনিটে তিনটি করে ভোট পড়েছে, এটা কি করে সম্ভব?.....দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রতি ১৮ সেকেন্ডে ১টি করে ভোট দিয়ে সরকারি দলের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। এ কি সম্ভব? একটি ভোট দিতে কত সময় লাগে?

৯ মার্চ ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ ভট্টাচার্য এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, 'কমপক্ষে ৭০টি আসনে ন্যাপ ও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সুনিশ্চিত বিজয়কে শাসকদল ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে এবং বিরোধী প্রার্থীদের জোর করে পরাজিত করেছে.....ঐ সকল আসনে শাসকদল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার, অস্ত্রের ঝনঝনানি, ভয়ভীতি, সন্ত্রাস প্রয়োগ, গুণ্ডাবাহিনী ব্যবহার, ভূয়া ভোট, পোলিং বুথ দখল, পোলিং এজেন্ট অপহরণ, বিদেশি সাহায্য সংস্থা, জাতিসংঘ, সরকারি গাড়ি ও রেডক্রসের গাড়ির অপব্যবহার প্রভৃতি চরম অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের মাধ্যমে উক্ত নির্বাচন কেন্দ্রসমূহে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে এবং বিরোধীদলের প্রার্থীদের জোরপূর্বক পরাজিত করেছে।'

নির্বাচনে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝে জাসদ দুটি সিটে জয়লাভ করে এবং একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য জাসদে যোগদান করায় জাসদের সংসদে সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায়-৩। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাসদের বাঘা বাঘা নেতার বিজয়কে ছিনতাই করে। জাসদের সভাপতি মেজর জলিল, ইঞ্জিনিয়ার রসিদ, জাসদের সহ-সভাপতি ডাঃ আজহার উদ্দিন, চাঁপাইনবাবগঞ্জের এহসান আলী খানসহ অসংখ্য জাসদ নেতার বিজয়কে ছিনিয়ে নেয়া হয়।

৯ মার্চ জাসদের এক সাংবাদিক সম্মেলনে মেজর জলিল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যেভাবে নির্বাচনের সময় প্রচলিত কোনো ন্যায়নীতির তোয়াক্কা না রেখে সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠায় মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, এতে তাকে

www.pathagar.com

আমি জাতির পিতা বলতে ঘৃণাবোধ করি।' তিনি বলেন, 'নির্বাচনের দিন গণভবনেই নির্বাচনী কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয়েছিল এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বিরোধীদলের প্রার্থীরা যখন ভোট গণনায় এগিয়ে যাচ্ছিল তখন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই অকস্মাৎ বেতার-টেলিভিশনে এই সকল কেন্দ্রের ফলাফল প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সন্দেহজনক দীর্ঘ সময় পর নিজেদের পছন্দমত হিসাব অনুযায়ী ভোটের সংখ্যা প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।' মেজর জলিল আওয়ামী লীগ সরকারকে সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের তাঁবেদার বলে অভিহিত করে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়কে হিটলার, মুসোলিনী, চিয়াং কাইশেকের বিজয়ের সঙ্গে তুলনা করেন।

১০ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময়, নির্বাচনের দিন ও ফলাফল ঘোষণার পর তার নির্বাচনী এলাকা ধামরাইয়ের সংঘটিত আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ কর্মী ও রক্ষীবাহিনীর সার্বিক সন্ত্রাসকে 'দুঃস্বপ্নের কালোরাত্রি' বলে অভিহিত করেন।

একইদিনে সকালে কোটালীপাড়ার টুকুরিয়া গ্রামে চালানো হয়েছিল এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। একজন সংসদ সদস্য প্রার্থীসহ ৫জনকে খুন এবং বেশ ক'জনকে গুম করে ফেলা হয়। এ প্রসঙ্গে গণকণ্ঠ ১১ মার্চ সংখ্যায় লিখেছে, 'শনিবার সকালে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি কয়েকজন নেতা কোটালীপাড়া থেকে গোলাপগঞ্জ যাচ্ছিলেন। তারা যখন টুকুরিয়া গ্রামে পৌছেন তখন চারদিক থেকে বেশ বড় একটা দুর্বৃত্তদল তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুর্বৃত্তদের আকস্মিক আক্রমণে তারা হতভম্ব হয়ে যান। ইতিমধ্যে দুর্বৃত্তরা তাদের হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলে দেয়। তারপর চলতে থাকে নির্দয়ভাবে লাঠিপেটা। এই বর্বরোচিত আক্রমণে ঘটনাস্থলেই চারজন মারা গেছেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ফরিদপুর-২ থেকে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনের মোজাফফর-ন্যাপ প্রার্থী শ্রী কমরেশ চন্দ্র দেবজ্ঞ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় নেতা ওয়ালিউর রহমান লেবু, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা লুৎফুর রহমান মানিক ও শ্যামল ব্যানার্জি। এছাড়াও অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন।'

১১ মার্চ যুবলীগের নূরে আলম সিদ্দিকী এক সমাবেশে বলেন, '৭ মার্চের নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, তারা রাজাকার, আলবদর। স্বাধীনতার শত্রু এইসব বিদেশি চরদের মুজিববাদের নিড়ানি দিয়ে উৎখাত করা হবে।' তার এই উক্তির বিরুদ্ধে তখন সরকার থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে অভিনন্দন জানানো হয়।

১২ মার্চ ভাসানী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক কাজী জাফর আহমদ ঘোষণা করেন, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ তার ১৫ দফা দাবি আদায়ের জন্য গণ-আন্দোলন শুরু করবে। একইদিনে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে শেখ ফজলুল হক মনি মুজিববাদ বিরোধীদের উৎখাত করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনার কথা ঘোষণা করেন।

নির্বাচনে ব্যাপকভাবে জয়লাভ আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র রাজনৈতিক শক্তিই বৃদ্ধি করেনি, নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের সরকার পরিচালনায়ও লাভ করে একচ্ছত্র অধিকার। দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের আচরণেও এ ধরনের মানসিকতার স্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হতে থাকে। নির্বাচনে যা হয়েছে, তারজন্য দুঃখ প্রকাশ না করে পক্ষান্তরে তারা চলতে থাকেন উল্টো পথে। নির্বাচনের পর মাত্র একমাস সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগ দেশের শিল্পাঞ্চলগুলো থেকে অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের

www.pathagar.com

নেতা ও কর্মীদের বহিষ্কারের অভিযান চালায়। তাদের যুক্তি ছিল, 'আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে এবং সরকার শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। এমতাবস্থায় দেশের অন্য কোনো ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রয়োজন নেই।'

৫ এপ্রিল শ্রমিক লীগ টঙ্গী শিল্প এলাকায় বামপন্থী দলের শ্রমিক সংগঠন বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের ওপর প্রথমবারের মতো সরাসরি আক্রমণ চালায়। এতে কয়েকজন শ্রমিক নিহত হন ও অসংখ্য শ্রমিককে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। ইতিমধ্যে শ্রমিক ফেডারেশনের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় পৌঁছে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করলে শেখ মুজিব তাদের প্রতি সুবিচারের নিশ্চয়তা দেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে, শ্রমিক লীগের এক বৈঠকে 'পথভ্রষ্ট' শ্রমিক নেতাদের খতম করে দেশের সমস্ত শিল্প এলাকা থেকে তাদের বহিষ্কার করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। এর আগেই শ্রমিক লীগের নেতা আব্দুল মান্নান 'লাল বাহিনী' গঠন করেছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকারকে সাহায্য করাই ছিল এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য। শিল্প এলাকা থেকে 'খারাপ লোকদের' বহিষ্কার এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে 'দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের' অপসারণ ছিল এর প্রধান কাজ। অবশ্য প্রায়ই তারা ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত করে শিল্পখাত অতিক্রম করে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ব্যক্তিজীবনেও হস্তক্ষেপ করতে থাকে। ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতায় এদের শক্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলে রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পখাতগুলোর জন্য যে, শৃঙ্খলা ছিল অতি প্রয়োজনীয়, ক্রমশ সেই শৃঙ্খলার ভিত ধসে যেতে থাকে। দেশের বহুস্থানে নিরীহ শ্রমিকরা এদের হাতে নির্যাতিত হতে থাকে। নিজেদের কর্তৃত্ব প্রকাশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে তারা শ্রমিকদের স্থানীয়-অস্থানীয় এই দুই শিবিরের মধ্যে বিভক্ত করে ফেলে। শ্রমিকদের মধ্যে আঞ্চলিকতাবাদের বিষবাষ্প সঞ্চারিত হয়। এর আগেই প্রথমে টঙ্গী ও পরে কালুরঘাট ও সর্বশেষ চট্টগ্রামের বাড়বকুণ্ডে অবস্থিত আর আর পাট ও বস্ত্রকলে কয়েকজন শ্রমিককে হত্যা করা হয়। তাদের বেশিরভাগই চট্টগ্রামের বাইরের জেলাগুলো থেকে বছরের পর বছর ধরে কাজ করেছিলেন। এভাবে বাহিনী সদস্যদের মাধ্যমে দাঙ্গা বেঁধে উঠতে থাকে এবং বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব শ্রমিক লীগ বা এর পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্তদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীর অনশন

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দেশে যখনই দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সেটা উঠেছে দেশের অভাব-অভিযোগের সুযোগ নিয়েই। আর তা হয়েছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়ই। মুজীবি শাসনে একটা স্থায়ী কায়েমী স্বার্থবাদী দল গড়ে ওঠে। পাকিস্তানের জাঁদরেল শাসক আইয়ুব শাহীর শাসন দিবসে পল্লী উন্নয়নের নামে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি হাতে নিয়ে এর জন্য বরাদ্দকৃত সমস্ত অর্থই তিনি তখন বিডিদের হাতে তুলে দেন। বিডিদের হাতে এ টাকাটা সরাসরি সরকারি তহবিল থেকে আসত না। আসত এস.ডিও এবং সিও-এর হাতে ঘুরে। বিডিদের কাজের তদারক করার ভার ছিল সুপারভাইজারদের উপর। কিছুদিন পর তারা সবাই এক ঘরের লোক হয়ে যায়। এ সুযোগে অচিরেই পল্লী উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রামে গ্রামে দুর্নীতি উন্নয়নের কর্মসূচিতে পরিণত হয়ে যায়। ফলে দুর্নীতি তখন গ্রামের মাটিতে জন্ম নিয়ে শহর-বন্দর ঘুরে সোজা উপরের তলায় চড়ে আস্তে আস্তে বেশ সেয়ানা হয়ে উঠে। শেষের দিকে আইয়ুব খান ছিলেন এসব সেয়ানা দুর্নীতিবাজ চাটুকারদেরই একচেটিয়া প্রেসিডেন্ট। মুজিব সরকারের আমলেও আইয়ুবের মতো সমাজে দুর্নীতি প্রবেশ করে। বিদেশিদের পাঠানো বিভিন্ন রকমের রিলিফ দ্রব্য ও সাহায্য বিতরণ না করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের বুভুক্ষু মানুষের বুকের উপর পা দিয়ে করা হয় দুর্নীতি।

মুজিব সরকারের এক সময়ের একজন সাধারণ কর্মী যিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে পর্যন্তও শহরের ফুটপাতে বসে তৈল-নুন বেচে খেতেন স্বাধীন হওয়ার পর সামান্য ওয়ার্ড চেয়ারম্যান হয়ে রিলিফ দ্রব্য বিতরণের সুযোগ পেয়ে মাত্র কদিনের মধ্যেই তাকে দেখা যায় রীতিমত বিত্তবান সেজে নিজ গাড়িতে করে বুক ফুলিয়ে শহরময় ঘুরে বেড়াতে। শহর ও শহরতলীর একজন আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন চেয়ারম্যান যাকে স্বাধীন হওয়ার আগে মুদী দোকানে দেনা শোধ করার ভয়ে লুকিয়ে বেড়াতে দেখা গেছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাত্র ক'দিনের মধ্যেই তাকে দেখা যায় জীপ গাড়ি কিনে বাড়িতে প্রাসাদ বানিয়ে ক্রমে ক্রমে আশপাশের পাড়াসুদ্ধ কিনে ফেলার চেষ্টা করতে। আওয়ামী লীগের একজন ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান যে সামান্য চাকরি করে শহরে একটা একচালা ঘরের ভাড়াও ঠিকমত যোগাতে পারত না, তাকে দেখা যায় পাকা বাড়িতে থেকে রাস্তায় স্বীয় দামী জীপ হাঁকিয়ে চলতে। ইউনিয়নের এক জনসাধারণ কর্মকর্তাকেও দেখা যায় নিজের কেনা ট্যাক্সীতে করে চলাফেরা করতে। শত্রু সম্পত্তি হিসেবে পরিচিত পরিত্যক্ত ছোটখাট কল-কারখানা ও দোকানপাট দখল করে আওয়ামীরা রাতারাতি অনেক কিছুর মালিক হয়েছে। সরকার মনোনীত এক শ্রেণীর প্রশাসককে দেখা যায়, কলকারখানা চালাবার নামে নানা রকমের দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে স্বনামে-বেনামে লাখ লাখ টাকার মালিক হতে। *(সূত্রঃ আওয়ামী লীগের ভরাডুবি কেন? এ,কে, এম, সিরাজুল ইসলাম, জুলাই–১৯৭৯)*

বিশ্ববাসী বাংলাদেশের নতুন সরকারকে বুদ্ধি ও সাহায্য সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসলেও মুজিব এসব কিছুকে সাদরে গ্রহণ করে সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারেনি। এতে তাড়াতাড়ি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দেশ-বিদেশে সমালোচনার ঝড় উঠে। জাতিসংঘ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে জনগণের জন্য যে সমস্ত রিলিফ ও

www.pathagar.com

সাহায্য সামগ্রী এসেছিল এগুলোর সুষ্ঠু বিতরণের সুবিধার জন্য শহর-বন্দর ও গ্রাম-গঞ্জের প্রতিটি পাড়ায় ও মহল্লায় দলবল নির্বিশেষে সকল সৎ সমাজ কর্মীদেরকে নিয়ে রিলিফ কমিটি গঠন করা হবে বলে আশা করা গিয়েছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ তা না করে বিতরণ ব্যাপারটাকেও নিজ দলের মধ্যেই রেখে দেয়। এতে অনেকে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়ার ষোল আনা সুযোগ পেয়ে যায়।

সরকার সমর্থকদের সরকারি আনুকূল্য লাভ এমনকি এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, পরিত্যক্ত শিল্প ইউনিটগুলো জাতীয়করণের নামে সরকার সমর্থকদের হাতে তুলে দেয়া হয়। ত্রাণসামগ্রী নিয়ে দুর্নীতিও রীতিমতো ইতিহাস সৃষ্টি করে। সরকার সমর্থকরা ইচ্ছেমতো নিজেদের বাহিনী গড়ে তোলে। ফলে গোটা দেশকে এক অরাজক অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়। শিল্প খাতগুলো লোকসান দিতে শুরু করে, মুদ্রাস্ফীতি আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বল্গাহীন ঘোড়ার মতো ছুটতে থাকে (জানুয়ারি থেকে অক্টোবর ১৯৭২-এ ১০ মাসে মূল্যসূচক ২০৮ থেকে ২৯৭-এ গিয়ে পৌঁছে) এবং চোরাচালানী রীতিমতো বৈধ ব্যবসা বলে গণ্য হতে শুরু করে। ব্যবসা-বাণিজ্যে কি পরিস্থিতির সূচনা হয়েছিল তার একটি প্রমাণ মেলে বাণিজ্যমন্ত্রীর নিজস্ব বক্তব্যেই। ১১ মে, ১৯৭৩ বাণিজ্যমন্ত্রী কামরুজ্জামান বলেন, আমদানির জন্যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ২৫,০০০ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫,০০০ প্রতিষ্ঠানই ভূয়া (দৈনিক বাংলা, ১২ মে, ১৯৭৩)। অপর এক হিসাবে দেখা যায় যে, মোট লাইসেন্সপ্রাপ্ত ২৯০৪৪ জনের মধ্যে ১৪০০০-ই ভূয়া বলে ১৯৭৩ সালে সনাক্ত করা হয়। ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর নতুন শ্রমনীতি ঘোষণা করা হলেও শ্রমিক লীগের চাপের মুখে তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি চমৎকার চিত্র পাওয়া যায় ১৯৭৩ সালের জুন মাসে সংসদে বাজেটসংক্রান্ত আলোচনায় সরকারি দলের সদস্য আব্দুল কুদ্দুস মাখনের ভাষণে। তিনি বলেছিলেন, 'বাজারের ওপর সরকারের কর্তৃত্ব নেই, আছে মুনাফাখোরদের, চোরাচালানীদের।' এরই পাশাপাশি দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে অভাবিত রকমের। হত্যা, লুট, ছিনতাই নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। একমাত্র ১৯৭২ সালেই ৩১টি ব্যাংক লুট হয় এবং অন্ততপক্ষে ১৭৩৪১টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে (গণকণ্ঠ, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৭৩)। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই সংসদে স্বীকার করেন যে, স্বাধীনতার প্রথম ১৬ মাসে ২০৩৫টি গুপ্ত হত্যার ঘটনা ঘটেছে। (ইত্তেফাক, ৭ জুলাই, ১৯৭৩)। প্রথম ১৮ মাসে অন্তত ৪০০ টি আগ্নেয়াস্ত্র লুটের ঘটনা সরকারের গোচরে আছে বলে সংসদে জানানো হয় (গণকণ্ঠ ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪)। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮ দিনের ২০ জন আওয়ামী লীগ নেতা আততায়ীর হাতে নিহত হন। (ইত্তেফাক, ২ মার্চ, ১৯৭৩) *(সূত্রঃ শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, আলী রিয়াজ, জুলাই ১৯৮৭)*

জাতির সংকটকালীন সময়ে মানুষের খাদ্যের দাবিতে মওলানা ভাসানী অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ৫ মে, ১৯৭৩ সন্তোষে অনুষ্ঠিত ন্যাপের কার্যনির্বাহী পরিষদের এক জরুরি সভায় মওলানা ভাসানী ৯১ বছর বয়সে অনশন পালনের কর্মসূচির মূল বক্তব্য অর্থাৎ ঐতিহাসিক তিন দফা দাবিনামা ঘোষণা করে বলেন, '১৫ মে থেকে তিনি সন্তোষে নিজ বাড়ির পরিবর্তে ঢাকায় দলের কেন্দ্রীয় দফতরে আমৃত্যু অনশন শুরু করবেন।' মওলানা ভাসানী তিন দফা ছিল নিম্নরূপঃ

খাদ্য, বস্ত্র ও দ্রব্যমূল্য হ্রাসের দাবি

(ক) গ্রামাঞ্চল-শিল্পাঞ্চলসহ সর্বত্র পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রথা চালু করতে হবে। ন্যায্যমূল্যে চাল, সরিষা, তেল, কাপড় ও ওষুধ এ পাঁচটি জিনিস সরবরাহ করতে হবে। জনগণের ক্রয়

www.pathagar.com

ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য করে ক্রয়মূল্য বেঁধে দিতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারকে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

(খ) প্রত্যেক ইউনিয়নে টেস্ট রিলিফের কাজ করা, খালকাটা, পুকুর সংস্কার, জঙ্গল ও আবর্জনা পরিষ্কার প্রভৃতি কাজ করিয়ে প্রত্যেককে ৫ সের গম, ১ সের চাল, ৪ ছটাক ডাল ও ১ ছটাক লবণ দিতে হবে।

(গ) যে সমস্ত দুর্গত মানুষ কাজ করতে অক্ষম তাদের জন্য প্রত্যেক এলাকায় লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) ঘূর্ণি দুর্গত এলাকায় খয়রাতি সাহায্য, গৃহ নির্মাণের বাঁশ, কাঠ, ছন, টিন ও কৃষিঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) খাদ্য ও অন্যান্য সম্পদ পাচার বন্ধ করার জন্য চোরাচালান নিরোধের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(চ) সরকারি ও বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিম্ন পদস্থ কর্মচারী ও শিল্প শ্রমিকদের বর্তমান দ্রব্যমূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বেতন বৃদ্ধি করার কথা অবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে।

(ছ) জেলখানার কয়েদীদের একবেলা ভাত ও একবেলা রুটি খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করতে যদি সরকার না পারে তাহলে তাদের মুক্তি প্রদান করতে হবে।

(জ) স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার বেতন ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ছয় মাসের জন্য মওকুফ করে দিতে হবে এবং সমপরিমাণ অর্থ স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে হবে।

দমননীতি বন্ধের দাবি

(ক) বাংলাদেশের সর্বত্র ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ সকল বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে গুম, খুন, প্রকাশ্য হত্যা এবং অন্যান্য ফ্যাসিবাদী ধরনের যে সমস্ত নির্যাতন চলছে তা বন্ধ করতে হবে এবং প্রেসনোটের মাধ্যমে সরকারকে এ ব্যাপারে জবাব প্রদান করতে হবে।

(খ) ন্যাপসহ যে সকল বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী এবং এই সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমর্থক যে সমস্ত সাধারণ নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের বিনা শর্তে মুক্তি প্রদান করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

(গ) প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার নং ৫০ ধারা বাতিল করতে হবে।

(ঘ) শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের ইচ্ছানুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে এবং সন্ত্রাস বন্ধ করে শিল্পে ফিরিয়ে আনতে হবে যাতে শ্রমিকরা নির্ভয়ে-নির্ভাবনায় জাতীয় উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

শিল্প ব্যবসা চাকরি ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে অরাজকতার অবসান ও জানমালের নিরাপত্তার দাবি

(ক) অবিলম্বে লাল-বাহিনী, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও সকল প্রকার বেসরকারি বাহিনী নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে এবং জনজীবনের নিরাপত্তা ফিরিতে আনতে হবে।

www.pathagar.com

(খ) সাধারণ ব্যবসায়ী ও আইনানুগ নাগরিক প্রশাসনিক কর্মচারীদের ওপর সকল প্রকার জুলুম ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

(গ) রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে নিরপেক্ষ করার সুস্পষ্ট আশ্বাস দিতে হবে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব প্রশাসনিক বিভাগকে নিতে হবে।

একই সভায় দ্রব্যমূল্য জনগণের আয়ত্তে আনার লক্ষ্যে আন্দোলনের অংশবিশেষ হিসেবে ১৫ মে থেকে সারাদেশে খাদ্যের দাবিতে সভা, ভুখা মিছিল, ঘেরাও, শোভাযাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে গণআন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার এক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অনশন শুরু করার পূর্বে ১৪ মে ঢাকার পল্টন ময়দানে ন্যাপ আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে ও ইংরেজি সাপ্তাহিক হলিডেতে প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে মওলানা ভাসানী ১৫ মে'তে ঘোষিত তাঁর আমৃত্যু অনশনের কথা পুনরুল্লেখ করে বলেন, 'যুবক হয়ে বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে গিয়ে জনসভা করে সরকারের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইবার ক্ষমতা আমার নেই। তাই আমি অনশন ধর্মঘট করে দেশের মানুষের মনে বিদ্রোহের দাবানলটা জ্বালাইতেছি।'

একই সময় তিনি একটি বিশেষ বুলেটিন-এর মাধ্যমে ঘোষিত অনশনের যৌক্তিকতা ব্যাখা করেন। বিশেষ বুলেটিনটির হুবহু বিবরণ ছিল এরূপঃ

অনাহারক্লিষ্ট মানুষের বাঁচার দাবিতে মওলানা ভাসানীর

অনশনের বিশেষ বুলেটিনঃ টেলিগ্রাম

প্রতিদিন আমার নিকট লোক মারফত ও চিঠিপত্র জরিয়তে জানিতে পারিতেছে যে, বাংলাদেশের বহু গ্রামে অসংখ্য লোক খাদ্যের অভাবে মারা যাইতেছে। ধানের মণ ৬৬ টাকা, চিনি ৫২ টাকা, মিঠা আলু ২৭/২৮ টাকা তদুপরি হিন্দুস্থানের ছাপানো নোট গরিব লোকেরা ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইতে না পারিয়া শতকরা ১০/১২ টাকা বাট্টা দিয়া মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ভাঙ্গাইতেছে। গ্রাম-বাংলার আটারকল মবিল, ডিজেলের অভাবে বন্ধ হওয়ায় গম পাটায় বাটিয়া খাইতেছে। কাপড় ক্রয় করা গরিব ভূমিহীন মজুর, রিক্সাওয়ালা, টাঙ্গা চালক, পিয়ন, আর্দালী, গরিব কর্মচারী প্রভৃতি মেহনতি মানুষ বড় বড় জোতদার বাদে সমস্ত কৃষক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া মারা যাইতেছে।

আমার বয়স ৯১ বছর তদুপরি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইয়া ভীষণ কষ্ট পাইতেছি। বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করিয়া, সভা-সমিতি করিয়া কোটি কোটি মরণাপন্ন মানুষের বাঁচার দাবি সরকারের নিকট হইতে আদায় করা আমার পক্ষে মোটেও সম্ভব নহে। তাই আল্লাহকে ভরসা করিয়া নিম্নলিখিত দাবি আদায়ের জন্য ইনশাআল্লাহ আগামী ১৫ই মে হইতে সন্তোষে আমার বাড়িতে আমরণ অনশনব্রত আরম্ভ করিব। দুনিয়ার শান্তিকামী ও মানবদরদী ভাই-বোনেরা আমার জন্য দোয়া করিবেন। আমি যেন বুভুক্ষু মানুষের প্রাণ বাঁচানোর সংগ্রামে নিজের জীবন দিয়া ঈমানের সাথে মরিতে পারি। আমার জীবনের শেষ আশা 'ইসলামী সমাজতন্ত্র', 'সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের শেষ কাজ' দেখিয়া মরিতে পারিলাম না। দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষের কাছে আমার ফরিয়াদ রহিল আমার

www.pathagar.com

মৃত্যুর পর আপনারা দেশের বা যে ধর্মের, যে মতের লোকই হন না কেন আমার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিলে কবরে গিয়া আসানে থাকিতে পারিব।

সরকার ও দেশের বিত্তশালী লোকদের নিকট আমার দাবি

(১) অতি সত্বর প্রত্যেক বড় ইউনিয়নে ৪টি এবং ছোট ইউনিয়নে ২টি করিয়া লঙ্গরখানা খুলিয়া দুস্থ লোক যাহারা কাজকর্ম মোটেই করিতে পারেন না তাহাদের একবেলা রুটি ও একবেলা খিচুড়ি খাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক ইউনিয়নে টেস্ট রিলিফের কাজ যথাঃ খাল কাটা, পুকুর সংস্কার, জঙ্গল ও আবর্জনা পরিষ্কার ইত্যাদি কাজ করাইয়া প্রত্যেক মজুরকে ৫ সের গম, ১ সের চাউল, ৪ ছটাক ডাল এবং ১ ছটাক লবণ দিতে হইবে।

(৩) যে সকল এলাকায় ঘূর্ণিবাত্যা ও প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে ঘর-দরজা, ধান, পাট, আম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি ফসল এবং ফলমূল ধ্বংস হইয়াছে সেইসব এলাকায় খয়রাতি সাহায্য, গৃহ নির্মাণের জন্য বাঁশ, কাঠ, ছন, টিন ও কৃষি ঋণ দেওয়ার অতি সত্বর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) জেলাখানায় রাজনৈতিক বন্দি ও সাধারণ কয়েদীরা প্রায় তিন সপ্তাহ যাবত শুধু রুটি খাইয়া কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগকে ১ বেলা ভাত ও ১ বেলা রুটি খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যথায় মুক্তি দিতে হইবে।

(৫) স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন তাহাদের অভিভাবকগণ মোটেই চালাইতে পারিতেছে না। তাই আগামী তিন মাসের বেতন মাফ দিয়া প্রত্যেক স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সমপরিমাণ অর্থ সাহায্য দিতে হইবে।

ইহা আল্লাহর গজব নহে। বিশ্বাসঘাতক, দুর্নীতিবাজদের (ও গোপন ৭ চুক্তির) পাপের ফল

রিলিফ চোর, পারমিট শিকারী, চোরাকারবারী, ধর্মবিরোধী ও বর্তমান অপদার্থ সরকারের স্বজন-প্রীতি, দুর্নীতির পাপে বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে আল্লাহর গজব নামিয়া আসিয়াছে। ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইলসহ বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড়, শীলা বৃষ্টিতে অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে। গৃহহারা হইয়াছে, ফসল নষ্ট হইয়াছে এবং মহামারীর আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ কি? বাড়িতে আগুন লাগিলে যদি মসজিদও থাকে তাহাও রেহাই পায় না।

সরকারের সীমাহীন পাপাচারের ফলে দেশে যে আগুন লাগিয়াছে তাহার হাত হইতে নিরীহ জনসাধারণ রক্ষা পাইতেছে না। চরম খাদ্য ও বস্ত্রাভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভারতের ছাপানো নোট বদলাইতে অদক্ষতা এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা নদীর পানি প্রতিদিন ৩/৪ হাত করিয়া বাড়ার ফলে কৃষকদের তিল, কাউন, ইরি, বোরো প্রভৃতি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। সমগ্র বাংলাদেশ আজ ভারতের চোরাকারবারী, মুনাফাখোর মাড়োয়ারীদের চারণ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। শকুনের মতো এই রক্ত শোষকের দল বাংলাদেশের বুকে ঝাঁকে ঝাঁকে নামিয়া আসিয়াছে। বাংলার সম্পদের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত চুষিয়া খাওয়ার জন্য ইহারা যে গভীর চক্রান্ত করিয়াছে দেশের বর্তমান ক্ষমতালোভী সরকার তাহা মোকাবেলা করার পরিবর্তে গোপন ৭টি চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ হইতে যাহাতে আন্তর্জাতিক চোরাকারবারের পারদর্শী মাড়োয়ারী গোষ্ঠী বিনা বাধায় সমস্ত সোনা-রূপা, তামা-কাঁসা,

www.pathagar.com

পাট, ধান-চাউল ভারতে লইয়া যাইতে পারে তাহার জন্য দেশ তাহাদের নিকট বন্ধক দিয়াছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বাংলার শতকরা ৮৬ জন মুসলমানের ধর্ম ইসলামের সার্বজনীন আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। ইহাদের পাপেই আজ বাংলাদেশে আল্লাহর গজব নাজেল হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, এই দালালের দল বাংলার করুণ অবস্থার জন্য দায়ী। চোরাকারবারী, মোনাফাখোরদের প্রতিভূ বাংলাদেশ সরকার এবং ভারতের শোষকদের নির্মূল শোষণের ফলেই ৭ কোটি বাঙালির জীবনে হতাশার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। উহার দায়িত্ব শুধু সরকারের কাঁধে ফেলিয়া ভারত দোষ ঢাকার অপচেষ্টা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার জন্য হিন্দুস্থানের শোষক এবং বাংলাদেশের পুতুল সরকার ও দুর্নীতিপরায়ণ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উভয়ই সমানভাবে দায়ী।

নির্বাচনের আগে আমি ভারতের ছাপা নোটের একই নাম্বারের কোটি কোটি নোট বাংলাদেশে চালু রহিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিলেও সরকার তখন উহা অস্বীকার করিয়াছিল। দেশের চরম সর্বনাশ ঘটানোর পর আজ মুজিব সরকার উহা বাতিলের নির্দেশ দিয়াছে কেন তাহা সকলের জানা আছে। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষ আজ ব্যাঙ্কে টাকা বদলাইতে যাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সরকার হিন্দুস্থানে যে পরিমাণ টাকা ছাপাইতে দিয়াছিল বিশ্বাসঘাতক ইন্দিরা সরকার একই নাম্বারের ২/৩ গুণ বেশি টাকা ছাপাইয়া অতিরিক্ত টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশের সকল খাদ্য-শস্য কিনিয়া তাহাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে। আর বাংলাদেশে আসিয়াছে কোটি কোটি জাল কাগজের নোট। সমগ্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও তাহার লেজুড়ের দল এখনও জ্বী হুজুর জ্বী হুজুর করিতেছে।

সুতরাং একদিকে যেমন ভারত সরকার অপরদিকে তেমনি ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে কেনা স্বাধীনতা যে নেতৃবৃন্দ সামান্য লোভের বশবর্তী হইয়া গোপন ৭ চুক্তির মাধ্যমে ভারতের নিকট বিক্রি করিয়াছে তাহাদের পাপেই আজ বাংলার উপর আল্লাহর গজব নাজেল হইয়াছে। এ গজব লক্ষ লক্ষ শহীদের অতৃপ্ত আত্মারই অভিশাপ। তাই আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি বর্তমান সরকার যদি তাহার দুর্নীতির পথ পরিহার করিয়া দেশের বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতির মোড় ঘুরাইতে না আসে তবে আগামী ১৫ই মে তারিখ হইতে আমি দেশ ও জাতির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও অসহায় জাতির বর্তমান করুণ অবস্থার প্রতিবাদে আমরণ অবশন ধর্মঘট করিব। আমার বৃদ্ধ বয়সে অনাহারক্লিষ্ট জাতির ক্ষুধিতের কাতারে সামিল হইয়া জীবন কোরবানী করিব। *(সূত্রঃ টেলিগ্রাম, প্রকাশক মোহাম্মদ হোসেন)*

মওলানা ভাসানী পূর্ব কর্মসূচি অনুযায়ী তিনদফা দাবিতে ১৫ মে সকাল আটটায় আমৃত্যু অনশন শুরু করেন। অনশনের পূর্বে ডাঃ একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি মেডিক্যাল বোর্ড তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে অনশন না করার অনুরোধ জানান। কিন্তু ভাসানী নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। মোনাজাতের মাধ্যমে অনশন শুরু করার পর মুমূর্ষু অবস্থায় অনশনরত ভাসানী সংবাদ সংস্থা এনার কাছে প্রদত্ত বক্তব্যে বলেন, 'লাখো মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্যই আমি বর্তমানে আমরণ অনশনের পথ বেছে নিয়েছি।' অনশনরত মওলানা ভাসানী বলেন, দেশে খাঁটি সমাজতন্ত্র কায়েমের মধ্যেই দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত লাখো মানুষের মুক্তি নিহিত রয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। অন্য

www.pathagar.com

কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাই মানুষের মুক্তি আনতে পারে না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। গ্রামাঞ্চলে লাখ লাখ মানুষের দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবনযাত্রার কথা উল্লেখ করে অনশনরত নেতা বলেন, 'দিনে দু'মুঠো আহার যোগাড় করা আজ তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছেন।' তিনি বলেন, 'অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে খেয়ে তাদের অনেকেই আমাশয়ে ভুগছেন।' কাপড়ের অভাবে গ্রামের মেয়েরা চটের বস্তা দিয়ে ইজ্জত রক্ষা করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'সারাদেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে।' তিনি বলেন, 'যেখানে সরকার বারবার ঘোষণা করেছেন একজনকেও অনাহারে মরতে দেয়া হবে না, সেখানে অনেকেই অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করছেন।' ৯১ বছর বয়স্ক জননেতা তাঁর সকল ভুলভ্রান্তি এবং কোনো ঋণ থাকলে তাঁকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানান। তাঁর অসমাপ্ত সন্তোষের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মহিপুর হাজী মুহম্মদ মহসীন কলেজ, চিত্তরঞ্জন একাডেমী, এ.কে. ফজলুল হক হাসপাতাল, নজরুল ইসলাম গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং কাগমারী কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সকলের প্রতি মুক্তহস্তে দান করার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন, তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ হলেই তাঁর আত্মা শান্তি পাবে।

ক্ষমতাসীন সরকার, তাদের প্রভু শক্তিগোষ্ঠীর সামনে একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে ছিল মওলানা ভাসানীর এই অনশন। এই দিন শহরে সারাদিনব্যাপী মিছিল এবং পথসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। সাময়িকভাবে হলেও সমস্ত বিরোধীদলকে, অন্যান্য অরাজনৈতিক সম্প্রদায়কে, সংখ্যাহীন নারীপুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী, কৃষক-শ্রমিক, সর্বহারা মেহনতি মানুষ, রিক্শাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, হাকিম-ডাক্তার, ক্ষুদ্রব্যবসায়ী, দিনমজুর, ফকির-মিসকিন, পঙ্গু, মুক্তিযোদ্ধা তথা সমগ্র জনতাকে এমনকি বয়োবৃদ্ধ জননেতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল সত্যিকারের দেশপ্রেমিক আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীকেও এক মোহনায় সন্নিবেশিত করতে এবং বাংলার মুক্তিকামী মানুষের মনে আশার সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলো মওলানা ভাসানীর এই অনশন।

১৬ মে মওলানা ভাসানীর স্বাস্থ্যের সামান্য অবনতি ঘটে। মেডিক্যাল বোর্ড তাঁকে অবিলম্বে হাসপাতালে স্থানান্তরের সুপারিশ করে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর ওজন হ্রাস পায় ছয় পাউন্ড। বিকেলে তাঁকে সেলাইন দেয়া হয়। ইসিজির রিপোর্টে তাঁর হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা ধরা পড়ায় অক্সিজেন এবং নার্স মোতায়েন রাখা হয়। অনশনকে কেন্দ্র করে সারা শহর সহসা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। রাতে দলীয় নেতৃবৃন্দসহ প্রধানমন্ত্রী মুজিব মওলানার সাথে দেখা করেন এবং তাঁকে অনশন ভঙ্গের অনুরোধ জানান। তাঁর দাবি মেনে নেয়া হবে-এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিলে তিনি অনশন ভঙ্গের ব্যাপারটি বিবেচনা করবেন বলে তাঁকে জানান। তাঁদের আলোচনা হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশেই হয়।

১৭ মে মুজিববাদী ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন মিলে গঠন করে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ। এটিই সম্ভবত বাকশালের সঙ্গে মস্কোপন্থীদের বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রথম আলামত। ১৭ মে মওলানা ভাসানীর অবস্থার আরো অবনতি ঘটে, তাঁর ওজন কমে যায় ১৭ পাউন্ড। তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা নেয়া হয়, কিন্তু তিনি হাসপাতালে না যাবার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক পিজি হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলামকে পাঠান মওলানার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। মন্ত্রীগণ, আওয়ামী লীগ ও বিরোধী নেতৃবৃন্দ ভাসানীকে দেখতে যান এবং তাঁকে অনশন ভঙ্গের অনুরোধ জানান। বুদ্ধিজীবীসহ

www.pathagar.com

সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এমনকি কবি জসীমউদ্‌দীন ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে তাঁকে অনশন ভঙ্গের অনুরোধ করেন। বিকেলে ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক কাজী জাফর আহমদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'মজলুম জননেতার অবস্থা আশঙ্কাজনক।' তারা সরকারি নেতাদের ব্যক্তিগত ও শুভেচ্ছার পরিদর্শন চান না। তাদের দাবি তিন দফা মেনে নিতে হবে।'

১৮ মে মওলানা ভাসানীর অবস্থার অবনতি ঘটায় সর্বমহলে দেখা দেয় উৎকণ্ঠা। তাঁর পা পানিতে ফুলে যায়। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীগণ তাঁকে দেখতে গেলেও সরকারি দল থেকে উষ্মা প্রকাশ করা হয়। মওলানা ভাসানীর অনশনকে কেন্দ্র করে তোফায়েল আহমদ, আব্দুর রাজ্জাকসহ আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, হবু মন্ত্রীরা তাঁকে আর একদফা 'সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট, রাজাকারদের দালাল ও দেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করার চক্রান্ত কারী' বলে অভিহিত করতে শুরু করেন। ভাসানীকে দেখতে যাওয়ার পিছনে প্রধানমন্ত্রীর কোনো রাজনীতি ছিল না বলে সরকারি পর্যবেক্ষক মহল ঘোষণা করে। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য সাতটি বিরোধীদল ন্যাপ (ভাসানী), জাসদ, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলা জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি-লেনিনবাদী), শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল এবং বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপের অফিসে এক বৈঠকে মিলিত হয়।

অনশনের পঞ্চম দিনে ১৯ মে ভাসানীর শারীরিক অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটে। হাজার হাজার জনতার ঢল নামে ন্যাপের দফতরে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থেকে সর্বস্তরের জনগণ তাঁকে হাসপাতালে নেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও জনতার অস্থিরতার সংবাদ আসতে থাকে। ঐদিন জাসদ ভাসানীর অনশন সমর্থন করে ঢাকায় এক বিরাট গণজমায়েতের আয়োজন করে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও নেতার জীবন রক্ষার্থে ন্যাপের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। ভাসানীর অনশনকে কেন্দ্র করে একদিকে বিরোধীদলগুলোর পেছনে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিলো, অন্যদিকে অধিকতর জোরদার হয় সরকারের দমন নীতি। নগ্নভাবে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর। গোটা দেশ যেন এক যুদ্ধক্ষেত্রের আকার ধারণ করে। বিভিন্ন জেলা শহর থেকেও বিক্ষোভ ও উত্তেজনার খবর পাওয়া যাচ্ছিল।

২১ মে মওলানা ভাসানী আওয়ামী সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় হরতালের ডাক দেন এবং তা পালিতও হয়। আওয়ামী লীগ বলে হরতাল হয়নি। সংবাদপত্রে রিপোর্ট বের হয় যে, 'গাড়ি কিছু চলছে, তবে তাতে কোন ভিড় ছিল না, এবং সেগুলো কোথাও থামেনি। বাজার বসেছিল কিন্তু কোন লোক আসেনি। দোকান দু'একটি খোলা ছিল কিন্তু কোন ক্রেতা ছিল না।' সেদিনই ভাসানী ন্যাপ নেতা কাজী জাফর আহমদ অভিযোগ করেন যে, 'মুজিববাদীরা শহরের বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে।'

মওলানা ভাসানীর একজন অনুসারী হিসেবে হরতালে নেতার আহবানে সাড়া দিতে গিয়ে রাজধানীর নূর হোসেন জাতীয় প্রেসক্লাব অদূরের মিছিলের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। এ মিছিলে কাজী জাফর আহমদ, আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, সিরাজুল হোসেন খান, সাদেক হোসেন খোকা, মোস্তফা জামাল হায়দার-এর মতো রাজনীতিবিদ ছাড়াও সাংবাদিক এনায়েতুল্লাহ খান, কামাল লোহানী এবং ডঃ মাহবুব উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

নূর হোসেনকে মিছিল থেকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে আওয়ামীরা ও রক্ষীবাহিনীরা হত্যা করে। দৈনিক গণকণ্ঠ ২২ মে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করেছে, "ঢাকার রাজপথ আবার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর খুনী হাতে মেহনতি মানুষের রক্তের দাগ

www.pathagar.com

পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও ঔপনিবেশবাদের লেজুড় আওয়ামা লাগের প্রাইভেট বাহিনীগুলো গতকাল সোমবার হরতালের দিন কমপক্ষে ১০ জনকে হত্যা করেছে এবং অসংখ্য মানুষকে আহত করেছে। নিহত ১০ জনের মধ্যে কেবল বাংলাদেশ বিমানের পণ্য সরবরাহ কর্মচারী নূর হোসেনের পরিচয় পাওয়া গেছে। কোন লাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হত্যা করার পর প্রাইভেট বাহিনীর লোকেরা নিহত ব্যক্তিদের লাশ জীপে করে সরিয়ে ফেলেছে।'

২২ মে অনশনরত মওলানা ভাসানীর অবস্থার অবনতি ঘটে। কতিপয় সাংবাদিকের অনুরোধে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত হতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এদিকে ভাসানীর তিনদফার সমর্থনে সিলেটে ৬-২টা পর্যন্ত সফল হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে সকল সরকারি-বেসরকারি দপ্তর, দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। রাস্তায় কোনো যানবাহন চলেনি। হরতাল উপলক্ষে মিছিল বের করা হয় এবং জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা অবিলম্বে মওলানা ভাসানীর ঘোষিত তিনদফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

অপরদিকে জাসদের মেজর এম.এ. জলিল ও আ.স.ম. আব্দুর রব, জাতীয় লীগের অলি আহাদ ও আনসার হোসেন ভানু, বাংলাদেশ জাতীয় লীগের মিসেস আমেনা বেগম ও ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের মোখলেসুর রহমান, কমিউনিস্ট পার্টির (লেনিনবাদী) বাবু অমল সেন ও হায়দার আকবর খান রনো এবং ন্যাপের (ভাসানী) ডঃ আলিম আল রাজী, বজলুস সাত্তার ও কাজী জাফর আহমদ মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করে তাঁকে অনশন ভঙ্গের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। মওলানা তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনটি শর্তসাপেক্ষে অনশন ভঙ্গ করতে সম্মত হন। তিনটি শর্ত হচ্ছে ঃ

১. আজ (২২মে) অপরাহ্নে ন্যাপ কর্তৃক আহত জনসভাকে সর্বদলীয় জনসভায় পরিগণিত করতে হবে এবং সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ উক্ত সভায় ভাষণ দিবেন,

২. ২৯ মে হতে আইন অমান্য আন্দোলন করতে হবে,

৩. ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

মওলানা ভাসানীর শর্তাবলীতে সম্মতি জ্ঞাপন করে সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের কর্মসূচি নির্ধারণকল্পে জাসদের কেন্দ্রীয় দফতরে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। বৈঠক চলাকালে মাত্র কয়েক মিনিটের অনুমতি প্রার্থনা করে জাসদের রব সভাস্থল ত্যাগ করেন এবং প্রায় তিন ঘণ্টা পর সভাস্থলে প্রত্যাবর্তন করে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেন যে, জাসদ বর্তমানে কোন সক্রিয় আন্দোলনে অবতীর্ণ হবে না। তবে মুখ বাঁচানোর জন্য জাসদ শেষ পর্যন্ত একটি যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। যুক্ত বিবৃতি ছিলঃ 'আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ আজ দুপুর ২-১৫ মিঃ-এর সময় অনশনরত মৃত্যু পথযাত্রী মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করেছি। মওলানা সাহেবের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডের সর্বশেষ স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ কথা বলা হয়েছে যে, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং যে কোনো মুহূর্তে একটি দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক নহে। মেডিক্যাল বোর্ড আরো বলেছেন যে, আজ সকাল ৯টায় তিনি কোলাপস করে গিয়েছিলেন, তাঁর শরীরের তাপমাত্রা ৯৬ ডিগ্রী নেমে গিয়েছিল। তাঁর সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়েছিল। এমতাবস্থায় আমরা মওলানা ভাসানীর মতো জাতীয় অমূল্য সম্পদ একজন সংগ্রামী নেতার জীবনাশঙ্কায় বিচলিত হয়ে

www.pathagar.com

পড়ি। আমরা মওলানা সাহেবকে গোটা জাতির পক্ষ থেকে অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ করার জন্য অনুরোধ জানাই এবং এই প্রতিশ্রুতি তাকে প্রদান করি যে, দাবির ভিত্তিতে এবং যে লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে তিনি অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন সে দাবি ও লক্ষ্যকে আদায় করার জন্য আমরা আপসহীন সংগ্রাম করে যাব। বর্তমানে গণবিরোধী ফ্যাসিবাদী শাসকগোষ্ঠীকে উৎখাত করার জন্য মেহনতি জনতাকে সাথে নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাব এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে মওলানা সাহেবের আপসহীন লড়াইয়ের মাধ্যমে উৎখাত করার করার অঙ্গীকার ঘোষণা করছি। আমরা সর্বজন শ্রদ্ধেয় মওলানা সাহেবকে উক্ত আন্দোলনের স্বার্থেই অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানাচ্ছি। জাতি তাঁর সেবা ও নেতৃত্ব চায়।

স্বাক্ষরকারীগণ -

১. মেজর এম.এ. জলিল
২. অলি আহাদ
৩. আমেনা বেগম
৪. দেবেন সিকদার
৫. আবুল বাশার
৬. মিসির আহমদ ভূঁইয়া
৭. মোখলেসুর রহমান
৮. অমল সেন
৯. হায়দার আকবর খান রনো
১০. আব্দুস সোবহান
১১. আ.স.ম. আব্দুর রব
১২. আতাউর রহমান খান
১৩. সৈয়দ রিয়াজুল হোসেন।

মওলানা ভাসানীর শর্ত মোতাবেক বিকেলে পল্টন ময়দানে ন্যাপের উদ্যোগে এক সর্বদলীয় জনসভা অনুষ্ঠানের সার্বিক প্রস্তুতি সমাপ্ত হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনী সে সভার প্যান্ডেলে হামলা চালিয়ে সব কিছু পণ্ড করে দেয় এবং সভার উদ্যোক্তা ও বক্তাদের মারধর করে। তখন সেখানে রণভূমির চিত্র পত্রিকা সাংবাদিকদের তুলতে হয়। অবশ্য কিছুক্ষণ সন্ত্রাস হওয়ার পর নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ অভিযানে পরিস্থিতি পুরোপুরি শান্ত হয়ে যায়। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং সর্ব অনুরাগীদের উপর্যুপরি অনুরোধে মওলানা ভাসানী ১৮০ ঘণ্টার সুদীর্ঘ আমৃত্যু অনশন পালন করার পর মেডিক্যালে রাত সোয়া আটটায় ঠেলাগাড়ির চালক মলয় সরকারের হাত দিয়ে কাগজী লেবুর রস খাওয়ার মাধ্যমে অনশন ভঙ্গ করেন।

-০-

www.pathagar.com

রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন ও সিপিবির কুমন্ত্রণা

১৯৭৩ সালের মে মাসের দিকে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন বাড়তে থাকে। জনতার সাথে রক্ষীবাহিনীর সংঘর্ষ বাধে বিভিন্ন স্থানে। ১৯৭৩ সালের ৮ জুন বিকেল ৫টায় মুজিববাদী গুণ্ডারা প্রকাশ্য দিবালোকে বগুড়ার রাজপথে আতা এবং রঞ্জু নামে ছাত্রলীগের দু'জন কর্মীকে গুলি করে হত্যা করে। একইদিনে নোয়াখালীর মাইজদীতে রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে জনগণের সংঘর্ষ ঘটে। শহরবাসীরা এই হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে। ৯ জুন মাইজদীতে ঐ হামলার প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয়। এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক উস্কানি ছিল না। ঐ দিনই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মালেক উকিল ঘটনার তদন্ত করতে যান। ১০ জুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, 'মাইজদীর ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল সে খবর খবরের কাগজে ছাপা হয়নি। জানতে পারেনি এদেশের নির্যাতিত জনগণ।

একইদিনে বায়তুল মোকাররমে কমিউনিস্ট পার্টির এক সমাবেশে দলের সভাপতি মণি সিং উচ্চ কণ্ঠে বলেন, 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদী চীনের নেতৃত্বে এবং তাদের সহযোগী ভাসানী ন্যাপ, উগ্রপন্থী জাসদ, মুসলিম লীগ ও জামাতপন্থীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে।'

১৩ জুন (বরিশালে) জাসদের কর্মী ফারুক আলম দুস্কৃতকারীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। ১৭ জুন রক্ষীবাহিনীর নির্মম শিকারে পরিণত হয়ে দুপুরে ১২ টার সময় (বগুড়া) কারাগারে জাসদের অন্যতম কর্মী শ্রী মানিক দাস গুপ্ত মৃত্যুবরণ করেন। ৮ জুন রাত ১০টায় রক্ষীবাহিনী হঠাৎ করে গ্রেফতার করে তাকে গ্রেফতার করার পরপরই তার উপর নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন। বেদমভাবে মারপিটের ফলে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কারাগারে থাকাকালে তার আহার্য বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শেষ পর্যায়ে তার আঙুলগুলো কেটে ফেলা হয়। এহেন অত্যাচারের শিকার হয়ে শ্রী মানিক মারা যান।

১৯ জুন ঢাকার জেলা প্রশাসক ঘোষণা করেন যে, 'শহরে অতঃপর আর বিনানুমতিতে মাইক ব্যবহার করা যাবে না।' মাইক ব্যবহারের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা ছিল সুস্পষ্টভাবে বিরোধীদলের জনসভা অনুষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা। মোজাফফর ন্যাপ বা সিপিবি এর কোন প্রতিবাদ করেনি; বরং ২৪ জুন মোজাফফর ন্যাপের সভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, তার দল বাস্তব অবস্থায় নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। ঐ জনসভায়ও তিনি মওলানা ভাসানীকে 'সাম্রাজ্যবাদের চর' বলে আখ্যায়িত করেন।

২৯ জুন চট্টগ্রামে ঘটে আর এক ঘটনা। চট্টগ্রামের ইস্টার্ণ রিফাইনারীর বাসের ওপর রক্ষীবাহিনীর গুলিবর্ষণে নিহত হয় একজন। আর গুরুতর আহত হয় দু'জন। ইস্টার্ণ রিফাইনারীর শ্রমিকরা এই ঘটনার প্রতিবাদে ধর্মঘট করেন। ঘটনাটি ছিল রিফাইনারীতে যাবার পথে রিফাইনারীর বাস রক্ষীবাহিনীর একটি ট্রাককে ওভারটেক করে। তাতে ক্রুদ্ধ রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা একটি রেল ক্রসিংয়ের মুখে ঐ গাড়ি ঘেরাও করে গুলিবর্ষণ করে। এমনি সামান্য ছুতোতেই রক্ষীবাহিনী নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে এদেশের সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষকে। এই সময় দৈনিক বাংলার কলামিস্ট নির্মল সেন (অনিকেত) মার্চের নির্বাচনের ক'দিনের পর লিখেছিলেন, 'আমি স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই' শীর্ষক একটি উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ। ঐ লেখায় তিনি এক সপ্তাহের একটি ঠিকুজি তুলে ধরেন ১টি হত্যার। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'এ খবর সব খবর নয়। সব খবর সংবাদপত্রে পৌঁছে না। সব খবর পৌঁছে না থানায়। দূর-দূরান্ত হতে কে দেয় কার খবর। আর খবর দিতে গেলে জীবনের যে ঝুঁকি আছে সে ঝুঁকি নিতেই বা ক'জন রাজি?' লুটেরা বলে, রাজাকার বলে, খুনী বলে এই নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে নির্মল সেন জানতে চেয়েছিলেন-

(১) ১৯৭২ সাল হতে আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ক'টি হত্যাকাণ্ডের কিনারা হয়েছে।

(২) ক'জন হত্যাকারী গ্রেফতার হয়েছে।

(৩) ক'টি গাড়ি হাইজ্যাক হয়েছে। সে হাইজ্যাকার কারা। কি তাদের পরিচয়। কি তাদের ঠিকানা।

(৪) যারা গ্রেফতার হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

(৫) পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে, অভিযুক্তদের ধরা কলে ফোনের জন্য মুক্তি দিতে হয়। এই অভিযোগ কতটুকু সত্য। এই ফোন কারা করে থাকেন।

তিনি বলেন, 'খুঁজে দেখতে হবে এই হত্যাকারীরা কাদের প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠেছে। নইলে দিনের পর দিন হত্যা-রাহাজানির খবর বের হয় অথচ একটি প্রাণীরও শাস্তি হয় না- এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে কি করে।' *(সূত্রঃ ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ, আহমেদ মুসা, ফেব্রুয়ারি-১৯৯১)*

৯ জুলাই জাতীয় প্রেসক্লাবে ভাসানী ন্যাপের ভাইস-চেয়ারম্যান ডঃ আলীম আল রাজী বলেন, 'ক্ষমতাসীন সরকার একদলীয় স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিগত নির্বাচনে ক্ষমতার অপব্যবহার, সন্ত্রাস সৃষ্টি, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূয়া ভোট প্রদান, বিপুল অর্থ ব্যয়, বেতার ও টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সকল যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছেন। বিরোধীদলগুলো ও জনসাধারণ যাতে বিরোধী বক্তব্য প্রকাশ করতে না পারে সেজন্য ক্ষমতাসীন দল তাদের নিজস্ব রক্ষীবাহিনী, লালবাহিনী-নীলবাহিনীর হাতে বিপুল অস্ত্র দিয়ে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণকে হয়রানি করছে।' তিনি বেতার-টেলিভিশনসহ সকল প্রচার মাধ্যম সরকারি দলের দলীয় স্বার্থে যথেচ্ছ ব্যবহারের উল্লেখ করে একে 'বেবিলনিয়ান ক্যাপটিভ প্রেস' বলে অভিহিত করেন। জানুয়ারিতে দু'জন ছাত্রহত্যার কথা উল্লেখ করে ডঃ রাজী বলেন, 'ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন সরকার যেভাবে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল, দু'শ বছরের ইতিহাসে তার নজির নেই।' তিনি বলেন, 'সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

জুলাই মাসে রাষ্ট্রপতির অগণতান্ত্রিক ৫০ নম্বর ধারা অনুসারে রক্ষীবাহিনীকে দেয়া হয় নতুন ক্ষমতা। তাতে 'জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ডেপুটি লিডার ও তার উপরস্ত সকল অফিসারকে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া সন্দেহজনক যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ক্ষমতা' দেয়া হয়।

২০ জুলাই ন্যাপের ডঃ আলীম আল রাজী রাষ্ট্রপতির ৫০ নম্বর আদেশ বাতিলের দাবি করেন। তিনি বলেন, 'এ ধারার যথেচ্ছ প্রয়োগ করে বিরোধীদের বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকাল আটক রাখা হচ্ছে।' ১৪ আগস্ট বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্মল সেন ঐ ধারায় প্রতিবাদ করেন।

www.pathagar.com

২ সেপ্টেম্বর ন্যাপের জাতীয় কার্যকরী সংসদের সদস্য ও কর্মীদের প্রতি মওলানা ভাসানী একটি চিঠি প্রেরণ করেন, যেখানে তিনি বলেন-

সম্মানিত

সদস্য/সদস্যাবৃন্দ ও আমার কর্মী ভাইয়েরা,

আসসালামু আলাইকুম

॥১॥ নির্বাচনোত্তর আজ এক জরুরি কথা বলার প্রয়োজনে এই বিশেষ পত্র লিখছি। আপনারা জানেন আজ একশত ভাগ মিথ্যাকে হিন্দুস্থানের মতো প্রচার চালাইতে পারিলে সত্য হইয়া যায়। আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ও মণি সিং-এর দল একত্র হইয়া বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করিয়াছে। যাহার ফলে খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। চোরাকারবার, চোরাচালান বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ "সোনার বাংলা গড়ার কাজ" অনেকেই অগ্রসর হইয়াছে। ভাসানীর হরতাল সফল হয় নাই ইত্যাদি প্রচার উনিশটি জেলায় ও দুনিয়ার সর্বত্র করানো হইয়াছে। ইহাতে ত্রি-দলীয় পার্টির অসংখ্য মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশন প্রভৃতি এবং বিদেশি প্রভুরাও আছেন। আমার একখানা পত্রিকাও নাই। দৈনিক হককথা, সাপ্তাহিক মোবাল্লিগ, মাসিক ওয়ার্ল্ডপিস (ইংরেজি) প্রকাশের জন্য টাঙ্গাইলের ডিসির নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছি। আজও পাই নাই। সাপ্তাহিক হককথার সম্পাদক ইরফানুল বারীকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে দেড় বছর যাবত আটক রাখা হইয়াছে। সরকার তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগও দায়ের করিতে পারে নাই। তবুও তাহাকে মুক্তি দিতেছে না। ইহাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নমুনা।

॥২॥ যাহারা চোরাকারবার নাই বলিয়া ঢাক-ঢোল পিটাইতেছে তাহারা একবার খোঁজ খবর লইয়া দেখিবেন কি যে মতিউর রহমান মন্ত্রীর সিট রংপুর সীমান্ত দিয়া কি ধরনের চোরাকারবার চলিতেছে। খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যহ্রাস তো ঘটে নাই বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অর্থাভাবে চাউল শতকরা ৫ জন বাঙালিও আর কিনিতে পারে না। ৯৫ টাকা দরে এবং অধিকাংশ স্থানে ১১০ টাকা হইতে ১২০ টাকা মণ দরে বিক্রি হইতেছে। কাপড় খোলা বাজারের চাইতে ন্যায্যমূল্যের দোকানে কিছু কম মূল্যে বিক্রয় হইলেও ভারতীয় কাপড় এত খারাপ যে, একবার কেউ ক্রয় করিলে আর ক্রয় করিতে চান না।

॥৩॥ ২৯ আগস্টের হরতাল ব্যর্থ হইয়াছে কিনা এ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাহি না, দেশবাসীই তাহা ভালভাবে জানেন।

॥৪॥ গ্রামে, ইউনিয়নে সর্বত্র যদি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গড়িয়া তোলা হইত তবে ত্রিদলীয় শক্তি এতদিন বাংলার মাটি হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভিতর কমিউনিস্ট-নন কমিউনিস্ট দুই দলের ভিতরে কোন দল কাহাকেও হারাইতে পারিবে ইহার জন্য যতটা পরিশ্রম ব্যয় হয়, তাহা না করিয়া, কোন্দলে লিপ্ত না হইয়া গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গড়িয়া তুলিতে পারিলে শুধু বাংলা নহে, উহা এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত হইতে পারিত।

॥৫॥ কমিউনিস্টদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং পার্টির কর্মসূচির প্রতিফলন কোন কালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দ্বারা হইবে না, অন্যদিকে নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামের

www.pathagar.com

আশা-আকঙ্ক্ষা ও ধ্যান-ধারণা কিছুতেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হইবে না।

॥৬॥ তাই উভয় উপদলের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ যত শীঘ্র সম্ভব কোন্দল পরিহার করিয়া ন্যাশনাল অওয়ামী পার্টির গঠনতন্ত্র ও আদর্শ অনুযায়ী দেশের সর্বত্র সংগঠন গড়ার কাজে আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন।

॥৭॥ তিন দলের মিথ্যা প্রচার ইনশাআল্লাহ অল্প দিনের মধ্যেই সত্যে পরিণত না হইয়া মিথ্যায় পরিণত হবে। মিথ্যার যাহার চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ধ্বংস অনিবার্য-উহাই বাংলাদেশ সরকার ও তাহাদের প্রভু হিন্দুস্থান সরকারের পরিণতি হইবে।

১৯ সেপ্টেম্বর গণকণ্ঠে বলা হয়, 'বর্তমান সভ্যতাকে এদেশে আরো একবার সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে গত ১৭ সেপ্টেম্বর। আপাতত এই সর্বশেষ বধ্যভূমিটি হচ্ছে ঢাকা জেলার নওয়াবগঞ্জ। এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত সর্বশেষ এই বিরাট মুজিববাদী অপারেশনে কত জীবন যে বলি হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। তবে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের মর্গে গতকাল পর্যন্ত ৭টি লাশ এসে পৌঁছেছে.....ঢাকা থেকে নওয়াবগঞ্জে একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ যাচ্ছিল। মুজিববাদী এবং রক্ষীবাহিনীর মনে করে ঐ লঞ্চে হয়তো তাদের বিরোধী কেউ রয়েছে। তখন রক্ষীবাহিনী ঐ লঞ্চ থামাতে বলে। সারেং লঞ্চ থামাচ্ছিলেন, কিন্তু থামাবার সময়ও সারেং পাননি। তার আগেই উপর্যুপরি কয়েকবার ব্রাশ ফায়ার করা হয়। আর সেই সঙ্গে লঞ্চে যে কত জন যাত্রীর জীবন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে তার সঠিক হিসেব এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি.....ঢাকা পুলিশ সূত্রে গত রাতে জানানো হয় ৭ জনের মৃত্যু ও ২ জনের আহত হবার কথা।'

২৯ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মালেক উকিল ঘোষণা করেন যে, 'থানায় থানায় দুর্বৃত্তের তালিকা তৈরি হচ্ছে। সারাদেশ থেকে দুষ্কৃতকারীদের উৎখাত করা হবে।'

৪ অক্টোবর সংসদে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মালেক উকিল বলেন, 'রাজনৈতিক কারণে কাউকে আটক করা হয়নি।'

১২ অক্টোবর বিরোধীদলগুলো অভিযোগ করেন যে, 'থানায় থানায় রক্ষীবাহিনী বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক কর্মীদের হয়রানি করছে।'

১৯৭৩ সালের দিকে 'এসো দেশ গড়ি' শ্লোগান তুলে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একদলের হাতে ক্ষমতা পরিচালনার লাইসেন্স নেয়ার প্রয়াস চলে। তখন আওয়ামী লীগ ছাড়া ন্যাপ (মোজাফফর) এবং কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিং) এ ধারার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে। সৃষ্টি হয় ত্রি-দলীয় ঐক্যজোট। ১৪ অক্টোবর ন্যাপ, আওয়ামী লীগ ও সিপিবি'র সমন্বয়ে ঐক্যজোট গড়ে ওঠে। বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও এই লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধাসমূহ দূর করাই ছিল এই জোটের ঘোষিত লক্ষ্য। ত্রি-দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হলেও তারা আওয়ামী লীগের বি-টিম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তখন মওলানা ভাসানীসহ জাসদের নেতা-কর্মীরা মুজিব সরকারের দুঃশাসনের সঠিক চিত্র তুলে ধরলে ন্যাপ (মোজাফফর) এবং সিপিবি তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে। বিশেষ করে সিপিবি মুজিব সরকারের তোয়াজে তার দিন অতিবাহিত করে। ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে, 'চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ভিত্তিতে দেশ গঠন, দেশের সংহতি ও স্বাধীনতা রক্ষা, দুস্কৃতকারী, চোরাকারবারী, মুনাফাখোর, মজুদদার, সাম্রাজ্যবাদ ও স্বাধীনতার শত্রুদের উৎখাত করার ক্ষেত্রে এই তিনটি দল ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে যাবে।' তাতে নির্ধারিত হয় যে, জোটের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আওয়ামী লীগের সদস্যসংখ্যা থাকবে ১১ জন, ন্যাপের ৫ জন এবং কমিউনিস্ট পার্টির ৩ জন।

www.pathagar.com

১৫ অক্টোবরে ন্যাপের মোজাফফর আহমদ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ সুবিমল দত্তের সঙ্গে দেখা করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৬ অক্টোবর পাবনার ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকে রক্ষীবাহিনী গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করে ত্রি-দলীয় ঐক্যজোটের জেলা ন্যাপ কমিটি একটি বিবৃতি দেয়। ১৮ অক্টোবর জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান অভিযোগ করেন যে, 'দুস্কৃতকারী আখ্যা দিয়ে বিরোধীদলীয় কর্মীদের ওপর পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন চলছে। সরকার দুস্কৃতকারীদের নির্মূলের নামে সরকারি দলের লোকদের কাছে অস্ত্র দিচ্ছেন। এটা উদ্বেগজনক। এ পদক্ষেপ দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে।'

একই দিনে সংসদে আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচিত ইত্তেফাক সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন রাষ্ট্রপতির ৫০ নং আদেশের প্রতিবাদ করে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'এই আইনে গ্রেফতারের বিধান আছে কিন্তু জামিনের বিধান নাই। ফলে আইনের শাসনের প্রতি মানুষের বিদ্বেষই প্রধান হয়ে উঠেছে এবং এর ফলে অনেকেই দুস্কৃতকারী হচ্ছে।' দেশে ৫০ নং আদেশের যথেচ্ছা ব্যবহার হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তিনি ৫০ নং আদেশের সংশোধনী দাবি করেন।

জাসদ ২১ অক্টোবর অভিযোগ করে যে, তাদের রাজবাড়ী জেলা শাখার সম্পাদককে গ্রেফতার করে রক্ষীবাহিনী পিটিয়ে অজ্ঞান করে রেখেছে। একই দিনে আওয়ামী লীগের জিল্লুর রহমানকে আহ্বায়ক করে ত্রি-দলীয় ঐক্যজোট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। মোজাফফর আহমদ আর মণি সিং থাকেন ঐ কমিটিতে। ২৪ অক্টোবর জাসদ অভিযোগ করে যে, বাগমারীর জাসদ নেতাকে রক্ষীবাহিনী খুন করেছে। ২৪ অক্টোবর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মালেক উকিল জানান যে, 'গ্রামরক্ষী দল গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রত্যেককে একটি শটগান দেয়া হবে। কাজের মেয়াদ শেষ হলে এসব অস্ত্র থানায় জমা দেয়া হবে।' তিনি আরও পরিষ্কার করে বলেন যে, 'এ ব্যাপারে মহকুমা হাকিমের অনুমোদনসাপেক্ষে স্থানীয় প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং এমপির সাথে আলোচনা করে গ্রামরক্ষী দল গঠনের জন্য ওসি'র প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

২৪ অক্টোবর গণকণ্ঠে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, 'জাসদের পাবনা জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক জনাব আসফাকুর রহমান কালু, বিশিষ্ট জাসদ কর্মী ফারুক ও পাবনা জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি জনাব মাসুদকে সম্প্রতি রক্ষীবাহিনী পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে ঢাকায় প্রাপ্ত এক খবরে জানা গেছে। ইতিপূর্বে রক্ষীবাহিনী পাবনা জেলা জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আহসাব হাবিবের ছোট ভাই সিদ্দিকুর রহমানকেও পিটিয়ে হত্যা করে।'

২ নভেম্বর ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের ন্যাপের সম্পাদক পঙ্কজ ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন যে, তার কর্মীদের ওপর রক্ষীবাহিনীর হামলা, হত্যা, নির্যাতন চলছে। তিনি বলেন, '১ নভেম্বর সুনামগঞ্জ মহকুমার প্রধান ন্যাপ কর্মী বন্ধু দাশকে রক্ষীবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পীরগাছায় ন্যাপ কর্মীদের নির্বিচারে মারধর করা হয়েছে। ৩১ অক্টোবর নাটোরের ন্যাপ কর্মীকে রক্ষীবাহিনী অপহরণ করেছে।' সেই সাথে পঙ্কজ অনুনয় করে বলেন যে, 'এদের ওপর হামলা হলে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।'

১২ নভেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মুজিব। সেখানে মণি সিং বলেন, 'ঐক্যজোটের ঘোষণায় যাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (ভাসানী

www.pathagar.com

ন্যাপ ও জাসদসহ) আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফলতা লাভ করতে পারি, তাহলে দেশে বিপ্লবের বিরাট অগ্রগতি সাধিত হবে। এটি আমাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য।'

২৯ নভেম্বর সরকারের অস্ত্রসংক্রান্ত এক ঘোষণায় বলা হয় যে, 'রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, জাতীয় সংসদের স্পীকার, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিবৃন্দ, প্রতিমন্ত্রী ও সহকারী মন্ত্রী এবং জাতীয় পরিষদের সদস্যরা লাইসেন্স ছাড়াই নন-প্রহিবিটেড বোরের অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের কাছে রাখতে পারবেন।' এর বৈধতার প্রশ্ন ছাড়াও এ সিদ্ধান্ত থেকে একটা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কতটা অবনতি ঘটেছিল।

৭ ডিসেম্বর ত্রিদলীয় ঐক্যজোট ঘোষণা করে যে, 'সকল সমাজবিরোধীকে নিশ্চিহ্ন করে সমাজতন্ত্রের পথ বাধামুক্ত করা হবে। সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়ন প্রতিটি দেশপ্রেমিকের কর্তব্য।'

ইতিমধ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। সরকারি প্রশাসকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আসে। লুটপাটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে জনসাধারণ। দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ছাড়িয়ে যায়। চার মাসে সরকার ৬৩ কোটি টাকা ছাড়ে বাজারে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় সরকারের। ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে রেল, পাটকল, বিদ্যুৎ, বিআরটিসি, স্বাস্থ্য দফতর, নৌ-পরিবহন কোম্পানী প্রভৃতি স্থানে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে দেয়। ১৫ ডিসেম্বর 'দুস্কৃতকারীদের' সঙ্গে গুলি বিনিময়ের পর পুলিশ ৬ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তাদের মধ্যে ছিল প্রধানমন্ত্রীর পুত্র শেখ কামালও। তখন পুলিশ জানায় 'দুস্কৃতকারীদের তাড়া করার সময় এরা আকস্মিকভাবে গুলিবিদ্ধ হন।'

১৯৭৩ সালের শেষ দিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মালেক উকিল ঢাকার কমলাপুরে এক জনসভায় বলেন, 'দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রয়োজনবোধে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর হাতে অস্ত্র দেয়া হবে।'

এভাবে শেখ মুজিবের নির্দেশে মুজিব বাহিনী, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, লাল বাহিনী প্রভৃতি বাহিনীর হাতে কি পরিমাণ অস্ত্র রেখে দেয়া হয়েছিল এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকদের হাতেই বা কি পরিমাণ অস্ত্র দিয়েছিলেন তা জানা না গেলেও রক্ষীবাহিনীসহ এদের হাতে যে হাজার হাজার বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী নিহত হয়েছিল এবং এই হত্যাযজ্ঞ যে একটি পরিকল্পনামাফিকই ঘটেছিল সেটার আভাস পাওয়া গিয়েছিল ১৯৭২ সালে খুলনার এমসিএ হাবিবুর রহমানের বক্তব্য থেকেও। খুলনার আফিল জুট মিলে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে হাবিবুর রহমান বলেন, 'জানেনতো আপনারা (অর্থাৎ শ্রমিকেরা) বাংলাদেশে আরো ত্রিশ লাখ লোক মারা হবে, মানে হত্যা করা হবে, বুঝলেন আমি এই খবর আন অফিসিয়ালী বলছিনে, অফিসিয়ালী বলছি। আর ভাসানী ও ন্যাপ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নে যারা আছে তারা সব নক্সাল। তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ স্বাধীনতার পরই হয়েছিল কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এই সমস্ত নক্সালদের অবিলম্বেই খতম করা হবে। সুতরাং সাবধান। আই এ্যাম এমসিএ স্পিকিং।' *(সূত্রঃ সাপ্তাহিক হককথা, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২)*

১৯ ডিসেম্বর ১৯৭৩ গণকণ্ঠ তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, 'গত ১০ ডিসেম্বর তানোর থানার মোহাম্মদপুর চৌবাড়ীয়া, পূর্বপাড়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে ১৩১ ব্যক্তিকে যৌথ

www.pathagar.com

বাহিনীর লোকজন ধরে নিয়ে যায় এবং পরে তাদের প্রত্যেককে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বলা হয়েছে নিহত ব্যক্তিরা বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছিল।'

২৬ ডিসেম্বর গণকণ্ঠে প্রকাশ, 'সমগ্র সিরাজগঞ্জ মহকুমায় সশস্ত্র মুজিববাদী গুণ্ডাবাহিনী ও রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার ও নির্যাতনের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সশস্ত্র মুজিববাদী গুণ্ডারা সিরাজগঞ্জে ২১টি সুরক্ষিত ক্যাম্প স্থাপন করেছে। এই ২১টি ঘাঁটি থেকেই সারা মহকুমায় অপারেশন চালানো হচ্ছে। এদের নির্যাতন ও সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে মহকুমার ৯টি থানার ১৩টি রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প থেকে সাহায্য করা হয়েছে ......ইতিমধ্যে এই যৌথ বাহিনী জাসদ, শ্রমিক লীগ (জাসদ) ও ছাত্রলীগ (জাসদ)সহ অন্যান্য প্রগতিশীল বামপন্থী বিরোধীদলীয় প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। ইজ্জত বাঁচানোর জন্য যুবতী মেয়েরা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করছে।'

সিপিবির নেতা মণি সিং মওলানা ভাসানীকে টুকরো টুকরো করার হুমকি দিয়েছিলেন মুজিবের আশীর্বাদে থেকে। জবাবে ৩০ ডিসেম্বর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক বিবৃতিতে ভাসানী বলেছিলেন, 'গত ২৯ ডিসেম্বর ত্রিদলীয় ঐক্যজোট কর্তৃক আহূত বায়তুল মোকাররমের এক গণজমায়েতে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রী মণি সিং বলিয়াছেন যে, আমাকে বাংলার মাটি হইতে উৎখাত করিবেন এবং টুকরো টুকরো করিয়া ফেলিবেন। তিনি সরকারের সমালোচনাকারী পত্রিকাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেও কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি আমার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা নস্যাতের অভিযোগ পুনরায় উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যেহেতু আমি ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইয়াছি তাই আমাকে টুকরো টুকরো করিয়া ফেলার সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষণদানকালীন আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা হাজির ছিলেন, ইহাও লক্ষণীয়। শ্রী মণি সিং-এর এহেন বাক্যসার বাসনায় আমার কি হইবে না হইবে আমি এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন বোধ করি না। কিন্তু যে খুঁটির জোরে তিনি এই কাজ করিয়াছেন তাহাদের গুপ্ত রাজনীতির অশুভ পাঁয়তারা সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল বলিয়া দেশবাসীর নিকট শ্রী মণি সিং-এর এই কাগুজে হুংকার দ্বিতীয় বারের মতো ভাবিয়া দেখিতে আলোচনায় অবতীর্ণ হইলাম। তাঁহার উপরিউক্ত ঘোষণা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ত্রিদলীয় ঐক্যজোট বাংলাদেশে একটি রক্তারক্তি ঘটাইতে বদ্ধপরিকর। এমনিতেই দেশে অরাজকতা বিরাজ করিতেছে। তাহার মধ্যে কোন দুঃসাহসে রুশ-হিন্দুস্থানের পা-চাটা জোট এই প্রকার ঘোষণা সর্বসমক্ষে করিতে পারিল ইহাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। নানা কারণের সহিত পরস্পর বিরোধী এই জোটের হুংকার মিলাইয়া আমি আজ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, অচিরেই আন্তর্জাতিক ভয়াবহ এক চক্রান্তের জেরস্বরূপ বাংলাদেশে অপ্রতিরোধ্য রক্তপাত ঘটিবে। শ্রী মণি সিংরা চাহিতেছেন ব্যাপক হারে একদফা হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়া বাংলাদেশে রাশিয়া ও হিন্দুস্থানের চক্রজাল নির্বিঘ্নে বিস্তার করিতে। অতীতেও রাশিয়া হাঙ্গেরী, মধ্য এশিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় খোলা হাতে রক্তপাত ঘটাইয়াছে। হিন্দুস্থান, নাগা, মিজো, সিকিম, দাক্ষিণাত্য, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি এলাকায় নির্লজ্জ বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড চালাইয়া মানুষের স্বাধিকার আন্দোলনকে ধ্বংস করিয়াছে। রুশ-হিন্দুস্থানে সামরিক সাহায্য, গোয়েন্দাগিরিতে সহযোগিতা, সর্বোপরি কূট পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করিয়া ত্রিদলীয় ঐক্যজোট এই সোনার বাংলাদেশকে কেনা গোলামের দেশে পরিণত করিতে চায়। যাহারা তাহাদের গোলাম থাকিবে না বলিয়া তাহারা মনে করিবে তাহাদিগকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হইবে। আমার জানমাল আজ বিপন্ন-এই কথা বলিবার পূর্বে আমি দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া

www.pathagar.com

দিতে চাই, বাংলাদেশের স্বাধীনচেতা প্রতিটি রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, শ্রমিক নেতা, ছাত্রনেতা এক মহা অনিশ্চয়তা ও অনিরাপত্তার দিন কাটাইতেছে। ঐক্যজোটের অনুসারীদের জরিয়তে স্বাধীনতার পর গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে কতো যে গুপ্তহত্যা সংগঠিত হইয়াছে ইহার ইয়াত্তা নাই। ইহার পরও জাতির শত্রুরা দেখিতেছে বাংলার মানুষ রাশিয়া-হিন্দুস্থানের কবলকে কবুল করিয়া লইতেছে না। তাই তাহারা বেহায়া হইয়া বেপরোয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। যুক্তির দ্বারা নহে-শ্রী মণি সিং বৃহৎ শক্তিবর্গের অঙ্গুলি ইশারায় তাই ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন, আমাকে টুকরো টুকরো করা হইবে। আফসোস শ্রী মণি সিং-এর মুরুব্বিরা বাংলাদেশের জাতীয় চরিত্র আজো অনুধাবন করিতে পারেন নাই। এক ভাসানীকে টুকরো টুকরো করিয়া তাঁহারা রেহাই পাইবেন না, ইতিহাস হইতে এই শিক্ষা পাওয়া উচিত। বাংলাদেশের মানুষ যেমন নম্র, তেমনি প্রচণ্ড। একবার তাহাদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে জলোচ্ছ্বাসের মতোই নিষ্ঠুর হইয়া পড়ে। অবশ্য শ্রী মণি সিংরা চাহিতেছেন দেশে বড় একটি গোলমান বাঁধাইয়া উহার উসিলায় এখানে রুশ-হিন্দু প্রভাব আরো প্রত্যক্ষ ও মজবুত করিয়া লইতে। আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, একবিন্দু রক্ত থাকিতে বাংলাদেশে রাশিয়া ও ভারতের কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রই কায়েম হইতে দিব না। এই সংকল্প আমার একার নহে। বিগত দুই বৎসরে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাংলাদেশের কোটি কোটি স্বাধীনচেতা নাগরিক জান-মাল সব কিছু হারাইতে প্রস্তুত, কিন্তু রাশিয়া ও ভারতের গোলামি মানিয়া লইবে না। আমি হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি, আপনারা আগুন লইয়া খেলা করিবেন না, রক্তপাতের ভয় দেখাইবেন না, গুপ্তহত্যার আশ্রয় লইবেন না। মনে রাখিবেন কোনো পন্থাই স্বাধীন বাঙালি জাতিকে কাবু করিতে পারিবেন না। অযথা শুধু রক্তপাতই হইবে। অবশেষ নিজেদেরকে তথাকথিত বন্ধুদেশেই পালাইতে হইবে। আমরা কথার তুবলিতে উড়িয়া যাওয়ার মানুষ নই, প্রত্যক্ষ মোকাবিলায় জীবন সংগ্রাম আমাদের নিত্য সাথী। রক্তপাতের বদলে রক্তপাতই ঘটিবে। গুপ্তহত্যার বদলে সামনাসামনি হত্যাকাণ্ড শুরু হইবে। শ্রী মণি সিং রুশ-হিন্দের মুরুব্বিয়ানা কায়েমের দুরাশা ত্যাগ করুন। দেশের রক্তপাত ঘটাইবার অশুভ পাঁয়তারা হইতে বিরত থাকুন। তাহা না হইলে জানিয়া রাখিবেন, আমরা সেই নবীর উম্মত যিনি রাজনৈতিক শত্রুর মোকাবিলা তলোয়ার লইয়াই করিয়াছেন, জানিয়া রাখিবেন আপনারা, প্রিয় কবি নজরুলের ভাষায়, 'ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে-জাতি।'

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সময়ে সিপিবিই আওয়ামী সরকারকে বহু অঘটন ঘটনে প্ররোচিত করেছে। তদানীন্তন মুরুব্বী সোভিয়েত রাশিয়ার নির্দেশে সিপিবি নেতৃবৃন্দ সে সময় আওয়ামী সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন 'ঘটনা' সৃষ্টিতে তৎপর ছিলেন। এজন্য তারা রাজনৈতিক, সামাজিক পরিমণ্ডল হতে শুরু করে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক স্তরে আওয়ামী লীগকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলতে গেলে এদের প্ররোচনাতেই তখন এদেশ থেকে ইসলামের নাম-নিশানা উঠে যেতে বসেছিল। সে সময় মাদ্রাসা শিক্ষার বিলোপ সাধন, ধর্মীয় আচার-ঐতিহ্যবিরোধী প্রচারণা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে মুসলিম ঐতিহ্য সংক্রান্ত চিহ্নসমূহ অপসারণসহ সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরেই ধর্মনিরপেক্ষতা উসকে দেয়ার কাজে লিপ্ত ছিল এ ধরনের বর্ণচোরা তাত্ত্বিকগণ। এছাড়া শেখ মুজিবের শাসনামলে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতিকে সোভিয়েতমুখী করার পশ্চাতেও এই দলের অতি উৎসাহ কম দায়ী নয়। কথিত আছে যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে বাকশাল প্রতিষ্ঠায় উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রেও এই সিপিবি ও হাফ কমিউনিস্ট মোজাফফর ন্যাপ বহুলাংশে দায়ী।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পদত্যাগ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আওয়ামী লীগের সংসদীয় সরকার পদ্ধতির অধীনে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে তাঁর স্বাভাবিক মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হয়েছে। আওয়ামী লীগ কর্তৃক মনোনীত হয়েই তিনি জাতীয় সংসদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে অমর্যাদাকর পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী যখন সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন প্রেসিডেন্টের পদ থেকে পদত্যাগ করে আওয়ামী লীগ সরকারের ভ্রাম্যমাণ দূতের পদটি বেছে নিয়েছিলেন, জাতি তখন বিস্ময়-বিমূঢ় হয়েছিল। নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের পদের সঙ্গে একটি লাভজনক পদের বিনিময় হতে পারে, তা কখনোই ভাবা যায়নি। কারণ, সরকারের ভ্রাম্যমাণ দূতের পদটি মর্যাদার দিক থেকে যেমন নিম্ন পর্যায়ের তেমনি এই পদে থাকা বা না থাকা পুরোপুরি সরকারের মেজাজ-মর্জির ওপর নির্ভরশীল ছিল। যতই অবিশ্বাস্য হোক না কেন, সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বেছে নিয়েছিলেন অথবা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন-এমন একটি কূটনৈতিক দায়িত্ব-যার মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা একজন কেবিনেট মন্ত্রীর সমতুল্য। পদত্যাগের বিষয়টি যত না দুঃখজনক ছিল, তারচেয়েও অধিক দুঃখজনক ছিল এই মর্যাদাহানিকর ঘটনা। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রের এক নম্বর ব্যক্তি। সকলের ঊর্ধ্বে তাঁর স্থান। তাকে কি করে সর্বোচ্চ এই অবস্থান থেকে নামিয়ে নিম্নতর অবস্থানে পদাবনতি ঘটানো যায়? প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পদত্যাগের ঘটনা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শেখ মুজিবের দমনমূলক শাসনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুজিববিরোধীদের অনেকেই এটাকে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাটল বলে ধরে নিয়েছিল। মুজিবের সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে কোনো উচ্চবাচ্য করার সুযোগ দেয়নি কিংবা বিচারপতি চৌধুরীও উচ্চবাচ্য করার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারেননি। পিতৃভক্ত বালক সেজে অম্লানবদনে পিতার নির্দেশটি মেনে নিয়েছিলেন। বিচারপতি চৌধুরী সুবোধ বালক সেজে সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের পদটিকে বড্ড খাটো করে ফেলেছিলেন। শেখ মুজিবের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করার শক্তি তার ছিল না। বিচারপতি চৌধুরী যেভাবে আচরণ করলেন তাতে করে 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' অনিবার্য হয়ে উঠলো।

দৈনিক সংবাদপত্রে বিচারপতি চৌধুরীর পদত্যাগসংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনা যেভাবে ম্যানেজ করা হলো আর যেভাবে তার হাসিমুখে বিদায়ের ছবি ছাপা হলো, তা ক্ষমতা-কুশল সরকারের অসীম পারঙ্গমতারই প্রতিফলন ঘটালো। পদত্যাগকারী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী মুজিব পারস্পরিকভাবে একে অপরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যেভাবে পত্রবিনিময় করেছেন, তাও উল্লেখ করবার মতো বিষয়। পত্রের শব্দ কারো সন্দেহ করার উপক্রম ছিল না যে, এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা ছাড়া আর কিছু। যারা বিচারপতি চৌধুরীকে শহীদের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন তারা এত গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছেন মাত্র। ঘটনাটি শুধু প্রমাণ করলো, কোনো ব্যক্তিই অপরিহার্য নয়।

www.pathagar.com

বিচারপতি চৌধুরীর সুবোধ আচরণ প্রমাণ করলো প্রেসিডেন্সি শাসন বিভাগের অধীন, যদিও কিছু বিষয়ে তার প্রাধান্য ছিল, বস্তুত প্রেসিডেন্ট ও আওয়ামী সরকারের মধ্যে একটি অস্বস্তিকর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই অস্বস্তিকর সম্পর্কের কারণ ছিল বাস্তব ক্ষমতার চৌহদ্দি নিয়ে নয়; বরং এর আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে। ক্ষমতার প্রয়োগে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যেসব আনুষ্ঠানিকতা পালন অপরিহার্য ছিল সেগুলোর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন নিছক অমনোযোগিতার কিংবা তুচ্ছ ভুল-ভ্রান্তির বিষয় ছিল না। পাকিস্তান সরকারের সহযোগীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার এখতিয়ার একমাত্র প্রেসিডেন্টের। এটি সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত। অথচ সংবিধানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে দিয়ে তখন প্রেসিডেন্টের অর্ডার ৮, ৯ ও ৫০-এর মতো খারাপ আইন বা অর্ডিন্যান্স পাস বা জারি করা হয়েছিল। সেইক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা মহানুভবতার নির্দেশটি তার হাত দিয়ে জারি করালে কিছুটা হলেও মন্দ কাজ ও ভালো কাজের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হতো। নিছক আনুষ্ঠানিকতা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরীর জন্য এটি হতে পারতো কিছুটা আত্মতুষ্টির বিষয়। ১৯৭৩'র ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরীর 'স্বর্গ থেকে বিদায়'-একব্যক্তি ও একদলের শাসনব্যবস্থা কায়েমের ইঙ্গিতবহ ছিল। সেই সময় 'সাপ্তাহিক হলিডে' সঠিকভাবেই ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৩-এ লিখেছিল 'The Subordination of the party to individual charisma began early enough, touching off fissiparous tendencies within the ruling party. The manifestations are clear. The al council has been put off twice, and as the crisis deepens the nation may witnes a lot of fire-works in the al congregation in late January, unless it is shifted again.

On the other hand, the prime minister is gradually leaning away from his own party in his pursuit of eternal glory and also away from the constitution.... and this is only the begining, We may witness many more, including the rebellion of some senior ministers like Mr. Tajuddin Ahamed and General M.A.G Usmany. Unlike Mr. Aby Sayeed Chowdhury. They may not choose to be so naive as to throw away their moral advantage. *(সূত্রঃ বাংলাদেশের দু'জন প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ ও রাজনীতি ভিন্নতর প্রেক্ষাপট, প্রফেসর মাহবুব উল্লাহ, মাসিক এশিয়া ডাইজেস্ট, ৫ আগস্ট, ২০০২)*

-o-

www.pathagar.com

ন্যাপ নেতা যাদু মিয়ার মুক্তিলাভ

১৯৭২ সালের প্রথম দিকে একমাত্র মওলানা ভাসানীর ন্যাপই ছিল একটি বড় ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিরোধীদল। সে দলে অবস্থান ছিল বড় নেতাদের। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন (১) ডঃ আলিম আল রাজী, (২) গাজী সহিদুল্লাহ, (৩) সলিমুল হক খান মিল্কী, (৪) আলহাজ্ব বজলুস সাত্তার বার এট ল, (৫) মুজিবুর রহমান চৌধুরী এ্যাডভোকেট, (৬) মশিয়ুর রহমান যাদু মিয়া, (৭) আবু নসর খান ভাসানী, (৮) আব্দুল করিম, (৯) নূরুর রহমান, (১০) আজাদ সুলতান, (১১) আলমগীর সিদ্দিকী, (১২) মওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ, (১৩) এসএসএ বারী এটি এডভোকেট, (১৪) এডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ।

এদের মধ্যে প্রথম গ্রেফতার করা হয় ন্যাপনেতা মশিয়ুর রহমান যাদু মিয়াকে। কোন অভিযোগ ছাড়াই সম্পাদিত হয় এই কর্মটি। মওলানা ভাসানী সরকারের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ পদক্ষেপের তীব্র প্রতিক্রিয়া ও নিন্দা জানান। ১৯৭২ সালের ২২ অক্টোবর থেকে সাপ্তাহিক হককথা বন্ধ হয়ে যাবার পর বস্তুত ন্যাপের কোন মুখপত্র ছিল না এবং সংবাদপত্রও সরকারের দমননীতির ভয়ে ন্যাপের বা মওলানা ভাসানীর সংবাদ তেমন ফলাও করে প্রকাশ করতো না। তাই বাধ্য হয়ে মওলানা ভাসানীর সহকর্মীরা বুলেটিন, প্রচারপত্র, মিনি মুখপত্র প্রভৃতি প্রকাশ করে ন্যাপের এবং মওলানা ভাসানীর অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। তেমন একটি মিনি মুখপত্রের নাম ছিল ভাসানী ন্যাপের মুখপত্র-এক। ঢাকা নগর ন্যাপের পক্ষে আজাদ সুলতান কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮০ পল্টন ঢাকা থেকে প্রচারিত সেই মুখপত্রে ভাসানীর 'ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে' শীর্ষক এক বিবৃতির বিবরণ ছিল এইভাবেঃ

ঢাকা, ১৭ মার্চ (বাসস) টাঙ্গাইলের সন্তোষ হইতে প্রেরিত এক তারবার্তায় মওলানা ভাসানী বলেন যে, ন্যাপ ও কৃষক সমিতির কর্মীদের হয়রানি করার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টিকারী একটি তথাকথিত প্রগতিশীল দলের তৎপরতার ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত করিবার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাইতেছি। আমি জানি যে, এই তথাকথিত প্রগতিশীল দল জনাব মশিয়ুর রহমান ও তাঁর দলের অন্যান্য কর্মীকে নানা অজুহাতে কারারুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকারের উপর চাপ দিয়া আসিতেছিল এবং ইহার দরুন দেশের জনগণের মধ্যে যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে ইহার জন্য এই তথাকথিত প্রগতিশীল দল ও ক্ষমতাসীন সরকারই দায়ী হইবেন। আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন এই দেশে এখন এ রকম ধারা অবাধে চলিতে থাকিলে দেশে একটি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। পরিশেষে আমার কর্মীদের প্রতি ন্যায়বিচার করিবার জন্য, পক্ষপাতহীন তদন্ত করিবার জন্যে কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানাইতেছি।'

এই মুখপত্রেই নগর ন্যাপের পক্ষ থেকে আহ্বায়ক মুজিবুর রহমান চিশতি এডভোকেট 'ন্যাপ নেতা মশিয়ুর রহমানের মুক্তি চাই' শীর্ষক এক নিবেদনে বলেনঃ

পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বশংবদ ফ্যাসিবাদী পশু সামরিক হানাদার গোষ্ঠী কর্তৃক নিদারুণভাবে বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করিয়া গড়িয়া তোলা দল, মত, ব্যক্তি নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক বাঙালির আজ একমাত্র কর্তব্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ সরকার সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে গড়িয়া তুলিবেন বলিয়া বহুবার শপথও ঘোষণা করিয়াছেন। এই সকল মহান লক্ষ্য, শপথ ও ঘোষণা মতে বাংলার জনগণ বাক-স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করিয়া সীমাহীন রক্ত, জীবন ও সম্পদের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। সেই স্বাধীনতা-গণতন্ত্র আজ আবার কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যবহার করিবার অশুভ প্রবণতাকে অবশ্যই বাধা দান করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করিবার জন্য ভয়ঙ্কর চক্রান্তে তৎপর রহিয়াছে। এই চক্রান্তের মোকাবিলা করিবার জন্য কোন বিদেশি শক্তির উপর নহে-দেশী শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে এবং বাঙালি জনগণের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা আজিকার অপরিহার্য কাজ। এই সকল বিশেষ জরুরি, দেশ গঠন ও জনকল্যাণমূলক কাজে স্বাধীন বাংলার প্রথম প্রবক্তা, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি খোলামনে ক্ষমতাসীন বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়াইয়া দিয়াছে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা গভীর বিস্ময় ও উদ্বেগের সাথে জানিতে পারিলাম যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগ্রামী নেতা, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব মশিয়ুর রহমানকে বিগত ১৩ মার্চ রংপুরের তথাকথিত প্রগতিশীল নামধারী কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানিতে সরকারি কর্তৃপক্ষ বিনা কারণে গ্রেফতার করিয়া রংপুরের কারাগারে আটক রাখিয়াছেন। কপালে সমাজতন্ত্রের লেবেল লাগাইয়া সুপরিকল্পিত উপায়ে ফ্যাসিবাদী গেস্টাপো বাহিনীর মতো ইতিপূর্বেও কে বা কাহারা দেশের বিভিন্নস্থানে ন্যাপের বহু-নেতা ও কর্মীকে গুপ্ত হত্যা, অপহরণ করিয়াছে আজ পর্যন্ত তাহারা কোন অনুসন্ধান, তদন্ত ও বিচার হয় নাই। জনাব মশিয়ুর রহমান বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় বামপন্থী নেতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাহার ভূমিকা কাহারো চাইতে কম নয়। মওলানা ভাসানীর ডাকে গত ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে 'স্বাধীন বাংলা দিবস' পালন উপলক্ষে যে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সভায় সকল প্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে দাঁড়াইয়া তিনি সোচ্চারভাবে স্বাধীনতার দাবি তুলিয়াছিলেন। ইতিহাস তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। বাংলার জনগণ সে কথা নিশ্চয়ই ভুলিয়া যায় নাই, ভুলিতে পারে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পশু খান সেনাবাহিনী জনাব মশিয়ুর রহমানের গ্রামের বাড়ি পোড়াইয়া দিয়াছে, তাহাকে গ্রেফতারের জন্য দস্যু, জল্লাদ খান সেনারা একাধিকবার গ্রামের বাড়ি-খগাখড়ি বাড়িতে হামলা চালাইয়াছে এবং তাহার সহকর্মী দুইজনকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। অথচ কোন রহস্যপূর্ণ কারণে, কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য জানি না জনাব মশিয়ুর রহমানকে গ্রেফতার করা হইল? তাঁহার এই রকম অহেতুক গ্রেফতারকে একটি উস্কানিমূলক আঘাত বলিয়া আমরা মনে করিতেছি। এই রকম হামলা, গ্রেফতার ও ক্ষমতা অপপ্রয়োগকে এক কথায় বাঙালি জনগণের মধ্যে অনৈক্য-বিভেদের বীজ বপনের শামিল এবং সরকারের বহু বিঘোষিত নীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া আমরা বিবেচনা করিতেছি। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষ হইতে আমরা বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ সরকারের "কথা ও কাজের" মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে জোর দাবি জানাইতেছি যে, জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষাকল্পে কালবিলম্ব না করিয়া ন্যাপ নেতা জনাব মশিয়ুর রহমানসহ সকল দেশপ্রেমিক ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক

www.pathagar.com

জানাইতেছি যে, জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষাকল্পে কালবিলম্ব না করিয়া ন্যাপ নেতা জনাব মশিয়ুর রহমানসহ সকল দেশপ্রেমিক ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক রাজবন্দিদের মুক্তি দান করিবার নির্দেশ করিবেন। এই সঙ্গে আমরা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষ হইতে জোর দাবি পেশ করিতেছি যে, বাংলাদেশের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের রক্ত, জীবন ও সম্পদের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জন করা হইয়াছে সেই স্বাধীনতার স্বাদ বাংলার আপামর জনসাধারণ বিশেষ করিয়া নিষ্পেষিত কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনগণ যাহাতে সমভাবে ভোগ করিতে পারে তাহার জন্য অবশ্যই ক্ষমতাসীন সরকারকে কালবিলম্ব না করিয়া-

(১) জনগণ যাহাতে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ধান, চাল, কেরোসিন তৈল, সরিষার তেল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাইতে পারে তারজন্য কঠোর হস্তে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) চোরাচালান বন্ধ করিবার জন্য সীমান্ত বন্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) চোরাকারবারী, মুনাফাখোরী বন্ধ করিতে হইবে।

(৪) লুটতরাজ, রাহাজানি, গুপ্তহত্যা, অপহরণ, গুণ্ডামী, চুরি-ডাকাতি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) দেশী মালের উৎপাদন বাড়াইয়া বিদেশি মালের উপর নির্ভরশীলতা কমাইয়া আনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যথায় দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। বাংলাদেশের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, আপামর জনগণের কাছে, প্রগতিশীল কর্মীদের কাছে নিম্নলিখিত দাবির ভিত্তিতে বাংলার আনাচে-কানাচে সভা, বৈঠক, মিছিল, বিবৃতি, পোস্টার, ফেস্টুন, গণস্বাক্ষরের মাধ্যমে জোর আওয়াজ তুলিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছি ঃ

※ ন্যাপ নেতা মশিয়ুর রহমানের আশু মুক্তি চাই।

※ দেশপ্রেমিক ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি চাই।

※ বাংলাদেশের সর্বত্র লুটতরাজ, রাহাজানি, গুপ্তহত্যা, অপহরণ, গুণ্ডামী, চুরি, ডাকাতি বন্ধ করিতে হইবে।

※ চোরাচালান বন্ধ করিবার জন্য অবিলম্বে সীমান্ত বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

※ চোরাকারবারী, মুনাফাখোরী বন্ধ কর।

※ দেশী মালের উৎপাদন বাড়ান, বিদেশি মাল বর্জন করুন।

※ ধান, চাল ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কমাও।

মওলানা ভাসানী ও ন্যাপের পক্ষ থেকে বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও মশিয়ুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে সরকার কোন কর্ণপাত করেননি। বিনা অজুহাতে আটক মশিয়ুর রহমানের বিরুদ্ধে তখন সরকার পাকিস্তানি দালালির অভিযোগ আনে। সরকারের এই হাস্যপদ অভিযোগের প্রতিবাদে তখন রংপুরবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়। তাতে বলা হয় ঃ

'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের নিকট রংপুর জেলাবাসীর পক্ষ থেকে খোলা চিঠি

www.pathagar.com

বিষয় ঃ **মশিয়ুর রহমানের মুক্তি।**

জনাব,

রংপুর জেলাবাসীর পক্ষ থেকে আমরা আপনার বিবেচনার্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিনয়ের সাথে পেশ করছি-

(১) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা জনাব মশিয়ুর রহমান দীর্ঘ কয়েক মাস হয় বিনা বিচারে বাংলাদেশ সরকারের কারাগারে আটক রয়েছেন। দীর্ঘদিন কারাগারে আটক থাকায় তিনি নানা প্রকার জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েছেন-স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারিভাবে অভিযোগ আনা হয়েছে কি-না বা হয়ে থাকলে তা কি প্রকৃতির অভিযোগ তা এখনও দেশবাসী জানতে পারেনি।

(২) কোন কোন সংবাদপত্রে এবং কোন কোন রাজনৈতিক মহল থেকে অবশ্য জনাব মশিয়ুর রহমানের বিরুদ্ধে নানাভাবে কুৎসা প্রচার ও তাঁর নামে নানাবিধ বানোয়াট অভিযোগ আনা হচ্ছে। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে তা লক্ষ্য করেছি।

(৩) যেহেতু সেসব কুৎসা এবং সেসব অভিযোগের মূলে কোনো সত্যতা আছে বলে আমরা মনে করি না এবং সেগুলো নেহায়েতই রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যমূলক তাই আপনার জ্ঞাতার্থে জনাব মশিয়ুর রহমানের রাজনৈতিক কার্যাবলী বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মতাদর্শগত লড়াই-এ তাঁর অবদান সম্পর্কে কয়েকটি কথা উল্লেখ করিতে চাই। অবশ্য আমরা জানি, জনাব মশিয়ুর রহমানের কার্যকলাপ সম্পর্কে আপনি ব্যক্তিগতভাবে সবকিছুতেই অবহিত।

(৪) ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠনের প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পর থেকে তাঁর গ্রেফতারের দিন পর্যন্ত জনাব মশিয়ুর রহমান সবসময় সর্বতোভাবে এ দেশের জনগণের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

(৫) ১৯৫৮ সালে সে কারণে তদানীন্তন সামরিক সরকার তাঁকে রংপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করেন।

(৬) প্রথম মার্শাল ল' উত্তর সময়ে এদেশের যে ক'জন নেতা গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট গঠনের কাজে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন জনাব মশিয়ুর রহমান তাঁদের অন্যতম। ১৯৬২ সালে তদানীন্তন জাতীয় পরিষদের তিনি আইয়ুব বিরোধীদল গঠনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং পরিষদে বিরোধীদলের সরকারি নেতা নির্বাচিত হন।

(৭) পরিষদের ভিতরে এবং বাইরে জনাব মশিয়ুর রহমানের সাহসী ভূমিকার জন্য তাঁকে আইয়ুব-মোনেম চক্রের কোপাদৃষ্টিতে পড়তে হয় এবং ১৯৬৩ সালে তিনি সামরিক আইনে গ্রেফতার হন।

(৮) ১৯৬৮-৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণআন্দোলনে জনাব মশিয়ুর রহমানের ভূমিকা অগ্রণীই ছিল। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং আপনার মুক্তির দাবিতে তিনিই প্রথম জাতীয় পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন।

(৯) ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের টোবাটেক সিং-এ তিনি প্রথম রাজনৈতিক নেতা প্রকাশ্যে সামরিক আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন এবং ইয়াহিয়া খানকে বাংলাদেশের স্বার্থের প্রতি সংঘাতক বলে আখ্যায়িত করেন। ফলে তাঁর ৭ বছরের কারাদণ্ড হয়।

www.pathagar.com

(১০) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ মওলানা ভাসানীর নির্দেশে তিনি পল্টন ময়দানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য আপনার প্রতি আহ্বান জানান।

(১১) ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের ভয়াল ঘটনাবলীর পর জনাব মশিয়ুর রহমান ভারতের কলকাতায় গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা আপনার জানা আছে। বিশেষ রাজনৈতিক মহলের ষড়যন্ত্রমূলক আচরণের জন্য তিনি পুনরায় দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন। কোন একটি রাজনৈতিক উপদল কলকাতায় তাঁকে পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করবারও চেষ্টা নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বিশ্বাসী একটি বামপন্থী দলের কর্মীদের সহায়তায় তিনি রংপুর (ডিমলা থানা) ফিরে আসতে সমর্থ হন। পশ্চিমবাংলায় মওলানা ভাসানী ও তাঁর দলের কর্মীদের উপর কি ব্যবহার করা হয়েছে এটা অনেকেরই জানা আছে।

(১২) জনাব মশিয়ুর রহমান যখন তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ফেলে ভারতে চলে যান তখন বর্বর পশ্চিম পাকিস্তান বাহিনী তাঁর বাড়ি সম্পূর্ণভাবে লুট করে।

(১৩) ভারত থেকে ফিরে জনাব মশিয়ুর রহমান আত্মগোপন করে মুক্তি সংগ্রামে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পাক-বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়ে পড়েন। হানাদার বাহিনী তার ওপর দৈহিক নির্যাতন চালায় এবং তাঁকে গ্রেফতার করতে গিয়ে তার বাড়ির একজনকে গুলি করে হত্যা করে। কলকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে তাহার দৈহিক নির্যাতন ও গ্রেফতারের সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

(১৪) মুক্তি পাবার পর তখনকার পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতার মধ্যে তিনি মুক্তি সংগ্রামের সাথে তাঁর সংযোগ রক্ষা করে চলেন।

(১৫) আজ যারা জনাব মশিয়ুর রহমানের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে পাক-বাহিনীর সাথে সহযোগিতার অভিযোগ আনার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে, আমরা তাদের কাছে অনুরোধ করছিঃ তাদের হাতে যদি জনাব মশিয়ুর রহমানের বিরুদ্ধে দাঁড় করবার মতো কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকে তবে তা প্রকাশ করা হোক। আমরা মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে তাঁর কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছি। তাঁর দালালি বা পাকবাহিনীর সাথে সহযোগিতার কোনো প্রশ্নই উঠে না।

(১৬) স্বাধীনতার পরও আমরা জনাব মশিয়ুর রহমানের রাজনৈতিক কার্যাদি লক্ষ্য করেছি। তিনি মনে করেন বর্তমানে পরিস্থিতিতে আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব সু-সংহত করার জন্য সবচাইতে বেশি প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য। বর্তমান সরকার এবং বিশেষ করে আপনার নেতৃত্ব সম্পর্কে তিনি দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল ছিলেন। আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে সরকারের সাথে সহযোগিতা করার পরামর্শই তিনি তার রাজনৈতিক সহকর্মী ও স্থানীয় জনসাধারণকে দিয়েছিলেন।

(১৭) এটা যদি কোন রাজনৈতিক অপরাধ হয় তবে জনাব মশিয়ুর রহমানকে অপরাধী বলা চলে। তবে আমরা মনে করি যে, আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে চক্রান্তের শেষ হয় নাই। আপনি একাধিকবার এ সম্পর্কে জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। সুতরাং যারা চক্রান্তের অংশীদার তারা স্বভাবতই চাইবে প্রথমেই আমাদের জাতীয় ঐক্যের ওপর আঘাত হানতে। জনাব মশিয়ুর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যারা সরকারের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করছে, তারা অসচেতনভাবে হলেও সেই চক্রান্তে সাহায্য করছে বলে আমাদের মনে করা অন্যায় হবে না।

www.pathagar.com

(১৮) জনাব মশিয়ুর রহমানের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে যদি আপনার মনে কোন প্রশ্ন দেখা দিয়ে থাকে তবে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠান করুন। তদন্তে যদি তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া যায় তবে উপযুক্ত শাস্তি তাঁর নিশ্চয়ই প্রাপ্য।

(১৯) আমরা যতটুকু খবর জানি, আজ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোন সঠিক তথ্যমূলক অভিযোগ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই।

আমরা ঐকান্তিকভাবে আশা করি সমস্ত কিছু বিবেচনা করে জনাব মশিয়ুর রহমানের মুক্তি দান করে আমাদের বাধিত এবং জাতীয় ঐক্যকে দৃঢ়তর করবেন।

আরজ ইতি-
মোঃ আবদুস সোহবান,
মোঃ মতিউর রহমান,
মোঃ রফিকুল ইসলাম এডভোকেট,
মোঃ আজহারুল হক (লুলু),
বাবু মৃণাল কান্তি,
মোঃ কার্জান আলী।

কিন্তু এত আবেদন-নিবেদন করার পরও সরকারের লাভাসুলভ মন গলিত না হওয়ার ফলে ৩০ জুলাই, ১৯৭৩ মওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে বলেন, 'বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার আমার দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব মশিয়ুর রহমানকে দীর্ঘদিন যাবৎ বিনা বিচারে কারাগারে আটক রাখিয়াছেন। তিনি আজ নানা প্রকার জটিল রোগে আক্রান্ত হইয়া দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছেন জানিতে পারিয়া আমি বড়ই উদ্বিগ্ন। কারান্তরালে মশিয়ুর রহমানের কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে সরকারকে এজন্য মারাত্মক পরিণতি ভোগ করিতে হইবে। কালবিলম্ব না করিয়া জনাব মশিয়ুর রহমানসহ সকল রাজবন্দির মুক্তির জন্য সরকারের নিকট দাবি জানাইতেছি।'

সরকার কারো মতামত ও দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে সময়ক্ষেপণ করতে থাকে। এ সময় সরকারের পদক্ষেপের বিরোধিতা করে ঢাকা শহর ন্যাপের পক্ষ থেকে আজাদ সুলতান ও সিরাজুল হক কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত এক প্রচারপত্রে বলা হয়, 'আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করছি যে, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম ন্যাপ নেতা মশিয়ুর রহমানকে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার বিনা বিচারের কারাগারে আটক রেখেছে। এর ফলে একদিকে তাহার পরিবার-পরিজন দারুণ অর্থ সংকটের মধ্যে কালাতিপাত করেছেন, অন্যদিকে তার স্বাস্থ্যের চরম অবনতি ঘটেছে। কোনো মানবিক বোধসম্পন্ন সরকার বিনা বিচারে এভাবে একজন জনপ্রিয় নেতাকে আটক করে রাখতে পারে না। জনাব মশিয়ুর রহমান এমনকি অপরাধ করেছেন? কি কারণে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে তা জানার অধিকার নিশ্চয়ই দেশবাসীর রয়েছে। তিনি যদি অপরাধী হন তাকে প্রকাশ্যে আদালতে বিচার করা হোক, অন্যথায় তাকে কালবিলম্ব না করে মুক্তি দেয়া হোক। এই সাথে হককথার সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীর আশু মুক্তির দাবি জানাচ্ছি। আইয়ুব, ইয়াহিয়ার আমলের মতো স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রকে হত্যা করার অশুভ প্রচেষ্টা জনগণ কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।'

উক্ত প্রচারপত্রে স্বাক্ষর করেন, ১. মুজিবুর রহমান চিশতী, সমন্বয় সম্পাদক ন্যাপ, ঢাকা, ২. আবদুল করিম, কেন্দ্রীয় ন্যাপ সংগঠক, ৩. মাহবুবুল্লাহ, কেন্দ্রীয় ন্যাপ সংগঠক,

www.pathagar.com

৪ রফিউদ্দিন আহমদ (ইন্তু মিয়া), কেন্দ্রীয় সংগঠক বাংলাদেশ কৃষক সমিতি, ৫. আজাদ সুলতান, কেন্দ্রীয় সংগঠক বাংলাদেশ কৃষক সমিতি, সভাপতি পাটুয়াটুলি ন্যাপ, ৬. শামসুল হক, আহবায়ক ঢাকা জেলা ন্যাপ, ৭. আবদুস সোবহান, আহ্বায়ক রংপুর জেলা কৃষক সমিতি, ৮. নাজির আহমদ, সভাপতি রাজারবাগ ইউনিয়ন ন্যাপ কমিটি, ৯. আবু সালেহ, সম্পাদক রাজারবাগ ন্যাপ, ১০. মুজিবর রহমান এডভোকেট, সভাপতি ধানমণ্ডি ন্যাপ, ঢাকা, ১১. মমিনুল হক চৌধুরী, সভাপতি খিলগাঁও ন্যাপ, ঢাকা, ১২. আবদুল হামিদ, সভাপতি দিলকুশা ইউনিয়ন ন্যাপ, ঢাকা, ১৩. ফিরোজ আল মোজাহিদ এডভোকেট, নারায়ণগঞ্জ, ন্যাপ ১৪. সিরাজুল হক মজুমদার, সভাপতি ফেনী মহকুমা ন্যাপ, ১৫. সিরাজুল হক (মন্টু), সংগঠক বরিশাল জেলা ন্যাপ, ১৬. এ কে এম কামরুজ্জামান, মুন্সীগঞ্জ মহকুমা ন্যাপ, ঢাকা, ১৭. আব্দুল মান্নান, সাবেক সভাপতি দেওয়ান বাজার ইউনিয়ন ন্যাপ, ঢাকা, ১৮. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদক, পাটুয়াটুলি ইউনিয়ন ন্যাপ, ঢাকা ১৯. শামসুর রহমান, সংগঠক ফরিদপুর জেলা ন্যাপ, ২০. নজরুল ইসলাম, সংগঠক বগুড়া জেলা ন্যাপ, ২১. সিরাজুল হক গোরা, সম্পাদক, আজিমপুর ইউনিয়ন ন্যাপ, ঢাকা, ২২. এম আলী আশরাফ, ইসলামপুর ন্যাপ, ঢাকা, ২৩. কাজী আনওয়ারুল আজিম মানিক, সভাপতি সীতাকুণ্ড থানা ন্যাপ, চট্টগ্রাম, ২৪. জাফর সাদেক, সংগঠক, ইসলামপুর ন্যাপ, ঢাকা, ২৫. আবু জাফর, আহ্বায়ক ফরিদপুর জেলা ন্যাপ, ২৬. আমেনা বেগম,বাংলাদেশ মহিলা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ২৭. জালাল আহমদ চৌধুরী এডভোকেট, সংগঠক পিরোজপুর ন্যাপ, বরিশাল, ২৮. মোঃ আবুল কাশেম, এডভোকেট, সভাপতি কমলাপুর শাখা ন্যাপ, ২৯. মোঃ আবদুল গনি, সভাপতি আজিমপুর ন্যাপ, ঢাকা, ৩০. ইফতেখার আজম, সম্পাদক ধানমণ্ডি শাখা ন্যাপ, ঢাকা, ৩১. মিয়া আব্দুল মজিদ, সংগঠক ইসলামপুর ন্যাপ, ঢাকা, ৩২. মোহাম্মদ আবুল হাশেম, সহ-সভাপতি বাকেরগঞ্জ জেলা ন্যাপ।

মশিয়ুর রহমানের গ্রেফতারের সঠিক কারণ সরকার উপস্থাপন করতে পারেনি বিধায় ১৯৭৪ সালের প্রথমদিকে উচ্চ আদালতের নির্দেশে তাকে মুক্তি প্রদান করা হয়।

www.pathagar.com

বিশেষ ক্ষমতা আইন বিল পাস

১৯৭৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পাস করা হয় শতাব্দীর জঘন্যতম কালাকানুন বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪। বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় নিবর্তনমূলক আটকাদেশের বিধান সংবিধান কর্তৃক ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার হরণের পথকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। বিশেষ ক্ষমতা আইনের ব্যবহার বা অপব্যবহার যাই বলি না কেন, তা যেন মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক কার্যকরী উপাদানে পরিণত হয়েছে। বিশেষ ক্ষমতা আইন Prejudical activities-এর বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার লক্ষ্যে কার্যকরী করা হয়। এ আইনের অধীনে দ্রুত বিচার এবং উপযুক্ত শাস্তিরও ব্যবস্থা করা হয়। এই আইন দ্বারা সরকার যে কোন ব্যক্তিকে কোন কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য (অপরাধ না করলেও) আটক রাখতে পারবেন এবং তার বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য অভিযোগ আনা হলেও তিনি জামিনের সুযোগ পাবেন না, প্রেস সেন্সরশীপের ব্যবস্থা নিতে পারবেন, সংগঠন গঠনের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ ও নিষিদ্ধ করতে পারবেন। এই আইনে এমনসব বিধি-নিষেধ অন্তর্ভুক্ত হয় যার ফলে পত্র-পত্রিকায় প্রায় কোন কিছুই লেখা সম্ভব ছিল না। *(সূত্রঃ অনিকেত, দৈনিক বাংলা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)*

Prejudical Act বলতে এই আইনের মতে any act Which is intended or likely

i. To prejudice the sovereignty or defense of Bangladesh;

ii. To prejudice the maintenance of friendly relations with Bangladesh;

iii. To prejudice the security of Bangladesh or to endanger public safety or the maintenance of public order;

iv. To crate or excite feelings of enmity or hatred between different communities, classes or sections of people;

v. To interfere with or encourage or incite interference with the administration of law or the maintenance of law and order;

vi. To prejudice the maintenance of supplies and services essential to the community;

vii. To cause fear or alarm to the public or to any section of the public;

viii. to prejudice the economic or financial interests of the state'.

উপরোল্লিখিত 'Predudical act' এর ব্যাপকাকৃতির সংজ্ঞাগুলো আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মানবাধিকার লঙ্ঘনের পথকেই সবসময় আরো প্রশস্ত করেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ এই আইনের বলে যে কাউকে ৬ মাস পর্যন্ত আটকিয়ে রাখতে পারে, যা Advisory Board-এর অনুমোদনসাপেক্ষে এর বেশি সময়ের জন্যও হওয়া সম্ভব। এই আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ আটকাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আটকাদেশ প্রাপ্তির সময় বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার আটকাদেশের কারণ সরবরাহ করবে, যা কোনমতেই ১৫ দিনের চেয়ে বেশি হবে না। এছাড়াও আটকাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আটকাদেশ দেয়ার ১২০ দিনের মধ্যে Advisory Board-এর সামনে হাজির করা এবং Board-এর আটকাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির বক্তব্য শোনার পর তাদের তদন্ত রিপোর্ট ১৭০ দিনের মধ্যে সরকারকে দেয়ার বিধান বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা হয়েছে।

www.pathagar.com

১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চে জাসদের উপর নিপীড়ন

জাসদের জন্ম হয়েছিল আওয়ামী সরকারের ফ্যাসিবাদ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ হিসেবে। আওয়ামী লীগের ভিত্তি ও শেখ মুজিবের ইমেজ ধ্বংস করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছিল জাসদ। জাসদ ব্লাস্ট করে দিয়েছিল 'মুজিববাদ'-কে। কোনো জাসদ নেতা বা জাসদের মুখপত্র 'দৈনিক গণকণ্ঠ' কখনোই 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি ব্যবহার করেনি। জাসদই ১৯৭২-১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগকে আনপপুলার ও জনবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।

জাসদের জন্মলগ্ন থেকে ফ্যাসিবাদী শেখ মুজিবের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাকে রুখতে গিয়ে জাসদের ৩০ হাজার নেতা-কর্মীকে ১৯৭২ সালের ৩০ অক্টোবর থেকে ১৯৭৫ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত জীবন দিতে হয়েছে। রক্ষীবাহিনী, বিভিন্ন প্রাইভেট বাহিনী ও সরকারদলীয় মস্তানদের হাতে, বুলেটের তপ্ত আঘাতে, ধারালো রামদার আঘাতে সম্ভাবনাময় অনেক জীবনকে স্বাধীন বাংলাদেশে জীবন দিতে হয়। যশোরের জাসদের সহ-সভাপতি এডভোকেট মোশাররফ হোসেন, কুষ্টিয়ার হাসি, মন্টু, রঞ্জু, মানিক দাসগুপ্ত, হেলাল, হাদী, নুরু মাস্টার, আজিম হোসেন, আব্দুল লতিফসহ জাসদের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে প্রাণ হারাতে হয়। হাজার হাজার কর্মী হয়েছিল জেল-জুলুম ও অবর্ণনীয় শারীরিক নির্যাতনের শিকার। দেশব্যাপী অন্তত ৪০ হাজার যুবক ও ছাত্রকর্মীর লেখাপড়া ও ক্যারিয়ার চিরতরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বিরান হয়ে গিয়েছিল হাজার হাজার পরিবার। জাসদের এসব নেতা-কর্মীর প্রত্যেকেই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে দেশপ্রেমিক এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি ও লোভ-লালসামুক্ত সৈনিক।

১৯৭৪ সালে সংসদে জাসদ বিশেষ ক্ষমতা আইনের তীব্র সমালোচনা করেছে। বেরুবাড়ী হস্তান্তরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে বিনাবিচারে ছেড়ে দেয়ার তীব্র সমালোচনা করেছে। প্রেস এন্ড পাবলিকেশন এ্যাক্টের প্রতিবাদ জানিয়েছে। জাসদের মুখপত্রও ছিল নেতা-কর্মীদের মতো তেজোদীপ্ত। ২৮ জানুয়ারি ১৯৭৪ গণকণ্ঠ প্রকাশ করে, 'আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান জনাব শেখ ফজলুল হক মনি অবশেষে সরকারি দল এবং মুজিববাদী ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, শাসকদলে দুর্নীতিবাজ রয়েছে'।

১৯৭৪ সালের ১৫ মার্চ বায়তুল মোকাররমের বিশাল গণজমায়েতে জাসদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ মুজিবের সরকারকে আল্টিমেটাম দিয়েছিলেন।

দৈনিক গণকণ্ঠে (১৬-৩-১৯৭৪) 'সময় শেষঃ এবার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পালা' শীর্ষক সংবাদের বিবরণ মতে, 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেছেন, শেষ সময় পার হয়ে গেছে। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী জাসদ ঘোষিত জনগণের ২৯টি দাবি মেনে নেয়নি। আগামীকাল বিকেল তিনটায় পল্টন ময়দানে সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পর্যায় হিসেবে ঘেরাও আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। গতকাল বিকেলে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক গণজমায়েতে বক্তৃতা দানকালে জাসদ নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ক্ষমতাসীনরা কোনদিনই জনগণের ন্যায্য দাবি-দাওয়া মেনে নেয় না। অধিকার ছিনিয়ে

www.pathagar.com

আনতে হয়। বাংলাদেশের শোষিত-নির্যাতিত জনগণের দাবি আইয়ুব মানেনি, মোনেম মানেনি, ইয়াহিয়া মানেনি। চীনের চিয়াং কাইশেক, রাশিয়ার জার, জার্মানিতে হিটলার আর কিউবার বাতিস্তাসহ বিশ্বের কোন ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্ট শাসক ও শোষকগোষ্ঠী কোনদিনই সর্বহারা মেহনতি মানুষের ন্যায্য দাবি-দাওয়া মেনে নেয়নি। দেশে দেশে, যুগে যুগে অধিকারহারা জনগণ তাদের বাঁচার দাবিগুলো আদায় করে নিয়েছে সংগ্রামের মাধ্যমে। বাংলাদেশের জনগণও আইয়ুব-ইয়াহিয়াকে উৎখাত করেছে সংগ্রামের মাধ্যমে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের যুগ্ম সম্পাদক জনাব শাজাহান সিরাজ বলেছেন, এদেশের কৃষক শ্রমিক সর্বহারা, মেহনতি মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে উনত্রিশটি দাবি অর্জন করতেই হবে। এ দাবি কোন নতুন দাবি নয়। জনাব সিরাজ মন্তব্য করেছেন-মরেই তো আছি। আওয়ামী শোষণ ও শাসনে জর্জরিত বাংলার নিপীড়িত বঞ্চিত জনগণ এবার শেষবারের মত সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের দাবি আদায় করতে বদ্ধপরিকর। জনতার এ লৌহ দৃঢ় ঐক্যের সম্মুখে কোন শক্তিই দাঁড়াতে পারবে না বলে জনাব সিরাজ ঘোষণা করেন। জাসদ নেতা গণজমায়েতে উপস্থিত হাজার হাজার জনতার উচ্ছ্বসিত করতালির মাঝে ঘোষণা করেছেন আর আবেদন-নিবেদন নয়, এবার কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। জনযুদ্ধের কর্মসূচি। এ যুদ্ধ ভয়ঙ্কর। একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পরের দিনগুলোর চেয়েও মারাত্মক হবে এর রূপরেখা। সতেরই মার্চের পরে কোন ঘটনার জন্য সরকারই দায়ী থাকবে বলে জাসদ নেতা উল্লেখ করেন। জনাব সিরাজ তার বক্তৃতায় দেশের সমস্যা সমাধানে সরকারের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। রক্ষীবাহিনীর জনস্বার্থবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং বক্তৃতার এক পর্যায়ে উল্লেখ করেন, আরো কিছুদিন আওয়ামী চক্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে দু'মাসের মধ্যে চালের মণ চারশ' টাকা হতে বাধ্য। এই জনসভায় আরো বক্তব্য রাখেন নূরে আলম জিকু, শ্রমিক নেতা মেসবা উদ্দিন আহমেদ, সামসুজ্জামান মিন্টু এবং সভাপতিত্ব করেন আতিকুর রহমান।'

১৭ মার্চ দৈনিক গণকণ্ঠ বিশাল হেডলাইন 'আজ পল্টনে জাসদ-এর জনসভাঃ শোষিত জনতার ২৯ টি দাবি আদায়ের জন্য প্রত্যক্ষ কর্মসূচি দেয়া হবে'-শীর্ষক সংবাদে বলে, '**স্টাফ রিপোর্টার ॥** আজ ১৭ মার্চ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে জাসদ-এর জনসভা। শোষিত, নির্যাতিত মেহনতি মানুষের দাবি আদায়ের সংগ্রামের প্রত্যক্ষ কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে আজ বিপ্লবী পল্টনে। জনতার পল্টন আজ ঘোষণা করবে শোষক ও শোষণকে নির্মূল করার প্রত্যক্ষ কর্মসূচি। ঘেরাও আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যাপকতর সংগ্রামের যে সূচনা ঘটবে, শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে-বলে জাসদ-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে।'

শেখ মুজিবের ৫৪তম জন্মদিনে ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চে পল্টন ময়দানে সভা শেষে ২০ সহস্রাধিক নেতা-কর্মী ২৯ দফা দাবিসম্বলিত স্মারকলিপি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির অভিমুখে অগ্রসর হলে রক্ষীবাহিনী, পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা ব্যাপক গুলিবর্ষণ করে। বেইলী রোডের মিন্টু রোডের পিচঢালা কালো রাজপথ জাসদের নেতা-কর্মীদের রক্তে লালে লাল হয়ে যায়। জাফর, জাহাঙ্গীর, মোজাম্মেল হক, মাহফুজুল্লাহসহ বেশ কিছুসংখ্যক মিছিলকারী নিহত হয় এবং জলিল-রবসহ কয়েকশত নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে মৃতের সংখ্যা ১১ উল্লেখ করা হলেও জাসদ নিহতের

www.pathagar.com

সংখ্যা ৫০ বলে বিবৃতি প্রদান করে। জাসদ ঐ ঘটনাকে বিপ্লবের রিহার্সেল বলে আখ্যায়িত করে।

প্রধানমন্ত্রীর ৫৪তম জন্মদিনে কি ঘটেছিল তা ১৮ মার্চ সোমবার দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত রিপোর্ট হুবহু তুলে ধরলাম।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনের সম্মুখে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলিবর্ষণ
৬ জন নিহত॥ জলিল-রবসহ ১৭ জন গ্রেফতার

গতকাল (রবিবার) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ঘেরাও আন্দোলনের সূচনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও-এর সময় পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর গুলিতে ছয়জন নিহত, বহু আহত এবং জাসদ সভাপতি মেজর জলিল ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আ.স.ম রবসহ ১৭ জন গ্রেফতার হইয়াছেন। জনাব আ.স.ম. রব গুলিতে আহত অবস্থায় এবং মেজর জলিল প্রহারে আহত হইয়া গ্রেফতার হইয়াছেন। আহতদের মধ্যে ১৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তন্মধ্যে ৮ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ইহাদের মধ্যে ইডেন কলেজের ছাত্রী মুকুল দেশাই রহিয়াছেন। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রব এবং মেজর জলিল এবং ৫ জন ছাত্রীও রহিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণ

পল্টনের জনসভায় মেজর এম এ জলিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুরের বাসভবন ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর পরই বিরাট মিছিল আ.স.ম আব্দুর রবসহ জাসদ নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে মিন্টু রোড অভিমুখে যাত্রা করে। মিছিলটি বিকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুরের বাসভবনের চারিদিক দিয়া জমায়েত হয়ে শ্লোগান দিতে থাকে। সন্ধ্যা ৫টা ৫৫ মিনিটে বিক্ষোভরত জনতার মধ্য হইতে ৫টি ইট বাসভবনের আঙিনায় নিক্ষিপ্ত হয়। ৬টার সময় বাসভবনের দক্ষিণ-পূর্বদিকে ৮টি টিয়ার গ্যাস শেল ছোঁড়া হয়, ফলে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ইহার পর রক্ষীবাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুরের বাসভবনের গেটে এই সময় জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছিল। এই সময় পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী গুলি ছোঁড়ে মিছিলকে লক্ষ্য করে। দশ মিনিট পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী জনতার মিছিলে অনর্গল গুলিবর্ষণ করতে থাকে। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় সমস্ত অঞ্চলটি ফাঁকা হইয়া যায়। এই সময় মেজর জলিল ও আ.স.ম আব্দুর রবসহ কয়েকজনকে আহত অবস্থায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনের সম্মুখস্থ ফুটপাতে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে পুলিশ জলিল ও রবসহ ১৭ জনকে গ্রেফতার করিয়া সোজা ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যায়।

নিহতদের নাম

৬ জন হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে ৪ জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং দুই জন হলিফ্যামিলি হাসপাতালে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রদীপচন্দ্র পাল, মোজাম্মেল হক ও দুইজন অজ্ঞাতনামা এবং হলিফ্যামিলি হাসপাতালে জনাব মাহফুজুল্লাহ ও ঢাকা সিটি কলেজ জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের সম্পাদক জাহাঙ্গীর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

আহতদের তালিকা

আহতদের মধ্যে ৩৬ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রথমে ১৬ জনকে ভর্তি করা হয়। তাহাদের মধ্যে ৩ জন মারা যায়।

www.pathagar.com

এখন ১৩ জন ৫নং ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাচ্চু মিয়া, কাজী মোস্তফা, আবুল কাশেম, আব্দুল বারেক, শাহজালাল, ফরহাদ, আব্দুল হাই, শহীদুল্লাহ, আবুল হোসেন, মঈনুদ্দিন, শামসুদ্দিন আজাদ, মোহাম্মদ বেলায়েত ও একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। হলিফ্যামিলি হাসপাতালে মিস মুকুল দেশাই, জাহাঙ্গীর ও শহীদুল হক। ইহাদের মধ্যে মিস মুকুল দেশাই ও শহীদুল হকের অবস্থা গুরুতর। জলিল ও রবসহ ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলিয়া সর্বশেষ খবরে জানা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন মেজর এম এ জলিল, জনাব আ.স.ম আব্দুর রব, মিস মমতাজ বেগম, মাইনুদ্দিন খান বাদল, মিস রোজী, মিস বানু, মিস মিথুন, মিস লীনু, মিস বাণী, নাজিরউদ্দিন রশীদ, ইকবাল, জয়নুল আবেদীন, খন্দকার আজিজুল হক, মজিবুর রহমান চৌধুরী মজনু, বাবুল, আজহারুল হক ও আসাদুল্লাহ। ইহাদের মধ্যে রব পায়ে গুলিবিদ্ধ হইয়াছেন, জলিল প্রহৃত হইয়াছেন।'

২১ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে মওলানা ভাসানী জাসদের মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। মওলানা ভাসানী বলেন, 'ইত্তেফাক ঃ ২১-৩-১৯৭৪ ইং সন্তোষ হইতে প্রেরিত এক তারবার্তায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেনঃ গত মঙ্গলবার বিভিন্ন পত্রিকায় আমার নামে এনা পরিবেশিত যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে উহার সহিত আমার মূল বিবৃতির সম্পূর্ণ মিল নাই। মূল বিবৃতিতে আমি শুধু জাসদ আয়োজিত ঘেরাও মিছিলের উপর রক্ষীবাহিনীর গুলিবর্ষণেরই নিন্দা করি নাই, হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিশন দ্বারা রক্ষীবাহিনীর পদস্থ অফিসারদের বিচারও দাবি করিয়াছিলাম। বিবৃতিতে আমি ব্রিটিশ, আইয়ুব এবং ইয়াহিয়া শাসনামলের ফ্যাসিস্ট নীতির ফলাফল অনুধাবনের জন্যও সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই।'

এ ঘটনার পর জাসদের উপর নেমে আসে ব্যাপক দমনপীড়ন। জাসদ নেতাসহ বহু রাজবন্দিকে ঢাকা ও বিভিন্ন জেলার কারাগারগুলোতে বন্দি করা হয়। শেখ মুজিব আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে এক জনসভায় বলেছিলেন, তিনি ক্ষমতায় গেলে এই দেশের কারাগারগুলোকে পাটের গুদামে পরিণত করা হবে। কোনো রাজবন্দি তার শাসনামলে কারাগারে থাকবে না। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, শেখ মুজিবের নির্দেশেই জাসদের এবং বামদলের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের সমস্ত জেলখানা রাজবন্দিদের গুদামে পরিণত হয়েছিল। এক একটা জেলখানার সেলে ঘুমানোর জায়গা হতো না, রাজবন্দিদের পালাক্রমে ঘুমাতে হত। এক গ্রুপ ঘুমালে আরেক গ্রুপ দাঁড়িয়ে থাকত। অনাহার, অখাদ্য, চিকিৎসার অভাবে অনেক রাজবন্দি জেলখানায় মারা যেত, কেউ বা পাগল হয়ে যেত, কেউবা চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে যায়।

১৭ মার্চ শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করেই মুজিব সরকার বসে থাকেনি, জাসদের মুখপত্র দৈনিক গণকণ্ঠের ওপরও একই দিনে হামলা চালায়। দৈনিক ইত্তেফাকে ২১ মার্চ 'গণকণ্ঠ কর্তৃপক্ষের ভাষ্য' হেডলাইনে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে তারা বলেন 'দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকায় কর্তৃপক্ষের এক প্রেস রিলিজে দৈনিক গণকণ্ঠ প্রকাশিত না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বলা হয়, গত ১৭ই মার্চ রাত তিনটায় সময় তিন ট্রাক বোঝাই রক্ষীবাহিনী ও পুলিশ কোনরূপ সরকারি নির্দেশ ছাড়াই গণকণ্ঠ কার্যালয়ে প্রবেশ করে এবং সোমবারে প্রকাশিতব্য শেষ ফর্মা (১ ও ৮ পাতায়) মেশিন হইতে নামাইয়া ফর্মাটি ভাঙ্গিয়া ফেলে। তাহারা কার্যালয়ের প্রতিটি কক্ষের জিনিসপত্র তছনছ করে

www.pathagar.com

ও কর্মরত কর্মচারীদের উপর নির্যাতন চালাইয়া ৭ জনকে গ্রেফতার করে। একই সময় বাসভবন হইতে গণকণ্ঠ সম্পাদক কবি আল মাহমুদকেও গ্রেফতার করা হয়। একই সময়ে ছাপাখানা হইতেও সোমবারের শেষ ফর্মার সিলোফিন পেপারসহ প্লেটটি আটক করে। সোমবারের পত্রিকা প্রকাশ কার্যত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সোমবার ও মঙ্গলবার সারাদিন ও রাত ধরিয়া পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী কিছুক্ষণ পরপর গণকণ্ঠ কার্যালয়ে যাইয়া সেখানে কর্মরত সাংবাদিক ও কর্মচারীদের হুমকি দেয়া এবং রাতে কম্পোজ ম্যাটার ভাঙ্গিয়া সিলোফিন ও প্লেট লইয়া যায়। ইহাছাড়া টেলিফোনে ও প্রকাশ্য সাংবাদিক ও কর্মচারীদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হইতেছে; পত্রিকার বার্তা সম্পাদকসহ অন্যান্য সাংবাদিকরা প্রাণভয়ে বাড়িঘর ছাড়িয়া অন্যত্র রাত কাটাইতে বাধ্য হইতেছেন। কারাগারে গণকণ্ঠ সম্পাদকের (কবি আল মাহমুদ) সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, তাহাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে সাধারণ কয়েদীদের সহিত রাখা হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। তাহাছাড়া মফস্বল সংবাদদাতাসহ গণকণ্ঠ কার্যালয় হইতে গ্রেফতারকৃতদের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। কর্তৃপক্ষের ভাষ্যে সংবাদপত্রের সহিত জড়িত তিনটি ইউনিয়নের উদ্যোগকে অভিনন্দন করিয়া অবিলম্বে গণকণ্ঠ প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হয়।'

জাসদের ১৭ মার্চ ঘেরাওকালে রক্ষীবাহিনীর নির্মমতা সম্পর্কে মেজর জলিল লিখেছেন, 'আজ ১৭ মার্চ, ১৯৭৪ সাল......বেলা দশটা বাজতেই দেখা গেলো গোটা বিশেক বড় বড় ট্রাকভর্তি রক্ষীবাহিনী ও পুলিশ-এর আড্ডা জমেছে বায়তুল মোকাররমের সামনে আমাদের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে এবং পল্টনের আশেপাশে। বেলা দু'টো বাজতে আরো গোটা তিরিশেক ট্রাক ভর্তি সরকারি বাহিনী এলো। এছাড়া প্রধান প্রধান মোড়ে পুলিশ ভ্যানগুলোকে দাঁড়ানো দেখা গেলো। মনে হচ্ছে ওরা যেন নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার যুদ্ধে নামবে। প্রত্যেকের হাতেই ছিল আধুনিক অস্ত্র, এস.এল.আর, স্টেনগান, এলএমজি, গ্রেনেড। সরকারি বাহিনীকে এরকম যুদ্ধাবস্থায় সজ্জিত দেখে জনসাধারণ কৌতূহল বোধ করলো-এমন যুদ্ধ পরিস্থিতি কাদের ঠেকানোর জন্য? বিকেল তিনটা বাজতে না বাজতেই বিভিন্ন দিক থেকে জনতার ঢল নেমে এলো পল্টনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পল্টন উপচে লোকজন পার্শ্ববর্তী স্টেডিয়ামের নিচে-উপরে এবং গুলিস্তান বিল্ডিং পর্যন্ত জমাট বেঁধে গেলো ......অবশেষে মিছিলটি এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির গেটের সামনে ঘিরে দাঁড়ালো। উত্তেজিত জনতার শ্লোগান চলছে তখন পুরোদমে। দীর্ঘক্ষণ এমনি ঘিরে রাখার পর হঠাৎ অসংখ্য অস্ত্রধারী রক্ষীবাহিনী '.....' মতো ছুটে এলো গেটের দিকে। রাইফেলের বাঁট ও বেয়োনেট দিয়ে জখম করলো অসংখ্য ছাত্র-জনতাকে। লোকজন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছুটোছুটি শুরু করলো। আমি, আ.স.ম রব সামনে এসে রক্ষীবাহিনীকে খালি হাতেই বাধা দিতে লাগলাম.....অকস্মাৎ শুরু হলো বন্যার মতো গুলিবর্ষণ। এসএলআর, স্টেনগান সবগুলো টক্ টক্ ঠুস্ ঠাস, দুরুমদারোম শুরু হলো আপন আপন গতিতে। যেন শত শত দানব ছুটে আসছে, যে যেখানে পারলো শুয়ে পড়লো। নিরীহ, নিরস্ত্র জনতার আর্তনাদ শোনা গেলো চারিদিকে। এ যেন যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ শুরু হলো। মুহূর্তে গোটা মিন্টো রোডটি একপক্ষীয় যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নিলো। সন্ধ্যা তখন সবেমাত্র ঘনিয়ে এসেছে। অন্ধকারের গাঢ় ছায়া তখনো পড়েনি। মাটিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলাম একটি মেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আমার দিকে আসছে.....রাস্তার পাশে দু'জনের

www.pathagar.com

রক্তমাখা দেহ। অদূরে আরো কয়েকটি যুবক-যুবতীর রক্তমাখা স্তব্ধ শরীর পড়ে রয়েছে। রক্ষীবাহিনীর গুলি তখনো থামেনি। গাঢ় অন্ধকারের বীভৎসতা ভৌতিক হয়ে উঠছে। আহতদের মরণ আর্তনাদ, রক্ষীবাহিনীর শিকারী চিৎকার, গুলির শব্দ ফানা ফানা করে দেয় রাতের নিস্তব্ধতাকে। গোলাগুলি চলার সময়েই পুলিশের একটা ট্রাক এসে তাড়াতাড়ি আহত-নিহত অবস্থায় যারা গেটের সামনে পড়েছিল তাদের ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।' *(সূত্রঃ সূর্যোদয়ঃ মেজর জলিল, পৃষ্ঠা. ১৪৪-১৪৯)*

জাসদের ঘেরাও এবং অন্যান্য প্রকাশ্য দলের উপর সরকারি বাহিনীর নির্মমতা ও নির্যাতন সম্পর্কে মওদুদ আহমদ তার 'বাংলাদেশঃ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল' গ্রন্থে লিখেছেন, '......এই সময়ে মওলানার নেতৃত্বাধীন ন্যাপ এবং জাসদ উভয় দল তীব্র আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সংস্কারপন্থী অসংখ্য যুবকের সমর্থনপুষ্ট জাসদই সরকারের জন্য প্রধান হুমকি হিসেবে অবস্থান করতে থাকে। দেশব্যাপী জাসদের জনসভাগুলোতেও প্রচুর লোক সমাগম হতে থাকে। জনগণের কাছে জাসদই ছিল তখন বৃহত্তম বিরোধী রাজনৈতিক দল। ১৭ মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে জাসদ এক বিরাট জনসমাবেশ অনুষ্ঠান শেষে সরকারের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। জনসভায় জাসদ সরকারের নৈরাজ্য ও নির্যাতনের অবসানকল্পে শোষক শ্রেণীর এজেন্টদের ঘেরাও-এর কর্মসূচি সম্বলিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঢাকা থেকে এই ঘেরাও অভিযান শুরু হয় এবং একই দিন রেডক্রসের চেয়ারম্যান, মহল্লা ত্রাণ কমিটির চেয়ারম্যান, বেআইনী বাড়ি-গাড়ি, জমি-সম্পত্তির দখলদার, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা, ভূয়া লাইসেন্সধারী, সরকারের আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের অফিস, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কেন্দ্রীয় কারাগার, সচিবালয়, পরিকল্পনা কমিশন, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের অফিস ও বাসগৃহ, রেডিও-টিভি ও সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র, রক্ষীবাহিনীর কার্যালয় এবং সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান ঘেরাওয়ের কর্মসূচি গ্রহণ করে। একই দিনে জাসদ মিন্টো রোডে অবস্থিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওয়ের মাধ্যমে ঘেরাও অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। জাসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে জনসভা শেষে একটি বিশালাকার বিক্ষোভ মিছিল স্মারকলিপি হস্তান্তরের জন্য পল্টন ময়দান থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন অভিমুখে রওয়ানা হয়। মিছিলটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করলে সেখানে উত্তেজিত জনতার সাথে কর্তব্যরত পুলিশ বাহিনীর এক খণ্ডযুদ্ধ শুরু হলে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রক্ষীবাহিনী তলব করা হয়। সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে। যদিও দুইপক্ষই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছিল বলে অভিযোগ পাওয়া যায়, তথাপি এই গুলিবর্ষণের ফলে মূল্য দিতে হয়েছে বিক্ষোভকারীদেরই। গুলিবর্ষণে সরকারিভাবে ছয় জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই সংঘর্ষে নিহত হয় ১২ জনেরও বেশি এবং শতাধিক ব্যক্তি আহত হন এবং জাসদের সভাপতি এম এ জলিল ও সাধারণ সম্পাদক আ.স.ম আব্দুর রবসহ ২০ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরদিন আওয়ামী লীগ জাসদের ওপর একটা পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে আরো প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। সরকার যেখানে জাসদকে ধ্বংসযজ্ঞে নিয়োজিত রাষ্ট্রবিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন, সেখানে আওয়ামী লীগ একে চীন-মার্কিন দালাল হিসেবে চিহ্নিত করে বলে যে, এরা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে সরকারের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি ব্যাহত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সেদিন আওয়ামী লীগ জাসদকে

www.pathagar.com

স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র এবং উন্নয়নের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে ঢাকা শহরে নানা ধরনের অস্ত্রসজ্জিত লোক সমন্বয়ে বিরাট এক মিছিল বের করে। তারা জাসদের নেতা-কর্মীদের শাস্তি দাবি করে ও বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে অবস্থিত জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় পুড়িয়ে দেয়। রক্ষীবাহিনী একই রাতে জাসদের মুখপত্র দৈনিক গণকণ্ঠ অফিসের দখল গ্রহণ করে এবং গণকণ্ঠের সম্পাদক আল মাহমুদকে আটক করে জেলখানায় পাঠায়। ঘেরাও মিছিলে জাসদ কর্মী হত্যা এবং দলের অফিস আক্রমণের প্রেক্ষিতে দেশের প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল সরকারি ভূমিকার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে। পরদিন সরকার দেশব্যাপী প্রায় প্রত্যেকটি জেলা ও মহকুমায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। শত শত জাসদ কর্মীকে আটক করে জেলে পাঠানো হয়। এতে করে প্রচুর সংখ্যক জাসদ নেতা ও কর্মী জেলে থাকায় এবং আওয়ামী লীগ জাসদকে শায়েস্তা করার নামে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করায় দলের অন্যান্য কর্মীরা হতোদ্যোম হয়ে পড়েন। বিক্ষোভ প্রশমিত হলে সরকার ক্ষমাহীনভাবে জাসদকে শায়েস্তা করার জন্য মাঠে নামেন। এ সময় সরকারের প্রশাসনযন্ত্রের একটি সুসংগঠিত অংশকে জাসদের ওপর দমননীতি চালানোর জন্য লেলিয়ে দেওয়া হয়। এতে করে দেশের অন্যান্য মার্কসবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তাদের তৎপরতা জোরদার করতে শুরু করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টি, মোহাম্মদ তোয়াহা, আব্দুল হক, টিপু বিশ্বাস, ওয়াহিদুর রহমান ও অন্যান্যের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট গ্রুপগুলোর বিভিন্ন অংশও ক্রমশ সক্রিয় হতে থাকে। জাসদের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ শুরু হওয়ায় দলের অসংখ্য কর্মী আন্ডারগ্রাউন্ডে আশ্রয় নেন। পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন গুপ্ত সংগঠনের মাধ্যমে সশস্ত্র গ্রুপ তৈরি করে দেশের রাজনৈতিক প্রবাহে নতুন ধারা সংযোজনের প্রত্যয় নিয়ে আবির্ভূত হন।'

১৯৭৪ সালের চট্টগ্রামের উপ-নির্বাচনে জাসদের প্রার্থীর পক্ষে চট্টগ্রামে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। এই গণজোয়ারে ভীত হয়ে আওয়ামী সরকার চট্টগ্রাম পুলিশের দ্বারা জনসভাগুলোতে মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেয়। বিনা মাইকেই খণ্ড খণ্ড জমায়েতে চট্টগ্রাম শহর ও শহরতলীতে জাসদের নেতারা বক্তৃতা দিতে থাকেন। সমস্ত গণজোয়ারকে উপেক্ষা করে, চট্টগ্রামবাসী ভোটারদের ভোটকে বানচাল করে দিয়ে উপ-নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জোর করে জাসদের প্রার্থীর বিজয়কে ছিনিয়ে নেয়। ১৯৭৪ সালের রাজপথের আন্দোলন, পার্লামেন্টে প্রতিটি কালাকানুনের তীব্র বিরোধিতা করা, দেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ, আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি এই অবস্থায় আওয়ামী লীগ দিশেহারা হয়ে পড়ে।

১৯৭৪ সালের শেষ দিকে শেখ মুজিব জাসদের ৩ জন এমপিকে তাঁর (প্রধানমন্ত্রী) কার্যালয়ে ডেকে পাঠান। ময়েন উদ্দিন আহামেদ মানিক, আব্দুস সাত্তার এবং আব্দুল্লাহ সরকার সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গেলে তিনি বললেন, 'তোরা কেমন আছিস? রব, সিরাজ (সিরাজুল আলম খান) কেমন আছে?' ময়েন উদ্দিন আহামেদ মানিক সাথে সাথে উত্তর দেন, 'রব ভাই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অত্যন্ত খারাপ সেলে আছে। তার সাথে আত্মীয়-স্বজনদের দেখা করতে দেয়া হয় না। আর দাদা (সিরাজুল আলম খান) পুলিশের তাড়ায় আত্মগোপন করে আছেন।' আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে শেখ মুজিব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন, 'রব, শাহজাহান সিরাজ আমার সাথে রাজনীতি করেছে। তারা আমাকে গালাগালি করলে আমি কিছু মনে করি না। কিন্তু তোদের মেজর জলিল। সে যখন পল্টন ময়দানের জনসভায় আমাকে গালি দেয়, সশস্ত্র বিপ্লবের

www.pathagar.com

কথা বলে তখন আমার সহ্য হয় না। সে কবে রাজনীতি করেছে? তাকে যে আমি ফাঁসি দেইনি-এটা তার ভাগ্য।' শেখ মুজিব ক্ষোভ থেকে হঠাৎ আবেগে ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বলেন, 'আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আমি একটা লোককেই দেখেছি যে রাজনীতি করে, অন্য কিছু পাওয়ার জন্য রাজনীতি করে না-সে সিরাজ (সিরাজুল আলম খান)'। শেখ মুজিব আবেগে কেঁদে ফেলেন। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে চোখের পানি মুছতে মুছতে ধীরে ধীরে নিজেকে সংযত করে জাসদ এমপিদের ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি বলেন, 'দ্যাখ তোরা (জাসদ) সমাজতন্ত্র চাস। আমিও চাই। এজন্য ঠিক করেছি-আমি একটি কৃষক শ্রমিকদের পার্টি গঠন করব। আমার লক্ষ্য হবে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করা। এজন্য এই পার্টি গঠন করে আমি (শেখ মুজিব) রেসকোর্সের জনসভায় সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানাব এই একদলে যোগদানের জন্য।' শেখ মুজিব আরও বলেন, 'যারা এই দলে যোগ দিবে না-তারা হবে দেশদ্রোহী। তাদের বাংলার মাটিতে স্থান হবে না।' শেখ মুজিব আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'দ্যাখ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী খুব ভাল মহিলা। সে বাংলাদেশের ভাল চায়। কিন্তু ভারতের মাড়োয়ারী গোষ্ঠী বাংলাদেশের ভাল চায় না। আমাদের কৃষকরা যখন ক্ষেতে পাট লাগায়, সে সময় গরিব কৃষকদের টাকা দিয়ে মাড়োয়ারীরা দাদন দেয়। পাট কাটার আগেই মাড়োয়ারীরা পাট কেটে নিয়ে যায়।' শেখ মুজিব বামপন্থী রাজনীতিবিদদের সমালোচনা করে বলেন, 'তারা মুখে বড় বড় বিপ্লবের কথা বলে কিন্তু তারা জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু আমি (শেখ মুজিব) সর্বদা মানুষের চাল, তেল, লবণ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উচ্চ মূল্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জনগণকে নিয়ে আন্দোলন করছি। জনগণের ছোট ছোট সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করছি। এজন্য বাংলাদেশের বড় বড় নেতারা রাজনীতি থেকে হারিয়ে গেছে। আমি রাজনীতিতে সফল হয়েছি।' শেখ মুজিব পরিশেষে বলেন, 'তোরাও যদি এই এক দলে যোগ না দিস-তোদের সংসদ সদস্য পদও থাকবে না।'

-০-

www.pathagar.com

জেনারেল ওসমানীর মন্ত্রিসভা ত্যাগ

১৯৭৪ সালে শেখ মুজিবের একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করেন। জেনারেল ওসমানী তাঁর সাথে একমত না হয়ে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যে লিখিত পদত্যাগপত্রে তিনি উল্লেখ করেন-

জেনারেল মুহম্মদ আতাউল গনি ওসমানী, পিএসসি (অবসরপ্রাপ্ত)
জাহাজ চলাচল, আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন এবং বেসামরিক বিমান দপ্তরের মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
ডি ও নং-০০১৪জি
১ মে '৭৪

আমার প্রিয় বঙ্গবন্ধু,

অনুগ্রহ করে স্মরণ করবেন যে, উপমহাদেশের রাজনীতি চর্চায় 'কপটতার' প্রকোপ ডিজরাইলীর ভাষায় 'ডিসসিমুলেশন' আরো স্পষ্ট বলতে গেলে প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান থাকার কারণেই ১৯৭০ সনে আমি রাজনীতিতে যোগদানের ব্যাপারে ঘোরতর অনিচ্ছুক ছিলাম। জাতীয় চাহিদা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বার্থে আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তার উপরে আপনি জোর দিয়েছিলেন। বিশেষ করে সামরিক ক্ষেত্রে সৈনিকদের অধিনায়কত্ব এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিকল্পনায় আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে পার্টি একজন সামরিক উপদেষ্টা লাভ করবে বলে জাতির সেবায় আমাকে আপনার সঙ্গে যোগদানের জন্য চাপ দিয়েছিলেন। বাঙালিদের স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রশ্নে আপনি কখনও আপস করেননি। তাই আপনি এবং আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্র ও সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত জনগণের সার্বভৌমত্ব, দেশরক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করবেন এমন নিশ্চয়তা প্রদানের পরই আমি রাজনীতিতে যোগদান করি। এটাও নিশ্চয়ই আপনার স্মরণ আছে যে, আমি বলেছিলাম ইংরেজি 'পলিটিকস' শব্দ বলতে আমি রাজনীতির পরিবর্তে গণনীতি বুঝে থাকি।

(২) তখন থেকে আমার অতীত জীবনের মতোই নিঃস্বার্থভাবে পূর্বোল্লিখিত আদর্শ বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গণপ্রতিনিধি, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও পরবর্তীকালে সংসদ সদস্য এবং জাহাজ ও বেসামরিক বিমান পরিবহনকে কার্যকরী, সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গড়ে তোলা এবং দেশের প্রধান প্রধান নৌ-পথগুলোর নাব্যতা রক্ষা ও নৌ-পথ পুনরুদ্ধার করার মহান দায়িত্বে নিযুক্ত মন্ত্রী হিসেবে আমি দেশ ও জাতির সেবা করেছি। এসব ক্ষেত্রে উৎসর্গীকৃত অফিসার কর্মচারীদের সহায়তায় আমি দেড় বছরের মধ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এবং অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছি। তবে আমার বলার উদ্দেশ্য এটা নয়, আমার উদ্দেশ্য হলো-এ সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে, কতিপয় মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে না হলে এক্ষেত্রে আরো অধিক সাফল্য অর্জন সম্ভব ছিল।

www.pathagar.com

(৩) মন্ত্রিসভা ও সরকারের সদস্যরূপে আপনার প্রতি-আপনি মন্ত্রিসভার নেতা ও সরকারপ্রধান-আন্তরিকতা ও আনুগত্য আমার একান্ত কর্তব্য। তদনুযায়ী আমি মৌখিকভাবে আপনাকে জানিয়েছিলাম যে, নিম্নলিখিত দুঃখজনক পরিস্থিতিতে যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি দলে যোগ দিয়েছিলাম তার কার্যকরী ও বলিষ্ঠ বাস্তবায়ন করতে অক্ষম বোধ করছি।

॥ক॥ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নতির ধারা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে একান্ত প্রয়োজনীয় ও জরুরি বিষয় যথা ঃ নীতি, নিয়োগ, অপসারণ ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্তের অনুমোদন স্থগিত রাখা এসব বিষয়ে অগ্রগতির জন্যে আমাদের সমগ্র প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে।

॥খ॥ আমাদের প্রতিশ্রুত নীতির পরিপন্থী ব্যক্তিবিশেষ বা কায়েমী স্বার্থের প্রবক্তাদের দ্বারা সহজে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা দলগতভাবে এবং সরকার হিসেবে দুর্নামের ভাগী হচ্ছি।

॥গ॥ আপাতদৃষ্টিতে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের নির্দিষ্ট নীতির অভাবে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছি। শহীদদের পরিবার ও প্রাক্তন সামরিক ব্যক্তিদের উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়েছে-যদিও এসব উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ ও নিবেদিত প্রাণ অফিসার এবং সামরিক ব্যক্তিদের ব্যতিরেকে বাংলাদেশের উদ্দীপ্ত সামরিক শৌর্যবীর্য ও ঐতিহ্য ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব ও তার পাঞ্জাবি জেনারেলদের প্রবল বিরোধিতার মুখে পঁচিশ বছরে গড়ে উঠতো না। এমনকি আপনার আহবানে মুক্তিযুদ্ধের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রারম্ভকাল হতে তাদের দৃঢ় সংকল্প ও শৌর্যবীর্যময় যুদ্ধ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হতো না। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বাঙালি প্রতিরক্ষা বাহিনী নির্জীব ও হতাশ হয়ে পড়েছে।

॥ঘ॥ জনগণের শ্রদ্ধা নেই এমন বিতর্কিত ব্যক্তিদের দলে স্থান দেয়া।

॥ঙ॥ দেশের জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থাপনারই একটি সুষ্ঠু সংবিধান যা ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসের নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, তার বিধান ও তাৎপর্য বাস্তবায়িত হোক-এটা কাম্য হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নে তার কোনো অংশ নেই।

(৪) এই দুঃখজনক পরিস্থিতিতে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও সেই সঙ্গে সংসদ সদস্য পদ থেকে আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করুন এবং তা গ্রহণের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি সুপারিশ জানান।

(৫) এবং এরই সঙ্গে আপনার ও মন্ত্রিসভার অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের কাছ থেকে যে সম্মান ও সৌজন্য আমি পেয়েছি সেজন্য আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে দিন। কারণ, আপনার অনুপস্থিতিতে তারাই আমাদের ইতিহাসের অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্তে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে রাজনৈতিক উপদেশ ও সমর্থন দিয়ে আমাকে সর্বাধিনায়কের দুর্বহ কর্তব্য পালনে সক্ষম করেছিলেন। আমি জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যদের নিকটও কৃতজ্ঞ তাঁরা আমাকে বিশেষ বিবেচনা ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

প্রতি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

স্বাক্ষর
মুহম্মদ ওসমানী

www.pathagar.com

ন্যাপের ভাঙন

স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম ধাপে ন্যাপে কোন দ্বন্দ্ব দেখা না দিলেও কয়েক বছরের মধ্যে তা তীব্র আকার ধারণ করে। ন্যাপের সে দ্বন্দ্ব বদরুদ্দীন ওমরের ভাষায় ছিল, '১৯৭২ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর কমিউনিস্টদের সাথে বিশেষত যে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলো ১৯৭১ সালের প্রথম পর্যন্ত কিছুটা সম্পর্কিত ছিল তাঁদের সাথেও মওলানার পরিপূর্ণ রাজনৈতিক বিচ্ছেদ ঘটে। কাজেই এরপর তাঁর নেতৃত্বাধীন ন্যাপে কমিউনিস্ট নামে পরিচয়দানকারী কোন গ্রুপের কেউ আর অবস্থান করেননি। *(সূত্রঃ কমিউনিস্ট আন্দোলন ও মওলানা ভাসানী, বদরুদ্দীন ওমর, শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম)*

বদরুদ্দীন ওমরের বক্তব্য থেকে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মওলানা ভাসানীর ন্যাপের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল মূলত কমিউনিস্টপন্থীরা। এই কমিউনিস্টপন্থীরা যখন মওলানার ইমেজকে ব্যবহার করতে অক্ষম হচ্ছিল তখন তাঁকে ছেড়ে নতুন রাজনৈতিক দল করতে বেশ মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। আর ন্যাপ ভেঙ্গে নতুন দল করার প্রথম পদক্ষেপ নেন প্রবীণ কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ, সিরাজুল হোসেন খান ও এনায়েতুল্লাহ খান প্রমুখ নেতা। তারা গঠন করেন, 'জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন' নামক আলাদা রাজনৈতিক দল।

জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার পর মওলানা ভাসানী ন্যাপকে টিকিয়ে রাখতে সক্রিয় হন। কিন্তু বয়সের চাপে তা ধীরগতিতে চলতে থাকে। তাঁর ধীরগতি চলার সুবাদে ন্যাপে আবার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই গ্রুপের মধ্যে ছিলেন কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন ও মাহবুব উল্লাহদের নেতৃত্বে 'কো অর্ডিন্যাশন কমিটি ফর কমিউনিস্ট রেভোল্যুশন' পন্থী নামে পরিচিত কমিউনিস্টরা। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মওলানা ভাসানীর সাথে এই গ্রুপের বিরোধ প্রকাশ্য রূপলাভ করে। এই গ্রুপটির অভিযোগ ছিল মওলানা ভাসানীসহ রাজী-মশিয়ুর-ব্যারিস্টার কামরুল ইসলাম, সালাহউদ্দিন প্রমুখ নেতা প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা পোষণ করেন। দলের প্লাটফরম থেকে 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার' শ্লোগান দেয়া হয়, কুরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়, কিন্তু মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিগত ইমেজের সামনে দাঁড়িয়ে এসব প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের বিরোধিতা করাও সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে ন্যাপের প্রবীণ গ্রুপটির অভিযোগ ছিলঃ জাফর-মেননপন্থীরা প্রকাশ্যে ভাসানীর নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন ও জড়িত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তারা দেবেন সিকদারের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জড়িত। তাছাড়া তারা ভারতের সিপিএম-এর সাথেও সম্পর্কযুক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়।

তৎকালীন সরকার ন্যাপের নেতা মশিয়ুর রহমানকে দালাল আখ্যায়িত করে কারাগারে নিয়ে যাওয়ায় এবং কাজী জাফরের ওপর হুলিয়া থাকায় ন্যাপের চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব শুরু হয়। উভয় গ্রুপ কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলে। তাই আর বলতে দ্বিধা নেই যে, ন্যাপের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্যে ক্ষমতাসীন সরকারের কৌশলই দায়ী। ন্যাপের অভ্যন্তরে চরম বাম ও সমন্বয়পন্থীদের দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট রূপলাভ করার পর চরমপন্থীরা

www.pathagar.com

নিজস্ব মুখপত্র হিসেবে বঙ্গবার্তা এবং অন্যদিকে সমন্বয়পন্থীরা ডিক্লারেশন বাতিলকৃত সাপ্তাহিক হককথাকে দৈনিকরূপে প্রকাশ করারও তোড়জোড় শুরু করে। উল্লেখ্য, সরকারের কাছে বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও হককথার ডিক্লারেশন পুনঃপ্রবর্তন করে দৈনিকরূপে প্রকাশের অনুমতি চেয়ে মওলানা ভাসানী বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন।

ন্যাপের বিরাজমান দুই গ্রুপের দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত আকার ধারণ করে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সন্তোষে অনুষ্ঠিত দলের জরুরি কাউন্সিল অধিবেশন। সে কাউন্সিলে ন্যাপ বস্তুত, দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক ভাগের নেতারা মওলানা ভাসানীর সকল নির্দেশ পালন করতে থাকেন। অপর ভাগের নেতারা মওলানা ভাসানীর সকল নির্দেশ অমান্য করে তাঁর বক্তব্য ও সাংগঠনিক পদক্ষেপের বিরোধিতা করে ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। এই কার্যকলাপে মওলানা ভাসানী বিরক্ত না হয়ে নির্দেশ অমান্যকারীদের নিয়মতান্ত্রিক ও সত্যনিষ্ঠ বক্তব্য প্রদানের আহ্বান জানিয়ে ২২ মে, ১৯৭৪ সংবাদপত্রে প্রেরিত এক বিবৃতি ও জনজ্ঞাতার্থে একটি প্রচারপত্র উপস্থাপন করেন। ন্যাপের পক্ষে যুগ্ম সম্পাদক আবদুল করিম কর্তৃক প্রচারিত ও দফতর সম্পাদক আজাদ সুলতান, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ১৫৯, শান্তিনগর কর্তৃক 'তথাকথিত বিপ্লবী নামধারী কমিউনিস্টদের প্রতি মওলানা ভাসানী' শিরোনামে প্রকাশিত বিবৃতি ও প্রচারপত্রের হুবহু বিবরণ ছিল নিম্নরূপঃ

'রাশেদ খান মেননের গতকালের প্রেস কনফারেন্সের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আমি শুধু দেশবাসীর নিকট ইহাই বলিতে চাই যে, তথাকথিত বিপ্লবী নামধারী কমিউনিস্টরা গত ত্রিশবছর যাবৎ আমার ঘাড়ে সওয়ার হইয়া রাজনীতি করিয়া বাজিমাৎ করিতে চায়। কিন্তু তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা মোটেই পূরণ করিতে পারে নাই। কারণ, আমি কোনকালেই কমিউনিস্ট ছিলাম না এবং বর্তমানেও নহি। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও হইব না। আমি আজীবন শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি, ইনশাআল্লাহ শেষ দিন পর্যন্ত তাহা করিয়া যাইব। আমি বারবার তাহাদিগকে বলিয়াছি আমার পাছে ঘুরিয়া "তথাকথিত কমিউনিজম" প্রচার করিয়া কোন লাভ হইবে না। তোমরা নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী পৃথকভাবে নিজে সংগঠন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা কর। একই ব্যক্তি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও ভিন্ন একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য হইয়া সমাজকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া কোন ফল হইবে না। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আমার ছত্রচ্ছায়ায় যাহারা রাজনীতি করে তাহারাই আবার পরে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে তাহাতে আমি মোটেই দুঃখিত নহি।'

মওলানা ভাসানীর বিবৃতি ও প্রচারপত্র উপস্থাপনের পর নির্দেশ অমান্যকারীরা ন্যাপের তথাকথিত জাতীয় 'রিকুইজিশন কাউন্সিল অধিবেশন' আহ্বান করে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র মোতাবেক জরুরি কোন সমস্যা সমাধানকল্পে চেয়ারম্যান 'রিকুইজিশন অধিবেশন' করে থাকেন। কিন্তু মওলানা ভাসানীর মতো দক্ষ সাংগঠনিক ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ১৫ জুলাই নির্দেশ অমান্যকারীরা 'রিকুইজিশন অধিবেশন' সম্পন্ন করে। সে অধিবেশনে প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক রাশেদ খান মেনন প্রদত্ত লিখিত ভাষণে বলেন, 'আমরা আজ এই রিকুইজিশন কাউন্সিল অধিবেশনে সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাচ্ছি। বলাবাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যেয়ে আমাদের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে তার পূর্ব আদর্শ ও ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নতুন রাজনৈতিক সাংগঠনিক অবয়ব দিতে হচ্ছে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এটা করতে যেয়ে আমাদের কতকগুলো অপ্রিয় অথচ অনতিক্রম্য দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

এমনকি মওলানা ভাসানী, যিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর সাথেও আমাদের নতুন রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সম্পর্ক নির্ধারণ করতে হচ্ছে.....।'

রাজী-মশিয়ুর-ব্যারিস্টার, ইসলাম-সালাহউদ্দিন প্রমুখ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে প্রকৃত জাতীয় গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি পার্টির এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকারীর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক নিয়মেই তুমুল আদর্শগত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানী পার্টির মধ্যকার এই অশুভ প্রবণতার বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করেননি; বরং তিনি পার্টির আদর্শ ও ঐতিহ্যবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করেছেন। তাছাড়া মওলানা সাহেব নিজেও বিভিন্ন সময়ে এমন সব বক্তব্য উত্থাপন করেছেন যা তাঁর ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সুতরাং ন্যাপের মধ্যে আজ যা চলছে, তা হচ্ছে আদর্শগত লড়াই-কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়.....বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি বর্তমান ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর বিশ্বাসঘাতকতার বিষময় ফল আজ অত্যন্ত উলঙ্গ চেহারা নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলাদেশে আজ লুটেরা, হাইজ্যাকার, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এক শ্রেণীর আমলা, পুঁজিপতি শ্রেণী ও সামন্ত প্রভুদের নির্মম শোষণ ও রাজত্ব চলছে। চলছে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক আধিপত্য। চলছে রুশ শাসকচক্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উলঙ্গ প্রয়াস। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও বসে নেই......বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর মূলত জাতীয় গণতান্ত্রিক শক্তির সমাবেশ বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে ঘটেছিল। বস্তুতপক্ষে, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিই হচ্ছে শাসকবিরোধী প্রধান রাজনৈতিক দল। শাসকবিরোধী অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে অবশ্য জাসদ-এর সংগঠন ও শক্তি কম ছিল না। কিন্তু প্রথম থেকেই জাসদ-এর রাজনীতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে নানা দ্বিধা ও সংশয় ছিল। ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী এবং আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠীর একটি অংশের সাথে তাঁদের গোপন সম্পর্ক রয়েছে বলে জনগণের মধ্যে একটি সাধারণ ধারণা বিদ্যমান। তাছাড়া, জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের স্তর অতিক্রম না করে এক লাফে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির কথা বলা এবং আন্দোলনকে ধাপে ধাপে বিকশিত না করে এক লাফেই শাসকগোষ্ঠীর সাথে সশস্ত্র মোকাবিলার কথা তাদের স্বরে ঘোষণা করাকে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখেছেন ১৭ মার্চের কর্মসূচির ব্যর্থতার ফলে জাতীয় রাজনীতিতে তারা কার্যকরী ভূমিকা অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে। ১৫ মে অনুষ্ঠিতব্য কাউন্সিলের ঠিক পূর্বমুহূর্তে মওলানা ভাসানী যেভাবে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ন্যাপের একটি নতুন এডহক কমিটি ঘোষণা করেছিলেন, তখন এই রিকুইজিশন কাউন্সিল অনুষ্ঠিত না করা পর্যন্ত আমাদের সাংগঠনিক কোনো সত্তা ছিল না। গণআন্দোলনের প্রত্যক্ষ কার্যকরী ভূমিকা পালনের ব্যাপারে আমাদের সুযোগ ও অবকাশ ছিল একেবারেই সীমিত। তবু ৩০ জুন ঢাকায় আমাদের পরিকল্পনা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ফলেই ১৪৪ ধারা স্ট্রাটেজিকভাবে ভঙ্গ করা সম্ভব হয়েছিল। হরতালেও আমাদের কর্মী বন্ধুরাই সীমিত সুযোগ নিয়েই অংশগ্রহণ করেছেন।'

উল্লেখ্য, রিকুইজিশনপন্থীরা সভা অনুষ্ঠানের পক্ষে নামের তালিকায় যে কাউন্সিল সদস্যদের নাম উল্লেখ করেন তাঁদের মধ্যে ১৩ জন নেতৃস্থানীয় কাউন্সিলের নোটিশে তাদের নাম দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। পাল্টা বিবৃতিতে তাঁরা বর্ষীয়ান নেতা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বের প্রতি তাঁদের পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করেন। অবশেষে ন্যাপের ভাঙন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। রিকুইজিশন অধিবেশনের পর মেনন-জাফরের নেতৃত্বে একটি অংশ ন্যাপ ভেঙ্গে ১৭ নভেম্বর, ১৯৭৪ ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউপিপি) গঠন করেন।

www.pathagar.com

ভাসানীর বন্দিজীবন

১৪ এপ্রিল ১৯৭৪ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী), জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের সমন্বয়ে চারদফা দাবির ভিত্তিতে সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্ট নামক মোর্চা গঠিত হয়। সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্টের চার দফা ছিল ঃ

(১)

(ক) রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি, রাজনৈতিক কারণে হুলিয়া, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও মিথ্যা রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার।

(খ) বিশেষ ক্ষমতা আইন, রক্ষীবাহিনী আইন, প্রেসিডেন্টের ৮ ও ৯ নং আদেশ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দমন আইন ও শ্রমিক দমন আইন বাতিল।

(২)

(ক) রক্ষীবাহিনী বাতিল করে উপযুক্তভাবে তাদের পুনর্বাসনকরণ।

(খ) দেশের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন ও সকল নাগরিকের জানমাল ও ইজ্জতের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান।

(৩)

(ক) গ্রাম ও শহরের সর্বত্র খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রয়োজনীয় রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনয়ন।

(খ) সকল প্রকার দুর্নীতি, চোরাচালান, মুনাফাখোরী, লাইসেন্স পারমিটবাজী দমন, অসদুপায়ে অর্জিত বা বেআইনীভাবে দখলকৃত ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধান এবং

(৪)

(ক) বাংলাদেশের শিল্প ব্যবসাসহ সামগ্রিক অর্থনীতিতে বিদেশি আগ্রাসন ও আধিপত্য থেকে মুক্তকরণ এবং

(খ) জাতীয় স্বার্থে সার্বভৌমত্ববিরোধী সকল বৈদেশিক চুক্তি বিশেষ করে ভারতের সাথে সকল গোপন ও অসম চুক্তি বাতিলকরণ।

স্বাক্ষরঃ

(১) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (চেয়ারম্যান) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিং),

(২) জনাব মশিউর রহমান (সদস্য) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিং),

(৩) ডঃ আলীম আল রাজী (সদস্য) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিং),

(৪) জনাব নূরুর রহমান (বিকল্প সদস্য) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিং),

(৫) জনাব অলি আহাদ (সদস্য) বাংলা জাতীয় লীগ,

(৬) কাজী জওয়াহেরুল ইসলাম (সদস্য) বাংলা জাতীয় লীগ,

(৭) জনাব আনসার ভানু (বিকল্প সদস্য) বাংলা জাতীয় লীগ,

www.pathagar.com

(৮) জনাব আতাউর রহমান খান (সদস্য) বাংলা জাতীয় লীগ,

(৯) মিসেস আমেনা বেগম (সদস্য) বাংলা জাতীয় লীগ,

(১০) হাজী মোঃ দানেশ (সদস্য) বাংলা জাতীয় লীগ,

(১১) জনাব সিরাজুল ইসলাম খান (সদস্য), জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন,

(১২) জনাব আবদুল ওয়াদুদ খন্দকার (বিকল্প সদস্য) জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন,

(১৩) খান সাইফুর রহমান (সদস্য) বাংলাদেশ শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল,

(১৪) জনাব মুখলেসুর রহমান (সদস্য) বাংলাদেশ শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল,

(১৫) জনাব রুহুল আমিন (সদস্য) বাংলাদেশ শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল,

(১৬) জনাব নাসিম আলী (সদস্য) বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী),

(১৭) জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার (সদস্য) বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী),

(১৮) জনাব হায়দার আকবর খান রনো (সদস্য) বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী)।

মওলানা ভাসানী চারদফার ভিত্তিতে ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু করলে সরকার এ সময় আন্দোলন নস্যাৎ করার প্রয়াসে দমননীতি পরিচালনার জন্য ২৪ এপ্রিল সেনাবাহিনী তলব করে এবং সাময়িকভাবে সর্বপ্রকার ধর্মঘট, লক আউট, বিক্ষোভ, শোভাযাত্রা বন্ধ বলে ঘোষণা দেয়। ফলে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং সরকার পরিস্থিতি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার, চোরাচালান দমন, সমাজবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধীদের আটক এবং খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মজুতদারী, মুনাফাখোরী রোধ করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী তলব করা হয়েছে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে। তথাপি জনসাধারণ সরকারের এই ভূমিকাকে তীব্র ভর্ৎসনা দৃষ্টিতে দেখেন। রাজনীতিতে সেনা হস্তক্ষেপের সঠিক পরিণতি অবলোকন করে ২৫ এপ্রিল মওলানা ভাসানী 'রক্ষীবাহিনী, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর প্রতি আমার অনুরোধ'-শীর্ষক এক দীর্ঘ বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রেরণ করেন কিন্তু সরকারি হস্তক্ষেপে তখন তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি।

মওলানা ভাসানী প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেন, 'বাংলাদেশের থানা, কোর্ট, কাচারী ও অন্যান্য অফিসের অধিকাংশই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আমলে নির্মিত হইয়াছিল। পাকিস্তান আমলেও কিছু নির্মিত হইয়াছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অতি নগণ্য হইলেও রাস্তাঘাট, চটকল, চিনির কল, সূতা ও কাপড়ের কল, চামড়ার ট্যানারী ইত্যাদি সমস্তই পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলাদেশ সরকারের আমলে কোনো শিল্প কারখানাই গড়িয়া উঠে নাই। নতুন যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা হইল একমাত্র রক্ষীবাহিনী ও সেনাবাহিনী। বাংলাদেশ সরকার দেশের আইন-শৃঙ্খলা, চোরাচালান, দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি দমনে ব্যর্থ হইয়া বর্তমানে রক্ষীবাহিনী ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে দেশ শাসন করিতে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। তাহাও আওয়ামী লীগের এম.পিদের নেতৃত্বে। প্রত্যেক জেলায় রক্ষী ও সেনাবাহিনীর পরিচালনার জন্য কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই-একথা আমি পল্টন ময়দানের জনসভায়ই পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করিয়াছি। বাংলাদেশের সরকারের অক্ষমতা, অজ্ঞতা, দুর্নীতির ফলে সরকার রক্ষী ও সেনাবাহিনীর সাহায্য শেষ সম্বল হিসেবে গ্রহণ করিয়াছে। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আওয়ামী লীগ সরকারের পরিচালকমণ্ডলী ও

www.pathagar.com

তাহাদের সমর্থকরা যখন দলীয় আদর্শ বিসর্জন দিয়া লুটপাট সমিতির সদস্য হইয়া দেশের সর্বনাশ করিতেছিল তখনই আমি বারবার তাহাদিগকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছিলাম যে, তোমাদের পাপের ভরাডুবিতে শুধু তোমরাই ধ্বংস হইবে না, দেশ ও জাতিকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। বিদেশি প্রভাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেও নিজেদের চরিত্র গঠন করিয়া দেশ শাসন করিলে সর্বপ্রকারের সংকট কাটাইয়া দেশের কল্যাণ তোমরাই করিতে পারিবে। কিন্তু আমার উপদেশ সরকার ও সরকারের সমর্থকগণ কেহই শোনে নাই। আমার দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সামরিক বাহিনীও যদি আমার শেষ উপদেশ না শোনে তাহা হইলে বাংলাদেশের যে সর্বনাশ হইবে তাহা হইলে দীর্ঘকালব্যাপীও দেশকে উদ্ধার করা সম্ভবপর হইবে না। প্রত্যেক দেশের সামরিক বাহিনীই বুকের রক্ত দিয়া বিদেশি শত্রু ও দেশীয় মীরজাফরদের কবল হইতে দেশকে বাঁচাইতে সক্ষম হইয়া থাকে। ইনশাল্লাহ আমাদের দেশের সামরিক বাহিনীও অন্য কোনো দেশের তুলনায় পিছনে পড়িয়া থাকিবে না। কারণ তাহারা মাত্র কিছুদিন পূর্বেই বিদেশি শোষক ও শাসকদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী লড়াই করিয়া দেশকে স্বাধীন করিয়াছে। তাই আজ তাহাদের নিকট আমাদের শেষ অনুরোধ, আপনারা দেশের মহাশত্রু চোরাচালান, ঘুষখোর, টাউট, চোর-ডাকাত, গুণ্ডা, অতিরিক্ত মুনাফাখোর, পারমিট শিকারীদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিয়া দেশকে ধ্বংসের পথ হইতে উদ্ধার করিতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করুন। ইহাতে দেশবাসী আপনাদিগকে ঐকান্তিক মোবারকবাদ জানাইবে। কিন্তু আপনারা যে কোনো অবস্থাতেই আওয়ামী লীগের লুটপাট সমিতির সদস্যদের মতো লোভে পড়িয়া দুর্নীতির পথে পা না দেন এবং নির্দোষ লোকদিগকে কাহারো পরামর্শে শাস্তি প্রদান না করেন। আমার উপদেশ গ্রাহ্য করিয়া প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের শায়েস্তার পরিবর্তে যদি বিরোধীদলের কর্মীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন এবং হিন্দুস্থান ও অন্যান্য দেশের যে চোরাকারবারীরা সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া আমাদের দেশকে ফকির বানাইতেছে তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন না করেন তাহা হইলে শুধু দেশের আপামর জনসাধারণের কোপানলেই পড়িবেন না, বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের গজবে ধ্বংস হইয়া যাইবেন। সরকারের আদেশ-উপদেশ অনুযায়ী কাজ করা অবশ্যই কর্তব্য, কিন্তু তাই বলিয়া সরকার ও সরকারপক্ষীয় এম.পি বা এডভাইজরী কাউন্সিলারদের অন্যায় আদেশ মাথায় বরণ করিয়া কিছুতেই বিরোধীদলীয় নেতা ও কর্মীদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করিবেন না। ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্য যাহারা আপনাদিগকে লেলাইয়া দিয়া নির্দোষ-নিরপরাধী মানুষকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক তাহাদের কথায় কিছুতেই কান দিবেন না এবং রুই-কাতলা বাদ দিয়া শুধু ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও শ্রমিক-কৃষকদের প্রতি দমননীতির স্টীমরোলার চালাইয়া বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বীর সামরিক বাহিনীর কলঙ্কময় ইতিহাস কিছুতেই সৃষ্টি করিবেন না-ইহাই আমার শেষ অনুরোধ।'

ন্যাপের নেতৃত্বের সংকট ও ফ্রন্ট নেতাদের ভূমিকায় দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও মওলানা ভাসানী চারদফা দাবি আদায়ের আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলেন। সভা-সমাবেশ করার পাশাপাশি বিবৃতি প্রদান অব্যাহত ছিল।

২ মে প্রদত্ত 'বাংলাদেশ সরকার ও সেনা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিকট আমার আরজ'-শীর্ষক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'দেশে দুর্নীতি, চোরাচালান ও অসৎ উপায়ে ভূয়া লাইসেন্স-পারমিট লইয়া সরকার ও জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করিয়া এবং হিন্দুস্থানের

www.pathagar.com

স্বার্থপর শোষক শ্রেণীর দ্বারা জালনোট তৈরি করাইয়া যাহারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে তাহাদিগকে শায়েস্তা করিতে আরম্ভ করিলে যতদিন পর্যন্ত ঐ সকল সমাজবিরোধী ও বিদেশের শোষকগোষ্ঠী মহাপাপীর দল ধ্বংস না হয় ততদিন দেশব্যাপী আপনাদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবে। তাই বলিয়া ইহাকে কেবল সাময়িক ব্যবস্থারূপে সমর্থন করিবে। কয়েকদিনের মধ্যেই বাংলাদেশের বীর সৈন্যদল দেশের বিভিন্ন মহাপাপী সমাজবিরোধীদিগকে শায়েস্তা করিতে যে তৎপরতা গ্রহণ করিয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি নিরপরাধ নির্দোষ বিরোধীদলীয় নেতা ও কর্মীদিগকে শায়েস্তা করিয়া পথের কাঁটা দূর করিবার কর্মসূচি যেন গ্রহণ করা না হয়। আমার উপদেশ অনুযায়ী কাজ না করিলে শুধু জনসাধারণই ক্ষেপিয়া উঠিবে না, বিশ্বস্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের গজবও শাসকগোষ্ঠীর উপর নামিয়া আসিবে। জনসাধারণ, সরকার ও সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের নিকট আমার বিশেষ আরজ, শুধু দুর্নীতি দমন করিলেই দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করা যাইবে না। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবল হইতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে রক্ষা করা যাইবে না যদি সম্মিলিতভাবে অতিরিক্ত ফসল জন্মাইয়া খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম আরম্ভ না করা হয়। এই কাজে নিষ্ক্রিয়তা ও শুধু রেডিও-টেলিভিশনের প্রচারের আভাস পরিত্যাগ করিয়া কৃষি বিভাগের মন্ত্রী ও প্রশাসকগণকে বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করিয়া জনগণের সহিত হাতে হাত মিলাইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। বৈশাখ মাসের মধ্যেই আমন, ইরি ধান যাহাতে উঁচু জমিতে লাগানো যায় তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। মাসকলাই, মুগকলাই, ঠাকরী কলাই, ভুট্টা, শসা, মিঠা লাউ, আমন, ডাঁটা ইত্যাদি তরিতরকারির ভাল বীজ ও সার এখন হইতেই গ্রামে গ্রামে পৌঁছাইয়া দিয়া কৃষকদের দ্বারা বুনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী মাসকলাই, ঠাকরী কলাই ও মগকলাই আশ্বিন মাসে বুনানী করা হয়। আমার বহু দিনের অভিজ্ঞতানুযায়ী বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বুনানী করিলে ভাদ্র মাসে উহা পাকিয়া উঠানো যাইবে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বুনানী করিলে ভাদ্র মাসে উহা পাকাইয়া উঠানো যাইবে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বৃষ্টির সময় উঁচু জমি কাদো করিয়া ধানের অংকুর গজাইয়া ছিটাইয়া বুনাইলে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি কাটিতে পারিবে। কটকের ডাঁটা ও অন্যান্য মোটা ডাঁটার চাষ বেশি পরিমাণে করিলে এক সিকি চাউল ও তিন ভাগ ডাঁটা দিয়া খিচুড়ি রান্না করিয়া খাইলে ভাতের মতোই খাদ্য হইবে এবং ইহাতে পেটে কোন অসুখ হয় না। বিলাস দ্রব্যাদি তিন-চার মাসের জন্য বর্জন করিলে যে কোটি কোটি টাকার খাদ্য সংগ্রহ করা যাইবে তাহার ব্যবস্থা অবিলম্বে করিতে হইবে। প্রতি মাসের মানুষের ওজন যে পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক মাসে অনাহারে মৃতের সংখ্যা ১৯৪২ সনের চাইতেও বেশি হইবে। তাই এখন হইতেই দলমত নির্বিশেষে দেশের মূল সম্পদ মানুষকে বাঁচাইতে হইবে। দেশ বলিতে শুধু নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, কোর্ট-কাচারী, শিল্প-কারখানা এবং নগণ্য সংখ্যক ধনিক-বণিককেই বোঝায় না বরং দেশের শতকরা ৯০ জন কৃষক, শ্রমিক, ভূমিহীন মজুর, কামার-কুমার, জেলে-মাঝি, তাঁতি-কন্নাতি, সূত্রধর, রিকশাওয়ালা, গরুর গাড়ি, টাঙ্গাওয়ালা প্রভৃতি শ্রেণীগুলিকেই বোঝায়। এই সকল মেহনতি মানুষ অনাহারে বেশিসংখ্যক মরিতে ধরিলে দেশে যে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবে তাহা ঠেকাইবার শক্তি সরকার ও সামরিক বাহিনীর কাহারও নাই। একবেলা খাবার দিয়া শুধু

www.pathagar.com

বন্দুক দেখাইলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা, লুটতরাজ, রাহাজানি ইত্যাদি কিছুতেই দমন করা সম্ভব হইবে না। তাই সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট আমার আবেদনঃ সকল প্রকার দলাদলি ভুলিয়া গিয়া বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করিয়া আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ বাঁচান।'

১৯৭৪ সালের ১৩ থেকে ১৬ মে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় নয়াদিল্লীতে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়ে সমাপ্তি দিবসে নিজ নিজ দেশের পক্ষে এক চুক্তি ও যুক্ত ইশতেহারে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরিত চুক্তি ও যুক্ত. ইশতেহার অনুযায়ী কার্যত ভারতের নিকট দাসখত প্রদান করা হয়। সংসদ নির্বাচনের মাত্র এক বছরের মাথায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আওয়ামী লীগ সরকারপ্রধানের এই পদক্ষেপের ফলে সারাদেশে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠে। মওলানা ভাসানীও এই পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করেন।

১ জুন 'জনগণ ও সেনাবাহিনীকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার পরিণাম শুভ হইবে না'-শীর্ষক এক বিবৃতিতে বলেন, 'চোরাচালান, কালোবাজারী, দুর্নীতি ও চুরি-ডাকাতি দমন এবং বে-আইনী অস্ত্রোদ্ধারের অভিযানে বাংলাদেশের বীর সেনাবাহিনীকে নিয়োজিত করার পর দেশবাসী আনন্দিত হইয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, চোরাচালানীরা আর এদেশের সম্পদ হিন্দুস্থানে পাচার করিতে পারিবে না, কালোবাজারীদের দৌরাত্ম্যের অবসান হইবে, জাতীয় জীবনে সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ ঘটিবে, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানিও বন্ধ হইয়া যাইবে। জনগণের ঐকান্তিক আশা ছিল যে, তাহাদের গর্বের ধন বীর সেনাবাহিনীর জরিয়তে চাউল-আটাসহ সকল খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পাইবে, এক বেলা অন্তত দু'মুঠো ভাত জুটিবে, দু'টি রুটির মুখ দেখা যাইবে এবং আর যাই হউক পিতা-মাতার সামনে কোন সন্তান মরিবে না। না খাইয়া সন্তানের সামনে পিতা মরিবে না। ওষুধের অভাবে, আহার জুটাইতে না পারিয়া কোলের শিশু বিক্রয় করিয়া কোন মাতাকে তার গলায় দড়ি বাঁধিয়া মরিতে হইবে না আত্মহত্যার যন্ত্রণাদায়ক পন্থায়। তাহারা ভাবিয়াছিল, দলমত নির্বিশেষে সকল কালোবাজারী, মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইবে সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ অভিযান। খাদ্যদ্রব্যের সাথে সাথে দাম কমিবে কাপড়েরও। পথে পথে ছিন্ন বস্ত্রধারীদের করুণ চেহারা আর চোখে পড়িবে না, সাধারণ মোটা শাড়ির অভাবে মা-বোনদের লুকাইয়া থাকিতে হইবে না লোক চক্ষুর অন্তরালে। কাফনের কাপড়ের অভাবে নদীতে ভাসাইতে হইবে না প্রিয়জনদের মৃতদেহ। কলা পাতায় ঢাকিয়া কাফন শেষে কাউকে কাঁদিতে হইবে না কাপড় ক্রয়ের অক্ষমতার জন্য। প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আরও অনেক আশায়ই উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল জনগণ। কারণ তাহাদের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস তাহারা ন্যস্ত করিয়াছিল তোমার নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী লীগ সরকারের উপর। কিন্তু তোমার সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, জনগণের সর্বনাশ সাধনে সদা ব্যস্ত চোরাচালানী, কালোবাজারী, সমাজবিরোধীদের প্রতি তোমার সরকারের প্রশ্রয় এবং সহযোগী মনোভাব, বাংলাদেশকে পদানত রাখার স্বপ্নে বিভোর হিন্দুস্থানী শাসকদের প্রতি তোমার অমানবিক ঔদাসিন্য জনগণকে শুধু হতাশই করে নাই, করিয়াছে বিক্ষুব্ধও। এমতাবস্থায় তাহাদের প্রধান ভরসা ছিল সেনাবাহিনী। জনগণকে সেই আশ্বাস দিয়াই সেনাবাহিনীকে নিয়োজিত করিয়াছিলে। জনগণের সাথে একযোগে আমি এবং অন্যান্য বিরোধীদলগুলি তাই তোমার পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করিয়াছিলাম। সেনাবাহিনীও প্রকৃত নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়াই তাহাদের অভিযানে অগ্রসর হইতে শুরু করিয়াছিল। কিন্তু মাত্র দুই সপ্তাহ তোমার দেরী সইল না, তাহাদের উপর চাপাইয়া দিলে নিষেধাজ্ঞার পর নিষেধাজ্ঞা। ধমকের কষাঘাতে করিয়া দিলে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ। তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিলে, পরিণত করিতে শুরু করিলে হিন্দুস্থানি শাসক-শোষক, দেশদ্রোহী চোরাচালানী -কালোবাজারী এবং

www.pathagar.com

তোমার দলের অপরাধীদের পা-চাটা গোলামে। অভিযানে নিয়োজিত হইবার পর প্রথম অবস্থায় বীর সেনাবাহিনী তাহাদের ওয়াদা খেলাপ করে নাই। তাহাদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এই সত্যই উদ্ঘাটিত হয়েছিল যে, যে দলকে তাহারা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়া স্বাধীন দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছিল সেই দলের নেতা ও সদস্যরাই হইল সকল অপরাধের স্রষ্টা, তাহারাই দেশ ও জনগণের সকল সর্বনাশের প্রধান হোতা। ইহারাই কোটি কোটি টাকার অস্ত্র-শস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়া বিরোধীদলীয় নেতা ও কর্মীদের হত্যা করিয়াছে গুপ্ত হত্যার ঘৃণ্য পথে, চোর-ডাকাতদের নিকট সেগুলি ভাড়া দিয়া দেশবাসীর সম্বল ও নিদ্রা লইয়াছে কাড়িয়া। তাই সঠিকভাবেই সেনাবাহিনী প্রথম আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে তোমার দলের আতে ঘাঁ লাগিল, ঘাঁ লাগিল দিল্লীর শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থেও। তাহারা হায় হায় করিয়া উঠিল, যেন বিরোধীদলের পক্ষ হইতে আমরাই সেনাবাহিনীকে মাঠে নামাইয়াছি। যাহাকে শোষিত-বঞ্চিত জনগণ অনেক বিশ্বাসে, অনেক মর্যাদায় জাতীয় নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে সেই তুমিই আর একবারের মতো দেশদ্রোহী ও হিন্দুস্থানি শাসকদের শিকারে পরিণত হইলে, নিজের সিদ্ধান্ত হইতে স্খলন ঘটিল তোমার। তাহাদের আদর্শেই তুমি সেনাবাহিনীর উপর চাপাইতে লাগিলে নিষেধাজ্ঞার বোঝা, তাহাদের স্বাধীন মর্যাদা করিলে পদদলিত ও কলঙ্কিত। এখন আর তাহারা প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে পারে না। কারণ, ধরিতে গেলেই তাহাদের পকেট হইতে বাহির হইয়া আসে তোমার সরকারের দেয়া পরিচয়পত্র যাহাতে লেখা আছেঃ পরিচয়পত্র বহনকারী নির্দোষ, সৎ ও দেশপ্রেমিক এবং তাহাকে গ্রেফতার বা অপদস্ত করা চলিবে না। সেনাবাহিনীর আবির্ভাবকালে যাহারা কৃত অপরাধের শাস্তির ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, সেনাবাহিনী যাহাদের ঘর-বাড়িতে তল্লাশি চালাইয়া উদ্ধার করিয়াছে অস্ত্র-শস্ত্র এবং আরও অনেক বে-আইনী দ্রব্যসামগ্রী, মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে তাহারাই আবার পথে পথে নির্ভয়ে ঘুরিতেছে বুক ফুলাইয়া-পকেটে তাহাদের পরিচয়পত্র। যাহাদের গুদামে পাওয়া গিয়াছে লক্ষ লক্ষ টাকার খাদ্য-শস্য, তাহারাও দেখি শাস্তির পরিবর্তে পাইয়াছে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা-তোমার সরকারের আশীর্বাদ এবং আশ্বাস। অন্যদিকে সেনাবাহিনীকেও রক্ষীবাহিনীর কায়দায় বিরোধীদলগুলির বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যেই তাহার লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, অযথা হয়রানি এবং গ্রেফতারের কবলে পড়িতেছে বিরোধীদলের নেতা ও কর্মীরা। কিন্তু তফাৎ এই যে, তাহাদের বেলায় আছে বিনা বিচারে কারাগার ও শাস্তির ব্যবস্থা, নাই শুধু তোমার সরকারের কোন পরিচয়পত্র। ইহাই যদি করিবে তবে কেন তুমি গালভরা বুলি আওড়াইয়া সেনাবাহিনীকে অভিযানে নামাইয়াছিলে? তাহাদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষতাকেই যদি পিষ্ট করিবে তবে কেন তাহাদের নিরপেক্ষ অভিযানের ক্ষমতা প্রদানের ধাপ্পা দিয়াছিলে। প্রকৃত অপরাধীদের বাদ দিয়া বিরুদ্ধ নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধেই যদি লেলাইয়া দিবে তাহা হইলে তোমার সরকারের পেটোয়া রক্ষীবাহিনীকেই কেন পূর্ণাঙ্গ হিংস্র পশুতে পরিণত করিলে না? নাকি উদ্দেশ্য তোমার অন্যত্র নিহিত ছিল? নিরপেক্ষ অভিযানের নামে প্রহসন সৃষ্টি করিয়া দেশের গৌরব, দেশবাসীর প্রধান ভরসা বীর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জনমত অংশ বেরুবাড়ি 'ভোগ' দিয়া ফারাক্কার পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান এবং স্বাধীনতার পর হিন্দুস্থানে লইয়া যাওয়া সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র ফেরত দানের কোনো ব্যবস্থা না করিয়াই বাংলাদেশের ভিতর দিয়া হিন্দুস্থানের মালবাহী রেল চলাচলের সম্মতি দিয়া যে চুক্তি তুমি সম্পাদন করিয়া ফিরিয়াছ তাহার বিরুদ্ধে যাহাতে জনমত প্রকাশ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইতে না পারে সেজন্যই কি সেনাবাহিনী নিয়োজিত করিয়া দেশবাসীর দৃষ্টি ঘুরাইয়া দিয়েছিলে? এইজন্যই কি স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক অধিকার কাড়িয়া লইয়াছ? দীর্ঘদিন এই বাংলাদেশে

www.pathagar.com

রাজনীতি করিয়াও তুমি জনমত এবং তাহাদের বিদ্রোহী চরিত্র উপলব্ধি করিতে পার নাই তা দেখিয়া দুঃখ হয়, করুণা জাগে ভাবিয়া। তুমি স্বাধীনতাকে হিন্দুস্থান ও রাশিয়ার কাছে বিকাইয়া দিয়াছ, জনগণকে গোলাম বানাইয়াছ, তাহাদের অনাহারে কষ্টকর মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছ। বিবস্ত্র করিয়া মা-বোনদের ইজ্জতহানি ঘটাইয়াছ, আইন-আদালতের প্রভুদের সেবাদাসে পরিণত করিলে, তাহাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া উঠিবার সুযোগ করিয়া দিলে। ইহাতে তোমার প্রভুদের মনোরঞ্জন হইতে পারে, কিন্তু যে দেশ ও জনগণকে তুমি ভালবাস বলিয়া জাহির কর, তাহাদের পরিণতি ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? জনগণ এবং বীর সেনাবাহিনীকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়া বিদ্রোহী বানাইলে তাহার পরিণাম শুভ হইবে না। হিন্দুস্থানের পারমাণবিক বিস্ফোরণে যে তাহারা ভীত হইয়া পিছাইয়া যাইবার মতো কাপুরুষ নয় এবং তোমার সরকারের ন্যায় যে তাহারা আত্মমর্যাদা বলিদানকারী গোলামে পরিণত হইতেও রাজি নয় এই সত্য উপলব্ধি করিয়া পদক্ষেপ পরিবর্তন না করিলে উহার ভয়াবহ পরিণামের জন্য তোমাকেই দায়ী থাকিতে হইবে। হিন্দুস্থান আর রাশিয়া তাহাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়াও মীরজাফরের পরিণতি হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না, গোলামির আনন্দে ইহাও কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? এখনো সময় চলিয়া যায় নাই, এখনো ফিরিবার পথ রুদ্ধ হয় নাই। তোমার শুভ বুদ্ধির উদয় ঘটিলেই দেশ ও জনগণ নতুন এক ভয়ংকর পরিস্থিতির কবল হইতে রক্ষা পাইবে বলিয়া তোমার প্রতি আমার আহ্বান ঃ তুমি আবার সংগ্রামী শেখ মুজিবুর রহমান হও-মনে রাখিও গোলাম মুজিবকে দেশবাসী সহ্য করিবে না।'

২ জুন বার লাইব্রেরিতে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঐক্যফ্রন্টের উদ্যোগে বেরুবাড়ী হস্তান্তর ও ফারাক্কা বাঁধজনিত সংকটের প্রতিবাদে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত হাজী মোহাম্মদ দানেশ, আতাউর রহমান খান, ডঃ আলীম আল রাজী, মশিয়ুর রহমান, অলি আহাদ প্রমুখ সরকারের পররাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা করে এই চুক্তিকে ভারতের নিকট বাংলাদেশের দাসখত হিসেবে চিহ্নিত করেন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, 'সরকার বিরোধীদলের সভা-সমাবেশে বাধা প্রদানের জন্য অগণতান্ত্রিক পন্থায় সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করেছে। এমতাবস্থায় বিরোধীদলের দাবি মেনে নিয়ে খাদ্য সমস্যা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি রোধে ব্যবস্থা না নিলে, সভা-সমাবেশের সুযোগদানের নিমিত্তে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার না করলে বা মেয়াদান্তে ১৪৪ পুনঃপ্রবর্তন করলে সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্ট ৩০ জুন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের মাধ্যমে দেশব্যাপী গণআন্দোলন শুরু করবে।'

উক্ত সভায় ৩০ জুন 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৫ জুন সরকার এক আদেশবলে ১৪৪ ধারা জারির মাধ্যমে ঐদিন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সারাদেশে প্রকাশ্যে জনসভা ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। উল্লেখ্য, ঐদিন থেকে ১৪৪ ধারা জারি করলেও মূলত ১৭ মার্চে জাসদ কর্তৃক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওয়ের পর থেকে সারাদেশে ১৪৪ ধারা জারি ছিল। সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২৬ জুন মওলানা ভাসানী প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে বলেন, 'তুমি আমাদের কর্মসূচি বানচাল করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছ। ইহা প্রত্যাহার করার জন্য আমি অনুরোধ জানাইতেছি। ৩০ জুনের সভার জন্য ১৪৪ ধারা তুলে না নিলে যদি কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সূচনা হয় তাহার জন্য তুমি ও তোমার সরকার দায়ী থাকিবে।'

২৮ জুন ফ্রন্টের সদস্য অলি আহাদ সরকারের আদেশ জারির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রীট করেন। এই রীটের রায় অনেক পরে ৯ সেপ্টেম্বর প্রদান করা হলেও তা কার্যত সরকারের বিপক্ষে যায়। বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিচারপতি আব্দুর

www.pathagar.com

রহমান চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টে ডিভিশন বেঞ্চ ২৫ জুন জারিকৃত ১৪৪ ধারা আদেশকে অবৈধ, বাতিলযোগ্য, আইনের এখতিয়ার বহির্ভূত ও সংবিধান বর্ণিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেন এবং অলি আহাদকে মামলার খরচ বাবদ ১৫ টি স্বর্ণমোহর তুল্য অর্থ প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দান করেন। সরকার উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার আবেদন জানায়। মাননীয় বিচারপতিগণ সরকারের এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

২৯ জুন মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৫৯, শান্তিনগরস্থ ন্যাপ কার্যালয় থেকে ৩০ জুনের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ও 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের লক্ষ্যে একটি মিছিল বের হয়। রমনা থানা পুলিশ বেদম প্রহার করলে মওলানা ভাসানী এবং শত শত কর্মী ও মানুষ আহত হন। ঐদিন দিবাগত রাতে হঠাৎ মওলানা ভাসানীকে মশিয়ুর রহমানের মগবাজারস্থ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে একটি জীপে তুলে সূর্য উঠার আগেই পুলিশ প্রহরাধীনে ঢাকা থেকে টাঙ্গাইলের সন্তোষে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সন্তোষেই ১৯৭৪-এর জুন থেকে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত তিনি গৃহবন্দি ছিলেন। মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ঐ দিন পল্টন ময়দানে জনসভা করার জন্য আতাউর রহমান খান, অলি আহাদ, হাজী দানেশ, আমেনা বেগম, নূরুর রহমান, মশিয়ুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত হন। কিন্তু বিপুলসংখ্যক মোতায়েনকৃত রক্ষীবাহিনী তাদের জনসভা পণ্ড করে দেয় এবং মশিয়ুর রহমান, নূরুর রহমান ও অলি আহাদকে বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪-এর মাধ্যমে গ্রেফতার করে ১২০ দিনের আটকাদেশ প্রদান করা হয়।

১ জুলাই মওলানা ভাসানী ও অন্য নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ঢাকায় হরতাল আহ্বান করা হয়। তবে সীমিত প্রচার থাকায় এবং সরকারের প্রচণ্ড দমননীতির কারণে হরতাল পুরোপুরি সফল হয়নি। অপরদিকে মওলানা ভাসানী বন্দিদশা থেকেও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে 'আমি গৃহবন্দি আন্দোলন চালিয়ে যাও' শীর্ষক এক ক্ষুদ্র প্রচারপত্রে বলেন-

প্রিয় দেশবাসী,

হিন্দুস্থান আর রাশিয়ার চক্রান্ত এইবার নতুন মোড় নিয়াছে। শেখ মুজিবকে দিয়া আমাকে সন্তোষের ঘরে গৃহবন্দি করা হইয়াছে। ৫০০ পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করিয়া আমার সকল স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বলিতে যতটুকু ছিল এইবার তাহাও হারাইতে বসিয়াছে। কিন্তু হতাশ হইবার কিছু নাই। জালেমের বিরুদ্ধে আপনারা আন্দোলন চালাইয়া যাইতে পারেন। আমার আকুল আহ্বান, দুর্বার আন্দোলন চালাইয়া যান। শত্রুর মোকাবিলা করুন। তাহাদের স্বপ্নসাধ চিরদিনের জন্য ধুলায় মিশাইয়া দিন। আল্লাহ আপনাদের সহায়। নিশ্চয়ই সত্যের জয় অনিবার্য।'

২ জুলাই সংসদে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী বলেন, 'মওলানা ভাসানীর নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে তাঁকে সন্তোষে প্রহরাধীন রাখা হয়েছে, গ্রেফতার করা হয়নি।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই উক্তি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মিথ্যা প্রমাণিত হয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি মওলানা ভাসানীর খোলাচিঠির মাধ্যমে। মওলানা ভাসানী এই চিঠির ফটোকপি দৈনিক ইত্তেফাক, আজাদ, দৈনিক বাংলা, জনপদ, পূর্বদেশ, বাংলাদেশ অবজারভার, দ্য পিপলস, বাংলার বাণী ও বাংলাদেশ টাইমসকেও প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন-

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী
বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

(১) ২৯ জুন আমার ও ঐক্যফ্রন্টের কর্মীদের উপর রমনা থানার পুলিশ যে দুর্ব্যবহার এবং প্রহার করিয়াছে তাহার তদন্ত করিয়া দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি জানাইতেছি।

(২) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দি এবং আমাদের ঐক্যফ্রন্ট এবং ছাত্রকর্মী ও নেতাদের আশু মুক্তিদানের জন্য দাবি জানাইতেছি।

(৩) ২৯ জুন দিবাগত রাত্রি ২।। (আড়াই) টার সময় মশিয়ুর রহমানের বাড়িতে আমাকে বহু পুলিশ ও উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসার ঢাকার এডিসির দস্তখতযুক্ত ডিটেনশনের অর্ডার দেখাইয়া ৩০ দিনের জন্য ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাখার জন্য গ্রেফতার করিয়া পরে সেন্ট্রাল জেলের রাস্তা পরিবর্তন করিয়া সন্তোষে কড়া পুলিশ পাহারায় নজরবন্দি রাখিয়াছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আইয়ুব শাহীর আমলে তোমার বাসার নিকট ৮ জন পুলিশ, ২ জন হাবিলদার, ২ জন ডিআই ওয়াচার, ১ জন সাব ইন্সপেক্টরের পাহারায় ধানমণ্ডিতে নজরবন্দি রাখিয়াছিল। আজ তোমার আমলে সন্তোষে অসংখ্য পুলিশ, হাবিলদার, এসআই, সাব এসআই, ১ জন পুলিশ সুপার যারা আমার বাসার চারদিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, এমনকি পায়খানা, পেসাবখানার রাস্তাও বাদ পড়ে নাই। আমার গরু ঘরেও পুলিশ আছে। সরকারের কোন ঘরের ব্যবস্থা নাই। আমার মেহমানখানায় (ছনের ঘর), ছেলে-মেয়ে থাকার ঘরেও পুলিশ পাহারা আছে। একজন ডিআই ওয়াচার আমার থাকার ঘরের দরজার সম্মুখে আমার বিবাহিত মেয়ের সম্মুখে যত্রতত্র সর্বদা পাহারা থাকে। বাড়ির ভিতরে আমার লোকজন ডিউটি ওয়াচারের পারমিশনে সেখানে তাহারা যাতায়াত করে : তোমার আমলে আমি এই অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করিব ইহা কল্পনাও করি নাই। অদৃষ্টের পরিহাস, তাই তুমি যত শীঘ্র পার অনুগ্রহ করিয়া আমার বাড়ির মেয়েদের পর্দা-পুশিদা রক্ষার জন্য নিজস্ব ঘরের বা তাঁবুর ব্যবস্থা করিয়া পুলিশ ও অফিসারদের রাখার ব্যবস্থা করিবে। অথবা টাঙ্গাইল বা অন্য কোন স্থানে আমার পরিবারবর্গসহ আমার স্থান পরিবর্তন করার ব্যবস্থা সত্বর করিবে। কর বৃদ্ধির ঘোষণা প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাপড়সহ সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। মূল্য হ্রাসের দাবি জানাইতেছি। যতদিন পর্যন্ত আমাকে নজরবন্দি রাখা হইবে ততদিন পর্যন্ত আমার জীবনের শেষ কাজ সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহাদী নির্মাণ ও শিক্ষা প্রদানের কাজ যাহাতে চালু থাকে তাহার ব্যবস্থা সরকার হইতে করার দাবি জানাইতেছি।'

মওলানা ভাসানীকে গৃহবন্দি করার পর কারও সাথে দেখা করার বা কাউকে সাক্ষাত প্রদান করতে দেয়া হয় নাই। এই চিঠি যেদিন প্রকাশিত হয়, সেদিনই দৈনিক ইত্তেফাকসহ কয়েকটি পত্রিকার প্রতিনিধি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথামতো মওলানা ভাসানীর সাক্ষাৎকার নিতে সন্তোষে যান। তখন মওলানা ভাসানীর বাড়িতে প্রহরারত পুলিশ অফিসার একজন ফটোগ্রাফারের ক্যামেরাটি ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে তা নষ্ট করে ফেলেন। তাদের সঙ্গে মওলানা ভাসানীর সাক্ষাৎ করতে দিতেও অস্বীকার করেন। মওলানা ভাসানী প্রতিনিধিকে কি অবস্থায় তিনি আছেন তা দেখে যেতে বলেন। ৪ জুলাই সে খবর পত্রিকায় ছাপা হয়। ২০ জুলাই সাংবাদিকরা আবার মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার তাদের জানান যে, 'মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাংবাদিকদের ও রাজনৈতিক নেতাদের সাক্ষাৎকারের অনুমতি নেই।'

www.pathagar.com

১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষ ও অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিনের বিদায়

আওয়ামীদের হীন লিপ্সার জন্য ১৯৭৩-এর জুলাই থেকে ১৯৭৪-এর এপ্রিল পর্যন্ত মাত্র ২২ মাসের মধ্যে ১০০ ভাগ নয় ২০০ ভাগ নয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৮০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম। বিশেষ ক্ষেত্রে তা হাজারের কোটা ছাড়িয়ে ১৫০০ ভাগ হতেও দেখা গেছে। আর তা সরকারি হিসেবেই। এই সময় সরিষার তেল, নারিকেল তেলের দাম বেড়েছে যথাক্রমে ১৩২ ভাগ ও ২১৮ ভাগ। হলুদের দাম বেড়েছে ২২০ ভাগ। আদার দাম বেড়েছে ১৪০ ভাগ। আর সবচেয়ে দাম বেশি বেড়েছে লংকার। একেবারে ১৫০০ ভাগ। এই সময় সরকার রেশনের চালের দাম বাড়িয়েছে ২৯ টাকা থেকে ৪০ টাকায়। বৃদ্ধির হার ৩৮%। ১৯৭২-এর ১ জুলাই প্রতি মণ সরু আমন চালের খুচরা দাম ছিল বাজারে ৭৫ টাকা। ১৯৭৩-এর জুলাইতে হয়েছে ১১৫ টাকা। ১৯৭৪-এর মার্চে তা বেড়ে হয়েছে ১৬০ টাকা। বৃদ্ধির হার ২১৫%। মসুর ডাল ১৯৭২-এর ১ জুলাই প্রতি মণ ৪১ টাকা, ১৯৭৪-এর মার্চে ১৫০ টাকা। বৃদ্ধির হার ১৫৪ ভাগ। মুগ ডাল ৫০ টাকা, ১৯৭৪-এর মার্চে ১৮০ টাকা, বৃদ্ধির হার শতকরা ১৬০ ভাগ। মটর ১৯৭২-এর জুলাইতে প্রতি মণের দাম ৩৫ টাকা, বৃদ্ধির হার শতকরা ২৭০ ভাগ হয়ে ১৯৭৪-এর মার্চে ১৩০ টাকা। সরিষার তেল ১৯৭২-এর জুলাই মাসে প্রতি মণ ২৮০-৩২৫ টাকা। ১৯৭৪-এর মার্চে প্রতি মণ ৬২০-৬৫০ টাকা। বৃদ্ধির হার শতকরা ১৩২ ভাগ। সয়াবিন তেল ১৯৭২-এর ১ জুলাই প্রতি মণ ৪২৬ টাকা হতে ৪৫০ টাকা। ১৯৭৪-এর মার্চ মাসে ১০০০-১১০০ টাকা। বৃদ্ধির হার ১৩০ ভাগ। গরুর গোশত ১৯৭২-এর জুলাই মাসে প্রতি সের দাম ছিল ৩.০০-৩.২৫ টাকা। ১৯৭৪-এর মার্চে ৯.০০-১০.০০ টাকা। বৃদ্ধির হার ২৩৩ ভাগ। খাসির গোশতের দাম বেড়েছে শতকরা ২০০ ভাগ। মোরগের দাম বেড়েছে ১৫৫ ভাগ। জিরার দাম বেড়েছে ৩০০ ভাগ। হলুদের দাম বেড়েছে ২৬০ ভাগ, লম্বা হলুদের দাম ২৫৩ ভাগ। ধনিয়ার দাম ১৫০ ভাগ। ছোট ও বড় এলাচির দাম বেড়েছে যথাক্রমে শতকরা ২৫০ ভাগ ও ১৫০ ভাগ। কালি জিরার দাম বেড়েছে ১১০ ভাগ। ১৯৭২-এর জুলাই মাসে জ্বালানি কাঠের দাম ছিল প্রতি মণ ৬ টাকা। ১৯৭৪-এর মার্চে তা বেড়ে হয়েছে ১৪-১৬ টাকা। বৃদ্ধির হার ২৪০ ভাগ। এই সময়ে কেরোসিন তেলের দাম বেড়েছে ২৪৩ ভাগ। ১৯৭২-এর জুলাই মাসে প্রতি তোলা তেজাবী সোনার দাম ছিল ৩০০ টাকা। ১৯৭৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৯৫০ টাকা। বৃদ্ধির হার ২১২ ভাগ। গিনি সোনার দাম বেড়েছে শতকরা ২০৩ ভাগ ও রূপার দাম বেড়েছে ২০৮ ভাগ।

'১৯৭২-৭৫ এর সোনার বাংলা'-শীর্ষক (দৈনিক দিনকাল, ২১ জুন, ২০০২) লেখায় ডঃ নজরুল ইসলাম লিখেছেন, 'স্বাধীনতা-পরবর্তী আওয়ামী লীগের দুর্নীতি সম্পর্কে এবার নিজের কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলি। ১৯৭২-৭৩ সালে আমি কলেজের ছাত্র। ফতুল্লা এলাকায় একটি কোল্ড স্টোর ও বরফ কারখানায় কর্মরত ভাইয়ের বাসায় থাকি। পরিত্যক্ত কোল্ড স্টোর ও বরফ কারখানাটিতে সরকার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর এক নিকটাত্মীয়কে। কোল্ড স্টোর ও বরফ কারখানায় প্রতিদিন ১০০ ক্যান করে বরফ উৎপাদিত হতো। সেই সময়ের স্বাভাবিক বাজার দর ৩০/৪০ টাকা হিসেবে প্রতিদিন ৩/৪ হাজার টাকা বরফ বিক্রি হতো। মাঝে মধ্যে বরফের দাম বেড়ে প্রতি ক্যান ৮০/১০০

www.pathagar.com

টাকা পর্যন্ত উঠতো। প্রতিদিন বিকালে প্রশাসক মহোদয় কোম্পানীর গাড়িতে আসতেন এবং প্রতি ক্যান বরফের দাম ৮/১০ টাকা দেখিয়ে বাকি টাকা ব্রিফকেসে করে নিয়ে যেতেন। কিছুদিন পর সেই ভদ্রলোক লুটের টাকা দিয়ে একটি তেলবাহী লরি বানালেন। লরির ভেতর একটি গোপন কুঠুরী করলেন যাতে সাধারণ ধারণ ক্ষমতার চেয়েও কয়েকশ' লিটার তেল বেশি ধরে। উল্লেখ্য, তেল ডিপো থেকে তেল ভর্তি করার সময় তেল মাপা হয় না। রেজিস্ট্রেশনের ধারণ ক্ষমতা হিসাব করেই তেলের হিসাব করা হয়। গোপন কুঠুরী সম্পর্কে কেউ জানবে না আর জানলেই কি। অর্থমন্ত্রীর আত্মীয়কে চ্যালেঞ্জ করবে এমন ক্ষমতা কারো নেই। তেলবাহী গাড়িটি ফতুল্লার ডিপো থেকে নারায়ণগঞ্জের একটি পেট্রোল পাম্পসহ বেশ কয়েকটি জায়গায় তেল সরবরাহ করতো। মাসের শেষে ট্রিপ হিসেবে করে চোরাই তেলের দাম নিয়ে আসতো কোল্ড স্টোর ও বরফ কারখানায় কর্মরত আওয়ামী লীগ সমর্থক একজন হিন্দু কর্মচারী। সেই সময়ে আশপাশের যেসব কলকারখানা জাতীয়করণ করা হয়েছিল তার প্রতিটিতেই আওয়ামী লীগারদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। ফতুল্লা এলাকার সব কলকারখানাতে একই ধরনের দুর্নীতি চলতো এবং আমার ধারণা তৎকালীন সরকার কর্তৃক জাতীয়করণকৃত বাংলাদেশের সকল কলকারখানার খবর নিলে একই চিত্র পাওয়া যাবে। সবখানেই আওয়ামী লীগের প্রশাসকরা একই কাজ করেছে। এজন্যই বাংলাদেশের বিশ্বে পরিচিত হয়েছিল তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে। এরাই ছিল শেখ মুজিব বর্ণিত চাটার দল, এরাই ছিল শেখ মুজিবের চোরের খনির রত্নরাজি। এরাই ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষে বিদেশ থেকে সাহায্য হিসেবে পাওয়া গম, বিস্কুট, দুধ, গরিবকে না দিয়ে কালোবাজারে বিক্রি করেছে, গরু দিয়ে খাইয়েছে। এরাই গুদামের পাট ভারতে পাচার করে গুদামে আগুন লাগিয়ে দিয়ে জ্বালিয়েছে। এরাই ১৯৭৩-এর নির্বাচনে বিরোধীদলীয় প্রার্থীকে মনোনয়ন জমা দেয়ার পূর্বে কিডন্যাপ করেছে। এরা ১৯৭৫-এর পূর্বে পূজামণ্ডপে হামলা করে মেয়েদের লাঞ্ছিত করেছে, শহীদ মিনারে ফুল দিতে আসা মেয়েদের নিয়ে টানা হেঁচড়া করেছে। বাকশালে যোগদান না করলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের লাশ ফেলে দেয়া হবে বলে এরাই হুমকি দিয়েছে। এদেরকে নিয়েই শেখ মুজিব কায়েম করেছিলেন বর্তমান সময়ের আওয়ামী লীগারদের বর্ণিত সোনার বাংলা।'

বন্যার প্রেক্ষিতে বিদেশ থেকে প্রচুর সাহায্য সামগ্রী এদেশে আসে। কিন্তু তাও আবার লুটপাট সমিতির সদস্যদের দিয়ে বণ্টন করা হয়। সেই পুরাতন নিয়মে রিলিফ বণ্টনের কর্মটি সম্পাদিত হয়। সরকারের এহেন গরিমসি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের আগস্টের শেষের দিকে হুঁশিয়ারী প্রদান করে মওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে বলেন, 'দুর্গত লোকদের ত্রাণ কাজ ত্বরান্বিত না হইলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে একমাত্র বিলম্বের জন্যই ৫২ লাখ লোক মারা গিয়াছিল। এবারও সেই ভুল করিলে মৃত্যুর সংখ্যা ১৯৪৩ সালে মন্বন্তরকে ছাড়াইয়া যাইবে।'

২৩ সেপ্টেম্বর সারাদেশে ৪৩০০ লঙ্গরখানা খোলার কথা সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সরকারিভাবে পরিচালিত সেই লঙ্গরখানায় কত মানুষ আশ্রয় নিয়ে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে তা কেউ বলতে পারবে না। সে সময় পরিস্থিতি কতখানি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল তা অনুধাবন করা যায় ২৪ সেপ্টেম্বর প্রদত্ত সরকারি দলের এক সংসদ সদস্যের বিবৃতি লক্ষ্য করলে। নওগাঁর সংসদ সদস্য তাঁর বিবৃতিতে বলেন, 'সারা নওগাঁ জেলার লোক ৩ দিন ধরে না খেয়ে আছে।'

৬ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে সংবাদ বের হয়, 'সারাদেশে মানুষ যখন দুর্ভিক্ষে মরণাপন্ন তখনও এদেশে ২১ লাখ টাকার বিদেশি মদ ও সিগারেট এসেছে।' ঐদিনই

www.pathagar.com

খাদ্যমন্ত্রী জানান যে, এ পর্যন্ত অনাহারে কত লোক মরেছে, সরকারের তা জানা নেই। ৮ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৪ জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, 'জাতির জীবনে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রতি এত অনাসক্তি, অত অবজ্ঞা, এত অদ্ভুদ রকম ঔদাসীন্য কখনও দেখা গেছে বলে বিশ্বাস হয় না। নিজের প্রতি আস্থাহীন জাতি যে কি পরিমাণ জড় পদার্থে পরিণত হতে পারে, বর্তমান বাংলাদেশ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই একাত্মতা, ত্যাগের সহজ শক্তির সেই প্রচণ্ডতা, পরবর্তীকালে সিদ্ধান্তহীনতা, ভুল সিদ্ধান্ত, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা আর গুটিকতক লোকের লাগামহীন দুর্নীতির সয়লাবে সব ধুয়ে গেছে। দেশের নেতৃত্বের প্রতি এই জাতীয় দুর্দিনে আমাদের আকুল প্রার্থনা, জাতি হিসেবে আমাদের শক্তিতে আস্থাবান হওয়ার পরিবেশ ফিরিয়ে দিন।'

একই দিনে শ্রমিক লীগের আব্দুল মান্নান এমপি এক বিবৃতিতে বলেন, 'লবণের দুষ্প্রাপ্যতা সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল প্রকার খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যে, মজুতদার উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে ২ টাকা মণ দরে লবণ কেনে। মজুতদারদের জন্য অশোধিত লবণের সরকারি দাম ১৫ টাকা, আর শোধিত লবণের দাম ৫৫ টাকা। অশোধিত লবণের দাম ৪০ টাকা করা হলে বাজারে প্রচুর লবণ পাওয়া যাবে বলে মজুতদাররা মত প্রকাশ করেছেন ..... এ ব্যাপারে আমাদের দলীয় কোনো কোনো এমপি জড়িত রয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।'

১১ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবে দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও সামাজিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় ১ নভেম্বর বিকেলে বায়তুল মোকাররমে একটি গণজমায়েত অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া সে সভায় 'মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন' নামে একটি বিবৃতিমূলক প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। সুদীর্ঘ সেই বিবৃতিমূলক প্রচারপত্রে ৮২ জন ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সিকান্দার আবু জাফর, সভাপতি, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি, ড. আনিসুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মির্জা গোলাম হাফিজ, আইনজীবী, ভাষা সৈনিক গাজীউল হক, কামরুন্নাহার লাইলী মহিলা সংসদ সদস্যা, মহিউদ্দিন খান আলমগীর, সভাপতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, গিয়াস কামাল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়ন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সম্পাদক নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি, আমেনা বেগম, মহিলা সংসদ সদস্যা, ওয়াহিদুল হক, সাংবাদিক, এনায়েত উল্লাহ খান, সভাপতি জাতীয় প্রেসক্লাব, ড. সাঈদ উর রহমান, বাংলাদেশ লেখক শিবির, ফয়েজ আহমদ, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি, অধ্যক্ষ এ.এম. মোঃ ইছহাক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, আহমদ ছফা, বাংলাদেশ সংস্কৃতি শিবির, আবুল কাসেম ফজলুল হক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিনোদ দাশগুপ্ত, সাংবাদিক, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, চিত্রশিল্পী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আনোয়ার জাহিদ, সাংবাদিক এবং বদরুদ্দীন ওমর, সম্পাদক সংস্কৃতি প্রমুখ। তারা বিবৃতিমূলক প্রচারপত্রে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ আজ ভয়াল মন্বন্তর, সর্বগ্রাসী আকাল ও মহামারী এবং চরম জাতীয় দুর্যোগের কবলে নিপতিত। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলাদেশে বর্তমান খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক সংকট অতীতের সবচাইতে জরুরি সংকটকেও দ্রুতগতিতে ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং ১৯৪৩ সালের সর্বগ্রাসী মন্বন্তরের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অথচ বাংলাদেশের সরকার জনসাধারণের দুর্দশার প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে বর্তমান পরিস্থিতিকে অভিহিত করেছেন প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বলে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে মন্বন্তরের মোকাবিলায় দেশের বিভিন্ন সামাজিক শক্তিসমূহের ওপর কোনো প্রকার আস্থা প্রকাশ না করে সরকার সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছেন কতিপয় বিদেশি শক্তির সাহায্য ও ঋণের ওপর এবং অভ্যন্তরীণ এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ, টাউট, বদমাতব্বর ও অনুশোচনাহীন আত্মসাৎকারীদের ওপর। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশের বর্তমান সংকটকে সাময়িক বলে অভিহিত করেছেন এবং দুর্ভিক্ষের রাজনীতিতে লিপ্ত না হবার জন্য বিরোধীদলগুলোর প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তিতে কোনো রকম দূরদর্শিতা ও বাস্তববোধের পরিচয় আছে বলে আমরা মনে করি না। কেননা, এই মন্বন্তর ও মৃত্যু কোনো সাময়িক পরিস্থিতি নয় এবং মানুষের বাঁচার অধিকার একটি মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার। লঙ্গরখানার যে সামান্য ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন তা নিতান্তই ভাঁওতা মাত্র। তদুপরি লঙ্গরখানার পরিবেশ নির্যাতন কেন্দ্রের পরিবেশের শামিল। খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক সংকট যে কোনো অনুন্নত দেশে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এতদঞ্চলে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বলতে গেলে একটি সাংবাৎসরিক পরিস্থিতি। অন্যদিকে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত দুঃখ-দুর্দশা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিজনিত সংকটের সাথে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর পরিস্থিতির মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। দুর্ভিক্ষ মানুষ দ্বারা সৃষ্ট এবং একটি বিশেষ অর্থগৃধ্নু শ্রেণীর অবাধ লুণ্ঠন ও সম্পদ পাচারের প্রত্যক্ষ পরিণতি। এই শ্রেণীর যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত প্রভাবশালী অংশের যোগসাজশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় খাদ্য এবং অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখনই শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারণের অধিকারকে পদদলিত করে তারা তাদের লুণ্ঠন-লিপ্সা চরিতার্থ করে। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে এই শ্রেণীর অংশীদার ছিল মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী, জোতদার ও খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী। রাজনৈতিক ও প্রশাসনযন্ত্রের সরাসরি সহযোগিতায় সেই মন্বন্তর সৃষ্টি করেছিল.....আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, বাংলাদেশের বর্তমান মন্বন্তর মানুষ সৃষ্ট এবং উৎপাদন যন্ত্রের সাথে সম্পর্কহীন এক শ্রেণীর মজুতদার, চোরাচালানী ও রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট ব্যবসায়ীরাই এই মহামারী ও মন্বন্তরের জন্য দায়ী। এককথায় বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এই শ্রেণীরই প্রতিনিধি এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত। খাদ্যঘাটতি কখনই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ হতে পারে না। এমনকি সামান্যতম খাদ্যঘাটতির ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র বিতরণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই অর্থগৃধ্নু ও গণবিরোধী শক্তি দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে পারে। সরকার এবং আরো কোনো কোনো মহল ১৯৭১-এর যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী মূল্যবৃদ্ধি ও বর্তমান বছরের বন্যাকে আকালের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আমরা জাতির সামনে আমাদের মনোভাব প্রকাশ করতে চাই। আমরা মনে করি, যদি দেশের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় নিম্নতম আন্তরিক চেষ্টাও থাকত, তাহলে যুদ্ধের তিন বছর বাদে এবং দু'হাজার কোটি টাকারও বেশি বৈদেশিক সাহায্য পাবার পর ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে আজ বাংলাদেশে অন্তত অনাহারে মৃত্যুর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। গত তিন বছর ধরে মানুষ নামধারী একশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতাবান অমানুষের নির্লজ্জ শোষণ, তস্করবৃত্তি, সন্ত্রাসবাদ, চাটুকারিতা, প্রতারণা ও দুঃশাসনের যে প্রতিযোগিতা চলছে তারই ফল বর্তমান মন্বন্তর। এক কথায় বাংলাদেশের বর্তমান দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক সংকট গত তিন বছরের লুটেরা শাসন, শোষণ ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণেরই ফল।'

অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৭৪ সালের প্রথম থেকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। এক মাস সাত দিন বিদেশ সফর শেষে ১৩ অক্টোবর তেজগাঁও বিমানবন্দরে

www.pathagar.com

নেমে সাংবাদিকদের কাছে চলমান দুর্ভিক্ষের সত্যতা স্বীকার করে অব্যবস্থার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এ সম্পর্কে পরের দিন সরকারি মালিকানাধীন দৈনিক বাংলায় 'খাদ্য সংকটকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে হবে' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। সরকার সমর্থক বাংলার বাণী, জাসদের গণকণ্ঠ প্রভৃতি সংবাদপত্র তাঁর এ বক্তব্য ফলাও করে প্রকাশ করেছিল।

তাজউদ্দিন বলেছিলেন, 'খাদ্য সঙ্কট একটি জাতীয় বিপর্যয়। এই বিপর্যয়কে রাজনীতির উর্ধ্বে রেখে দলমত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে। কেউ অভিজাত বিপণী কেন্দ্রে মার্কেটিং করবে আর কেউ না খেয়ে রাস্তায় মরে থাকবে এ অবস্থা চলতে দেয়া যেতে পারে না।' তাজউদ্দিন গভীর ক্ষোভ সহকারে বলেন, 'এক শ্রেণীর লোক ৫৫৫ সিগারেট এবং বেআইনী আমদানি করা বিদেশি দামী মদ খায় এরা কোত্থেকে রাতারাতি এতো টাকা পায়?' তিনি বলেন, 'বিদেশে বাংলাদেশের যে ইমেজ দেখে এসেছি তাতে আমার মন ভেঙ্গে গেছে। বাইরে গেলেই বাংলাদেশকে চেনা যায়। পত্রিকায় লেখা হয় ফোর্ড বঙ্গবন্ধুর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। এতে দেশের ইমেজ নষ্ট হয়।' তিনি বলেন, 'লন্ডনে বৃটিশ টেলিভিশনে বাংলাদেশের অনাহারে মৃত্যু এবং এর পাশাপাশি একশ্রেণীর মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার দুই বিপরীত মর্মান্তিক ছবি দেখেছি। সাথে দেখেছি, ঢাকার রাজপথে না খেয়ে মরে যাওয়া মানুষের লাশ। আর তারই পাশাপাশি নাইট ক্লাবে এক শ্রেণীর মানুষ বেআইনীভাবে আমদানিকৃত বিদেশি দামী মদ এবং আস্ত মুরগী খাচ্ছে।' তিনি জানান যে, লন্ডনে বসে নিজ দেশের এই বিপরীত ও অমানবিক দৃশ্য দেখে তিনি মর্মাহত ও লজ্জিত হয়েছেন। তাজউদ্দিন বলেন, 'মানুষ ও মানবতার এহেন মৃত্যু গোটা জাতির জন্য অমঙ্গল ও লজ্জার ব্যাপার। আমাদের অবশ্য লাখো কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের এই মর্মান্তিক অবস্থার সাথে একাত্ম হতে হবে, না হয় জনগণ আমাদের ওপর আস্থা রাখবে না-ইতিহাসের অমোঘ বিধানে আমরা দোষী সাব্যস্ত হবো।' তাজউদ্দিন বলেন, 'অনেক বড় বড় আশার কথা আমরা জনগণকে শুনিয়েছি, অনেক বড় বড় শ্লোগান আমরা দিয়েছি লাভ কিছু হয়নি। ব্যক্তি বড় জিনিস নয়। জনগণ যদি মনে করে আমি যোগ্য নই, তাহলে গদিতে থাকার কোনো অধিকার আমার নেই।' তিনি বলেন, 'মানুষ মরে গেলে পলিটিক্স করে কি লাভ? আমার মন্ত্রিত্বের দরকার নেই-মানুষকে বাঁচাতে হবে। ভিক্ষার চাল দিয়ে পেট ভরে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সবদেশেই হয় কিন্তু এমন অবস্থা হয় না। এ অবস্থার জন্য আমি-আপনিই দায়ী। পয়সা আনাটা বড় জিনিস নয়।' তিনি বলেন, 'সরকারি দলই হোক আর বিরোধীদলই হোক কারো হাতে অস্ত্র থাকা উচিত নয়। আজ আমাদের শ্লোগান আর স্টেনগানের রাজনীতি পরিত্যাগ করে দেশের লাখো কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের জীবনধারণের রাজনীতিতে বাস্তবভাবে নেমে পড়তে হবে।' তিনি বলেন, 'ভিক্ষাবৃত্তি সকল জাতীয় অধঃপতন ও দুর্নীতির মূল কারণ। আমরা স্থায়িভাবে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হতে পারি না। আমাদের দেশে প্রচুর সম্পদ আছে। সেই সম্পদ আহরণ করে গণমানুষের মধ্যে সুষম বন্টনের মাধ্যমে আমাদের সুষম জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজ করতে হবে যদিও অনেক আগ থেকেই আমাদের তা করা উচিত ছিল।' তাজউদ্দিন দুর্ভিক্ষের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে সর্বদলীয় খাদ্য সম্মেলন ডাকার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে দেশের সকল বিরোধীদল এমনকি গুপ্ত সংগঠনগুলোকেও এ সম্মেলনে ডাকা উচিত বলে মনে করেন। তিনি কেবল ঐক্যজোটের শরীক দলগুলোকেই দেশপ্রেমিক মনে না করে বিরোধীদলগুলোকেও দেশপ্রেমিক বলে আখ্যায়িত করেন।

www.pathagar.com

তাজউদ্দিনের এ দূরদর্শিতা ও উদারতা থাকলেও শেখ মুজিবের তা ছিল না। ছিল না আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা-কর্মীর। তারা তখন গুপ্ত সংগঠনগুলোর কর্মীদের ওপর শেখ মুজিবের লালঘোড়া দাবড়ানোতে ব্যস্ত। সাথে সাথে তারা প্রকাশ্য সংগঠনগুলোর কর্মীদের উপর চালিয়েছে নিপীড়ন-হত্যা। এই সময় মাদারীপুর জেলার কালকিনির সাহেবরামপুর, কয়ারিয়া, রমজানপুর, চরদৌলত খান, বাঁশগাড়ি, এনায়েতনগর, কালকিটি সদর ইউনিয়ন এবং ফাঁশিয়াতলা এলাকা ছাড়াও বরিশালের মুলাদী গৌরনদী থানা এলাকায় মুজিবের তৈরি বাহিনীগুলো চালিয়েছিল সন্ত্রাসী তাণ্ডব। তাদের নিপীড়ন থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তরুণী-নববধূ-যুবতী কেউ রক্ষা পায়নি। পিতার সামনে পুত্রকে, স্ত্রীর সামনে স্বামীকে, মা-বাবার সামনে মেয়েকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, ভাইয়ের সামনে বোনকে রক্ষীরা নির্দয় নির্যাতন করেছে। কালকিনির সাহেবরামপুর ও আশপাশের ইউনিয়নগুলোর প্রায় প্রতিটি পরিবারের একই চিত্র। একইভাবে তাণ্ডবের শিকার তারা। রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠন নেতাদের ছিল অবাধ যাতায়াত। সন্ধ্যার পর তারা ক্যাম্পে ঢুকত। রক্ষীদের জলপাই রং পোশাক পরে রাতের আঁধারে ক্যাম্প থেকে বেরুত। রক্ষীদের সঙ্গে মানুষের বাড়ি বাড়ি হানা দিতো। চোখ, হাত, মুখ বেঁধে যুবকদের ক্যাম্পে নিয়ে গরু পেটা করতো। তাদের মধ্যে অনেকেই মারা গেছে। লাশগুলো গর্ত করে মাটি চাপা দিতো। ওদের খুনের কাজ ছিল অত্যন্ত নিপুণ। হাত-পা পিছমোড়া করে বেঁধে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে আটক ব্যক্তিকে অচেতন করে নিতো। পরে চিৎকরে শুইয়ে জবাই করতো। নিহতদের যাতে শনাক্ত না করা যায় সেজন্য শরীর এসিড দিয়ে পুড়ে দিতো।

রক্ষীবাহিনীর মার খায় নাই এমন লোক খুব কম পাওয়া যাবে। রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের শিকার মুক্তিযোদ্ধারাও। এমনই একজন মুক্তিযোদ্ধা কালকিনির কৃষ্ণনগর গ্রামের মরহুম মুন্সী আমজাদ আলীর দ্বিতীয় পুত্র হুমায়ূন কবীর। কালকিনি বাজার থেকে রক্ষীরা তাকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তার ওপর চালায় চরম নির্যাতন। লাকড়ি দিয়ে পেটাতে পেটাতে হুমায়ূনের সারা গা ক্ষত-বিক্ষত করে। ক্ষতে প্রথম মরিচ বাঁটা মেখে দেয়। পরে লোহার রড গরম করে ক্ষতস্থানে ছ্যাঁকা দিয়েছে। মরতে মরতে ফিরে এসেছিল হুমায়ূন। কিন্তু পরবর্তীতে তাকে খুন করা হয়।

রক্ষীবাহিনী এবং আওয়ামী লীগাররা দেশের শিক্ষাব্যবস্থায়ও ভেঙে তছনছ করে। মাসের পর মাস দেশের বিভিন্ন এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। এসব প্রতিষ্ঠান ছিল রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন ও খুন করার ঘাঁটি। কালকিনির সাহেবরামপুর এলাকা এরই একটি। এলাকার শিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সাহেবরামপুর হাইস্কুল। এখানে মূর্তিমান সন্ত্রাসীরা ক্যাম্প স্থাপন করে ১৯৭৪ সালে। স্বাভাবিক কারণেই স্কুলের কার্যক্রম বন্ধ থাকে। শেখ মুজিবের বাকশাল সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত স্কুলটিতে ক্লাস হয়নি। ক্যাম্প লীডারের অনুমতি নিয়ে এবং বিশেষ পাহারায় প্রধান শিক্ষককে অফিস কক্ষে যেতে হতো। আবার রক্ষীদের পাহারায় তাকে অফিস ত্যাগ করতে হতো। স্কুল ছিল রক্ষীবাহিনীর আস্তানা। ক্যাম্প করেই ওরা স্কুল বন্ধ করে দেয়। কোথায় ক্লাস করা যায় এই ভেবে শিক্ষকরা স্থানীয় কলেজে ক্লাস নেয়া শুরু করেন। ছাত্র খুব হত না। রক্ষীদের তাণ্ডব সকল সীমালঙ্ঘন করে। রক্ষীরা যাকে তাকে ধরে এনে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনেই পেটায়, খুন করে। এতে ছাত্ররা ভীতসন্ত্রস্ত হয়। রক্ষীদের অন্যায়, অবিচার, খুন-খারাবির কাণ্ডকারখানা এলাকাটি লণ্ডভণ্ড করে দেয়। শুধু যুবক ছাত্ররাই তাদের নির্যাতনের শিকার হয়নি, শিক্ষকরাও হন নির্যাতিত। স্কুলে রক্ষীবাহিনী আস্তানা গড়ার ফলে জরুরি প্রয়োজনে

www.pathagar.com

স্কুলে যাওয়া যেত না। এতে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের স্কুলে আসা বন্ধ করে দেন। সর্বত্র আতঙ্ক। ছাত্র, যুবকরা এলাকা ছেড়ে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে আশ্রয় নেয়। অনাহারে-অর্ধাহারে কেটেছে তাদের দিন। অথচ ওইসব ছেলের পরিবার ছিল সচ্ছল। ১৯৭৪ সালের ১৫ অক্টোবর কারা সাহেবরামপুর ক্যাম্প আক্রমণ করেছিল তা স্পষ্ট নয়। আক্রমণকারীদের মধ্যে ২ জন ঘটনাস্থলে নিহত হয়। তাদের পকেটে খুলনা-টরকী বাস টিকেট পাওয়া যায়। এ সত্ত্বেও রক্ষীবাহিনী এলাকায় তাণ্ডব চালায়। ঐ দিন সাহেবরামপুর হাইস্কুলের একজন শিক্ষক মোহাম্মদ খায়রুল আনামও রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। ১৫ অক্টোবর বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ক্যাম্প এ্যাটাক হয়। নিরাপত্তার জন্য খায়রুল ক্রোকারচর গ্রামে ফুফার বাড়িতে যান। ফুফাতো ভাই শহীদ উল্লাহসহ তাঁকে রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষ রাতে ক্যাম্পে নেয়ার পর দিনভর নির্যাতন চলে। রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনে তাদের সামনে আব্দুল হক, খলিল, ফালান মেম্বার, শহীদ উল্লাহসহ ৮ জন মারা গেলেও নিহতদের লাশ আত্মীয়-স্বজনকে দেয়নি।

সাহেবরামপুর গ্রামের সরদার বাড়ির সরদার বদরুজ্জামান হিরণকে ১৯৭৪ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে ধরে নিয়ে গিয়ে রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা খুন করে। হিরণ তিন ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন। লেখাপড়া খুব একটা করেননি। পরিবারের প্রয়োজনে তাকে বিয়ে করতে হয়েছিল মাত্র ২২ বছর বয়সে। স্ত্রী, তিন মেয়ে চুকমী, হিমকী ও কাকনকে রেখে গেছেন হিরণ। ছোট মেয়ে কাকনের বয়স ছিল মাত্র দুই বছর। রমজান মাস। কারা যেন সাহেবরামপুর স্কুলে রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে গোলাগুলি করেছে। ওইদিন ছিল হাটবার। ওদের বাবা হাট থেকে গরুর মাংস এনেছিলেন। সন্ধ্যা রাতে সবাই খেয়েছে। বিকেলের গোলাগুলি থেকে এলাকায় চরম ভীতি, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রক্ষীরা বাড়ি বাড়ি হামলা করতে পারে এ আশঙ্কায় অনেকেই গাঁ ছেড়ে পালায়। হিরণ ছিলেন বাড়িতে। সেহরী খেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে ছিলেন। আযান হলে নামায পড়তে মসজিদে যাবেন। ছোট মেয়ে কাকনকে বুকের ওপর তুলে হাসাহাসি করছেন। ঠক ঠক শব্দ। চারিদিকে দিয়ে রক্ষীরা ঘরটি ঘিরে ফেলেছে। পরক্ষণেই দরজার শিকল নড়লো। হিরণ ভেতর থেকে চিৎকার করে বলতে থাকেন কে কে? ওরা জবাব দেয়নি। তাকে বারবার বাইরে ডাকে। ঘর থেকে বেরুতে কিছুটা দেরী হওয়ায় দরজা ভেঙে রক্ষীরা ঘরে ঢুকে পড়ে। তাকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে বের করে। এ সময় মেঝো মেয়ে হিমকী তার কাপড় ধরে বলতে থাকে 'আব্বু আমিও যাবো। তোমার সঙ্গে যাবো।' রক্ষীদের একজন বলে নামায পড়েই তোমার আব্বু চলে আসবে। তিনি বলেন, 'মা তুমি থাকো নামায পড়ে আসছি।' এটা তার শেষ কথা। ক্যাম্পে নিয়ে পিটিয়ে তাকে খুন করে। এরপর গুলি করেছে। লাশ ফেরত দেয়নি। এসিড দিয়ে পুড়িয়ে লাশটি গুম করা হয়।

এই সময়ই শেখ মুজিবের পেটোয়া বাহিনীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে নিহত হন সাহেবরামপুর গ্রামের পুলিশ আব্দুর রব। তাঁর স্ত্রী আনোয়ারা বেগম। তাদের তিন সন্তান খোকন, নাসরিন ও রোকন। রব রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত হবার সময় রোকন ছিল ছোট। বয়স মাত্র ২ বছর। স্বামীকে হারিয়ে নিতান্ত দীনহীনভাবে সংসার চালিয়েছেন আনোয়ারা। তিন সন্তান নিয়ে কত কষ্ট করেছেন। দিন বাদে একবেলা খেয়েছেন। সাহেবরামপুর হাইস্কুলে রক্ষীরা ক্যাম্প স্থাপনের কিছুদিনের মধ্যে তাদের আচার-আচরণ সন্দেহজনক মনে হয়। যেসব বাড়িতে যুবতী মেয়ে, তরুণী গৃহবধূ ছিল ওরা ওই বাড়িতে বিনা কারণে যাওয়া-আসা করতো। আগ বাড়িয়ে যুবতীদের সাথে কথা বলতো। যদিও রক্ষীরা কোন

www.pathagar.com

জবাব পেত না। এরা কি চায় কি করতো একটি মহল ব্যতীত সবাই এটা অনুমান করেন। পরিবারের কর্তা ব্যক্তি তরুণী কন্যা, নববধূদের এলাকার বাইরে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেন। রক্ষীদের ভয়ে এলাকাটি যুবক-যুবতী শূন্য ছিল। বাড়িতে থাকতেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। কারণ পাকবাহিনীর মতো ওদের নজর ছিল যুবতীদের প্রতি। গ্রাম পুলিশ আব্দুর রব তার স্ত্রীসহ সন্তানদেরকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দেন। বাড়িতে মাকে নিয়ে থাকতেন।

অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিনের আহ্বান মন্ত্রিসভা থেকে তাঁর বিদায়ের পথকেই প্রশস্ত করে। ১৯ অক্টোবর দেশের অন্যতম প্রধান কবি ফররুখ আহমদ সরকারের চরম উদাসীনতার জন্য খাদ্য ও চিকিৎসাবিহীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মওলানা ভাসানী অত্যন্ত বেদনাদায়ক হৃদয়ে এক বিবৃতিতে এ ঘটনার জন্য বলেন, 'দেশের দানশীল ব্যক্তিদের অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে কবি ফররুখ আহমদের ইন্তেকালের খবরে আমি দুঃখিত হইলেও আশ্চর্য হই নাই এইজন্য জাতির লজ্জিত হওয়া উচিত।'

সংবাদপত্রে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তাজউদ্দিনের বিভিন্ন সময়ে স্পষ্ট স্বীকারোক্তির ফলে ক্ষমতাসীন মহলে আতঙ্ক বিরাজ করে। আওয়ামী লীগে শীর্ষ স্থানীয়রা শেখ মুজিবের প্রতি চাপ প্রয়োগ করে যাতে তিনি যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শুধু চাপ নয়, প্রকাশ্যও এরকম আহ্বান জানানো হয়। ২২ অক্টোবর জয়দেবপুরে একটি কর্মী সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সভাপতি এএইচএম কামরুজ্জামান কারো নাম উল্লেখ না করে বলেছিলেন, 'যারা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা বঙ্গবন্ধু এবং জনগণের বন্ধু নয়। দলের মধ্যে কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা সহ্য করা হবে না। যারা সরকার ও আওয়ামী লীগের বদনাম ছড়াচ্ছে তাদের সরকারে ও দলের অভ্যন্তরে থাকার কোনো অধিকার নেই।' দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেছিলেন, 'দলের শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের অবশ্যই দল থেকে বের করে দিতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রীর প্যাডে ২৬ অক্টোবর সকাল ১১টায় শেখ মুজিব তাজউদ্দিনকে একপত্রে নিজের ব্যর্থতা অন্যের উপর চাপিয়ে বলেন-

প্রিয় তাজউদ্দিন আহমদ,

বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে আপনার মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকা সমীচীন নয় বলে আমি মনে করি। তাই আপনাকে আমি মন্ত্রী পদ ইস্তেফা দেয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এই সাথে আপনার স্বাক্ষরের জন্য পদত্যাগপত্র পাঠানো হল।

ইতি-

শেখ মুজিবুর রহমান।

ওই দিন বেলা ১২টা ২২ মিনিটে তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করেন। এতে লেখা ছিল,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮(১) (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মন্ত্রী পদ হইতে ইস্তেফা দিলাম। আমার এই পদত্যাগপত্র মাননীয় রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশ করিলে বাধ্য হইব।

বিনীত-

তাজউদ্দিন আহমদ।

www.pathagar.com

তাজউদ্দিনের পদত্যাগের সংবাদ পরিবেশন করে ২৭ অক্টোবর দৈনিক গণকণ্ঠ তাজউদ্দিনের ডাবল কলাম ছবিসহ আট কলাম হেডলাইন দিয়ে সংবাদে বলে '.......তাজউদ্দিন আহমদের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা গেছে যে, তিনি গতকাল সকালে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পদত্যাগের নির্দেশসম্বলিত একটি চিঠি পান। চিঠির নির্দেশ অনুসারে তিনি দুপুর বারটা বাইশ মিনিটে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করে তা গণভবনে পাঠিয়ে দেন।'

তাজউদ্দিনের পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়ার নেপথ্য কারণ হিসেবে গণকণ্ঠ তাদের ২৭ অক্টোবরের প্রতিবেদনে লেখে, '.....স্বাধীনতা-উত্তরকালে লুটেরাদের সংগঠন আওয়ামী লীগের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক হুজুগে চিন্তা, অযোগ্যতা, পরিকল্পনাহীনতা ও অদূরদর্শিতার বিরুদ্ধে তাজউদ্দিন সাহেব ক্ষীণ কণ্ঠে হলেও প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা সরকারি প্রয়াসের বিরুদ্ধেও তাঁকে সোচ্চার দেখা গেছে.....জনাব আহমদের এ ভূমিকা ক্ষমতাসীনদের অসহনীয় হয়ে ওঠে। এমনকি ক্ষমতাসীন দলের কোনো কোনো নেতা প্রকাশ্যেই তাঁকে ক্ষমতাসীন দলে বিদ্রোহ কণ্ঠ বলে অভিহিত করতেন। সম্প্রতি বিদেশ সফর থেকে ফিরে ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের কাছে তিনি সরকারের চরম ব্যর্থতা, বিদেশে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলের দুর্নামও তুলে ধরেন। এমনকি সরকারি মন্ত্রী হয়েও দুর্ভিক্ষাবস্থা প্রতিরোধে সর্বদলীয় খাদ্য সম্মেলন আহ্বান করার একটি প্রস্তাব পেশ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে আওয়ামী লীগেরই একটি মহল তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে থাকে ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে থাকেন।'

তাজউদ্দিনের পদত্যাগের সংবাদ পরিবেশন করে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সম্পাদনায় প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক ২৭ অক্টোবর 'অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের পদত্যাগ' শিরোনামে লিখেন, 'প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পদত্যাগ করিতে বলায় অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ গতকাল (শনিবার) মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন....পদত্যাগের খবর প্রচারিত হইবার পর জনাব তাজউদ্দিন আহমদের সহিত তাঁহার বাসভবনে যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশেই তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। জাতির বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এই ব্যাপারে তিনি কোনো বিতর্কের সৃষ্টি করিতে চাহেন না....বেলা ১টায় মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকের অব্যবহিত পর প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদকে পদত্যাগ করিতে নির্দেশ দিলে তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করেন।'

দৈনিক বাংলা তাজউদ্দিনের ছবি ছাড়া দুই কলামে মাত্র তিনটি প্যারাগ্রাফের একটি খবরে বলে, 'শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন....রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদ উল্লাহ জনাব তাজউদ্দিনের পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করেন....প্রধানমন্ত্রী জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই জনাব তাজউদ্দিনকে পদত্যাগের অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন বলে জানা গেছে।'

সরকার সমর্থক বাংলার বাণী ডাবল কলাম ছবিসহ আট কলাম হেডলাইন দিয়ে সংবাদে বলে, 'যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিনের পদত্যাগ'। বাংলার বাণী লিখে, 'মন্ত্রিসভা থেকে তাজউদ্দিন বিদায়....বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্বার্থের খাতিরে তাজউদ্দিন আহমদকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠানোর আগে মন্ত্রিসভার কয়েকজন সিনিয়র সদস্যের সঙ্গে

www.pathagar.com

মিলিত হন....তাজউদ্দিন আহমদের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা গেছে যে, তিনি গতকাল সকালে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পদত্যাগের নির্দেশসম্বলিত একটি চিঠি পান। চিঠিটির নির্দেশ অনুসারে তিনি দুপুর বারোটা বাইশ মিনিটে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করে তা গণভবনে পাঠিয়ে দেন।'

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বৈদ্যনাথতলায় স্বাধীনতার ঘোষণা, সনদ পাঠ এবং সরকারের শপথ নেয়ার অনুষ্ঠানমালার আয়োজনও করেছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ। ঐতিহাসিক বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে একথা মানতেই হবে যে, অন্য কেউ নন, তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান প্রাণপুরুষ এবং তার মতো একজন সৎ ও সাহসী নেতা না থাকলে একাত্তর সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়তো। এই কৃতিত্ব ও অবদান আবার স্বাধীনতার পর তাজউদ্দিন আহমদের জন্য সমস্যা ও বিপদের কারণ ঘটিয়েছে। তাজউদ্দিনের গুরুত্ব ও সম্মান বৃদ্ধির আশঙ্কা থেকে শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন সরকার ১৭ এপ্রিলের মতো ঐতিহাসিক দিনকে স্বীকৃতি দেয়নি এবং পালন করেনি জাতীয় পর্যায়ে। অন্য অনেক পন্থায়ও তাজউদ্দিনকে অসম্মানিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব তাঁকে অসম্মানজনকভাবে মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় করে দিয়েছিলেন। *(সূত্রঃ মুজিবনগর দিবস এবং ইতিহাসের অসঙ্গতি, শাহ আহমদ রেজা, দৈনিক ইনকিলাব, ২৭ এপ্রিল, ১৯৯৯)*

এম.এ. মোহাইমেন লিখেছেন, 'তবে আমি যতটুকু অনুমান করতে পেরেছি তাজউদ্দিন কর্তৃক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন করে দেশ স্বাধীন করাকে শেখ সাহেব মনেপ্রাণে সন্তুষ্টির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি। এটাকে তিনি তাজউদ্দিনের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব মনে করে বোধ হয় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। তার ধারণা ছিল পঁচিশে মার্চ রাতে পাকবাহিনী যে আক্রমণ আরম্ভ করেছিল কিছু ছাত্র-জনতা হত্যার মারফত সাময়িকভাবে হলেও তারা অবস্থা আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু এক বছর কি দেড় বছর পর হলেও জাগ্রত জনতার আন্দোলনের সামনে নতি স্বীকার করে তাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না করে পারবে না। কিন্তু তার সে হিসাবকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাজউদ্দিন যে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশ স্বাধীন করে ফেলতে পারবে এটা তিনি কল্পনাই করতে পারেননি। তাই এটা যখন বাস্তবে ঘটলো তখন তাজউদ্দিনের প্রতি একটা প্রচণ্ড অভিমান বা বিতৃষ্ণা তিনি মনে পোষণ করতে আরম্ভ করলেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তার গ্রেফতার হওয়ার পরে দেশ কিভাবে স্বাধীন হয়েছিল, কিভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করে পরিপূর্ণ রূপ দেয়া হয়েছিল, সে সময় কে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, কার অবদান কতটুকু ছিল এ সম্পর্কে তিনি কোনদিন কোন খবরই জানতে চাননি। এ ব্যাপারে কখনো কোন আলোচনাও হতে দেননি। বাহাত্তরে দশই জানুয়ারি থেকে পঁচাত্তরের পনরই আগস্ট পর্যন্ত রেডিও-টেলিভিশন, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় একাত্তরের পঁচিশে মার্চ থেকে বাহাত্তরের নয়ই জানুয়ারি পর্যন্ত এ সময়টুকু সম্পর্কে সর্বপ্রকার নীরবতা পালন করা হয়ে আসছিল, কারণ ঐ সময়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এবং আলোচনা হতে গেলেই তাজউদ্দিনের নাম মধ্যমণি হিসেবে এসে পড়ে যেটা তিনি সহ্য করতে রাজি ছিলেন না। স্বাধীনতা অন্যের হাতে দিয়ে আসবে সেটা তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না।' *(সূত্রঃ ঢাকা-আগরতলা-মুজিবনগর, পৃষ্ঠা. ১৩৪-১৩৬)*

তাজউদ্দিন আহমদকে অবহেলার ইতিহাস আরো অনেক পুরোনো। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, 'তাছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই যে, ঢাকায়

www.pathagar.com

কমরুদ্দীন আহাম্মদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দিন আহমদ, অলি আহাদ প্রমুখ যারা তখন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি গঠনের চেষ্টা করছিলেন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শেখ মুজিব ছাত্র রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের সাথে একজোট হয়েই মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করেছেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগ নামক আর একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানেও যোগদান করেছেন ও তাতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন...,শেখ মুজিব ১৯৪৭-৫৩ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পরিহার করতে অক্ষম হয়ে মুসলিম ছাত্রলীগ তথা পরবর্তী পর্যায়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃস্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের একজন হয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে নিমজ্জিত থেকেছিলেন।' *(সূত্রঃ ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা.২৯)*

যাহোক তাজউদ্দিনের সাথে আচরণ বিদেশেও বিস্ময়ের কারণ হয়ে উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সাহিত্যিক আওয়ামী লীগের প্রিয়পাত্র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'অবশ্য যে তাজউদ্দিন সাহেব ছিলেন প্রথম বাংলাদেশ সরকার গড়ার প্রধান স্থপতি, যার দেশাত্মবোধ নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সেই তাজউদ্দিন সাহেবকে শেখ মুজিব নিজে বরখাস্ত করবেন, তা-ই বা কে কল্পনা করেছিল? যে গণতন্ত্রের নামে শেখ সাহেব সারাজীবন গলা ফাটালেন শেষে তিনি নিজেই হত্যা করতে গেলেন সেই গণতন্ত্রকে।' *(সূত্রঃ পূর্ব-পশ্চিম, দ্বিতীয় খণ্ডঃ আনন্দ পাবলিশার্স ঃ কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা. ৫৭০)*

২৯ অক্টোবর সারাদেশে ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই দিনেই মজুতদারী আর কালোবাজারীর দায়ে আওয়ামী লীগের একজন এমপি গ্রেফতার হন। অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিনের পদত্যাগ নিয়ে ৩০ অক্টোবর দৈনিক গণকণ্ঠে শামসুদ্দিন আহমদ উপ-সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, '...... প্রশ্ন তাজউদ্দিনের পদত্যাগের ঘটনার সঙ্গে বাংলাদেশের ও সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কতটুকু জড়িত? আওয়ামী লীগ থেকে পাওয়া সংবাদ এটুকু নিশ্চয়তা মিলেছে যে, মুজিব প্রেসিডেন্ট হতে আগ্রহী। সংসদীয় গণতন্ত্রকে তিনি বিদায় দিতে প্রস্তুত-আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তাদের মধ্যে জনাব তাজউদ্দিন ছিলেন অন্যতম। ২৫ বছর ধরে তিনি শেখ মুজিবের পাশে থেকে গণতন্ত্রের সপক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। স্বাধীনতার পরেও সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে সুস্পষ্ট রায় দিয়েছেন। বলেছেন সংসদীয় গণতন্ত্রের স্কোপ বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনো ফুরিয়ে যায়নি। দীর্ঘদিন ধরে সংসদীয় গণতন্ত্রকে কবর দেয়ার জন্য শেখ মুজিব যে চিন্তা-ভাবনা করছেন এবং জাতীয় সংসদ আহবানের অল্প কয়েকদিন পূর্বে সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম সমর্থক তাজউদ্দিন যেভাবে পদত্যাগ করলেন তাতে রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি মাত্রই আঁৎকে ওঠার কথা। যে কেউই ভাবতে পারেন শেষ পর্যন্ত এ দেশ থেকে কি গণতন্ত্রকে অবসর গ্রহণ করতে হবে? তাজউদ্দিনের বিদায় কি গণতন্ত্রের বিদায়ের প্রথম লক্ষণ?'

১ নভেম্বর ইত্তেফাক লিখেছে, 'ওপেন সিক্রেট ঃ সরকারি খাদ্য গুদাম হইতে চাউল পাচার। স্মাগলিং হয় সীমান্ত এলাকা হইতে এ খবর সবারই জানা। কিন্তু সরকারি খাদ্য গুদাম হইতে, সাইলো হইতেও যে এ কারবার হইয়া থাকে তাহার খোঁজ কেহ রাখেন কি?'

১ নভেম্বর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে পূর্ব ঘোষিত সংগঠনের প্রতিনিধির বর্তমান মন্বন্তর প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন-সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে এক গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল স্বাধীন দেশে তাদের প্রথম পদক্ষেপ। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির সভাপতি সিকান্দার আবু জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুই ঘণ্টারও বেশি

www.pathagar.com

এ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন এডভোকেট মির্জা গোলাম হাফিজ, ড. আহমদ শরীফ, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, এনায়েত উল্লাহ খান, কামরুন্নাহার লাইলী, নিজামুদ্দীন আহমদ, মহিউদ্দিন খান আলমগীর, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মুহাম্মদ জাকারিয়া এবং বদরুদ্দীন আহমদ। সমাবেশে বিদ্যমান পরিস্থিতি ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কে ৭টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহীদ মিনার পর্যন্ত যায় এবং সেখানেই সেদিনের সমাবেশের কর্মসূচি শেষ হয়। সমাবেশে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল এই রকম-

(১) এই মন্বন্তর ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতাকে অতিক্রম করেছে এবং এই মন্বন্তর বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্টি হয়নি; বরং শাসকশ্রেণী ও তাদের সহযোগীদের গণবিরোধী নীতি ও কর্মকাণ্ডেরই প্রত্যক্ষ পরিণতি। এইসব মন্বন্তরকে দুর্ভিক্ষাবস্থা উল্লেখ না করে এই সভা মন্বন্তর বলে ঘোষণা করার দাবি জানাচ্ছে।

(২) এই সভা বৈদেশিক সাহায্যের একটি শ্বেতপত্র ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানাচ্ছে।

(৩) এই সভা সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠন করার জোর দাবি জানাচ্ছে।।

(৪) এই সভা সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠনের ব্যাপারে বিরোধীদলসমূহের প্রতি উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে।

(৫) এই সভা লঙ্গরখানার সংখ্যা বৃদ্ধি ও সেখানে নির্যাতন বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

(৬) এই সভা রেডক্রসের চেয়ারম্যান হিসেবে সুপ্রি;কোর্টের একজন বিচারপতিকে নিয়োগের আর্জি জানাচ্ছে।

(৭) এই সভা রাজনৈতিক নির্যাতন বন্ধ ও সকল রাজবন্দির মুক্তি, মিথ্যা মামলায় আটক এবং বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি দাবি জানাচ্ছে।

২২ নভেম্বর সরকারের খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল মোমিন স্বীকার করেছিলেন, 'শুধু নভেম্বর মাসেই সাড়ে ২৭ হাজার মানুষ অনাহার ও ব্যাধির ফলে মৃত্যুর কোলে নিপতিত হয়েছেন।'

দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে লন্ডনভিত্তিক ডেইলি মেইল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, "পশ্চিম এশিয়ার এবং দুর্ভিক্ষের প্রাচীনতম বিচরণভূমি বাংলাদেশে মহা-দুর্ভিক্ষের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। এতে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ সম্ভবত অনেককালে দেখা যায়নি। মৃত্যুর কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। এক হিসাব মতে, গত জুলাই মাসের বন্যায় সমস্ত ফসল এবং পরবর্তী মৌসুমের বীজ ধান বিনষ্ট হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে এবং পার্শ্ববর্তী ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কয়েক লাখ লোক মারা গেছে।" ঢাকার সেভ দি চিলড্রেন ফান্ড-এর কো-অর্ডিনেটর-মিঃ মাইকেল প্রোসার বলেন, "আমাদের চরম আশঙ্কাই ফলে গেছে। আমরা এমন একটা বিপর্যয়ের সূচনাতে আছি যা আমি এই উপমহাদেশে গত ৩১ বছর দেখিনি। বসন্তের আগে নতুন ফসল উঠবে না। বাইরের দুনিয়া থেকে যদি বাংলাদেশে প্রতি সপ্তাহে ১ লাখ টন খাদ্যশস্য ও তদসঙ্গে প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল সাহায্য না পায়, আমার ভয় হচ্ছে, বহু লোকের জীবন বিপন্ন হবে।"

বস্তুত বাংলাদেশের একটি অবিশ্বাস্য পরিসংখ্যান হচ্ছে এই যে, দেশের সবগুলো হাসপাতাল মিলিয়ে শিশুদের জন্য সর্বমোট ৭৫টি বেড আছে-অর্থাৎ প্রতি দশলাখে একটি।

www.pathagar.com

মীরপুর শরণার্থী শিবিরের প্রকাণ্ড লৌহ-কপাটের বাইরে বহু নারী ও শিশু ভিড় করে আছে। গেটের সামনে একজন সিপাই পুরানো ৩০৩ রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে। তার কাজ আশ্রয়-প্রার্থীদেরকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখা। এসব শরণার্থীদের অধিকাংশই ঢাকা থেকে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত সবচেয়ে দুর্ভিক্ষ-কবলিত রংপুর জেলা থেকে এসেছে। অন্তত দু'দিন তাই এদের পেটে কিছু পড়েনি। দেখে মনে হল মাত্র দুটি ছাড়া সব ক'টি শিশুই বসন্ত রোগে আক্রান্ত। এরা এত দুর্বল যে, গা থেকে মাছিও তাড়াতে পারে না। এদিকে রিলিফ ক্যাম্পেও তিলধারণের ঠাঁই নেই। বরাবর যেমন হয়ে থাকে আমার ক্ষেত্রে তাই হ'ল। একজন বিদেশি সাংবাদিককে দেখে ক্যাম্পের গেট খুলে দেওয়া হ'ল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট আব্দুস সালাম সবাইকে ভেতরে প্রবেশের জন্য ইঙ্গিত করলেন। আর অমনি ওরা প্রাণপণ ছুটল ভেতরে। এ কথা আমি আক্ষরিক অর্থেই বলছি। জনাব সালাম বললেন, "এখানে তিন হাজার শরণার্থী রয়েছে। শুক্রবার থেকে সবাইকে দেওয়ার মত খিচুড়ি জুটবে না। শনিবারে হয়ত কিছু আমেরিকান বিস্কুট পেতে পারি। যেভাবেই হোক আমরা যোগাড় করতে চেষ্টা করছি।" এ দেশে একটি শিশুকে একটু গুঁড়ো দুধ ও এক মুঠো দানা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে মাত্র ২৫ পেন্স খরচ হয়। শুক্রবার থেকে আব্দুস সালাম তাও পাবেন না। একটি তিন বছরের শিশু-এত শুকনো মনে হ'ল যেন, মায়ের পেটে থাকাকালীন অবস্থায় ফিরে গেছে-আমি তার ছোট হাতটা ধরলাম। মনে হ'ল তার চামড়া আমার আঙুলে মোমের মত লেগে গেছে। এই দুর্ভিক্ষের আর একটি ভয়ঙ্কর পরিসংখ্যান এই যে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা-এর হিসাব মতে ৫০ লাখ মহিলা আজ নগ্নদেহ। পরিধেয় বস্ত্র বিক্রি করে তারা চাল কিনে খেয়েছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে এবং আমার গাড়ি ইসলামিক মানব কল্যাণ সমিতি আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম-এর লরীর পিছনে পিছনে চলছে। এই সমিতি রোজ ঢাকার রাস্তা থেকে দুর্ভিক্ষের শেষ শিকারটিকে কুড়িয়ে তুলে নেয়। সমিতির ডাইরেক্টর ডাঃ আব্দুল ওয়াহিদ জানালেন, "স্বাভাবিক সময়ে আমরা হয়ত ক'ডজন ভিখারীর মৃতদেহ কুড়িয়ে থাকি, কিন্তু এখন মাসে অন্তত ৬০০ লাশ কুড়াচ্ছি-সবই অনাহারজনিত মৃত্যু।" লরীটা যখন গোরস্থানে গিয়ে পৌঁছল ততক্ষণে সাতটি লাশ কুড়ান হয়েছে। এদের মধ্যে চারটি শিশুর। সব ক'টি বেওয়ারিশ। লাশগুলো সাদা কাপড়ে মুড়ে সংক্ষিপ্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর গোরস্থানের এক প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে গত মাসে দুর্ভিক্ষে যারা মারা গেছে তাদের কবর খুঁড়ে নতুন দাফনের জায়গা করা হয়। এ ধরনের দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি। প্রকৃতি আর মানুষ মিলে যদি কখনো রেলসেন আর অশউৎসের অসংখ্য কবর নতুন করে রচনা করার চেষ্টা করে থাকে, তাহলে তারা এই গোরস্থানে সফল হয়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু কঙ্কাল আর কঙ্কাল-বোধ করি হাজার হাজার। প্রথমে লক্ষ্য করিনি। পরে বুঝতে পারলাম। অধিকাংশ কঙ্কালই শিশুদের। *(সূত্রঃ ডেইলি মেইল, লন্ডন, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৪)*

৩০ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী দেশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গৃহবন্দি অবস্থায় সন্তোষ থেকে প্রেরিত এক বিবৃতিতে বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বলে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ যে সমগ্র জাতিকে গ্রাস করিয়াছে ইহা আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। মানবতার খাতিরে রাজনীতির উর্ধ্বে থাকিয়া এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে হইবে। বাংলাদেশ হইতে ভারতের চালসহ অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী যে পাচার হইয়া যাইতেছে এখনও এ ব্যাপারে কি কাহারও সন্দেহ রহিয়াছে? স্বাধীনতার শুরু হইতে আমার সাপ্তাহিক হককথা এবং বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে

www.pathagar.com

আমি উল্লিখিত ঘটনাসমূহের পুনরুক্তি করিয়াছি। উহার জন্য আমাকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। হককথা আজ বন্ধ, আমিও স্বগৃহে বন্দি জীবন যাপন করিতেছি। কিন্তু শান্তি ও সমৃদ্ধি কোথায়? আমার দেশের নিরপরাধ জনগণ যখন ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করে তখন আমার হৃদয় ব্যথায় ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। এই দুর্ভাগা জাতিকে বাঁচানোর মানবিক ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি সরকারের নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি। গণহত্যা সর্বদাই রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্ত কিন্তু দুর্ভিক্ষ সরকারের নিকট উহার চেয়েও মারাত্মক। বন্ধুত্বের নামে, কর্মদক্ষতা ও প্রজ্ঞার অভাবে এবং একগুঁয়েমী ও প্রশাসনিক দুর্বলতার ফলে সাত কোটি আশরাফুল মাখলুকাত আজ অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকারে পরিণত হইয়া মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে। যেখানে সরকার নিজ দায়িত্ব অনুধাবন ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ সেখানে শুধুমাত্র রিলিফ আর ঋণদান করিয়া এ জাতিকে বাঁচানো যাইবে না। ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় কালোবাজারীদের থাবা বিস্তৃত হইয়াছে। এসব কালোবাজারীর হিংস্র থাবা হইতে সাড়ে সাত কোটি লোককে রক্ষা করার জন্য সরকারের এ মুহূর্তে দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা কামনা করা উচিত। এজন্য দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় স্বাভাবিককরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমি মশিয়ুর রহমানসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি দাবি করিতেছি। আমি মনে করি এ বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে এ জাতিকে রক্ষা করার জন্য সরকার এবং বিরোধীদলসমূহকে একই কর্মসূচির ভিত্তিতে বর্তমান মানবিক সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে।

১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ বর্তমান প্রজন্মের জন্য একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হয়ে রয়েছে। ক্ষমতালিপ্সু, দুর্নীতিবাজ আর দেশের প্রতি চরম অবহেলাকারী আওয়ামী লীগ সরকার তখন জনগণের দুঃখ-দুর্দশার দিকে লক্ষ্য না রেখে লক্ষ্য রেখেছিলেন দমননীতির মাধ্যমে কিভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় সে পদ্ধতির দিকে। দেশের মানুষ যখন কঙ্কালসার, ক্ষুধার্ত, উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ তখন মুজিব ৫৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করেন ৫৫ পাউন্ড ওজনের কেক কাটার মাধ্যমে। 'আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম' নামক একটি সংস্থা সরকারের অবহেলার জন্য মানবতার খাতিরে শুধু রাজধানী ঢাকায়ই ২৮৬০টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করেছিল।

১৯৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মহামারীতে না খেয়ে রোগ-ব্যাধিতে কঙ্কালসার হয়ে লাখ লাখ লোক মৃত্যুবরণ করে। কারো কারো হিসাব মতে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২ লাখের উর্ধ্বে। খোদ সরকারি কর্তৃপক্ষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, মৃতের সংখ্যা ২৭ হাজার। আজও যদি কেউ ১৯৭২-৭৪ এর পত্রিকার ফাইল খোলে তবে নিশ্চিতভাবে তার শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা শিউরে উঠবে। মুজিব ও তার সহকর্মীদের তথা আওয়ামী লীগের দুঃশাসন এদেশে একটি কলঙ্কময় ইতিহাস। সে শাসনামলে সম্ভ্রম রক্ষার্থে জাল দিয়ে নিজ শরীর আবৃত করেছিল বাসন্তীরা।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট মুহম্মদ উল্লাহর জরুরি অবস্থা জারি

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস প্রকৃত অর্থেই একটি সর্বভারতীয় ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইন্দিরা গান্ধীর শাসনামলে দলটি গণতান্ত্রিক দর্শন এবং রাজনৈতিক শক্তির ওপর নির্ভরতা পরিহার করে কর্তৃত্ববাদী দর্শন ও পেশীশক্তির প্রতি ঝুঁকে পড়ায় নানা দিক থেকে বিপর্যয় নেমে আসে। যে ভারতবাসীর সমর্থন এবং ভালোবাসায় দলটি স্নাত ছিল, দিনে দিনে তা গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার জন্যে ইন্দিরা গান্ধী জনইচ্ছার বিপরীতে জরুরি অবস্থা জারি করে শাসনের দড়ি ঘোরাতে থাকেন। তার মদদ এবং সার্বিক আনুকূল্যে স্বীয় পুত্র যুব কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় গান্ধী ও তার বন্ধু প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সীদের পেশীশক্তির প্রতাপে ভারতের জনগণ এতই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে, নির্বাচনে হেরে যান ইন্দিরা গান্ধী। প্রধানমন্ত্রী হন মোরারজী দেশাই। এরপর ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ইন্দিরা-কংগ্রেস আবার ক্ষমতা করায়ত্ত করে ঠিক, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতার মাত্রাতিরিক্ত অপপ্রয়োগ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নির্মূল, বাহুবলের রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাস এমন অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে যে, স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীকে জীবন দিয়ে এর মূল্য দিতে হয়। আবেগ আর সহানুভূতি ভোটে রাজীব গান্ধী পুনরায় ক্ষমতায় আসেন ঠিক, কিন্তু মায়ের আমলে দল এবং দলীয় সরকার যে গণবিরোধী সন্ত্রাসী রাজনীতির ফাঁকে আটকে গিয়েছিল, সেখান থেকে তিনিও বেরিয়ে আসতে পারেননি। ফলে তাকেও বরণ করতে হয় মায়ের ভাগ্য। ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে। হত্যা, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস, নৈরাজ তথা দেশে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে শেখ মুজিব ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর ইন্দিরা গান্ধীর অনুকরণে জারি করেন জরুরি আইন। হরণ করেন জনগণের মৌলিক অধিকার। ২৮ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট মুহম্মদ উল্লাহ সংবিধানের ১৪১-ক ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সমস্ত দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্টের জরুরি অবস্থা ঘোষণাপত্রটি হুবহু বিবরণ ছিল এরূপঃ

অসাধারণ

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতি-সচিবালয়

ঘোষণা

যেহেতু রাষ্ট্রপতির নিকট নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন ভয়াবহ জরুরি অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন। যেহেতু, এক্ষণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪১-ক অনুচ্ছেদের (১) দফার দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি অনুগ্রহপূর্বক এতদ্বারা এই জরুরি অবস্থার ঘোষণা জারি করিতেছেন।

১. **সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ** এই অধ্যাদেশ জরুরি অবস্থা জারি ১৯৭৪ নামে অবহিত হইবে।

www.pathagar.com

২. আদেশঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪১-গ অনুচ্ছেদের (১) দফার দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি অনুগ্রহপূর্বক এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে, উক্ত সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২ ও ৪৩ অনুচ্ছেদের দ্বারা প্রদত্ত অধিকারসমূহে বলবৎকরণের জন্যে আদালতে মামলা রুজু করিবার ব্যাপারে কোন ব্যক্তির অধিকার এবং উক্ত অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য আদালতের বিচারাধীন সকল মামলা উক্ত সংবিধানের ১৪১-ক অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীনে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে জারিকৃত জরুরি অবস্থা ঘোষণার কার্যকারিতাকাল স্থগিত থাকিবে।

ঢাকা

মোহাম্মদ উল্লাহ
রাষ্ট্রপতি

দৈনিক ইত্তেফাকে (২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৪)এ সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, '.....জরুরি ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স ১৯৭৪' বলে সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকার কার্যকরীকরণের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকারও সাময়িকভাবে স্থগিত করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির জারিকৃত নির্দেশ অনুযায়ী সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২ ও ৪৩ ধারা বর্ণিত অধিকারসমূহ কার্যকরীকরণের জন্যে যে কোন ব্যক্তির যে কোন আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার ও এই কার্যকরীকরণের জন্যে যে কোন আদালতে বিচারাধীন সকল মামলা জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকাকালে স্থগিত থাকিবে। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির ঘোষণাপত্রে প্রতিস্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন।'

'গণতন্ত্রের মৃত্যু' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক ডেভিড হার্ভাড লিখেছেন, 'গত ২৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি মুহম্মদ উল্লাহকে সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার অনুমতি দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান অবশেষে গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এই সিদ্ধান্ত আকস্মিক নয়। এখানকার রাজনৈতিক মহল সমাধিককাল যাবত এমনি সম্ভাবনার কথা আলোচনা করে এসেছেন। কেননা, গুজব রটেছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমান পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা বাতিল করে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রথা চালু করার ও নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করার চেষ্টা করছেন।'

জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ফলে সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪২ ও ৪৩ অনুচ্ছেদসমূহ বাতিল কিংবা স্থগিত হয়ে যায়। ফলে দেশের মানুষের আইনের দৃষ্টিতে সমতার অধিকার, আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার, গ্রেফতার ও আটকের প্রতিবাদসংক্রান্ত অধিকার, বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ, সমাবেশের স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, গৃহ ও যোগাযোগ রক্ষণের অধিকার সম্পর্কিত আর্টিকেলসমূহের সকল কার্যক্রম স্থগিত হয়ে পড়ে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা আইনটি সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী নবম-ক ভাগ নামে একটা নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। আইনের ধারা মতে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিকে ১৪১-ক অনুচ্ছেদবলে যদি তার কাছে মনে হয় যে, 'এমন জরুরি অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে যাহাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা উহার যেকোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তা হইলে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন।'

www.pathagar.com

তিনি ১৪১-খ অনুচ্ছেদবলে জরুরি অবস্থার সময় সংবিধান স্বীকৃত চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা, পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার-এই অধিকারগুলো স্থগিত করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতি ১৪১-গ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য আদালতে মামলা রুজু করিবার অধিকার এবং কোন অধিকার বলবৎকরণের জন্য কোন আদালতে বিবেচনাধীন সকল মামলা জরুরি অবস্থা ঘোষণার কার্যকারিতাকালে কিংবা উন্মুক্ত আদেশের দ্বারা নির্ধারিত স্বল্পতরকালের জন্য স্থগিত করতে পারবেন। যদিও প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শের প্রসঙ্গ যুক্ত করে এবং ১২০ দিনের মধ্যে সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তাকে যুক্ত করে এই ব্যবস্থাকে কিছুটা জবাবদিহিতামূলক করার চেষ্টা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সিরাজ সিকদারের হত্যাকাণ্ড

এ কথা অস্বীকার করার জো নেই যে, সিরাজ সিকদার আজ আর কোন ব্যক্তির নাম নয়। সিরাজ সিকদার একটি সংকল্পের, একটি সংগ্রামের, একটি আদর্শের, একটি লক্ষ্যের ও ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের নাম। এ মানবতাবাদী-সাম্যবাদী নেতাকে হাতে পেয়ে যেদিন প্রচণ্ড প্রতাপ শঙ্কিত আওয়ামী-বাকশালী সরকার বিনা বিচারে হত্যা করল সেদিন ভীতসন্ত্রস্ত মানুষের কেউ তারজন্য প্রকাশ্যে আহা শব্দটি উচ্চারণ করতেও সাহস পাইনি।

ছাত্রাবস্থায়ই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন সিরাজ সিকদার। রাজনীতির প্রচণ্ড মোহ তাঁকে টেনে নিয়ে আসে। বিরামহীন পারিশ্রমিক ক্ষমতা আর সাংগঠনিক দক্ষতা ১৯৬৭ সালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার আগ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) সাথে সম্পৃক্ত রাখে। এ সময়কালে ক্রমান্বয়ে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ও তিতুমীর হলের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে কর্মজীবনের শুরুতে সিরাজ সিকদার প্রথমে সিএন্ডবির সহকারী প্রকৌশলী এবং পরে ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড নামে একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। একই বছর তিনি ঢাকার মালিবাগে 'মাও সে তুঙ চিন্তাধারা গবেষণা কেন্দ্র' স্থাপন করেন।

১৯৬৮ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। নবগঠিত দলকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রথম রাজনৈতিক শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। কারণ শ্রমিক আন্দোলনের ঘোষণাপত্রে বা থিসিসে সিরাজ সিকদার মনে করেছিলেন, 'পূর্ব বাংলার সামাজিক বিকাশের জন্য মূল দ্বন্দ্ব হলো-

(ক) পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

(খ) পূর্ব বাংলার বিশাল কৃষক জনতার সাথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব।

(গ) পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে (১) সংশোধনবাদ ও বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের, (২) সংশোধনবাদ ও বিশেষত সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের, (৩) ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

(ঘ) পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব। *(পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের ঘোষণাপত্রে বা থিসিসের পূর্ণবিবরণ দেখুন পরিশিষ্ট-১)*

১৯৭০ সালে ইয়াহিয়ার সামরিক আইন কাঠামোর অধীনে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে কিন্তু এ নির্বাচন বর্জন করে মওলানা ভাসানীসহ বামপন্থী অনেক রাজনৈতিক দল পূর্ব বাংলা স্বাধীন করার অভিপ্রায়ে আপোসহীন মনোভাব পোষণ করে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সিরাজ সিকদারও তাদের পথ অনুসরণ করেন। অবশ্য এর মধ্যে সরকারের দৃষ্টি এড়াতে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা টেকনিক্যাল ট্রেনিং কলেজে খণ্ডকালীন অধ্যাপনা করেন। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ সিরাজ সিকদার শেখ মুজিবের প্রতি একটি চিঠি লিখে পূর্ব বাংলা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেন। চিঠির পূর্ণবিবরণ ছিল নিম্নরূপ-

'আপনার ও আপনার পার্টির ছয়দফা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, ছয়দফার অর্থনৈতিক দাবিসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে, পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন করে।

www.pathagar.com

আপনাকে ও আপনার পার্টিকে পূর্ব বাংলার সাত কোটি জনসাধারণ ভোট প্রদান করেছে পূর্ব বাংলার উপরস্থ পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকগোষ্ঠীর উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান করে স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েমের জন্য। পূর্ব বাংলার জনগণের এ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন আপনার প্রতি ও আওয়ামী লীগের প্রতি নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী পেশ করছেঃ

পূর্ব বাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এবং সংখ্যাগুরু জাতীয় পরিষদের নেতা হিসেবে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করুন। পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিক, প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধিসম্বলিত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার কায়েম করুন। প্রয়োজনবোধে এ সরকারের কেন্দ্রীয় দফতর নিরপেক্ষ দেশে স্থানান্তর করুন। পূর্ব বাংলাব্যাপী এ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জানান। এ উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী গঠন এবং শহর ও গ্রামে জাতীয় শত্রু খতমের ও তাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহ্বান জানান। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিক-কৃষক এবং প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে "জাতীয় মুক্তি পরিষদ" বা "জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট" গঠন করুন। প্রকাশ্য ও গোপন, শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী পদ্ধতিতে সংগ্রাম করার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে ঃ

(ক) পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণভাবে উৎখাত এবং পূর্ব বাংলাস্থ তাদের সকল সম্পত্তি বিরাষ্ট্রীকরণ করা। উপনিবেশিক সরকারের সকল প্রকার শোষণ ও অসম চুক্তির অবসান করা। এদের দালালদের সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা। এদের মধ্যে ঘৃণ্যতমদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(খ) পূর্ব বাংলার জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের সকল নাগরিক অধিকার বাতিল করা। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক দেশপ্রেমিকদের জাতীয় সরকার গঠন করা।

(গ) গ্রাম্য এলাকায় উপনিবেশিক সরকারের ভূমি শোষণের অবসান করা। সরকারি খাস ভূমি এবং বিশ্বাসঘাতক জমিদার, জোতদার ও অন্যান্য দেশদ্রোহীদের ভূ-সম্পত্তি ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা। দেশপ্রেমিক জমিদার-জোতদারদের পরিচালিত শোষণ হ্রাস করা।

(ঘ) শ্রমিকদের আটঘন্টা শ্রম সময়, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সমর্থন করা।

(ঙ) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করা।

(চ) ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া প্রতিষ্ঠিত করা।

(ছ) ধর্মীয়, ভাষাগত ও উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা।

(জ) পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অসম উন্নতির সমতা বিধানের ব্যবস্থা করা।

(ঝ) বন্যায়, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা ও পোকা এবং দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।

www.pathagar.com

(ঞ) জাতীয় সংস্কৃতি, শিল্পকলা, শিক্ষা, গবেষণা, খেলাধুলা ও শরীর গঠনের ব্যবস্থা করা।

(ট) পঞ্চশীলার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করা।

(ঠ) বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক অগ্রগতির সংগ্রামকে সমর্থন করা।

(ড) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পূর্ব বাংলাস্থ তৎপরতার বিরুদ্ধে সজাগ করা।

ইয়াহিয়া-ইয়াকুবের বেয়নেট-বুলেটের নিকট আত্মসমর্পণ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য উপনিবেশিক শাসন ও শোষণ মেনে নেয়া বা সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার দু'টো পথ পূর্ব বাংলার জনগণের সামনে খোলা রয়েছে। পূর্ব বাংলার জনগণ রক্তের বিনিময়ে প্রমাণ করেছেন স্বাধীনতার চাইতে প্রিয় তাদের নিকট আর কিছুই নেই।

আপনি ও আপনার পার্টি অবশ্যই উপরক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে জনতার এ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করবেন। অন্যথায় পূর্ব বাংলার জনগণ কখনই আপনাকে ও আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করবে না।

* পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা-জিন্দাবাদ।

* পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-জিন্দাবাদ।

* পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও দালালদের-খতম কর।

* গ্রামে-শহরে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করুন।

* সমস্ত দেশপ্রেমিকদের-ঐক্যবদ্ধ করুন।'

মার্চের দিকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সিরাজ সিকদার ভারতকে সম্প্রসারণবাদী বলে আখ্যায়িত করে আশ্রয়গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল 'শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে ভারতে গঠিত পূর্ব বাংলার জনগণের প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রসঙ্গে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন' শীর্ষক এক প্রচারপত্রে তিনি বলেন-

'পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার জনগণের জাতীয় সত্ত্বাকে ধ্বংস করে এক স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করার জন্য তার ফ্যাসিবাদী সামরিক বাহিনী দ্বারা সবাইকে হত্যা করছে, সবকিছু পুড়িয়ে দিচ্ছে এবং সব কিছু লুট করছে। পূর্ব বাংলার বীর জনগণ এই চরম ফ্যাসিবাদী বর্বরতার নিকট আত্মসমর্পণ না করে বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের নিকট স্বাধীনতার চাইতে প্রিয় আর কিছুই নাই। এর জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ফ্যাসিবাদী হামলা পরিচালনা করার যখন পাঁয়তারা করছিল তখন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন ২ মার্চ শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নিকট একটি খোলা চিঠি প্রেরণ করে। এতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ ছিল-

* পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন করা ব্যতীত ছয়দফা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন করা সম্ভব পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সৈন্যবাহিনীকে পূর্ব বাংলার ভূমিতে পরাজিত ও ধ্বংস করে তার রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার মাধ্যমে।

* মিটিং-মিছিল-অহিংস অসহযোগের ভুল পথ পরিত্যাগ করে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথ গ্রহণ করে স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব বাংলার প্রজাতান্ত্রিক সরকার ঘোষণা করা এবং পূর্ব বাংলার প্রকাশ্য-গোপনে কার্যরত সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি, গোষ্ঠী, ব্যক্তি, ধর্মীয়-ভাষাগত ও উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী বিপ্লবী কোয়ালিশন সরকার গঠন করা।

www.pathagar.com

* এ সরকারে পূর্ব বাংলাব্যাপী কায়েম করার জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে কার্যরত পূর্ব বাংলার সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি, গোষ্ঠী, ব্যক্তি, ধর্মীয়-ভাষাগত-উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট স্থাপন করা। এই সাথে পূর্ব বাংলার সরকারের সর্বনিম্ন কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কর্মনীতির কথা উল্লেখ করা হয়। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, অহিংস অসহযোগের ভুল পথে লেগে থাকে, স্বাধীনতা ঘোষণা, সরকার গঠন ও মুক্তিফ্রন্ট গঠনে বিরত থাকে। এভাবে জনসাধারণকে তারা ফ্যাসিবাদী হামলার মুখে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ও নেতৃত্বহীন করে রাখে।

পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী জনসাধারণের ওপর পূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হত্যা ও ধ্বংসলীলা শুরু করে। লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র-নিরপরাধ জনসাধারণ নিহত হয়, আহত হয় ও প্রাণ ভয়ে সর্বস্ব পরিত্যাগ করে গ্রামে যেতে বাধ্য হয়। তবুও তারা অসীম আত্মত্যাগ ও বীরত্বের সাথে প্রায় নিরস্ত্রভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, রক্তের ঋণ তারা তুলবেই।

এ পর্যায়ে শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একক সরকার গঠনের কথা ভারতের বেতারে শোনা যায়। পূর্ব বাংলার জনগণ ও পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন মনে করে, পূর্ব বাংলার জনগণের স্বার্থের সত্যিকার প্রতিনিধিত্বকারী সরকারের নিম্ন-লিখিত সর্বনিম্ন সুনির্দিষ্ট নীতিসমূহ পালন করতে হবে।

* এই সরকার অবশ্যই একটি কোয়ালিশন সরকার হবে যেখানে সংগ্রামরত পূর্ব বাংলার বিভিন্ন প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি, গোষ্ঠী, ব্যক্তি, ধর্মীয়-ভাষাগত-উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

* পূর্ব বাংলার সর্বস্তরে এ সরকার স্থাপনের নিমিত্ত পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রামের পরিচালনা ও নেতৃত্ব প্রদানের জন্য পারস্পরিক স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যতার ভিত্তিতে একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট স্থাপন করা।

এ সরকার ও মুক্তিফ্রন্ট কর্তৃক পূর্ব বাংলার পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য গণযুদ্ধের পথ গ্রহণ করা ও তাতে শেষ পর্যন্ত লেগে থাকা।

* বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ সরকার ও মুক্তিফ্রন্ট নিম্নলিখিত সর্বনিম্ন নীতিসমূহ পালন করবে।

* ভারতসহ অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে পরস্পরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, পরস্পর অনাক্রমণ, পরস্পরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, সমতা ও পারস্পরিক সহায়তা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চশীলা নীতির ভিত্তিতে।

* পূর্ব বাংলার মুক্তির জন্য পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনসাধারণের ওপর নির্ভর করা। ভারত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বা অন্য কোনো দেশের সৈন্য, সশস্ত্র ব্যক্তিকে পূর্ব বাংলার মুক্তির সহায়তার নামে পূর্ব বাংলার ভূমিতে প্রবেশ করতে অনুমতি প্রদান না করা। এর বিরোধিতা করা। তাদের বেসামরিক বা সামরিক ব্যক্তির পূর্ব বাংলার মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে কোনো সাহায্য গ্রহণ না করা, তাদের হস্তক্ষেপে বিরোধিতা করা।

* পশ্চিম বাংলার সাথে সংযুক্ত হয়ে যুক্ত বাংলা স্থাপন বা ভারতের সাথে ফেডারেশন স্থাপনের বিরোধিতা করা।

www.pathagar.com

* ভারত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বা অন্য কারো দেশের সাথে কোন প্রকার সামরিক জোট স্থাপন না করা, এদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান না করা, এ সকলের বিরোধিতা করা।

* এদেরকে পূর্ব বাংলায় কোনো প্রকার সামরিক ঘাঁটি স্থাপন এবং কোনো প্রকার সামরিক তৎপরতায় পূর্ব বাংলার ভূমি ব্যবহারের বিরোধিতা করা।

* পূর্ব বাংলায় সরকারের কার্য পরিচালনায় এবং নীতি নির্ধারণে ভারত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বা অন্য কোনো দেশের কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ বা প্রভাবের বিরোধিতা করা।

পূর্ব বাংলার মুক্তির বিষয়ে শর্তহীনভাবে সকল প্রকার বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা। কিন্তু শর্তযুক্ত বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত সকল প্রকার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা ও তার বিরোধিতা করা।

ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, প্যালেস্টাইনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নিপীড়িত জাতি, দেশ ও জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রাম এবং সামাজিক অগ্রগতির সংগ্রামকে সমর্থন করা এবং সহায়তা করা।

* এ সরকার ও মুক্তিফ্রন্ট দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সর্বনিম্ন নীতিসমূহ পালন করবেঃ

* গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা এবং জনগণ থেকে আসা ও জনগণের নিকট নিয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করা।

* পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত পুঁজি ও প্রতিষ্ঠান বাজেয়াপ্ত করা।

* ব্যক্তিগত জাতীয় পুঁজি রক্ষা করা।

* পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজি (একচেটিয়া ব্যবসা, ব্যাংক, বীমা ও কারখানা) বাজেয়াপ্ত করা।

* মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব বাংলাস্থ সকল পুঁজি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, তাদের ঋণ পরিশোধ বন্ধ করা।

* পর্যায়ক্রমে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার করে যে জমি চাষ করে তার হাতে জমি প্রদান করা।

* শ্রমিকের আট ঘণ্টা সময়সীমা নির্ধারণ করা এবং তাদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ করা।

* দেশপ্রেমিক প্রতিটি রাজনৈতিক পার্টি, গোষ্ঠী, ব্যক্তি বা সংগঠনের কার্য পরিচালনার অবাধ অধিকার প্রদান করা। তাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তৎপরতা, গ্রেফতার ও বিনা বিচারে বন্দি রাখার পদ্ধতির বিরোধিতা করা।

উপরিউক্ত সর্বনিম্ন নীতিসমূহের অন্তর্ভুক্তি ব্যতীত কোনো সরকার বা সংস্থা পূর্ব বাংলার জনগণের সত্যিকার রাজনৈতিক মুক্তি আনয়ন করতে পারে না। উপরন্তু এ সকল বিষয় ব্যতীত মুক্তি সংগ্রাম হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের ষড়যন্ত্রে পরিচালিত প্রতিবিপ্লবী সংগ্রাম এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে পূর্ব বাংলা হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের উপনিবেশ এবং এ সরকার হবে এদের পুতুল সরকার। পূর্ব বাংলার জনগণ এক

www.pathagar.com

উপনিবেশিক শোষণের পরিবর্তে অপর এক উপনিবেশিক শোষণের জালে আবদ্ধ হতে চায় না।

কাজেই উপরিউক্ত শর্তসমূহ ব্যতীত পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে সমর্থন করে না এবং এ সরকার বাস্তবায়নে কোনো প্রকার সহযোগিতা বা সংগ্রাম করবে না। উপরিউক্ত শর্তসমূহ ব্যতীত এ সরকারকে পূর্ব বাংলার জনগণ ও পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন মনে করে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের ষড়যন্ত্রের ফল, যার উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশে পরিণত করা, একে লুণ্ঠন ও শোষণ করা। পূর্ব বাংলার জনগণ ও পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন একে বিরোধিতা করে।

পূর্ব বাংলার সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি, গোষ্ঠী, ব্যক্তি, ধর্মীয়, ভাষাগত ও উপজাতীয় সংখ্যালঘু এবং আওয়ামী লীগের সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের প্রতি পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন আহ্বান জানাচ্ছে উপরিউক্ত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে একটি কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করুন, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা, মুক্তি ও গণতন্ত্রের গণযুদ্ধে লেগে থাকুন, স্বাধীন গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েম করুন।

পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে কয়েকটি পয়েন্ট

(১) পাকিস্তানের ফ্যাসিবাদী উপনিবেশিক সামরিক চক্রের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

(২) শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব বাংলার জাতীয় সংগ্রাম প্রগতিশীল নয়। এ কারণে পূর্ব বাংলা ও বিশ্বের সর্বহারারা ইহা সমর্থন করে না।

(৩) শেখ মুজিব তার সমর্থকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করতে পারবে না।

(৪) ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন ও সহায়তায় পূর্ব বাংলার সত্যিকার মুক্তি আসতে পারে না, আসতে পারে নতুন শৃঙ্খল ও পরাধীনতা।

(৫) পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে অর্জিত হবে।

(৬) দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথ পূর্ব বাংলার মুক্তির পথ।

(৭) রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কর। জাতীয় শত্রু খতম কর।

(৮) পূর্ব বাংলার সর্বহারা বিপ্লবী ও জনগণকে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ কর।

(৯) পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের রাজনৈতিক লাইন সঠিক।'

মে সিরাজ সিকদার তাঁর নিজস্ব গেরিলাদের সাথে নিয়ে বরিশাল কীর্তিপাশা নদীকে এক সম্মুখ সমরে ২৬ জন পাকসেনাকে নিহত করে একটি সেনা ইউনিট বিপর্যস্ত করে ফেলেন। এরপরই পেয়ারাবাগানে অবস্থানকালে ৩ জুন গঠিত হয় 'পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি'। এই সময়ই বরিশাল সদর-বানারীপাড়া, ঝালকাঠি, কাউখালী, স্বরূপকাঠি থানার সীমান্তবর্তী আটঘর, কুড়িখানা, ভিমরুলী, ভুমুরিয়া ও অন্যান্য গ্রামে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বে একটি নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে ওঠে। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে পাক হানাদার বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে তাদের পরাস্ত করতে থাকে। সংগ্রামের মাধ্যমে বিশাল এলাকা মুক্ত করে, মুক্ত এলাকায় ঘাঁটি

www.pathagar.com

স্থাপন করে। জনগণকে সংগঠিত করে এক গুরুত্বপূর্ণ রণভূমিকা স্থাপন করতে সক্ষম হন সিরাজ সিকদার।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে সিরাজ সিকদার শেখ মুজিবের কাছে লিখিত এক পত্রে বিনয়ের সাথে অভিযোগ করে কিছু সুপারিশ প্রদান করেন যার বিষয়বস্তু চিঠিটি না পড়লে অনুধাবন করা অসম্ভব। চিঠির (বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি) পূর্ণবিবরণ ছিল নিম্নরূপ-

প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

পূর্ব বাংলার সত্যিকার স্বাধীনতার জন্য পূর্ব বাংলার লাখ লাখ জনগণ আত্মবলিদান করেছেন। তাদের আকাঙ্ক্ষিত প্রাণের চেয়ে প্রিয় স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হতে পারে নিম্নলিখিত সর্বনিম্ন দাবিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঃ

১. পূর্ব বাংলার ভূমি থেকে অনতিবিলম্বে শর্তহীনভাবে সকল ভারতীয় সৈন্য, সামরিক ও বেসামরিক উপদেষ্টাদের ভারতে ফেরত পাঠানো। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, স্থিতিশীলতা আনয়ন, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন বা অন্য কোনো কাজে সহায়তা করার জন্য ভারত বা অন্য কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের সামরিক বা বেসামরিক নাগরিকদের উপদেষ্টা বা অন্য কোন পদে নিয়োগ না করা। নিয়োজিত হয়ে থাকলে তাদেরকে অনতিবিলম্বে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো।

ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক নাগরিকদের পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব, হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের অবসান করা। ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্বদেশে ফিরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা যাতে জনগণের ওপর অত্যাচার করতে না পারে সে বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২। পূর্ব বাংলার স্থিতিশীলতা আনয়ন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজের জন্য পূর্ব বাংলার সম্পদ এবং কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ, সাহসী ও দেশপ্রেমিক জনগণের ওপর সর্বতোভাবে নির্ভর করে।

৩। পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্য থেকে নিয়মিত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী গড়ে তোলা এবং জনগণকে সামরিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সশস্ত্র করে স্থানীয় বাহিনী গড়ে তোলা। পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষার জন্য এই সামরিক বাহিনী ও জনগণের ওপর নির্ভর করা।

পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষার জন্য ভারত বা অন্য কোনো দেশের ওপর নির্ভর না করা। পূর্ব বাংলার নিয়মিত বাহিনী ও স্থানীয় বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব মুক্তিবাহিনীর পক্ষেই সম্ভব। মুক্তিবাহিনীকে নিরস্ত্র করা থেকে ভারতীয় বাহিনীকে বিরত করা। মুক্তিবাহিনীর মধ্যকার প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা জনগণের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা।

ভারত বা অন্য কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে প্রকাশ্য বা গোপনে কোনো প্রকার প্রতিরক্ষার চুক্তি, সামরিক চুক্তি বা বন্ধুত্বের চুক্তির আবরণে সামরিক চুক্তি না করা।

৪। পূর্ব বাংলার জামাত, পিডিপি, মুসলিম লীগ (তিন অংশ), নেজামে ইসলাম এবং পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের সাথে সহযোগিতা করেছে এইরূপ অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টি, গোষ্ঠী, দল ও ব্যক্তিদের নির্বাচিত হওয়া, ভোট প্রদানের অধিকার, মিটিং, মিছিল ও

www.pathagar.com

সংগঠিত হওয়া এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার অধিকার বাতিল করা। তাদের ভূমি গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা। ভূমি ব্যতীত তাদের শিল্প-ব্যবসা ও অন্যান্য সম্পত্তি ক্ষতিপূরণ ছাড়াই রাষ্ট্রীয়করণ করা। এদের মধ্যকার গোঁড়া জনগণ-বিরোধীদের বিচার করা ও শাস্তি প্রদান করা।

৫। আদমজী, দাউদ, ইস্পাহানী, বাওয়ানী, গান্ধারা, করিম, হাবিব ও অন্যান্য অবাঙালিদের পূর্ব বাংলাস্থ বৃহৎ শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই রাষ্ট্রীয়করণ করা। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জাতীয় পুঁজিকে রক্ষা ও তার বিকাশে সাহায্য করা।

৬। পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের সাথে সহযোগিতা করেনি-এরূপ পূর্ব বাংলার সামন্ত জমিদার-জোতদারদের ভূমি ক্ষতিপূরণসহ ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা। মহাজনী প্রথা, সুদ গ্রহণের প্রথা ও বন্ধকী প্রথা বাতিল করা এবং এর ফলে হারানো ভূমি কৃষকদের মাঝে বিনা ক্ষতিপূরণে ফেরত দেয়া। গ্রাম-পঞ্চায়েত ও গ্রাম রক্ষীবাহিনীর মাধ্যমে গ্রামে জমিদার, জোতদার, মহাজন, টাউট, অত্যাচারী, জুলুমবাজদের শাসন কায়েম ও তাদের রক্ষা না করা। পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের হাতে ও যুদ্ধে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

৭। ২৫ মার্চের পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনা ও তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের তৎপরতার ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের হাতে নিহত, যুদ্ধকালে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। ব্যক্তিমালিকানাধীন ক্ষতিগ্রস্ত সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কার্য শুরু করার জন্য সাহায্য করা। পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের দ্বারা আটককৃত সকল রাজবন্দিদের মুক্তি প্রদান করা।

৮। শর্তহীন ও স্বল্প সুদে ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ঋণ গ্রহণ করা। প্রকাশ্য বা গোপনে ভারত বা অন্য কোনো দেশের সাথে কোনো প্রকার স্বল্প মেয়াদী বা দীর্ঘ মেয়াদী অসম বাণিজ্য চুক্তি, পণ্য বিনিময় চুক্তি না করা। গোপনে সম্পাদিত সকল প্রকার চুক্তি জনসাধারণের বিবেচনার জন্য প্রকাশ করা। চাল, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, তরি-তরকারি, শাক-সবজি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভারতে রফতানি বন্ধ করা।

ভারত কর্তৃক সরাসরি পূর্ব বাংলা থেকে পাট, চা, চামড়া ইত্যাদি ক্রয়ের অধিকার বাতিল করা, অন্যথায় পূর্ব বাংলার জনগণ শ' শ' কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা হারাবেন।

৯। পূর্ব বাংলার শিল্প ব্যবস্থা, বাণিজ্য, ব্যাংকিং, কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবহন, যোগাযোগ এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ভারত বা অন্য কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের পুঁজির অনুপ্রবেশ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব প্রতিরোধ করা। পূর্ব বাংলার সীমান্তে কাস্টম ব্যবস্থা চালু করা। পূর্ব বাংলা থেকে ভারত বা ভারত থেকে পূর্ব বাংলায় চোরাকারবারী বা অননুমোদিত উপায়ে দ্রব্যাদি পাচার রোধ করা।

১০। পূর্ব বাংলার ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠা, হালকা শিল্প ও কুটির শিল্প বিকাশ সাধন করা। এদেরকে বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্যে ভারত বা অন্য দেশের পণ্যে পূর্ব বাংলার বাজার দখল প্রতিহত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১১। পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের দ্বারা বরখাস্তকৃত, ছাঁটাইকৃত, ছুটি প্রদত্ত, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী এরূপ সকল কর্মচারীদের পুনরায় কাজে বহাল করা। বেকারদের চাকরির ব্যবস্থা করা।

www.pathagar.com

চাকরিকালীন অবস্থায় মৃতদের পেনশন ও অন্যান্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। ভারত বা অন্য কোনো বৈদেশিক নাগরিকদের সরকারি বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নিয়োগ না করা। নিয়োজিত হয়ে থাকলে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো।

সরকারি, বেসরকারি, সামরিক এবং অন্যান্য সকল চাকরিতে নিয়োগ, পদোন্নতি ও ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ধর্মীয়, রাজনৈতিক, পার্টিগত, গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত প্রভাবের বিরোধিতা করা, যোগ্যতাকে নিয়োগ, পদোন্নতি ও ছাঁটাইয়ের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা।

১২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু করা, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, জাতি ও দেশ গঠনমূলক গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।

১৩। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক শিল্পকলা-চলচ্চিত্র, সাহিত্যসহ সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের অবাধ বিকাশের ব্যবস্থা করা। ভারত বা অন্য দেশের সাহিত্য, চলচ্চিত্র, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে দেশীয় সাহিত্য, চলচ্চিত্র, শিল্পকলা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করা।

১৪। বেতার, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্রকে একক পার্টির প্রচারযন্ত্র বা বৈদেশিক প্রচারযন্ত্র হিসেবে ব্যবহারের বিরোধিতা করা।

১৫। দেশে সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় নিপীড়নের বিরোধিতা করা, উপাসনা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা রক্ষা। ধর্মীয় সমতার ব্যবস্থা করা।

১৬। বিভিন্ন মতাবলম্বী দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিদের রাজনৈতিক তৎপরতা ও নাগরিক-অধিকার নিশ্চিত করা, বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও প্রকাশনার স্বাধীনতা, সংগঠিত হওয়ার ও সমাবেশের স্বাধীনতা, বিক্ষোভ প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করা। প্রকাশ্যে বা গোপনে বিনা বিচারে গ্রেফতার-হত্যা-আটক রাখার বিরোধিতা করা।

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির কর্মীরা ভারতে না গিয়ে নিজেদের ও জনগণের শক্তির ওপর নির্ভর করে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় পাক সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির মহান গেরিলা যুদ্ধ চালায়, মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলে, একে স্বাগত জানাবার পরিবর্তে মুক্তিবাহিনীর মধ্যকার ফ্যাসিস্টরা, এ সকল অঞ্চল আক্রমণ ও দখল করে নেয়, সর্বহারা পার্টির বহু দেশপ্রেমিক কর্মী, গেরিলা, সহানুভূতিশীল ও জনগণকে 'নকশাল' অভিহিত করে হত্যা করা হয়।

বর্তমানেও প্রকাশ্যে বা গোপনে আওয়ামী লীগ থেকে ভিন্ন মতাবলম্বী, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের 'নকশাল' অভিহিত করে তাদের বিরুদ্ধে খতম অভিযান পরিচালনা বন্ধ করা। যে সকল ফ্যাসিস্ট খুনীরা এ ধরনের জঘন্য কাজ করেছে তাদের বিচার করা ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা। এ বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা জনগণের নিকট প্রকাশ করা। শহীদদের পরিবারে ক্ষতিপূরণে প্রদান করা। গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দান করা।

প্রমাণিত আল-বদর, রাজাকার ও পাক সামরিক দস্যুদের, অন্যান্য দালালের কঠোর শাস্তি বিধান করা। কিন্তু আওয়ামী লীগ থেকে স্বতন্ত্র বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিকদের আল-বদর, রাজাকার বা পাক সামরিক গোষ্ঠীর দালাল বলে খতম করার ঘৃণ্য কার্যকলাপের বিরোধিতা করা।

১৭। পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, আক্রমণ, পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, সমতা ও পারস্পরিক সহায়তা এবং

www.pathagar.com

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, এই পঞ্চশীলার নীতির ভিত্তিতে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। অন্য দেশের সামরিক তৎপরতায় শরীক না হওয়া, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা।

১৮। ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনগণ কর্তৃক পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। তাদের দ্বারা প্রদত্ত সাহায্য সুদসহ ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা।

১৯। ভারত বা অন্য কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের পূর্ব বাংলার আগমন বা পূর্ব বাংলা থেকে ভারত ও বৈদেশিক রাষ্ট্রে গমনের জন্য প্রচলিত আন্তর্জাতিক নিয়মের প্রবর্তন করা। অবাধ চলাচল প্রতিহত করা।

২০। মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক পাকিস্তানের সাথে স্বাক্ষরিত সকল চুক্তি অগ্রাহ্য করা। পাকিস্তানের অংশ হিসেবে মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদের ঋণ পরিশোধের যে অংশ পূর্ব বাংলার ওপর পড়ে তা প্রদান না করা। মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীর পূর্ব বাংলাস্থ সকল সম্পত্তি ও পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা।

২১। সকল ক্ষেত্রে নারীদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও কর্মের সুযোগ প্রদান করা।

২২। সকল প্রকার শ্রমিকদের আট ঘণ্টা শ্রম সময় নির্ধারণ করা এবং প্রগতিশীল শ্রম আইন প্রণয়ন করা। পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের হাতে ও যুদ্ধে নিহত শ্রমিকদের পরিবারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা, বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থান করা।

২৩। পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের হাতে ও যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, বিকলাঙ্গ, কর্মে অক্ষম ও তাদের ওপর নির্ভরশীলদের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা।

২৪। আত্মসমর্পণকারী পাক সামরিক দস্যুদের অস্ত্রশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা। এ সকল দ্রব্যাদি ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক দখল ও ভারতে প্রেরণ বন্ধ করা।

২৫। পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালিদের পূর্ব বাংলায় নিয়ে আসা ও তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

২৬। পূর্ব বাংলায় চালু মুদ্রার মান কমানোর ফলে ভারত লাভবান হচ্ছে। পূর্ব বাংলার বিপুল পরিমাণ মুদ্রা ভারত অর্জন করেছে। ইহা প্রতিরোধ করা এবং মূল্যমান বাড়িয়ে পূর্বের মূল্য ধার্য করা, বাজারে ভারতীয় মুদ্রা চালু বন্ধ করা। পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে স্বর্ণ, রৌপ্য পাচার বন্ধ করা।

২৭। ফারাক্কা বাঁধজনিত সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান করা।

উপরিউক্ত দাবিসমূহ বাস্তবায়িত না করার অর্থ পূর্ব বাংলার সত্যিকারের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্বাধীনতার আবরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন করে পরাধীনতার শৃঙ্খল।

পূর্ব বাংলার জনগণ আশা করে বাংলাদেশ সরকার উপরিউক্ত দাবিসমূহ বাস্তবায়িত করে তাদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের প্রমাণ দেবেন। অন্যথায় এ সরকার হবে ভারতের পুতুল এবং পূর্ব বাংলা হবে ভারতের উপনিবেশ।'

শেখ মুজিবের প্রতি চিঠি লেখার পর সিরাজ সিকদার অবলোকন করেন এদেশে ভারতীয় শোষণ আওয়ামী সরকারের আশীর্বাদেই বিস্তার লাভ করছে। তখন তিনি ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। এ ব্যাপারে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন 'আওয়ামী লীগ সরকার যেহেতু ভারতের পোষ্য সরকার, সেহেতু আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করাই হলো ভারতকে প্রতিহত করা।'

www.pathagar.com

১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণক্রমে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। তখন বাংলাদেশ সর্বহারা পার্টি 'ইন্দিরা গান্ধী জবাব দেবেন কি?' শীর্ষক প্রাঞ্জল ও জনবোধ্য একটি প্রচারপত্রটি প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন। প্রচারপত্রে উল্লেখ করেন-

'১. আপনার (ইন্দিরা গান্ধী) সেনাবাহিনী মিত্রবাহিনী। কিন্তু মিত্রবাহিনী কিভাবে পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের কয়েকশ' কোটি টাকার অস্ত্র-যুদ্ধ সরঞ্জাম ভারতে নিয়ে গেল, পূর্ব বাংলার বহু কলকারখানা-তার খুচরো অংশ, গাড়ি, উৎপাদিত পণ্য, পাট, চা, চামড়া, স্বর্ণ-রৌপ্য ভারতে পাচার করলো? আপনি আপনার দখলদার বাহিনী প্রত্যাহার করার কথা বলে জনগণকে ভাঁওতা দিচ্ছেন। আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো বাঙালিদের দ্বারা আপনার উপনিবেশ পাহারা দেওয়া, বাঙালিদের দমন করা। এছাড়া অসংখ্য ভারতীয় দখলদার সৈন্য আপনি সাদা পোশাকে এবং বাংলাদেশ বাহিনী ও বাংলাদেশ রাইফেলসের ইউনিফর্মে পূর্ব বাংলায় রেখেছেন। আপনার সৈন্য প্রত্যাহারের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

২. আপনি নিজেকে মুক্তি সংগ্রামের বন্ধু বলে জাহির করেন। কিন্তু নাগা, মিজো, কাশ্মীরী, শিখদের মুক্তি সংগ্রামকে কোন ফ্যাসিবাদী উপায়ে দমন করেছেন? ইহা কি প্রমাণ করে না আপনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের সহায়তার বেশ ধরেছেন? এর উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলায় আপনার উপনিবেশ স্থাপন, আপনার হারানো পশ্চাৎভূমি পুনরুদ্ধার, পূর্ব বাংলা শোষণ ও লুণ্ঠন করে আপনার আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকট হ্রাস করা, চীন ও কমিউনিজম প্রতিহত করার ঘাঁটি স্থাপন করা।

৩. আপনি মিত্রের বেশে পূর্ব বাংলার মাছ-মাংস-ডিম-তরকারি, ধান-চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, পাট, চা, চামড়া ও অন্যান্য কাঁচামাল, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রশাসন, দেশরক্ষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে শোষণ ও লুণ্ঠন করেছেন, পূর্ব বাংলায় আপনারা উপনিবেশ কায়েম করেছেন। এ উপনিবেশ কায়েমের জন্য আপনি পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিকদের খোরাক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যে সকল দেশপ্রেমিক বিশেষ করে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির কর্মী যারা আপনার গোলাম হতে রাজি হয়নি তাদেরকে 'নকশাল' অভিহিত করে আপনি খতম করিয়েছেন। এভাবে পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিকদের রক্তে আপনি হাত কলঙ্কিত করেছেন। এতদিন আপনি এ শোষণ ও লুণ্ঠন গোপন চুক্তির মাধ্যমে করেছেন। বর্তমানে ২৫ বছরের শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তির নামে আপনার তাঁবেদার বাংলাদেশ পুতুল সরকার প্রকাশ্যে আপনাকে বাঙালি জাতির দাসখতে লিখে দিয়েছে এবং আপনার শোষণ-লুণ্ঠনকে ন্যায়সঙ্গত করেছে। আপনার ও আপনার তাঁবেদারদের শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে পূর্ব বাংলায় ৭০-৮০ টাকা মণ হয়েছে চাল, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য হয়েছে অগ্নিমূল্য। অনাহার-অর্ধাহার ও বেকারের হাহাকার উঠেছে সর্বত্র। পূর্ব বাংলায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে। না খেয়ে লোক মরছে। পূর্ব বাংলার জন্য আপনার দরদ উছলে পড়ছে, চাল ও অন্যান্য সাহায্য দ্রব্য পূর্ব বাংলায় পাঠাবার কথা বলে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু কতগুণ বেশি লুটে নিচ্ছেন তা তো বলেন না, এর ফলেই আজ ভারতে চাল ও খাদ্যদ্রব্যের দাম কমেছে। এভাবে ভারতের অর্থনৈতিক সংকট আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে আপনি উদ্ধার পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

৪. আপনি গণতন্ত্রের কথা বলেন। কিন্তু আপনার দেশে কি আপনি সামরিক বাহিনী, রিজার্ভ পুলিশ, পুলিশ, সশস্ত্র যুব কংগ্রেসের পাণ্ডাদের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট শাসন চালাচ্ছেন না? 'নকশাল' অভিহিত করে শত-সহস্র জনগণকে হত্যা করেছেন, পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের সাথে আপনার নির্যাতনের কোনো পার্থক্য আছে কি?

www.pathagar.com

৫. আপনি গলাবাজি করে বেড়ান আপনি ধর্মনিরপেক্ষ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের তাঁবেদার কংগ্রেসস্থ হিন্দু ধর্মাবলম্বী প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার, জোতদার, পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবীরা যদি পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগণের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন না চালাতো তবে কি পূর্ব বাংলার জনগণ পৃথক ভূখণ্ড দাবি করতো? তারা এ কারণেই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সমর্থন করেছে। ১৯৪৭-এর পরে ভারতে মুসলিমবিরোধী কয়েক শত রায়ট হয়েছে-অবাঙালি মুসলমান, কলিকাতা, আসাম, ত্রিপুরার লাখ লাখ নিরীহ বাঙালি মুসলমান জনগণকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের বলপূর্বক কপর্দকহীন অবস্থায় পূর্ব বাংলায় ঠেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা ১৯৪৭ সালে ভারতে গিয়েছিল তাদেরকে আপনি শরণার্থীর বেশে পূর্ব বাংলায় পাঠাচ্ছেন। আপনার পুতুল সরকারের মাধ্যমে তাদের ভূ-সম্পত্তি ফেরত দেওয়াচ্ছেন। কিন্তু ভারত থেকে বিতাড়িত বিহারী এবং বাঙালি জনগণকে আপনি তাদের জন্মস্থান ভারতে ফেরত নিতে, তাদের সম্পত্তি ফেরত দিয়ে তাদেরকে পুনর্বাসন করতে কেন রাজি হচ্ছেন না? আপনি আফ্রিকা, বার্মা, সিংহল থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ফেরত নিয়েছেন। কিন্তু ভারত থেকে বিতাড়িত বাঙালি মুসলমানদের ফেরত না নিয়ে আপনি কি প্রমাণ করছেন না যে, 'মুসলিম' এই কারণে তাদেরকে ফেরত নিচ্ছেন না? ইহা প্রমাণ করে আপনি সাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ নন। আপনার ধর্মনিরপেক্ষতার বুলির উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলায় আপনার উপনিবেশ বজায় রাখার পথে মুসলিম ধর্মের বাধা দূর করা এবং ধর্মীয় নিপীড়ন চালানো।

৬. আপনি 'সমাজতন্ত্র' "গরিবি হটাও" বুলি কপচাচ্ছেন। এটা কি জনগণকে ভাঁওতা দেয়া ছাড়া আর কিছু? সমাজতন্ত্রের নামে ভারতে চলছে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ-এই চার পাহাড়ের নির্মম শোষণ-লুণ্ঠন। এর ফলে জনগণ অকল্পনীয় খারাপ অবস্থায় পতিত হয়েছে। আপনারা "গরিবি হটাও", "সমাজতন্ত্রের বুলির ভাঁওতা" ঢাকার জন্য অন্য দেশ শোষণ ও লুণ্ঠন করে চরম অর্থনৈতিক সংকট কাটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। অতীতে জাপানি ফ্যাসিস্টবাদীরা "এশিয়াসহ উন্নত অঞ্চলের বুলিকে এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।" তাদের দখলকৃত এলাকায় তথাকথিত স্বাধীন পুতুল সরকার বসায়। আপনিও জাপানি ফ্যাসিস্টদের কবরে যাওয়ার পদচিহ্ন বেয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বুলিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আপনার সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করেছেন। পূর্ব বাংলার জাতীয় সমস্যার সুযোগ গ্রহণ করে পূর্ব বাংলায় ছয় পাহাড়ের দালাল মীরজাফরদের সহায়তায় পূর্ব বাংলা দখল করে এখানে উপনিবেশ কায়েম করেছেন। মীরজাফরদের নিয়ে পুতুল সরকার কায়েম করেছেন। কিন্তু এখানেই আপনার অভিযোগ শেষ নয়, আপনি নেহেরুর "ভারত আবিষ্কার" অনুসরণ করে দক্ষিণ-এশিয়া ও ভারত মহাসাগরে রাজত্ব বিস্তার করার রঙিন স্বপ্ন দেখছেন। আপনার এই সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষায় সহায়তা করছে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী নয়া জার "ব্রেজনেভ-কোসিগিন বিশ্বাসঘাতক চক্র।" হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণ তার পরাজয়ের সূচনা করে, জাপানি ফ্যাসিস্টদের চীন আক্রমণ তার পরাজয়ের সূচনা করে, একইভাবে আপনার ঢাকা দখল বিজয়ের পদক্ষেপ নয়, আপনার চূড়ান্ত কবরে যাওয়ার পদক্ষেপ মাত্র। আপনার ও আপনার তাঁবেদারদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জনগণ ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করেছেন। পূর্ব বাংলার বীর জনগণ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, পূর্ব বাংলায় ছয় পাহাড়ের দালাল মীরজাফরদের চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করে পূর্ব বাংলার সত্যিকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন।

www.pathagar.com

নোটঃ ছয় পাহাড়ের দালাল সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ এবং পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্ত বাদ-এই ছয় পাহাড়ের প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের সংগঠনসমূহ।' *(সূত্রঃ মুদ্রিত প্রচারপত্র, ১৯৭২)*

সিরাজ সিকদার ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসকে ভারতের সম্প্রসারণ দিবস হিসেবে আখ্যা প্রদান করে কালো দিবস ঘোষণা করে তা পালনের জন্য পার্টির সর্ব শাখাকে নির্দেশ প্রদান করেন। দেশ স্বাধীনের পর দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব ক্ষণিকের জন্যও শোষণ-লুণ্ঠন, প্রশাসনের ব্যর্থতা ও ভারতীয় লুটপাট সহ্য করতে পারেনিনি। তখন মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে গঠিত হয়। সিরাজ সিকদার প্রকাশ্যে সে কর্মসূচির সাথে একাত্মতা ঘোষণা বা সম্পৃক্ত থাকতে পারেননি। কারণ স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকে তিনি শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৭৩ সালের ২০ এপ্রিল তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট। ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচির তৎপরতা দেশব্যাপী সর্বাত্মক হয়ে উঠে। ১৯৭৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর তাঁর ডাকে দেশব্যাপী হরতালের কর্মসূচি থাকলেও বরিশাল, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন অঞ্চলে হরতাল পালিত হয়। মূলত এই কারণেই তিনি আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হন। ঘটনার ঘনঘটায় সিরাজ সিকদার তিন সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে পার্টির সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন এবং সেখান থেকেই পার্টির ভেতরে বিভেদ সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে তাঁর বিশ্বস্ত কিছু সহচর সরকারের সাথে যোগাযোগ করে তাঁকে ধরিয়ে দেয়। জনশ্রুতি রয়েছে এই ষড়যন্ত্রের সাথে তাঁর রাজনৈতিক সহচর ও দ্বিতীয় স্ত্রী জাহানারা হাকিমও জড়িত ছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি গ্রেফতারের পূর্বে দলের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন সিরাজ সিকদার। হালিশহরে বৈঠকে আমন্ত্রিত সবাই উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষ হওয়ার পূর্বে একজন সদস্য একটু সময়ের জন্য বাইরে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। জনৈক সদস্যের রহস্যজনক লাপাত্তা উপস্থিত সবাইকে চিন্তিত করলে বৈঠকে নিরাপত্তার কারণে নির্ধারিত হয়েছিল সকলের আগে বেরিয়ে যাবেন সিরাজ সিকদার। সিদ্ধান্তনুযায়ী সহকর্মী মহসিনকে নিয়ে তড়িঘড়ি করে সিরাজ সিকদার বেরিয়ে গিয়ে দূরবর্তী স্থান থেকে একটি বেবিট্যাক্সী ভাড়া করেন। এ সময়ে তাঁর পরনে ছিল ঘিয়া রঙের প্যান্ট, টেট্রনের সাদা ফুলশার্ট, চশমা এবং হাতে একটি ব্রিফকেস। ট্যাক্সিতে উঠার পর একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁদের কাছে লিফট চায়। সিরাজ সিকদার অপরিচিত ব্যক্তির গন্তব্যস্থল জানতে চাইলে সে অনুনয়ের সঙ্গে সামনে নেমে যাওয়ার কথা বলে ট্যাক্সিতে চড়ে বসে। পুলিশ পূর্বের সংবাদ অনুযায়ী চট্টগ্রাম শহর থেকে হালিশহর পর্যন্ত পুরো রাস্তার ওপর কড়া নজর রেখেছিল। ট্যাক্সি যখন নিউ মার্কেটের (বিপণী বিতান) কাছে আসে তখনই জনৈক যাত্রী ট্যাক্সি থামাতে বলেন। এ পর্যায়ে কথা কাটাকাটি মধ্যে জনৈক যাত্রী লাফ দিয়ে ট্যাক্সির সামনে গিয়ে পিস্তল উঁচিয়ে ড্রাইভারের গতিরোধ করে। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে স্টেনগান হাতে ছয়জন সাদা পোশাকের পুলিশ ঘেরাও করে সঙ্গী মহসিনসহ তাঁর হাতে হাতকড়া পরিয়ে চোখ বেঁধে ডবলমুলিং থানায় নিয়ে যায়।

থানা থেকেই সর্বত্র খবর প্রেরণ এবং জরুরি ভিত্তিতে সন্ধ্যায় কক্সবাজার থেকে যাত্রী নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের শেষ ফকার বিমানটি চট্টগ্রাম পৌছার পর নিয়ম ভঙ্গ করে

www.pathagar.com

ঢাকাগামী যাত্রীদের কয়েকজনকে নামিয়ে ৬-৪৫ মিনিটে তাদের ঢাকা নিয়ে আসা হয়। এর পূর্বে ককপিটের পরেই সামনের চারটি আসন তাদের জন্য সংরক্ষিত করার পর পাইলট বন্দি অবস্থায় কোনো যাত্রীকে বহন করতে অস্বীকার করেন। কিছুটা বাক-বিতণ্ডার পর ঢাকায় পৌঁছে তড়িঘড়ি করে যাত্রীদের নামিয়ে বিমানটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় হ্যাঙ্গারের কাছে। বিমান থেকে অবতরণের সময় আগে থেকেই পেছনের গেট দিয়ে আসা অপেক্ষমাণ পুলিশের গাড়ি থেকে আকস্মিকভাবে পুলিশের জনৈক ইন্সপেক্টর দৌড়ে এসে সিরাজ সিকদারের বুকে লাথি মেরে চিৎকার করে ওঠে, 'হারামজাদা তোর বিপ্লব, কোথায় গেলো।'

এ পর্যায়ে উপস্থিত পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে নতুন আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পান সিরাজ সিকদার। বিমানবন্দর থেকে কড়া প্রহরায় সাইরেন বাজিয়ে সিরাজ সিকদারকে নিয়ে যাওয়া হয় এসবি অফিসে। এসবি অফিসে পাগলা ঘণ্টি বাজিয়ে সবাইকে সতর্ক করে কমিউনিটি টাস্কফোর্স এবং রক্ষীবাহিনী দ্বারা অফিস ঘিরে ফেলা হয়। এসবি অফিসে নিয়ে আসার পর নিরাপত্তার কারণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারী বা পুলিশের সুপারিনটেন্ডেন্টের পদমর্যাদার নিচে কাউকে দেখার অনুমতি দেয়া হয়নি। প্রাথমিক হেফাজতেই তাঁর ওপর চালানো হয় অত্যাচার। অত্যাচারের কথা বের করতে ব্যর্থ হলে এসবি অফিসে কর্মকতারা সিরাজ সিকদারকে তাঁর পরিণতির কথা বললে তিনি উত্তর দেন, 'একজন দেশপ্রেমিকের পরিণতি কি হতে পারে তা ভাল করেই আমার জানা আছে।' এসবি সেলের কর্মকর্তারা শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা বললে তিনি বলেন, 'জাতীয় বিশ্বাসঘাতকের কাছে একজন দেশপ্রেমিক ক্ষমা চাইতে পারে না-এতে যদি মৃত্যুবরণ করতে হয় সেই মৃত্যুকে আমি গ্রহণ করবো, সে মৃত্যু দেশের জন্য মৃত্যু, গৌরবের মৃত্যু।'

গণভবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য টেলিফোন আসলে রাত সাড়ে দশটায় পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় সিরাজ সিকদারকে হাজির করা হয় শেখ মুজিবের সামনে। তাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখেই শেখ মুজিব প্রাইভেট সেক্রেটারীর সাথে আলাপে ব্যস্ত থাকায় সিরাজ সিকদার প্রশ্ন করেন, 'রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাউকে বসতে বলার সৌজন্যবোধ কি আপনার নেই?' সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে একজন পুলিশ সুপার এগিয়ে এসে পিস্তলের বাঁট দিয়ে সিরাজ সিকদারের মাথায় আঘাত করে। গণভবনে কথাকাটাকাটির পর রাত বারোটায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে। রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে মধ্যরাতে সোরগোল বেঁধে গেলে তাড়াহুড়ো করে সেখানে আটক অন্যান্য বন্দিদের নিয়ে যাওয়া হয় অন্যত্র। সমগ্র এলাকা আলোকিত করে জ্বালিয়ে দেয়া হয় সার্চ লাইট। পুরো এলাকা কর্ডন করে ফেলে রক্ষীবাহিনী। রাত সোয়া বারোটায় রক্ষীবাহিনীর প্রধান (অপারেশ) সিরাজ সিকদারের দলের দু'জন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে হেডকোয়ার্টার থেকে কোয়াটার গার্ডে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন। রাত সাড়ে বারোটার দিকে সিরাজ সিকদার ও মহসিনকে নিয়ে আসা হয় রক্ষীবাহিনী হেডকোয়ার্টারে। তারপরই দুইজনকে আলাদা করে দেয়া হয়। রক্ষীবাহিনী হেডকোয়ার্টারের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয় পুলিশের বিশেষ টিম ও রক্ষীবাহিনীর ১১ ব্যাটেলিয়ানের এসপি কোম্পানীর ওপর। পরবর্তী প্রহরগুলোয় তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি। ২ জানুয়ারি ভোর পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় তাঁকে আটক করে রাখা হয় রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে। ২ জানুয়ারি সকালে সিরাজ সিকদারকে কড়া প্রহরাধীনে নিয়ে যাওয়া হয় সাভারে। চারটি ডজ গাড়ি ও একটি টয়োটা গাড়ি অনুসরণ করে তাঁকে।

www.pathagar.com

সাভারে তাঁকে সারাদিন রেখে দেয়া হয় রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে। সন্ধ্যার পর পুলিশের কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে রাত নয়টার দিকে তাঁকে আনা হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেকটু এদিকে। সেখানেই হাত বেঁধে রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয় বলে অনুমান করা হয়।

সিরাজ সিকদারকে হত্যার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি প্রেসনোট জারি করে পরিস্থিতিকে অন্যদিকে মোড় দেয়ার প্রচেষ্টা চালায়। ইত্তেফাকের রিপোর্টে বলা হয়, 'গতকাল বৃহস্পতিবার শেষ রাত্রিতে প্রাপ্ত পুলিশের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয় যে, পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি নামে পরিচিত একটি গুপ্ত চরমপন্থী দলের প্রধান সিরাজুল হক সিকদার ওরফে সিরাজ সিকদারকে পুলিশ ১ জানুয়ারি চট্টগ্রামে গ্রেফতার করে। একই দিন জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি স্বীকারোক্তিমূলক এক বিবৃতি দেন এবং তাহার পার্টির কর্মীদের কয়েকটি গোপন আস্তানা এবং তাহাদের বেআইনী অস্ত্র এবং গোলাবারুদ রাখার স্থানে পুলিশকে লইয়া যাইতে রাজি হন। সেইভাবে ২ জানুয়ারি রাতে একটি পুলিশ ভ্যানে করিয়া তাহাকে ঐসব আস্তানার দিকে পুলিশ দল কর্তৃক লইয়া যাইবার সময় তিনি সাভারের কাছে ভ্যান হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করেন। তাহার পলায়ন রোধ করিবার জন্য পুলিশ দল গুলিবর্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে তাহার মৃত্যু হয়। এ ব্যাপারে সাভারে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সিরাজ সিকদার তাহার গুপ্ত দলে একদল দুর্বৃত্ত সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সাহায্যে হিংস্র কার্যকলাপ, গুপ্তহত্যা, থানার ওপর হামলা, বন অফিস ও টেলিফোন একচেঞ্জের ওপর হামলা, ব্যাংক, হাট-বাজার লুট, লঞ্চ ও ট্রেন ডাকাতি, রেল লাইন তুলিয়া ফেলিবার জন্য গুরুতর ট্রেন দুর্ঘটনা, লোকজনের কাছ হইতে জোর করিয়া অর্থ আদায়ের মত কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করিয়া আসিতেছিলেন।' *(সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ জানুয়ারি, ১৯৭৫)*

দৈনিক বাংলার রিপোর্টে বলা হয়, 'পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির নামে গোপন উগ্রপন্থী দলের প্রধান সিরাজুল হক সিকদার ওরফে সিরাজ সিকদারকে গত ১ জানুয়ারি চট্টগ্রামে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঐদিন তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকা নিয়ে আসা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি একটি স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি দেন এবং তার দলীয় কর্মীদের ও অননুমোদিত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখার গোপন আস্তানায় পুলিশকে নিয়ে যেতে রাজি হন। তদনুযায়ী ২ জানুয়ারি রাতে পুলিশের সাথে একটি পুলিশ ভ্যানে এসব গোপন আড্ডায় যাবার সময় তিনি সাভারের কাছে পুলিশ ভ্যান থেকে লাফিয়ে পড়েন এবং পালানোর চেষ্টা করেন। তিনি যাতে পালাতে না পারেন সেজন্য পুলিশ গুলি চালনা করে। এর ফলে সিরাজ সিকদারের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়। সাভার থানায় এ ব্যাপারে একটি মামলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সিরাজ সিকদার তার গোপন দলের জন্য একদল ডাকাত সংগ্রহ করেছিলেন যাদের নিয়ে তিনি হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে সারাদেশে শান্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট করছিলেন, গোপন হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছিলেন, থানা, বন অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ, ব্যাংক, হাটবাজার লুট করছিলেন, লঞ্চ ও ট্রেন ডাকাতি করছিলেন, রেল লাইন তুলে মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছিলেন এবং লোকজনের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করছিলেন। ঢাকার পুলিশ সুপারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানানো হয়েছে।' *(সূত্রঃ দৈনিক বাংলা, ৩ জানুয়ারি, ১৯৭৫)*

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ্য, যাকে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বিশেষ বিমানে করে ঢাকা আনা হলো তাকে আর যাই হোক, সাধারণ ভ্যানে পালাবার মতো ফাঁক রেখে গোপন আস্তানার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এটা নেহায়েতই একটা বালখিল্য বিবৃতি। তৎকালীন এরকম অসংখ্য বিবৃতিতে যে মানুষ একেবারেই অনাস্থা পোষণ করতো তা সকলে জানেন। ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত একজন পদস্থ সেনা কর্মকর্তার জবানীতেও এটা উপস্থাপিত। পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে সিরাজ সিকদার নিহত হয়েছেন। এ সরকারি ভাষ্য তখন অধিকাংশ জনগণ ও সামরিক বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য বিশ্বাস করেনি। সিরাজ সিকদারকে ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে পুলিশ হেফাজতে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হতো এবং বিনা বিচারে হত্যার জন্য লোকজন সরকারকে দায়ী করতো। দেশে বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড নিয়ে বর্তমানে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু সিরাজ সিকদার হত্যাকাণ্ড নিয়ে কোনো তদন্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। *(সূত্রঃ এক জেনারেলের নীরব সাক্ষীঃ মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অবঃ), দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৯)*

শেখ মুজিবের ভাগ্নে, আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান এবং বাকশালের অন্যতম রূপকার শেখ ফজলুল হক মনির সম্পাদিত ও মালিকানাধীন দৈনিক বাংলার বাণীতে ৫ জানুয়ারি প্রকাশিত এক অতি উৎসাহী সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, 'বিপ্লব করিবার জন্য চারু মজুমদারকে যে কল্পনা বিলাসে পাইয়া বসিয়াছিল তাহার পরিণতি সকলের জানা থাকিবার কথা। সিরাজ সিকদারের পরিণতি তাহার চাইতে ভিন্নতর কিছুই হয় নাই। সিরাজ সিকদার ধৃত হইয়া মৃত্যুবরণ করিবার পর আশা করা যায়, যাহারা এই দেশে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতাকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারা অতঃপর নিজেদের ভুল ধরিতে পারিয়াছেন।'

সিরাজ সিকদার হত্যার ১৭ বছর পর ২৮ বছর বয়স্ক এক তরুণ ৪ জুন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সিরাজ সিকদার হত্যার বিচার প্রার্থনা করেন। রক্তের পরিচয়ে কোনভাবেই এই তরুণ সিরাজ সিকদারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। নাম শেখ মহিউদ্দিন। বাদী পক্ষে দাঁড়ালেন এডভোকেট ফরমান উল্লাহ খান। সঙ্গে আফজল হোসেন। ষাটের দশকের তরুণ ছাত্রনেতা ফরমান উল্লাহ খান এক পায়ে ভর দিয়ে শেষ করলেন তার যুক্তি। নিস্তব্ধপ্রায় আদালতে বহুল আলোচিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পটভূমি ব্যাখ্যা, বিচার এবং আসামীদের গ্রেফতারের হুকুম দাবি করলেন এডভোকেট ফরমান। বিজ্ঞ বিচারক অকুস্থলের থানা তেজগাঁও থানাকে নির্দেশ দিলেন তদন্তের। এ সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে গৃহীত হলো মামলা। মামলার আর্জিতে বলা হয়-

'মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত

ঢাকা

মোং নং-৫৩৮/৯২

তাং ঃ ০৪-০৬-১৯৯২

বাদী ঃ শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ, পিতা-শেখ মোঃ ওয়ারীশ আলী, সাং-স্বরূপকাঠি, ডাক+থানা-নেছারাবাদ, জেলা-পিরোজপুর। সাবেক সভাপতি সিরাজ সিকদার পরিষদ। বর্তমানে সুপ্রিম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, গণতান্ত্রিক সর্বহারা পার্টি, ২১, মতিঝিল বা/এ, ৩য় তলা, ঢাকা।

www.pathagar.com

বনামঃ (১) মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, পিতা-মৃত আফতাব উদ্দিন আহমেদ, সাং-ভাটিখানা সড়ক, আমানতগঞ্জ, বরিশাল, সাবেক পুলিশ সুপার।

(২) আব্দুর রাজ্জাক, পিতা-মৃত হাজী ইমাম উদ্দিন, সাং-দক্ষিণ ডামুড্যা, ডাক+থানা-ডামুড্যা, জেলা-শরিয়তপুর, হাল সাং-বাড়ি নং-১২/১, রোড নং-৪/এ, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

(৩) তোফায়েল আহমেদ, পিতা-আজাহার আলী, গ্রাম-কাড়ালিয়া, ভোলা সদর, হাল সাং-বাড়ি নং-৭৫, রোড নং-১৪ (পুরাতন) ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

(৪) ই এ চৌধুরী, সাবেক আইজি, চেয়ারম্যান পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

(৫) সরোয়ার হোসেন মোল্লা, সাবেক ডাইরেক্টর (অপারেশন) রক্ষীবাহিনী, সাং-বাড়ি নং-১৩, রোড, নং-৩২, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।

(৬) কর্নেল (অবঃ) নূরুজ্জামান, সাবেক মহাপরিচালক, রক্ষীবাহিনী, সুইডেনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের বর্তমান রাষ্ট্রদূত, প্রযত্নে-পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

(৭) মোঃ নাসিম, পিতা-মৃত মনসুর আলী, গ্রাম-কুড়িপাড়া, ডাক-গান্দাইল, সিরাজগঞ্জ, হাল সাং–বাড়ি নং-৭০১, রোড নং-১৩ (নতুন) ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

মামলার বিবরণ
ধারা ৩০২/১০১
বাংলাদেশ দণ্ডবিধি
ঘটনার তারিখ ও সময়ঃ ২ জানুয়ারি, ১৯৭৫।
রাত অনুমান ১১টা, রোজ বৃহস্পতিবার।

বাদীর বিনীত নিবেদন এই যে-

(১) বাদী হুজুরের আদালতে প্রায় ১৭ বছর পূর্বে সংঘটিত ইতিহাসের এক করুণ বেদনাদায়ক নৃশংস রাজনৈতিক হত্যার বিচার দাবি করে আপনার সম্মুখে উপস্থিত। এই নৃশংস ও কাপুরুষোচিত হত্যাযজ্ঞের শিকার বাংলার বীর, আজাদী-পাগল ও মুক্ত বিবেকের অধিকারী স্বাধীনচেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা যুব জননেতা প্রকৌশলী সিরাজুল হক সিকদার ওরফে সিরাজ সিকদার, পিতা-মরহুম আব্দুর রাজ্জাক সিকদার, সাং-৪৭৩, খিলগাঁও, চৌধুরীপাড়া, থানা-সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) এই দীর্ঘ ১৭ বছর যাবত দেশের অস্থির অগণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রী পরিবেশের কারণে আইন-শৃঙ্খলার অস্বাভাবিক অবনতি, সন্ত্রস্ততায় দীর্ঘ ১৭ বছর যাবত এই বীর যুব জননেতা মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের বিচার নিভৃতে কাঁদিয়া ফিরিয়াছে। এই বিষয়ে মরহুমের পরিবারবর্গ ও সহকর্মীর পক্ষে কোনক্রমে কোন অবস্থায় এজাহার করা কিংবা হুজুরের আদালতে উপস্থিত হওয়ার নিম্ন ও ক্ষুদ্রতম সাহস কারও ছিল না এবং এখনও নাই।

(৩) নিহত সিরাজ সিকদার তাহার জীবদ্দশায় বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে প্রথমে শ্রমিক সংগঠন, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং পরবর্তীতে 'পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি' নামে রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া কাজ করিতে থাকেন। শোষিত, বঞ্চিত, মেহনতি জনতার পক্ষে কাজ করিবার কারণে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বের প্রতি জনসমর্থন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তৎকালীন সরকারপ্রধান (মরহুম) শেখ মুজিবুর রহমান ঈর্ষাবশত

www.pathagar.com

জনসমর্থন হারানোর কারণে ক্ষমতাচ্যুতির ভয়ে ভীত হইয়া সর্বহারা পার্টির কর্মীদের উপর দমননীতি চালাইতে থাকেন। এমনকি পার্টির প্রধান সিরাজ সিকদারকে হত্যা করিতে বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন।

(৪) আসামীগণ মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের সহচর এবং অধীনস্থ কর্মচারী থাকিয়া শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত যোগাযোগ এবং তাহার গোপন শলাপরামর্শে অংশগ্রহণ করিতেন। ১ হইতে ৬ নং আসামী তৎকালীন সময়ে সরকারের উচ্চাসীন থাকায় অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সহচরদের সহিত শেখ মুজিবুর রহমানের 'সিরাজ সিকদার হত্যার নীল নকশায়' অংশগ্রহণ করেন। তাহারা সিরাজ সিকদারকে হত্যার লক্ষ্যে সর্বহারা পার্টির বিভিন্ন কর্মীকে হত্যা, গুম, গ্রেফতার, অত্যাচার ও হয়রানি করতে থাকে।

(৫) মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অত্র আসামীসহ তাহার অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে সর্বহারা পার্টি দমন এবং সিরাজ সিকদারকে হত্যার উদ্দেশ্যে এক পর্যায়ে তাহার সর্বহারা পার্টির মধ্যে সরকারের চর নিয়োগ করে এবং বিগত ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি বুধবার চট্টগ্রাম নিউমার্কেট এলাকা হইতে অত্র মামলার সাক্ষী বাবু ওরফে আকবর ওরফে রবীন, পিং-অজ্ঞাত সাং-গুয়াবাড়িয়া, থানা-হিজলা, জেলা-বরিশালসহ সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার করাইয়া ঐ দিন বিমানযোগে বন্দিদের পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের মালিবাগস্থ অফিসে নিয়ে আসা হয়। সেখানে বন্দি দু'জনকে আলাদা করিবার পরে সিরাজ সিকদারের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। ২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় পুলিশ এবং রক্ষীবাহিনীর বিশেষ স্কোয়াডের অনুগত সদস্যরা গণভবনে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে সিরাজ সিকদারকে হাতবাঁধা অবস্থায় নিয়া যায়। সেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (মরহুম) ক্যাপ্টেন মনসুর আলীসহ আসামীগণ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের পুত্র মরহুম শেখ কামাল এবং ভাগ্নে মরহুম শেখ ফজলুল হক মনি উপস্থিত থাকেন। শেখ মুজিবুর রহমান বন্দি সিরাজ সিকদারকে প্রথম দর্শনে গালাগাল করিতে থাকলে সিরাজ সিকদার দেশের সরকারপ্রধান হিসেবে একজন রাজনৈতিক নেতার সহিত অসৌজন্যমূলক আচরণ করিবার প্রতিবাদ করিলে শেখ মুজিবুর রহমানসহ উপস্থিত সকলে উত্তেজিত হইয়া বন্দি সিরাজের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই সময়ে দেশের স্বাধীনতা ভারতের কাছে বিক্রি করিয়া দেয়া, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও শেখ মুজিবুর রহমানের পুত্র কর্তৃক ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, ঘুষ, দুর্নীতির প্রতিবাদ করিয়া বন্দি সিরাজ সিকদার সরকারপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে জনগণের দুঃখ লাঘবের জন্য আওয়ামী লীগ তথা দুর্নীতিবাজদের শায়েস্তা করার দাবি জানাইলে শেখ মুজিবুর রহমান উত্তেজনায় ফাটিয়া পড়েন। ১ নং আসামী মাহবুব উদ্দিন আহমেদ তাহার কাছে থাকা রিভলবারের বাঁট দিয়া বন্দির মাথায় আঘাত করিলে সে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমানের পুত্র শেখ কামাল রাগের মাথায় গুলি করিলে তা বন্দি সিরাজ সিকদারের হাতে লাগে। ঐ সময় সকল আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে বন্দি সিরাজ সিকদারকে পাড়াইয়া, লাথি ও ঘুষি মারিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলে। এরপর শেখ মুজিবুর রহমান, মনসুর আলীসহ ২ হইতে ৭ নং আসামী সিরাজ সিকদারকে হত্যা করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। ১ নং আসামীসহ এই সকল আসামী একত্রে বন্দি সিরাজ সিকদারকে শেরে বাংলা নগরস্থ রক্ষীবাহিনীর হেড কোয়ার্টারে নিয়া যায়। ইতিমধ্যে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আসামিগণ সেখানে বন্দি সিরাজ সিকদারকে অকথ্য নির্যাতন করে। নির্যাতনের পর তাহারা সিরাজ সিকদারকে কিভাবে হত্যা করা যায় তাহার কৌশল নির্ধারণ করেন। এরপর ১ নং আসামী বিশেষ

www.pathagar.com

স্কোয়াডের সঙ্গী পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের সাথে নিয়া এই সকল আসামীর উপস্থিতিতে ২ জানুয়ারি রাত আনুমানিক ১১টার দিকে রক্ষীবাহিনীর হেড কোয়ার্টার শেরে বাংলা নগরে সিরাজ সিকদারকে গুলি করিয়া হত্যা করে। এরপর পূর্বের পরিকল্পনা মতো বন্দি অবস্থায় নিহত সিরাজ সিকদারের লাশ সাভারের তালবাগ এলাকা হইয়া সাভার থানায় নিয়া যায় এবং সাভার থানা পুলিশ তাহার লাশ ময়না তদন্তের জন্য ৩ জানুয়ারি, ১৯৭৫ মর্গে প্রেরণ করে।

(৬) মুজিবুর রহমানের তৎকালীন স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রী শাসন এবং রক্ষীবাহিনীর সন্ত্রাসের কারণে সিরাজ সিকদারের পিতা মরহুম আব্দুর রাজ্জাক সিকদার থানায় মামলা রুজু করিতে গেলেও পুলিশ মামলা গ্রহণ করে নাই·এবং শাসকের সন্ত্রাসের মুখে আদালতে মোকদ্দমা করিতে পারেন নাই।

(৭) তৎকালীন সরকারপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সংসদে প্রদত্ত ভাষণে 'কোথায় সিরাজ সিকদার' দম্ভোক্তি করিয়া সিরাজ সিকদারকে হত্যা করিয়া তাহার জিঘাংসা চরিতার্থ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই ঘটনা কতক সাক্ষিগণ দেখিয়াছে, কতক সাক্ষী শুনিয়াছে, কতক সাক্ষী জানিয়াছে।

(৮) এই পর্যন্ত দেশের পুরোপুরি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এবং উপরে বর্ণিত কারণে সিরাজ সিকদার হত্যার মোকদ্দমা করা সম্ভব হয় নাই। দীর্ঘ বিলম্বিত মামলা দায়েরের কারণ এই।'

-o-

www.pathagar.com

বাকশাল শাসন কায়েম

১৯৭৫ সালের ১৮ জানুয়ারি বসে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠক। এই বৈঠকেই শেখ মুজিব সংসদ সদস্যদের কাছে তুলে ধরেন তার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক নতুন পরিকল্পনার কথা। এই বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'শতাব্দীর জীর্ণ ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থা পাল্টে দিয়ে প্রশাসন যন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতন্ত্রীকরণ এবং একটিমাত্র রাজনৈতিক প্লাটফরমের পতাকাতলে সমগ্র জাতিকে সমবেত করে সুসংহত ও সংঘবদ্ধ জাতীয় প্রয়াস ছাড়া সংকট থেকে পরিত্রাণের কোন পথ নেই। খণ্ডিত, বিক্ষিপ্ত এবং অসংলগ্ন পরস্পর বিরোধী কর্মতৎপরতা বন্ধের জন্য আজ যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সকল দেশপ্রেমিক শক্তির নিবিড় একাত্মতা এবং ঐক্যবদ্ধ ও গঠনমূলক সর্বাধিক কর্ম-প্রয়াস। কেবলমাত্র একটি শক্তিশালী ও বৈপ্লবিক ব্যবস্থার অধীনেই তা সম্ভবপর।'

এরপর ২০ জানুয়ারি বসে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। এই অধিবেশনেও দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি পেশ করা হয়। কিন্তু শেখ মুজিবের এই নতুন পদ্ধতির বিষয়টি অনেকেই সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। অন্যদল বা ব্যক্তিতো দূরে থাক আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেও একটি অংশ শেখ মুজিবের এই নতুন নীতির প্রতিবাদ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, নূরে আলম সিদ্দিকী, ব্যারিস্টার মঈনুল ইসলাম প্রমুখ। জেনারেল ওসমানী ১৮ তারিখের বৈঠকেই এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'আমরা আইয়ুব খানকে দেখেছি, ইয়াহিয়া খানকে দেখেছি। আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে খান হিসেবে দেখতে চাই না।'

বিরোধিতা সত্ত্বেও ২১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে শেখ মুজিবকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এরপরই শেখ মুজিব তার নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিব সকল রাজনৈতিক দল, সরকারবিরোধী আন্দোলন ও কার্যক্রম প্রভৃতি নিষিদ্ধ করে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েমের ইচ্ছা ২১ জানুয়ারি সংসদীয় দলের সভায় ব্যক্ত করলে জেনারেল ওসমানী তৎক্ষণাৎ এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সভাস্থল ত্যাগ করেন এবং পরের দিন শেখ মুজিবের প্রতি এক পত্রের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি পদত্যাগ পত্রে বলেন ঃ

জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী, পিএসসি (অবসরপ্রাপ্ত)
১৯ ডি.ও.এইচএস
ঢাকা সেনানিবাস।
ডি ও নং-০০১৪
২২ জানুয়ারি ১৯৭৫
আমার প্রিয় বঙ্গবন্ধু

১৯৭৫ সনের ২১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সভার পর আপনার নিকট আমার মৌখিক বক্তব্যের সমর্থনে এই চিঠি লিখছি। আপনি অবগত আছেন যে, উক্ত সভায় নিম্নলিখিত কারণে সংবিধানের আমূল পরিবর্তনের জন্য গৃহীত সংশোধনীর পক্ষে আমি ভোট প্রদান করিনি।

www.pathagar.com

॥ক॥ তা করলে আমি আমার বিশ্বাস ও বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতাম।

॥খ॥ এই সংশোধনীর অর্থ হলো জনগণের কাছে প্রদত্ত আমাদের দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতি এবং বস্তুত জনগণ ১৯৭৩ সনের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু অনুমোদন করেছে, তার সাথে প্রতারণা করা।

(২) উপরোক্ত কারণসমূহের জন্য আগামী ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে এই সংশোধনী প্রস্তাব জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হলে আমি তাতে সম্মতি প্রদানে অক্ষম। সংসদের দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে একটা অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা এড়ানোর জন্যই আমি বিনয়ের সঙ্গে একযোগে সংসদ সদস্যপদ ও দলীয় সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করছি।

(৩) পরিশেষে আমি এটাই কামনা করছি যে, বঙ্গবন্ধু আপনি এবং আওয়ামী লীগ জাতির সেবায় সাফল্য লাভ করুন। আল্লাহ আপনাকে দেশ ও জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে পথ প্রদর্শন ও সাহায্য করুন। যে দেশ ও জনগণের স্বার্থকেই আমি বারবার সবার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছি এবং আনুগত্য সহকারে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করেছি।

প্রতি — স্বাক্ষর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান — মুহম্মদ ওসমানী

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ

জনাব আব্দুল মালেক উকিল

স্পীকার, জাতীয় সংসদ, ঢাকা।

জনাব, এ এইচ এম কামরুজ্জামান

সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

বাড়ি নং-৪৬, সড়ক নং-৩

ধানমণ্ডি, আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

বাকশাল গঠিত হওয়ার আগেই মওলানা ভাসানী সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিলেন (১ জানুয়ারি, ১৯৭৫)। আজীবন সংগ্রামী জননেতা মওলানা ভাসানী অবসর গ্রহণের এই অবিশ্বাস্য ঘোষণার তাৎপর্য নিশ্চয়ই আলোচনার দাবি রাখে। এর ব্যাখ্যা হিসেবে একথা যথেষ্ট যে, অত্যাসন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতি সমর্থন জানানোর কিংবা একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থার সাথে তাল মেলানোর অনিচ্ছা থেকেই তিনি অমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বাকশালের প্রতি 'আশীর্বাদ' জানানোর ইচ্ছা থাকলে মওলানা ভাসানী আর যাই হোক রাজনীতি থেকে অবসর নেয়ার মতো কৌতূহলোদ্দীপক সিদ্ধান্তে আসতেন না এবং সে অবস্থায় 'উপদেষ্টা' ধরনের কোনো অসম্মানজনক পদ সৃষ্টি করে হলেও তাঁকে বাকশালের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার চমৎকার সুযোগ নিশ্চয়ই শেখ মুজিবও হাতছাড়া করতেন না। কিন্তু বাস্তবে তেমনটি ঘটেনি এবং অন্যদিকে, শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পরপরই যেহেতু মওলানা ভাসানী রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তাই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বাকশালের প্রতি 'আশীর্বাদ' জানানোর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না; বরং পাঠে বাকশালে যোগদানের প্রশ্ন এসে যায়- মূলত এই আশঙ্কাই মওলানা ভাসানীর রাজনীতি থেকে অবসরগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল।

www.pathagar.com

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাস হয় ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত সংসদ প্রায় ২ বছর মেয়াদ অতিক্রম করার পর সংসদে পূর্ণ বিধিবহির্ভূতভাবে মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করা হয়। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ষষ্ঠভাগের পর ষষ্ঠ ক ভাগ সংশোধিত হয়। তাতে বাকশালকেই বৈধ ঘোষণা করা হয় জাতীয় দল হিসেবে। প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ উল্লাহ পার্লামেন্ট ভবনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে বিল সই করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আনয়ন করে পবিত্র সংবিধানের ১১, ১৪, ৪৮, ৫৮, ৬৬, ৬৭, ৭০, ৭২, ৭৪, ৭৬, ৮০, ৮৮, ৯৬, ৯৮, ১০১, ১০২, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১৪১, ১৪৮ আর্টিকেলে বর্ণিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকার, কৃষক ও মেহনতি মানুষের শোষণ হতে মুক্তি, প্রেসিডেন্ট পদের ক্ষমতায়ন, মন্ত্রীদের কার্যক্ষমতা, সংসদ সদস্যদের অবস্থানের নিশ্চয়তা, সংসদ সদস্যদের নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সংসদের অধিবেশন, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারদের অবস্থান, সংসদের স্থায়ী কমিটির কার্যপ্রণালী, আইন প্রণয়ন পদ্ধতি, বিচারকদের পদের নিয়োগ প্রদান, সুপ্রিম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকদের কর্মক্ষমতার অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম, নির্বাচন কমিশনের দায়-দায়িত্ব, ভোটার তালিকায় নামভুক্তির অধিকার, নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারণজনিত ক্ষমতা, নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা, নির্বাচন কমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট প্রদান, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদ যথাঃ প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্মকমিশনের সদস্যদের শপথ গ্রহণ প্রভৃতিসহ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর কার্যকারিতা রহিত ঘোষণা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান দেশের একক ক্ষমতার অধিকারী হন এবং দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। *(সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পূর্ণবিবরণ দেখুন পরিশিষ্ট-৮)*

চীপ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের সংশোধনী বিল ১১ মিনিটের মধ্যে ২৯৪ জন পার্লামেন্ট সদস্যের ভোটে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে 'পার্লামেন্টারী কেবিনেট ফরম' প্রেসিডেন্সিয়াল ফরমে রূপান্তরিত হয়। সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্টভুক্ত অধিকাংশ অঙ্গদলের অদূরদর্শিতা, সংকীর্ণতা, ব্যক্তি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোন্দল এবং জাসদের বাল্যসুলভ হঠকারী মনোবৃত্তিই মুজিবকে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার পথে অগ্রসর হতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে উৎসাহ এবং সাহস যোগায়। (সূত্রঃ অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫')

একদল সম্পর্কে ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫ দৈনিক ইত্তেফাকে 'রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর শপথ গ্রহণঃ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার কায়েম' শীর্ষক সংবাদে বলা হয়, 'ইত্তেফাক রিপোর্ট॥ সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে দেশে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার কায়েম হইয়াছে। গতকাল ২৫ জানুয়ারি '৭৫ শনিবার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের সর্বময় ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর হাতে ন্যস্ত থাকিবে। অতঃপর দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকিবে। জাতীয় সংসদের কোন সদস্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দলের সদস্য তালিকাভুক্ত না হইলে তাহার সদস্যপদ বাতিল হইয়া যাইবে। দেশের নির্বাহী কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সংবিধান অনুযায়ী তিনি তাহা প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে তাহার অধীনস্থ কর্মচারীদের মাধ্যমে পালন করিবেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদানের

www.pathagar.com

জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে। রাষ্ট্রপতি একজন উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করিবেন। চতুর্থ সংবিধান সংশোধনী বিল ২৯৪-০ ভোটে গৃহীত হয়। এই বিলের বিরোধিতা করিয়া ৩ জন বিরোধী ও ১ জন স্বতন্ত্র সদস্য ওয়াক আউট করেন। জনাব আতাউর রহমান খান পূর্বাহ্নে সদস্য কক্ষ ত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন। সংবিধান লঙ্ঘন ও গুরুতর অসদাচরণের দায়ে রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরিত প্রস্তাবে এই অভিযোগ আনা যাইবে। রাষ্ট্রপতি পূর্বাহ্নে ভাঙ্গিয়া না দিলে বর্তমান সংসদের আয়ুষ্কাল হইবে পাঁচ বছর। রাষ্ট্রপতি পরবর্তীকালে এক আদেশবলে দেশের সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত ঘোষণা করিতে পারিবেন। সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী বিল পাসের অব্যবহিত পরেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। জাতীয় সংসদ ভবনে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে স্পীকার আব্দুল মালেক উকিল বঙ্গবন্ধুকে শপথ গ্রহণ করান। অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্যগণ, সাবেক মন্ত্রী পরিষদের সদস্যগণ ও কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বিলের উপর বক্তব্য রাখতে সুযোগ না দেয়ায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ৩ জন সদস্য আব্দুল্লাহ সরকার, আব্দুস সাত্তার ও ময়েনউদ্দিন আহমেদ মানিক এবং স্বতন্ত্র সদস্য মিঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ওয়াক আউট করেন। বিলে বলা হয়, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি রাষ্ট্রপতির পদে থাকিবেন না এবং রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হইবেন এবং রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত পরিবর্তন হইতে তিনি রাষ্ট্রপতির পদে বহাল থাকিবেন যেন তিনি এই আইনের দ্বারা সংশোধিত সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। বিলে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাহার উত্তরাধিকার কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। দেশে একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন। সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদ সামান্য পরিবর্তন করিয়া বিলে উহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, যদি কোন সংসদ সদস্য যে দল তাহাকে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত করিয়াছেন সেই দলের কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন। বিলে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের কথা বলা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ভাঙ্গিয়া না দিলে সংসদের আয়ুষ্কাল ৫ বছর হইবে। গত সোমবার ২২শে জানুয়ারি '৭৫ জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশন শেষে ৪ দিন বিরতির পর গতকাল ২৫শে জানুয়ারি '৭৫ সকাল ১০টায় সংসদের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইলে আইনমন্ত্রী মিঃ মনোরঞ্জন ধর গত ২৮শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত জরুরি অবস্থা ঘোষণাটি অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের চীপ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এ সম্পর্কে কোন প্রস্তাব উপস্থাপনের সুযোগ না দেওয়ার অনুরোধ জানান। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয় লীগের জনাব আতাউর রহমান বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আলোচনার সুযোগদানের জন্য স্পীকারকে অনুরোধ জানান। কিন্তু স্পীকার উহা নাকচ করিয়া দেন। পরে কণ্ঠভোটে চীপ হুইপের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর আইনমন্ত্রী সংসদে জরুরি ক্ষমতা বিল-১৯৭৫ পেশ করেন। চীফ হুইপ এক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার স্থগিতকরণ বিধি প্রয়োগের আবেদন জানাইলে বিলটি কণ্ঠভোটে পাস করা হয়। ১০টা ১৫ মিনিটে আইনমন্ত্রী সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) বিলটি উত্থাপন করেন। জাসদের জনাব আব্দুস সাত্তার বলেন যে, বিলটি এই প্রথম উত্থাপন করা

www.pathagar.com

হইল। কাজেই সদস্যদের বক্তব্য রাখার অধিকার আছে। কিন্তু বক্তব্য পেশ করিতে দেওয়া হইতেছে না। তিনি বলেন যে, ৩ বা ৭ দিন পূর্বে বিলের জন্য নোটিশ দেওয়া উচিত ছিল। তিনি বিলটির বিরোধিতা করেন। স্পীকার বলেন যে, বিলটি ইতিমধ্যেই সংসদে উত্থাপন করা হইয়াছে। কাজেই এখন কোন আপত্তিগ্রাহ্য হইবে না। চীপ হুইপ কার্যবিধির ৭৮, ৭৯, ৯০ ও ৯১ বিধি স্থগিত রাখার আবেদন জানান এবং উহা কণ্ঠভোটে গৃহীত হয়। এই পর্যায়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ৩ জন ও একজন স্বতন্ত্র সদস্য কক্ষ বর্জন করেন। জনাব আতাউর রহমান খান ইতিপূর্বে কক্ষ হইতে বাহিরে চলিয়া যান। তবে স্বতন্ত্র সদস্য মিঃ চাই খোয়াই রোয়াজাকে নিজ আসনে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। তবে তিনি বিলের পক্ষে বা বিলের বিপক্ষে ভোট দেন নাই। ১০টা ৫৫ মিনিটে স্পীকার ভোটাভুটির ফলাফল ঘোষণা করিয়া জানান যে, বিলের পক্ষে ২৯২ জন ভোট দিয়াছেন এবং কেহ বিপক্ষে ভোট দেন নাই। বিলটি যেভাবে স্থিরকৃত হইয়াছে সেইভাবে অনুমোদনের জন্য দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণ করা হয়। ১১টা ২৫ মিনিটে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়। এবার বিলের পক্ষে ২৯৪টি ভোট প্রদান করা হয়। বিলটি পাস করার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংসদের বিদায়ী নেতা হিসেবে অর্ধ ঘণ্টাকাল ভাষণ দেন। স্পীকার সংসদের পক্ষ হইতে বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানান এবং তিনি জাতীয় পথ নির্দেশক হইবেন বলিয়া আশা প্রকাশ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করেন এবং ১২টা ৫ মিনিটে সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন।'

পীটার গীল 'মুজিব একনায়কত্ব কায়েম করেছেন' অভিমতে লিখেন যে, ' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তার দেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন। গত শনিবার ঢাকায় পার্লামেন্টের এক ঘণ্টা স্থায়ী অধিবেশনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছে এবং একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে ক্ষমতা অর্পণ করেছে। অনেকটা নিঃশব্দে গণতন্ত্রের কবর দেয়া হয়েছে। বিরোধীদল দাবি করেছিল, এ ধরনের ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে আলোচনার জন্য তিন দিন সময় দেয়া উচিত। জবাবে সরকার এক প্রস্তাব পাস করলেন যে, এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক চলবে না। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয় মাস গৃহযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত কিন্তু গর্বিত স্বাধীন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব এমপিদের বললেন যে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অবদান (বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র রচনায়ও বৃটিশ বিশেষজ্ঞরা সাহায্য করেছিলেন)। তিনি দেশের স্বাধীন আদালতকে ঔপনিবেশিক ও দ্রুত বিচার ব্যাহতকারী বলে অভিযুক্ত করেন। প্রেসিডেন্ট এখন খেয়ালখুশিমত বিচারকগণকে বরখাস্ত করতে পারবেন, নাগরিক অধিকার বিন্দুমাত্রও যদি প্রয়োগ করা হয় তা প্রয়োগ করবে পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত স্পেশাল আদালত। এক্সিকিউটিভ অর্ডারের মাধ্যমে একটি জাতীয় দল প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন শাসনতন্ত্র মুজিবকে ক্ষমতা দিয়েছে। এটাই হবে দেশের একমাত্র বৈধ দল। যদি কোন এমপি যোগদান করতে নারাজ হন অথবা এর বিরুদ্ধে ভোট দেন, তাহলে তার সদস্যপদ নাকচ হয়ে যাবে। এহেন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ঢাকায় সমালোচনা বোধগম্য কারণেই চাপা রয়েছে। কিন্তু ৩১৫ সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টের ৮ জন বিরোধীদলীয় সদস্যদের ৫জনই প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগের ১১ জন সদস্য ভোট দিতে আসেননি। তাদের মধ্যে ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের গেরিলাবাহিনীর নায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী। শোনা যায় তিনি

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। শেখ মুজিব ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে শাসন করতে পারবেন। নতুন শাসনতন্ত্র ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত জাতীয় পার্লামেন্টের মেয়াদও দু'বছর অর্থাৎ ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে, তবে পার্লামেন্ট বছরে মাত্র দু'বার অল্প সময়ের জন্য বসবে। ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও কাউন্সিল অব মিনিস্টারস-এর মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হবে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। বাংলাদেশের ঘনায়মাণ আর্থিক ও সামাজিক সংকটে বিদেশি পর্যবেক্ষকগণ সন্দেহ করেছেন যে, দেশে একনায়কত্বের প্রয়োজন আছে কিনা কিংবা শেখ মুজিবের উদারতা আছে কিনা। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ যে নিশ্চিত দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতার দিকে এগুচ্ছে, শেখ মুজিবের নতুন ক্ষমতা ও নতুন ম্যান্ডেট তাতে তেমন কোন তারতম্য ঘটাতে পারবে কি-না। এক মাস আগে শেখ মুজিব জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন, কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বামপন্থী গেরিলা নেতা সিরাজ সিকদারকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, জরুরি আইন প্রয়োগে বিন্দুমাত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিনা। বর্তমানে সুশাসন বলতে কিছু নেই-পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব কিনা। নতুন প্রেসিডেন্টের যে আদৌ প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই, তা গত তিন বছরে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। তার স্টাইল হচ্ছে ডিক্টেটর স্টাইল। তিনি গুটিকতক নিম্নতম অফিসারের প্রমোশনে ও তাদের অভিমতে যথেষ্ট আগ্রহ দেখান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রায়ই ফেলে রাখেন। একদলীয় শাসন সৃষ্টির ফলে দুর্নীতি দূর না হয়ে বরং বাড়তে থাকবে। কেননা, ঊর্ধ্বতন আওয়ামী লীগারদের চেক করতে পারবেন একমাত্র প্রেসিডেন্ট। তিনি থাকবেন অতিরিক্ত কাজের চাপে। সরকার বিরোধীরা যতই আত্মগোপন করতে বাধ্য হবে, ততই গ্রামবাংলায় চরমপন্থী গেরিলা ও লুটতরাজকারীদের সমর্থন বাড়তে থাকবে *(সূত্রঃ ডেইলী টেলিগ্রাফ, লন্ডন, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৭৫)।*

প্রখ্যাত সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার সেই ব্যবস্থার সমালোচনা করে লেখেন যে, 'শেখ মুজিবুর রহমান জেনারেল ইয়াহিয়ার স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু আজ তিনি নিজেই রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন। ক্ষমতা দখল করতে গিয়ে তিনি নিয়মানুবর্তিতা, সমাজবিরোধীদল, বৈদেশিক চক্রান্ত প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে চলেছেন, যা এক সময় পাকিস্তানি সামরিক চক্রও ব্যবহার করত। আশ্চর্য, বাংলাদেশের জন্মের আগে যে জনসাধারণ এত দুর্ভোগ সহ্য করেছে, তাদের কোন মতামত নেয়া হয়নি। এমনকি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিকেও কিছু জানতে দেয়া হয়নি। পার্টির ২১ জানুয়ারির মিটিং-এ শুধু এটুকুই আলোচিত হয়েছিল যে, শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট করা হবে। সদস্যদের এটা জানা ছিল না যে, সুপ্রিম কোর্টকে মৌলিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হবে। এসব অধিকার প্রয়োগের জন্য বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কেও তারা জ্ঞাত ছিলেন না। শেখ যে নিজের পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারবেন না, তা' নয়। কিন্তু আগে থেকে সব কিছু জানিয়ে দিলে পার্টির ভিতর থেকে বিরোধিতা আসত। সম্ভবত মুজিব সেটাই আশঙ্কা করেছিলেন। অন্যথায় এ ধরনের ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক সংশোধন প্রস্তাব এক ঘণ্টার মধ্যে পার্লামেন্টে পাস হত না এবং প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ উল্লাহও পার্লামেন্ট ভবনের বারান্দায় দাঁড়িয়েই তা' সই করতেন না। স্পষ্টতই আগে থেকে এরূপ ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল এবং তা' প্রমাণিত হয় এই থেকে যে, মোহাম্মদ উল্লাহকে মন্ত্রিসভায় নেয়া হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই।

www.pathagar.com

এখন বিচার বিভাগকে জিঞ্জিরে আটকানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বিচারকগণকে অসদাচরণ ও অক্ষমতার জন্য বরখাস্ত করতে পারবেন। এই পটভূমিকায় কি করে মিসেস গান্ধী এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে শেখকে খোশ আমদেদ জানালেন, বোঝা মুশকিল। বাংলাদেশ যাই করুক, সেটা বাংলাদেশের নিজস্ব ব্যাপার। কূটনৈতিক শিষ্টাচার যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের প্রতিটি কাজকে ভারতের সমর্থন করার কোন দরকার পড়ে না। অন্তত অভিনন্দন বাণী প্রেরণ বিলম্বিত করা যেত শুধু এটুকু পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যে, বাংলাদেশে যা ঘটেছে, তাতে ভারত নিরুৎসাহ বোধ করছে। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর যখন আইয়ুব খান একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, মিঃ নেহেরুর প্রতিক্রিয়া ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। লোকসভায় বসে তিনি খবরটি পেয়েছিলেন। সদস্যদের বললেন, 'এটা নগ্ন সামরিক একনায়কত্ব।' নয়াদিল্লী হয়ত বিশ্বাস করছে যে, এই পরিবর্তন বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাবকে মোকাবিলা করতে শেখকে সাহায্য করবে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, শেখ ভারতের প্রতি অত্যন্ত বন্ধু-ভাবাপন্ন তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিয়েছেন তিন বছর আগে। তাজউদ্দিন আহমদকে বলেছিলেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এত ভাল যে, ইচ্ছা করে এখনি মরে যাই, এর অবনতি দেখতে বেঁচে থাকতে চাই না। ভারতবিরোধী মনোভাবের কারণ শেখ খুব ভাল করেই জানেন। জিনিসপত্রের অভাব এবং দুর্মূল্যের জন্য জনসাধারণ কষ্ট পাচ্ছে। কাজেই তারা বিশ্বাস করে যে, তারা অসুবিধা ভোগ করছে যেহেতু প্রতিটি জিনিস ভারতে চলে যাচ্ছে। বস্তুত ভারতবিরোধী মনোভাব প্রতিরোধ করার জন্য ঢাকা কিছুই করেনি। সম্ভবত এর একটা কারণ এই যে, ভারতবিরোধী মনোভাব মোকাবিলা করতে হলে সরকারকে জনসাধারণের রোষানলে পড়তে হবে। শেখ কেন একচ্ছত্র ক্ষমতা হাতে নিলেন, এটা এখনো বিভ্রান্তিকর লাগে। ১৯৭২ সালের শুরুতে যেদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন, সেদিন থেকেই তো তার সর্বময় ক্ষমতা ছিল। গত জুলাই মাসে আওয়ামী লীগ তাকে ব্ল্যাংক চেক দিয়েছিল এবং ডিসেম্বর মাস থেকে দেশ জরুরি অবস্থার অধীনে রয়েছে। কিভাবে অতিরিক্ত ক্ষমতা-যদি ধরেও নেয়া হয় যে, কিছু ক্ষমতার অভাব ছিল-তাকে সাহায্য করবে? জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে সরকারের পদক্ষেপ অত্যন্ত মন্থর এবং দুর্নীতি একটি জীবন পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্লোগান ও ফাঁকা-বুলি জনগণকে ভুলিয়ে রাখে। যে জাতি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে উদ্ধতভাবে লড়েছে, সে জাতি আজ আশা হারাতে শুরু করেছে। আজ সেখানে যা ঘটছে তা, এই প্রতিভাবান লোকেরা দেশ ত্যাগ করতে শুরু করেছেন। জানা যায়, এদের মধ্যে শেখের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদেরও কেউ কেউ রয়েছেন। *(সূত্রঃ শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন, কুলদীপ নায়ার, স্টেটসম্যান উইকলী, নয়াদিল্লী, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫)*

'প্রেসিডেন্ট মুজিব-' শীর্ষক আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের অবস্থা যেমন আছে এবং মুজিব নিজে যেমন আছেন, তাতে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনসাধারণের কোন উপকার হবে না। রাতারাতি মুজিব পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ছুঁড়ে ফেলে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। আমরা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার বলতে যা বুঝি এটা ঠিক তা' নয়। মুজিব যে সর্বাত্মক ক্ষমতা দখল করেছেন তা মার্কিন প্রেসিডেন্টেরই নেই। তিনি নিজের মর্জিমত একটিমাত্র রাজনৈতিক দলকে জাতীয় দল হিসেবে কাজ করার অনুমতি দিতে পারবেন। তিনিই এই দলের কর্মসূচি, সদস্যপদ এবং সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং শুধুমাত্র এই দলের সদস্যরাই পার্লামেন্টের সদস্য হতে

www.pathagar.com

পারবে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের মৌলিক মানবাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা আর থাকবে না। এসব অধিকার-যদি কিছু আদৌ থেকে থাকে, প্রয়োগ করবে পার্লামেন্ট অর্থাৎ মুজিবের লোকদের নিযুক্ত স্পেশাল কোর্ট ট্রাইব্যুনাল অথবা কমিশন। মুজিব দুর্ব্যবহার ও অযোগ্যতার অজুহাতে বিচারপতিগণকে অপসারিত করতে পারবেন। মিসেস জি (মিসেস গান্ধী)র মত তিনিও তার অনুগত বিচারপতি দেখতে চান, কিন্তু ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে অথবা মানবিক উৎকর্ষতার অভাবে ডাণ্ডা প্রয়োগই তিনি বেশি পছন্দ করেন। এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সরকারের একচ্ছত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করা যায় না। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের দুঃখ-কষ্ট এবং নব্যশাসকশ্রেণীর সৃষ্ট শ্রেণীগত অসঙ্গতিরই ফল। কিন্তু বাংলাদেশে শাসক ও প্রশাসকরা অধিকতর অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ এবং লোভী, এরা রাতারাতি বড় হতে চায়। ধুরন্ধর ব্যক্তিরা উচ্চাশার টোপ ফেলেছিল যে, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে এবং সরল মানুষেরা তা বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ভারতীয় হস্তক্ষেপের ফলে যারা বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসীন হল, তাদের মত স্বার্থপর নেতৃত্ব কোন দেশে সত্যিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পর আর দেখা যায়নি। দেশটি যে অর্থনৈতিক ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে, তা অবশ্যম্ভাবী ছিল। বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সাহায্য-সহায়তা বাংলাদেশের কোন কাজে আসেনি। আরামদায়ক বন্দিদশা থেকে শেখ মুজিব প্রত্যাবর্তনের পর দেশের অবস্থা মন্দ থেকে মন্দতর হয়েছে, হাজার হাজার লোক বন্যা, দুর্ভিক্ষ আর বিকৃত গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। যারা আইয়ুব আমলে পাঞ্জাবিদের কাছে তাদের ট্রেড ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স বিক্রি করে নিশ্চিত মুনাফা কুড়িয়েছিল, তারা এখনো ভাল মুনাফা কুড়াচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। জাঁকজমকের বিভ্রান্তিতে মুজিব যা করেছেন, তাতে তার নিজের এবং তার দলের ছাড়া আর কারো কোনো উপকার হবে না। হতে পারে, আজও গ্রাম-বাংলার কিছুসংখ্যক সরলপ্রাণ লোক জাতির পিতা হিসেবে দেখে আর মনে করে যে, সে একজন ভাল লোক। রেকেটিয়ারদের হাতে পড়ে গেছে। মুজিব সরল লোকদের এই আবেগের উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু তার এ মর্যাদা স্থায়ী হবে বলে মনে হয় না। জাতির প্রতি যা সবচেয়ে অবমাননাকর মুজিবকে দ্বিতীয় বিপ্লব নামে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ জানেন, প্রথম বিপ্লবের জন্য-যা বিদেশি চক্রান্তে হয়েছিল-জনগণকে কত খেসারত দিতে হচ্ছে। আমাদের ঐকান্তিক কামনা বাংলাদেশের জনগণ দ্বিতীয় বিপ্লব কাটিয়ে উঠবে। *(সূত্রঃ ফ্রনটিয়ার, কলিকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫)*

শেখ মুজিব সংসদের সহায়তায় সকল রাজনৈতিক দল বাতিল ঘোষণা করে ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠনের আদেশ জারি করেন। বাকশাল গঠনের পর (ক) আওয়ামী লীগ, (খ) ন্যাপ-ভাসানী, (গ) সিপিবি, (ঘ) ন্যাপ-মোজাফফর, (ঙ) জাসদ, (চ) বাংলা জাতীয় লীগ, (ছ) বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস, (জ) বাংলাদেশ লেবার পার্টি, (ঝ) জাতীয় গণতন্ত্রী দল, (ঞ) জাতীয় গণমুক্তি পার্টি, (ট) বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, (ঠ) ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, (ড) কমিউনিস্ট পার্টি এবং (ঢ) শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলকে বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৭৫ সালের ২০ মে বাংলা জাতীয় লীগ, ন্যাপ-ভাসানী, সিপিবি ও ইউনাইটেড পিপলস পার্টি অফিসে তালাবদ্ধ করা হয়।

মুজিব নিজ শাসন পাকাপোক্ত করার হীন উদ্দেশ্যেই সকল এমপিকে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে বাকশালে যোগ দেয়ার ফরমান জারি করেন। অন্যথায় সংসদ সদস্যপদ বাতিল হবে

www.pathagar.com

বলে জানিয়ে দেয়া হয়। বিরোধীদলের আতাউর রহমান খান ২৫ এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলনে বাকশালে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

সংসদ ভবনে স্বৈরাচারী একদলীয় শাসন পদ্ধতি বাকশাল আইন উত্থাপনের বিরোধিতা করার অভিযোগে জাসদের আব্দুল্লাহ সরকার ও ময়েনউদ্দিন মানিককে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হলে তারা আন্ডার গ্রাউন্ডে যেতে বাধ্য হন। সেই সময়কার ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে ২৫ জানুয়ারি ১৯৯৮ দৈনিক দিনকালকে আব্দুল্লাহ সরকার ও ময়েনউদ্দিন মানিক পৃথক পৃথক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন যে, 'এই একদলীয় আইন পার্লামেন্টে পাস করার আগে কোন আলোচনা করতে দেওয়া হয়নি। প্রতিবাদ জানিয়ে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে আমরা সেদিন সংসদ থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।' দুই নেতা জানান যে, তারা শঙ্কিত হয়ে পড়েন বিশেষ ক্ষমতা আইন পাসের পর। ২৫ জানুয়ারি সংসদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন আব্দুল মালেক উকিল। আইন ও সংসদবিষয়কমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী বা বাকশাল বিল উত্থাপনের জন্য স্পীকারের অনুমতি চান। মানিক ও আব্দুল্লাহ সরকার এই বিলটি উত্থাপনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তখন বিরোধিতা গ্রাহ্য করা হয়নি। এরপর বিলের ওপর আলোচনারও বিরোধিতা করে বসেন চীপ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ় ও কঠোর ভাষায় বলেন, 'এই বিলটি কোনো আলোচনা ছাড়াই পাস করতে হবে।' শেষ পর্যন্ত তাই হয়।

বাকশাল কালো আইন পাসের পর আওয়ামী লীগের ২ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেছিলেন। এরা হলেন জেনারেল ওসমানী ও ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন। ময়েনউদ্দিন মানিক ও আব্দুল্লাহ সরকার সংসদে দাঁড়িয়ে পদত্যাগ করার দৃপ্ত ঘোষণা দিয়ে সংসদ কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। এর পরই তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দেয়া হলে তারা আত্মগোপন করলে সেখানে উপ-নির্বাচন করা হয়। মানিকের শূন্য আসনে বাকশাল মনোনীত মোহাম্মদ মোহসীন ও আব্দুল্লাহ সরকারের শূন্য আসনে সিরাজুল ইসলামকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছিল। একদলীয় শাসনব্যবস্থার সেই নির্বাচন ছিল প্রহসন।

৬ জুন জারিকৃত এক ফরমানবলে প্রেসিডেন্ট নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন-

(১) চেয়ারম্যান-শেখ মুজিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, (২) সৈয়দ নজরুল ইসলাম-ভাইস প্রেসিডেন্ট, (৩) প্রধানমন্ত্রী-এম. মনসুর আলী-সেক্রেটারী জেনারেল, (৪) আব্দুল মালেক উকিল-স্পীকার, (৫) খন্দকার মোশতাক আহমদ-মন্ত্রী, (৬) আবু হেনা মোহাম্মদ কামরুজ্জামান-মন্ত্রী, (৭) মোহাম্মদুল্লাহ-মন্ত্রী, (৮) আব্দুস সামাদ আজাদ-মন্ত্রী, (৯) অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলী-মন্ত্রী, (১০) শ্রী ফনিভূষণ মজুমদার মন্ত্রী, (১১) ডঃ কামাল হোসেন-মন্ত্রী, (১২) মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন-মন্ত্রী, (১৩) আব্দুল মান্নান-মন্ত্রী, (১৪) আব্দুর রব সেরনিয়াবত-মন্ত্রী, (১৫) শ্রী মনোরঞ্জন ধর-মন্ত্রী, (১৬) আব্দুল মমিন-মন্ত্রী, (১৭) আসাদুজ্জামান খান-মন্ত্রী, (১৮) মোঃ কোরবান আলী-মন্ত্রী, (১৯) ডঃ আজিজুর রহমান-মন্ত্রী, (২০) ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী-মন্ত্রী, (২১) তোফায়েল আহমদ Special Assistant of President, (২২) শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন-চীফ হুইপ, (২৩) আব্দুল মতিন তালুকদার-প্রতিমন্ত্রী, (২৪) দেওয়ান ফরিদ গাজী-প্রতিমন্ত্রী, (২৫) প্রফেসর নূরুল ইসলাম চৌধুরী-প্রতিমন্ত্রী, (২৬) তাহের উদ্দিন ঠাকুর-প্রতিমন্ত্রী, (২৭) মোসলেম উদ্দিন খান-উপমন্ত্রী, (২৮) মোঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর-প্রতিমন্ত্রী, (২৯) কে.এম. ওবায়দুর

www.pathagar.com

রহমান-প্রতিমন্ত্রী, (৩০) ডঃ ক্ষিতিশচন্দ্রমণ্ডল-প্রতিমন্ত্রী, (৩১) রিয়াজউদ্দিন আহমদ-প্রতিমন্ত্রী, (৩২) মোঃ বয়েতুল্লাহ-ডেপুটি স্পীকার, (৩৩) খন্দকার রুহুল কুদ্দুস-প্রেসিডেন্ট এর প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারী, (৩৪) জিল্লুর রহমান-সেক্রেটারী (৩৫), মহিউদ্দিন আহমদ, (৩৬) শেখ ফজলুল হক মনি-সেক্রেটারী, (৩৭) আব্দুর রাজ্জাক-সেক্রেটারী, (৩৮) শেখ শহীদুল ইসলাম, (৩৯) আনোয়ার চৌধুরী, (৪০) বেগম সাজেদা চৌধুরী এমপি, (৪১) বেগম তসলিম আবেদ এমপি, (৪২), আবদুর রহিম এমপি, দিনাজপুর, (৪৩) আব্দুল আওয়াল-এমপি, রংপুর, (৪৪) লুৎফর রহমান এমপি, রংপুর, (৪৫) এ.কে.এম মুজিবুর রহমান-এমপি, বগুড়া, (৪৬) ডঃ মফিজ উদ্দিন এমপি, বগুড়া, (৪৭) ডাঃ আলাউদ্দিন-এমপি, রাজশাহী, (৪৮) ডাঃ আসহাবুল হক এমপি, কুষ্টিয়া, (৪৯) আজিজুর রহমান আক্কাস এমপি, কুষ্টিয়া, (৫০) রওশন আলী এমপি, যশোর, (৫১) শেখ আব্দুল আজিজ এমপি, খুলনা, (৫২) সালাউদ্দিন ইউসুফ এমপি, খুলনা, (৫৩) মাইকেল সুশীল অধিকারী, খুলনা, (৫৪) কাজী আবুল কাসেম এমপি, পটুয়াখালী, (৫৫) মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ এমপি, ফরিদপুর, (৫৬) শামসউদ্দিন মোল্লা এমপি, ফরিদপুর, (৫৭) শ্রী গৌরচন্দ্র বালা, ফরিদপুর, (৫৮) গাজী গোলাম মোস্তফা এমপি, ঢাকা নগর, (৫৯) শামসুল হক এমপি, ঢাকা, (৬০) শামসুজ্জোহা-এমপি, ঢাকা, (৬১) রফিক উদ্দিন ভূইয়া-এমপি, ময়মনসিংহ, (৬২) সৈয়দ আহমদ, ময়মনসিংহ, (৬৩) শামসুর রহমান খান এমপি, টাঙ্গাইল, (৬৪) নুরুল হক-এমপি, নোয়াখালী, (৬৫) কাজী জহিরুল কাইয়ুম-এমপি, কুমিল্লা, (৬৬) এম.এ. ওয়াহাব এমপি, চট্টগ্রাম, (৬৯) শ্রী চিত্তরঞ্জন সুতার এমপি, (৭০) সৈয়দা রাজিয়া বানু এমপি, (৭১) আতাউর রহমান খান এমপি, ধামরাই, (৭২) খন্দকার মোঃ ইলিয়াস, (৭৩) শ্রী মং প্রু সুং (King of Manikchari, Chittagong Hill Tracts), (৭৪) অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ-ন্যাপ, (৭৫) আতাউর রহমান-ন্যাপ, রাজশাহী, (৭৬) সৈয়দ আলতাফ হোসেন-ন্যাপ, (৭৭) পীর হাবিবুর রহমান-ন্যাপ, (৭৮) মোঃ ফরহাদ-সিপিবি, (৭৯) বেগম মতিয়া চৌধুরী-ন্যাপ, (৮০) হাজী মোঃ দানেশ-জাগমুই, (৮১) হোসেন তৌফিক ইমাম-সেক্রেটারী, ক্যাবিনেট এফেয়ার্স ডিভিশন, (৮২) নুরুল ইসলাম-সেক্রেটারী ফরেন ট্রেইড, (৮৩) ফয়েজ উদ্দিন আহমদ-সেক্রেটারী স্বরাষ্ট্র, (৮৪) মাহবুবুর রহমান-সেক্রেটারী এস্টাবলিস্টমেন্ট, (৮৫) আবুল খালেক Secretary of Vice President, (৮৬) মজিবুল হক-সেক্রেটারী দেশরক্ষা, (৮৭) আব্দুর রহিম Secretary of President, (৮৮) মঈনুল ইসলাম-সেক্রেটারী Works, Housing & Urban Development, (৮৯) সৈয়দুজ্জামান-সেক্রেটারী প্লানিং, (৯০) আনিসুজ্জামান-সেক্রেটারী কৃষি, (৯১) ডঃ এ সাত্তার Secretary of the President, (৯২) আবু তাহের-সেক্রেটারী ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার, (৯৩) আল- সোহাইনী-সেক্রেটারী পাওয়ার, (৯৪) এ সামাদ-সেক্রেটারী, যোগাযোগ, (৯৫) ডঃ আবুল হোসেন-সেক্রেটারী, স্বাস্থ্য, (৯৬) মতিয়ুর রহমান, চেয়ারম্যান, টিসিবি, (৯৭) মেজর জেনারেল কে.এম. শফিউল্লাহ- Chief of Staff Bangladesh Army, (৯৮) এয়ার ভাইস মার্শাল এ.কে. খন্দকার- Chief of Staff Bangladesh Air Force, (৯৯) কমোডর এম.এইচ. খান- Chief of Staff Bangladesh Navy, (১০০) মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান- Director General of Bangladesh Rifles, (১০১) এ.কে. নাজিরুদ্দিন আহমদ গভর্নর-বাংলাদেশ ব্যাংক, (১০২) ডঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী-ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (১০৩) ডঃ মাজহারুল ইসলাম-ভাইস চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, (১০৪) ডঃ এনামুল হক-

www.pathagar.com

ভাইস চ্যান্সেলর জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, (১০৫) এ.টি.এম সৈয়দ হোসেন-এডিশনাল সেক্রেটারী এস্টাবলিস্টমেন্ট ডিভিশন, (১০৬) নূরুল ইসলাম-আইজিপি, (১০৭) ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, (১০৮) ডাঃ নূরুল ইসলাম-ডিরেক্টর পিজি হাসপাতাল, (১০৯) ওবায়দুল হক-এডিটর বাংলাদেশ অবজারভার, (১১০) আনোয়ার হোসেন মঞ্জু-এডিটর ইত্তেফাক, (১১১) মিজানুর রহমান-চীফ এডিটর বিপিআই, (১১২) মনোয়ারুল ইসলাম Joint Secretary-President's Secreatariate, (১১৩) বিগ্রেডিয়ার এ.এন.এম. নূরুজ্জামান-ডিরেক্টর জাতীয় রক্ষীবাহিনী (১১৪) কামরুজ্জামান-সভাপতি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, (১১৫) ডাঃ মাজহার আলী কাদরী-সভাপতি, বাংলাদেশ চিকিৎসক সমিতি।

যে সকল অঙ্গ সংগঠন গঠন করা হয়

(১) জাতীয় কৃষক লীগ, (সাধারণ সম্পাদক-ফনিভূষণ মজুমদার)।
(২) জাতীয় শ্রমিক লীগ (সাধারণ সম্পাদক-অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলী)।
(৩) জাতীয় মহিলা লীগ (সাধারণ সম্পাদক-বেগম সাজেদা চৌধুরী)।
(৪) জাতীয় যুবলীগ (সাধারণ সম্পাদক-তোফায়েল আহমদ)।
(৫) জাতীয় ছাত্রলীগ (সাধারণ সম্পাদক-শেখ শহীদুল ইসলাম)।

কার্যকরী সংসদ যাদের নিয়ে গঠন করা হয়

(১) শেখ মুজিবুর রহমান-চেয়ারম্যান।
(২) সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
(৩) এম. মনসুর আলী-সেক্রেটারী জেনারেল।
(৪) খন্দকার মোশতাক আহমদ।
(৫) আবু হেনা মোঃ কামরুজ্জামান।
(৬) আব্দুল মালেক উকিল।
(৭) অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
(৮) শ্রী মনোরঞ্জন ধর।
(৯) ডাঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী।
(১০) শেখ আব্দুল আজিজ।
(১১) মহিউদ্দিন আহমদ।
(১২) গাজী গোলাম মোস্তফা।
(১৩) জিল্লুর রহমান-সেক্রেটারী।
(১৪) শেখ ফজলুল হক মনি-সেক্রেটারী।
(১৫) আব্দুর রাজ্জাক-সেক্রেটারী।

গভর্নরদের তালিকা

২৩ জুন সমগ্র দেশকে ৬১টি প্রশাসনিক জেলা কাঠামো ঘোষণা করা হয়। তিন সপ্তাহ পরে ১৬ জুলাই ৬১ জন জেলা গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এই গভর্নরদের মধ্যে ৩৩ জন ছিলেন সংসদ সদস্য, ১৩ জন বেসরকারি অফিসার, ১ জন সামরিক অফিসার এবং অবশিষ্ট ১৪ জনের মধ্যে ছিলেন জনসাধারণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যেমন আইনজীবী, উপজাতীয় নেতা, প্রাক্তন এমসিএ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। যারা গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন-১

www.pathagar.com

কক্সবাজার জেলা-এডভোকেট জহিরুল ইসলাম (প্রাক্তন এমসিএ), ২. চট্টগ্রাম-মোহাম্মদ খালেক (সংসদ সদস), ৩. চট্টগ্রাম (উত্তর)-জাকিরুল হক চৌধুরী, ৪. বান্দরবান-মং সু প্রু চৌধুরী (বোউমং প্রধান/ বান্দরবান), ৫. খাগড়াছড়ি-মংপ্রুসু (রাজা/ মানিকছড়ি), ৬. রাঙামাটি-এ. এম.এ.কাদের (জেলা প্রশাসক/ পার্বত্য চট্টগ্রাম), ৭. ফেনী-খাজা আহমদ (সংসদ সদস্য), ৮. লক্ষ্মীপুর-আবদুর রশীদ (সংসদ সদস্য), ৯. নোয়াখালী নূরুল হক (সংসদ সদস্য), ১০. কুমিল্লা-খোরশেদ আলম (সংসদ সদস্য), ১১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া-আলী আজম (সংসদ সদস্য), ১২. চাঁদপুর-আবদুল আউয়াল (সংসদ সদস্য), ১৩. হবিগঞ্জ-মোস্তফা আলী (সংসদ সদস্য), ১৪. মৌলভীবাজার-নুরুল আহাদ (জেলা প্রশাসক/বরিশাল), ১৫. সিলেট মোহাম্মদ রশিদুল হক (জেলা প্রশাসক/ সিলেট), ১৬. সুনামগঞ্জ-আবদুল হাকিম চৌধুরী (সংসদ সদস্য), ১৭. কিশোরগঞ্জ-আব্দুস সাত্তার (জেলা প্রশাসক/ পটুয়াখালী), ১৮. নেত্রকোনা-জুবেদ আলী (সংসদ সদস্য), ১৯. ময়মনসিংহ-রফিকউদ্দিন ভুঁইয়া (সংসদ সদস্য), ২০. জামালপুর-আব্দুল হাকিম (সংসদ সদস্য), ২১. শেরপুর-আনিসুর রহমান (সংসদ সদস্য), ২২. টাঙ্গাইল আবদুল কাদের সিদ্দিকী (মুক্তিযোদ্ধা ও যুবনেতা), ২৩. ঢাকা মহানগরী এম.এ. তাহের (ভূমি সংস্কার সচিব), ২৪. ঢাকা-আশরাফ আলী চৌধুরী (সাবেক এমসিএ), ২৫. বিক্রমপুর- মোহাম্মদ শামসুল হক (সাবেক এমসিএ), ২৬. নরসিংদী-আফতাব উদ্দিন ভুঁইয়া (সংসদ সদস্য), ২৭. মানিকগঞ্জ-এম নূরুজ্জামান (পরিবহন কমিশনার), ২৮. ফরিদপুর-শামসুদ্দিন মোল্লা (সংসদ সদস), ২৯. রাজবাড়ী-আবদুল ওয়াজেদ চৌধুরী, ৩০. মাদারীপুর-আবিদুর রেজা খান (সংসদ সদস্য), ৩১. গোলাপগঞ্জ-এএইচ এম মোফাজ্জল করিম (জেলা প্রশাসক কুষ্টিয়া), ৩২. ভোলা-এসআর খান (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা), ৩৩. ঝালকাঠি-আমির হোসেন আমু (সংসদ সদস্য), ৩৪. বরিশাল-আমিনুল হক চৌধুরী (এডভোকেট), ৩৫. পিরোজপুর-এনায়েত হোসেন খান (সংসদ সদস্য), ৩৬. পটুয়াখালী-শাহজাদা আবদুল মালেক খান (সংসদ সদস্য), ৩৭. বরগুনা-এম শফিকুর রহমান (জেলা প্রশাসক/ রাজশাহী), ৩৮. বাগেরহাট-এডভোকেট আব্দুল লতিফ খান (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার), ৩৯. খুলনা-কর্নেল মোহাম্মদ আনোয়ার উল্লাহ, (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার), ৪০. সাতক্ষীরা-কাজী মঞ্জুর-ই মওলা (জেলা প্রশাসক/ বগুড়া), ৪১. যশোর রওশন আলী (সংসদ সদস্য), ৪২. নড়াইল-খন্দকার আবদুল হাফিজ (সংসদ সদস্য), ৪৩. ঝিনাইদহ-কে.এম.আজিজ (সংসদ সদস্য), ৪৪. মাগুরা-লুৎফুল্লাহিল মজিদ (জেলা প্রশাসক/ নোয়াখালী), ৪৫. কুষ্টিয়া-আবদুর রউফ চৌধুরী (সংসদ সদস্য), ৪৬. চুয়াডাঙ্গা-এম ফয়জুর রাজ্জাক (জেলা প্রশাসক/ ফরিদপুর), ৪৭. মেহেরপুর-ছহিউদ্দিন আহমদ (সংসদ সদস্য), ৪৮. পাবনা-আবু সাঈদ (সংসদ সদস্য), ৪৯. সিরাজগঞ্জ-মোতাহার হোসেন তালুকদার, ৫০. বগুড়া-এ কে মজিবুর রহমান (সংসদ সদস্য), ৫১. জয়পুরহাট-কাসিমউদ্দিন আহমদ (সংসদ সদস্য), ৫২, দিনাজপুর-নাজিবুর রহমান (এডভোকেট), ৫৩. ঠাকুরগাঁও-এম ফজলুল করিম (সংসদ সদস্য), ৫৪. নীলফামারী-এম আবদুর রউফ (সংসদ সদস্য), ৫৫. রংপুর-এ কে এম জালালউদ্দিন (জেলা প্রশাসক/ ময়মনসিংহ), ৫৬. গাইবান্ধা-লুৎফর রহমান (সংসদ সদস্য), ৫৭. কুড়িগ্রাম-শামসুল হক (সংসদ সদস্য), ৫৮. নাটোর-শংকর গোবিন্দ চৌধুরী (প্রাক্তন এমসিএ), ৫৯. রাজশাহী-আতাউর রহমান (রাজনীতিক), ৬০. নওগাঁ-মোহাম্মদ আব্দুল জলিল (সংসদ সদস্য), ৬১. চাঁপাইনবাবগঞ্জ-ড. এ এ এম মিসবাহুল হক (সংসদ সদস্য)।

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ্য যে, মুজিব তার সচিবালয়ের একজন যুগ্ম সচিব, তার নিজের ভগ্নিপতি অতিরিক্ত সচিব এবং অন্য অনেক অপ্রয়োজনীয় লোককে এই ১৫৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাখলেও তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সহকর্মী তাজউদ্দিন আহমদকে রাখেননি; এমনকি ন্যাপ ও সিপিবি-এর ৬ জনকে সদস্য করা হয়। জাতীয় লীগের এমপি আতাউর রহমান খান ও জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়নের হাজী মোহাম্মদ দানেশকে সদস্যপদ দেয়া হয়।

-০-

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দলন ঃ ১৯৭২-১৯৭৫

সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়ে মুজিব সরকার দেশকে গণতন্ত্রহীন, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাহীন, সংবাদপত্রহীন একনায়ক ও স্বৈরাচার শাসিত দেশে পরিণত করে। শেখ মুজিব একজন বড় মাপের নেতা হওয়া সত্ত্বেও সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সম্পর্কে ক্ষমতায় বসেই তিনি বলে বসলেন, 'বিপ্লবে সংবাদপত্র যে স্বাধীনতা পেয়েছে তা এ দেশে আর কখনো ছিল না। এজন্যই রাতারাতি খবরের কাগজ বের করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছাপানো হয়, এক লক্ষ বামপন্থী হত্যা, বিমানবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ ইত্যাদি? এসব লেখা কি উচিত? এবং এসব কার স্বার্থে ছাপান হয়?.......কিছু কিছু সাংবাদিক নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করেন। কিন্তু তারা স্বাধীনতার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যান্টনমেন্টে খবর সরবরাহ করেছে। আপনারা কি বলবেন, তাদের গায়ে হাত দিলে গণতন্ত্র এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনতার ওপর আঘাত করা হবে?......অনেকে ভারতীয় চক্রান্তের কথা বলেন, যারা আমাদের দুর্দিনে সাহায্য করেছে তারা নাকি আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের পকেটে ফেলে রাখার চেষ্টা করছে। এ ধরনের কথা বলা কি সাংবাদিকতার স্বাধীনতা? এর নাম কি গণতন্ত্র......যারা ন'মাস এখানে (বাংলাদেশে) ছিল, তাদের কারো কারো সম্পর্কে দলিলপত্র আমাদের হাতে ধরা পড়েছে। তাদের গায়ে যদি আমি হাত দেই আশা করি আপনারা কিছু মনে করবেন না.....আর আয়ের কোন প্রকাশ্য উৎস নেই, সেও দৈনিক কাগজ বের করছে। রাতারাতি কাগজটা বের হয় কোত্থেকে? পয়সা দেয় কারা? আমি শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়াত্ত করেছি, ব্যাংক রাষ্ট্রায়াত্ত করেছি। এর জন্য তারা কেঁদে মরে। তাদের পয়সা আসে কোত্থেকে? আমি খবর পাই যে, বিদেশিরা তাদের সাহায্য করছে এবং তখন যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করি তাহলে কি আপনারা বলবেন, সংবাদপত্রের ও সাংবাদিকদের ওপর অন্যায় হামলা করা হয়েছে? *(সূত্রঃ বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ পৃষ্ঠা. ২৮-৩৩)*

শেখ মুজিবের শাসনামলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার হাল-হকিকত নিয়ে আলোচনার পূর্বে শেখ মুজিবের কাছে লেখা মওলানা ভাসানীর একটি খোলা চিঠির বিষয়বস্তু উল্লেখ করতে চাই। ভাসানী লেখেন, '....... তোমার সরকার গণতান্ত্রিক সরকার বলে দাবি করে থাকে কিন্তু সংবাদপত্র প্রকাশ ও সংবাদপত্রে লিখার স্বাভাবিক নাগরিক গণতান্ত্রিক অধিকার এ দেশে স্বীকৃত হচ্ছে না। পাঁচ মাস পূর্বে টাঙ্গাইলের ডিসির নিকট-আমি হককথা, সাপ্তাহিক মোবাল্লেগ ও মাসিক ওয়ার্ল্ড পীস পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছি। আজও তার কোনও উত্তর নেই। স্বাধীন বাংলাদেশে যদি পত্রিকা প্রকাশনার সাধারণ অধিকারটুকুও না থাকে, তবে আমি এ দেশে থাকতে চাই না। হয় পত্রিকা প্রকাশনার অনুমতি দানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দাও, নয়ত আমাকে এদেশ থেকে বহিষ্কার কর। যাতে অন্য কোন সত্যিকারের স্বাধীন দেশে গিয়ে বসবাস করতে পারি এবং বর্তমান মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি।' *(সূত্রঃ সামসুল হক, বাংলা সাময়িক পত্র ১৯৭২-১৯৮১, ভূমিকা পৃষ্ঠা. ২)*

মওলানা ভাসানীর এই চিঠির কথা, কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা নয়, সংবাদপত্রের প্রতি মুজিব সরকারের দলননীতি এবং একই সাথে গণতন্ত্রকামী আপামর জনতারই প্রাণের

www.pathagar.com

কথার প্রতিফলন ঘটেছে এই চিঠিতে। ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দৈনিক রূপে 'গণকণ্ঠ' নামক একটি পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে বিশিষ্ট সাংবাদিক আল মাহমুদ সর্বক্ষেত্র পরিচালনা করলেও জাসদ প্রতিষ্ঠার পর পত্রিকাটি দলীয় মুখপত্রে পরিণত হয়। 'গণকণ্ঠ' প্রথম থেকেই সরকারের অদক্ষতা, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করার মাশুল হিসেবে অনেক সাংবাদিককের ভাগ্যে বরণ করে নিতে হয় জুলুমের স্টীম রোলার। পত্রিকাটির সম্পাদককে টেলিফোনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজসহ বোমা হামলা, প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়। পরিশেষে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

মওলানা ভাসানীর আদর্শপুষ্ট সন্তোষ টাঙ্গাইল হতে মুদ্রিত এবং সৈয়দ ইরফানুল বারীর সম্পাদনায় ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক হককথা অচিরেই জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান দখল করে। সরকারি আমলাদের মদদে দেশব্যাপী যে দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় তার সঠিক প্রতিবেদন মূলত পত্রিকাটি প্রতিটি সংখ্যায় তুলে ধরে। এর ফলে সরকারি মহল মজিবের জনপ্রিয়তায় ভাটা যাতে না পরে সে লক্ষ্যে হককথার অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য নানা রকম প্রচেষ্টা চালায়। টাঙ্গাইলের প্রেস থেকে হককথা মুদ্রিত হওয়ার দরুন সরকার অধিকাংশ প্রেসের বিরুদ্ধে দমননীতি পরিচালনা করে। যার ফলশ্রুতিতে প্রায় সব'কটি প্রেস হককথা প্রকাশে অপারগতা প্রকাশ করে।

স্বাধীনতা-উত্তর ইংরেজি পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার নাম পরিবর্তন হয়। হামিদুল হক চৌধুরীর মালিকানাধীন পত্রিকাটি সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। নবনির্বাচিত সম্পাদক হিসেবে প্রবীণ সাংবাদিক আব্দুস সালাম পত্রিকার নামকরণ করেন 'দি বাংলাদেশ অবজারভার'। অবশ্য এর পূর্বে তিনি 'দি অবজারভার' নামকরণ করেছিলেন। ১৫ মার্চ 'দি সুপ্রিম টেস্ট' শীর্ষক মন্তব্য লেখার জন্য সরকার তাঁর ২২ বছরের চাকরি জীবন থেকে অবসর প্রদান করেন। আমাদের দেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে এই প্রতিবাদী সাংবাদিকের প্রতিবাদমূলক সম্পাদকীয়র উল্লেখ খুব কমই রয়েছে। তাই এর অনুবাদ এখানে উল্লেখ করছি ঃ

দি সুপ্রিম টেস্ট

'আওয়ামী লীগ সরকার আজ এক অদ্ভুত অবস্থায় রয়েছে। যদিও ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এ দলটিকে নির্বাচিত করেছিল, তথাপি আজ আমাদের দেশে যে সরকার রয়েছে তা নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল ও সাংবিধানিক সরকার নয়। এখন কোন সংবিধান নেই, তাই এর অস্তিত্বের কোন গণতান্ত্রিক বৈধ ভিত্তি নেই। এ বাস্তবতাই এর কারণ। এক বিপ্লবী যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল বলেই তারা ক্ষমতায় রয়েছে এবং তাই এটা এক বিপ্লবী অস্থায়ী সরকার। ন্যাপের একমাত্র বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এক পর্যায়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, বিপ্লবী যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষের সমন্বয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠন করা উচিত। পরে মওলানা ভাসানীসহ অন্যরা দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারকে সমর্থন দিতে সম্মত হন। আওয়ামী লীগ দাবি করতে পারে যে তারাই হচ্ছে জনগণের পছন্দ করা প্রতিনিধি এবং তাই সরকার গঠনের অধিকার রাজনৈতিকভাবে তাদেরই রয়েছে। এছাড়াও রাতারাতি সংবিধান প্রণয়ন করা যায় না, এ দেশের পরিস্থিতিও স্বাভাবিক নয়, সেহেতু সরকার গঠন করার স্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, অতঃপর গণপরিষদ আহ্বান ও রাষ্ট্রের মৌল

www.pathagar.com

আইন প্রণয়ন একান্ত প্রয়োজনীয়। স্বীকার করতে হবে যে, পরিস্থিতি এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি এবং দৈনন্দিন পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশেষ আইনগত ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। তবে আশা করা যায় যে, আমাদের রাষ্ট্রের আইনগত ও সাংবিধানিক মৌল কাঠামো রূপায়ণে কালক্ষেপণ করা ভালো না। জনগণ বঙ্গবন্ধুকে ভোট দিয়েছিল এবং তিনি বলেছেন যে, বাংলাদেশ হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা হবে এর পরিচালিকা, বর্তিকা। তিনি এবং আওয়ামী লীগ উভয়ই দীর্ঘকাল যাবৎ গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামই ছিল গণতন্ত্র ও মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। তাই তারা একটি আধুনিক রাষ্ট্রের এই দুই মৌল প্রয়োজন অস্বীকার করতে পারেন না। সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ একটি সংবিধান ও একটি সরকার পদ্ধতিই কেবল এসবের নিশ্চয়তা দিতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গড়ে তোলার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে খাপ খাওয়ানো যায়। এক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্বের কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি মানবাধিকার সংরক্ষণ ও শোষণ নির্মূলকারী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হচ্ছে সমস্যা। একটি রাষ্ট্রের মধ্যে আর একটি রাষ্ট্র থাকতে পারে না। এ কথাটি ভিন্নভাবে বললে, বলা যায় যে, সকল ক্ষমতা অবশ্যই আইনের অনুশাসনাধীন থাকবে। সরকার কাঠামো বহির্ভূত কোন গোষ্ঠীর অনুকূলে কোন কারণেই সেই দায়িত্ব পরিত্যাগ করতে পারেন না। ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য এবং বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তাসহ আইনের সর্বোচ্চ আসন প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা হচ্ছে ব্যক্তির অধিকার ও সুযোগ সামগ্রিকভাবে সমাজের সার্বিক স্বার্থের অধীন। মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ যে নামেই থাক না কেন তার অবসান ঘটানোও সমাজতন্ত্রের আবশ্যিক শর্ত। আজ আমাদের সম্মুখে এই বিশেষ সমস্যাটি রয়েছে। সংবিধান প্রণয়নকালে এটি খেয়াল রাখতে হবে। বর্তমানে সরকারি সার্ভিস নীতিভ্রষ্টের অবস্থায় পতিত হয়েছে। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর প্ররোচিত ১০ মাসব্যাপী আইনহীনতা এবং বর্বরতাও কম দায়ী নয়। পূর্ববর্তী শাসক-গোষ্ঠীগুলো যেদিকসমূহের নিন্দা করেছে আওয়ামী লীগ আজ ক্ষমতাসীন হয়ে সেগুলো করতে পারে না। স্থায়ী চাকরিসমূহ যথাসম্ভব নিরুপদ্রব থাকতে দেয়া উচিত। জনাব মোনায়েম খান গ্রাম্য দারোগাকেও নির্দেশ দিতেন। আমরা যদি একজন মোনায়েম খানের স্থলে অজস্র জনকে আসীন করি তাহলে অবস্থার উন্নতি ঘটবে না। শেখ মুজিব স্বদেশের জনগণকে ভালোবাসেন, প্রতিদানে জনগণও তাকে ভালবাসেন। এখন তাকে পুরো জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রগতির পথে পরিচালিত করতে হবে। সম্ভবত তিনি জানেন না যে, তিনি কত বলশালী। কোন বিশেষ গোষ্ঠী, কুচক্র বা কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের কাছ থেকে নয়, জনগণের কাছ থেকে আসা তার ক্ষমতা, তাই আজ তিনি স্বীয় মহত্ত্বের চরম পরীক্ষার সম্মুখীন।'

৪ মে স্পীকার মোহাম্মদ উল্লাহ সরকারের পক্ষেই যাক আর বিপক্ষেই যাক সাংবাদিকদের প্রকৃত তথ্য তুলে ধরার আহ্বান জানালেও ২২ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, 'গণপরিষদ সদস্যদের সাথে বচসার কারণে সাতক্ষীরায় একজন সাংবাদিক গ্রেফতার।'

২০ মে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক এক বিবৃতিতে বলেন, 'তারা (সংবাদপত্র) বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট হিসেবে স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং এখন ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই সমস্ত পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ কি এত সহজেই

www.pathagar.com

ভুলে গেছেন যে, গত বছর এই সময়ে উক্ত রাষ্ট্রগুলো স্বাধীনতার জন্য কি বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। আমি তাদের সাবধান করে দিয়ে বলতে চাই যে, গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে এভাবে গণবিরোধী ও বিদেশি চক্রান্ত সহ্য করা যাবে না....সরকার যদি এর আশু ব্যবস্থা না করেন, তবে জনগণই এই পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।'

৩০ মে দিবাগত রাতে আকস্মিকভাবে পুলিশ সাপ্তাহিক 'গণশক্তি'র সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হাবিবুর রহমানের বাড়ি বিনা নোটিশে ঘেরাও করে প্রচলিত আইনকে তোয়াক্কা না করে তাদের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আটক করে। শুধু তাই নয় 'বেনামী' সম্পত্তির অজুহাতে তোয়াহা সাহেবের স্ত্রী ও বিধবা কন্যার (প্রফেসর ফজলুল হককে পাকবাহিনী হত্যা করে) সম্পত্তি আটক করা হয়। সেই সময় থেকে গণশক্তির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। ২১ জুন গ্রেফতার করা হয় সাপ্তাহিক হককথার সম্পাদক ইরফানুল বারীকে।

১৭ জুলাই ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভায় শেখ মুজিব প্রতিশ্রুতি দেন, 'সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না।' একই সভায় তিনি ভিন্নমতাবলম্বীদের সমালোচনা করে বলেন, 'তথাকথিত প্রগতিবাদীরা সরকারের সমালোচনা শুরু করেছে। এদের সমালোচনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত হানছে। ফ্রি স্টাইলে কোন সমালোচনা সরকার সহ্য করবে না'।

৬ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির বিশেষ 'ক্ষমতা' বলে 'সাপ্তাহিক মুখপত্র' ও 'স্পোকসম্যান' সম্পাদক ফয়জুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ৭ সেপ্টেম্বর আওয়ামীরা চট্টগ্রামের দৈনিক 'দেশবাংলা' পত্রিকার অফিস জ্বালিয়ে দেয়। ৬ অক্টোবর এক নির্দেশ জারি করে আওয়ামী সরকার বলে, 'সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেতার, টিভি ও রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের চিন্তা ও মতামত প্রকাশের পূর্বে সরকারি অনুমোদন নিতে হবে। পূর্বানুমতি ছাড়া তাদের লেখা কোথাও ছাপা হতে পারবে না। *(সূত্রঃ দৈনিক বাংলা ১৭ অক্টোবর-১৯৭২)*

এই সময় ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের এক বিবৃতিতে দাবি করা হয়, 'আদালতের সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন সংবাদপত্র বন্ধ করা যাবে না। বন্ধ করে দেয়া সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোকে আদালতে মোকাবিলা করতে দেয়ার দাবি জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স বাতিলের জোর দাবি জানাচ্ছি।'

সরকারের অব্যাহত ফ্যাসিবাদী মনোভাব, গুপ্তহত্যা, নির্যাতন, উৎপীড়ন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ ও হিন্দুস্থানের শোষণের প্রতিবাদে ৮ অক্টোবর ন্যাপের উদ্যোগে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা ভাসানী সে সমাবেশে বক্তৃতার এক পর্যায়ে 'হককথা', 'লাল পতাকা', 'মুখপত্র', 'স্পোকস ম্যান' প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়ার তীব্র সমালোচনা করে অভিযোগ করেন যে, দৈনিক 'আজাদ', 'পূর্বদেশ', 'বাংলার বাণী'সহ সরকার সমর্থিত কোন পত্রিকাতেই গুপ্তহত্যা ও অনাহারে আত্মহত্যার কথা লেখা হয় না।

৬ ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের বুলেটিন-১ 'লাল পতাকা বন্ধ করে দিয়েছে' শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয়, '..... ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে লাল পতাকা, হককথা প্রভৃতি সাপ্তাহিকগুলো ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামের পাশে এসে দাঁড়ায়। সরকার ও তাদের বিদেশি প্রভুদের নাভিশ্বাস উঠলো। কিন্তু জনগণের সমালোচনার ভয়ে আওয়ামী লীগ সরকার এবার আর বাহিনী পাঠিয়ে সংবাদপত্রের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিল না। হাতে তুলে নিল স্বৈরাচারী আইয়ুবের প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সের খড়্গ। এইবার

www.pathagar.com

আক্রমণের শিকার হলো লাল পতাকা, হককথা, মুখপত্র, স্পোকস ম্যান ও বাংলার মুখ। মুজিবী শাসন বাস্তবে পরিণত হলো শাসনে।'

বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক এক প্রতিবাদে বলা হয়, '......সরকার ইতিমধ্যেই সাপ্তাহিক হককথার সম্পাদক ইরফানুল বারীকে গ্রেফতার করেছেন এবং সর্বশেষ সাপ্তাহিক মুখপত্র-এর সম্পাদক জনাব ফয়জুর রহমানকে গ্রেফতার করে প্রমাণ করে দিলেন সাইন বোর্ড হলো সরকারের মুখোশ মাত্র।' তারা অভিযোগ করেন, 'বাংলার সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে পদদলিত করা হচ্ছে। যতই সরকার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ততই ফ্যাসিস্ট হিটলারের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে।' তারা দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি ফ্যাসিস্ট হামলা একযোগে মোকাবিলা করার আহ্বান জানান। *(সূত্র ঃ সামসুল হক, বাংলা সাময়িক পত্র ১৯৭২-৮১, পত্রিকার উদ্ধৃতি, পৃষ্ঠা. ৯৫)*

দৈনিক গণকণ্ঠ পরিত্যক্ত সম্পত্তি জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস থেকে প্রকাশিত হতো। সরকারবিরোধী ভূমিকার জন্য মুজিব গণকণ্ঠ সরাসরি বন্ধের কোন নির্দেশ না দিয়ে গণকণ্ঠের মুদ্রণালয়ের প্রশাসক বদলের নামে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যাতে পত্রিকা প্রকাশনার স্বাভাবিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে উক্ত পত্রিকারই এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়, গত ২৩ মার্চ এক আদেশবলে আকস্মিকভাবে সরকার জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ-এর প্রশাসক জনাব মনিরুল ইসলামকে অপসারণ করে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উপ-প্রধান জনাব নাজির হোসেন হায়দার পাহাড়ীকে প্রশাসক নিয়োগ করেছেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে গণকণ্ঠের প্রধান ফটকে পুলিশ বসিয়ে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে আমরা আমাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ নিয়োগের আবেদন করেও সাড়া পাইনি। পুলিশ যদি আমাদের নিরাপত্তার জন্য অবস্থান করে, তাহলে অবশ্যই আপত্তির কিছুই থাকে না। কিন্তু তারা গণকণ্ঠের স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা দেবে না, এটাই কাম্য। অন্যদিকে চিরাচরিত নিয়মে নতুন প্রশাসক জনাব পাহাড়ী যদি অবাঞ্ছিত লোকজনদেরকে নিয়ে একটি সংবাদপত্রের অফিসে প্রবেশ করে (যে ধরনের চেষ্টা গত শনিবার করা হয়েছে) দেশের একমাত্র বিরোধীদলীয় পত্রিকা গণকণ্ঠ প্রকাশনায় বাধা বা গণকণ্ঠ অফিসের অভ্যন্তরে অবাঞ্ছিত ঘটনার সূত্রপাত করেন তাহলে বিরোধীদলীয় পত্রিকাবিহীন বাংলাদেশের অবস্থা কি হবে?' *(সূত্রঃ দৈনিক গণকণ্ঠ, ২৬ মার্চ, ১৯৭৩)*

এই সম্পাদকীয় প্রকাশিত হওয়ার দু'দিন পর ২৮ মার্চ গণকণ্ঠের প্রকাশনা বন্ধ করা হয় ব্যবসায়ী চুক্তির অজুহাত দেখিয়ে। ২৯ মার্চ দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গণকণ্ঠ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, 'গতকাল বিকেল ৩টায় একদল পুলিশ এবং জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ-এর নবনিযুক্ত প্রশাসক এসে গণকণ্ঠের প্রকাশনার সকল কাজ বন্ধ করে দেন। তারা কার্যত সাংবাদিক ও কর্মচারীগণকে বের হয়ে যেতে নির্দেশ দেন। গণকণ্ঠের মূল্যবান কাগজপত্র, ফাইল, আসবাবপত্র এবং গণকণ্ঠ মুদ্রণালয়ের অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সবকিছু ফেলে রেখে সাংবাদিক ও কর্মচারীগণ অফিস ত্যাগ করেন।'

পত্রিকা বন্ধের প্রতিবাদে বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সম্পাদক আল মাহমুদ বলেন, 'গণকণ্ঠ অত্যন্ত বেআইনীভাবে বন্ধ করে দেয়ার ফলে পৌনে তিনশত সাংবাদিক-কর্মচারীরা বেকার হয়েছে। সাংবাদিক-কর্মচারীদের মুহূর্তমাত্র সময় না দিয়ে অফিস হতে কাজ অসমাপ্ত রাখা অবস্থায় বের করে দেয়া হয়েছে'। গণকণ্ঠ বন্ধের

www.pathagar.com

ঘটনায় বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক মহলে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ৩১ মার্চ ২ ঘণ্টার প্রতীক ধর্মঘট পালন করে এবং প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। *(সূত্রঃ দৈনিক জনপদ, ১ এপ্রিল, ১৯৭৫)*

দেশের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে শামসুর রহমান, বদরুদ্দীন উমর, সিকান্দার আবু জাফর, আলী আশরাফ, আলমগীর কবির, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ এবং জনাব আবুল হাশিম এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, 'বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকা এবং অপরাপর প্রচারযন্ত্র সরকারের কর্তৃত্বাধীন ফলে সরকারের নীতির সমালোচনা প্রকাশ ও প্রচারের সুযোগ সীমিত। এই সীমিত সুযোগকেও সীমিত করে পরিশেষে একেবারে বন্ধ করার যে নীতি সরকার অনুসরণ করে চলেছেন আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৭ জন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, 'একজন প্রশাসকের ত্রুটির অজুহাত দেখিয়ে দেশের জনপ্রিয় এবং বিরোধী মতের ধারক একটি পত্রিকা প্রকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা প্রকৃতপক্ষে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা দেয়ার নামান্তর এবং দেশে গণতন্ত্রের স্থিতি ও সুষ্ঠু বিকাশের পথে গুরুতর বাধাস্বরূপ। জনগণের এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে আমরা এ ব্যাপারে সরকারের আশু সুবিবেচনা আশা করব।'

বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদের মুখে সরকার বাধ্য হয় গণকণ্ঠ পুনঃপ্রকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করতে। ১৫ দিন বন্ধ থাকার পর ১৩ এপ্রিল গণকণ্ঠ পুনঃপ্রকাশিত হয়। ২ মে সরকার অলি আহাদ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ইত্তেহাদের' বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না-এই মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে। অলি আহাদ তখন কনিষ্ঠ সহোদর আমিরুজ্জামানের আমন্ত্রণে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে অবস্থান করছিলেন। ১৬ মে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে তিনি সরকারের দমননীতি মনোভাবের জবাব দেন। পরিত্যক্ত সম্পত্তি দৈনিক পয়গাম পত্রিকার সাংবাদিকরা নাম পরিবর্তন করে দৈনিক স্বদেশ প্রকাশ শুরু করেন। সরকার আওয়ামী সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান কোরবান আলীকে পত্রিকার প্রকাশক নিযুক্ত করেছিলেন। এক বছরের মাথায় প্রশাসনিক অব্যবস্থার কারণে ও লুণ্ঠনের ফলে স্বদেশ অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যায়। ফলে ১৬ মে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়।

১৮ জুন সরকার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সবলে সাপ্তাহিক 'নয়াযুগ' পত্রিকার সম্পাদককে গ্রেফতার করে 'নয়াযুগ' বন্ধ করে দেন। ২২ জুন সংসদে দাঁড়িয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে তথ্যমন্ত্রী এক পর্যায়ে স্বীকার করেন যে, '১৯৭২ সালের মার্চ মাসে সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক রূপে প্রকাশিত বাংলার বাণী পত্রিকাকে সবচেয়ে বেশি তথা ৭ লাখ ৯৩ হাজার ১৯২ টাকার সরকারি বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। অথচ পত্রিকাটির ডিক্লারেশনের ক্রমিক নম্বর ছিল সকলের নীচে।'

আবু হেনা সম্পাদিত ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং ৬ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক দেশবাংলা'র প্রকাশনা বন্ধ করা হয় ১১ আগস্ট থেকে। এ সম্পর্কে দৈনিক জনপদে ১৩ আগস্ট প্রকাশিত সংবাদ, 'গত শনিবার রাত দশটায় আকস্মিকভাবে পুলিশ চট্টগ্রাম দেশবাংলা অফিসে তালা লাগিয়েছে। দু'জন সাংবাদিক ও আটজন প্রেস শ্রমিকসহ মোট দশজনকে পুলিশ একই সময় গ্রেফতার করেছে'।

দৈনিক গণকণ্ঠে ১৪ আগস্ট প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়, '......দেশের ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে সাংবাদিকরা অনেক সময় সত্যকে ব্যক্ত করেন না। আবার

www.pathagar.com

অনেক সময় জাতির নৈতিকবল বৃদ্ধির জন্য বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নেন। এ বছর গোড়ার দিকে কোন কোন সরকারদলীয় দৈনিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহী ও বিদেশি অনুচরদের ঘাঁটি সম্পর্কে প্রকাশিত খবর তদন্তের পর সত্য নয় বলে সরকার জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেসব রিপোর্টের জন্য সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ঠিক সেইভাবে সরকার দেশবাংলায় প্রকাশিত উক্ত রিপোর্ট সম্পর্কেও একই মনোভাব গ্রহণ না করে এতো কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, পত্রিকাটি বিরোধীদলের সমর্থক বলেই একটা অজুহাত দেখিয়ে এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হলো।'

দেশবাংলায় তালা লাগানো এবং সাংবাদিকসহ প্রেস শ্রমিকদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন ১২ আগস্ট রোববার এক জরুরি সভার আয়োজন করে। এছাড়া চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। জাসদ নেতা মেজর জলিল ও আসম আব্দুর রব এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, 'কোন পত্রিকা ভুল তথ্যসহ কোন খবর ছাপালে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু প্রেস কর্মচারী ও সাংবাদিকদের অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়ে পত্রিকা অফিসে বেআইনীভাবে তালা ঝুলানো যায় না।'

অনেক বাদ-প্রতিবাদ শেষে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাংবাদিকদের বৈঠকের মাধ্যমে দেশবাংলার সমস্যার সমাধান হয়। প্রায় ৪ মাস পর ম্যাজিস্ট্রেট দেশবাংলা অফিসের তালা খুলে দেন। *(সূত্রঃ দৈনিক আজাদ, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৩)*

সংসদকে পাস কাটিয়ে 'প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশন্স (রেজিস্ট্রেশন এন্ড ডিক্লারেশন) অর্ডিন্যান্স '৭৩ নামে কালাকানুন জারি করা হয় ২৮ আগস্ট (সংসদ নির্বাচনের ছয় মাসের মধ্যে) যা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স এ্যাক্ট-এর স্থলাভিষিক্ত হয়। অর্ডিন্যান্সটি কার্যত ১৯৬০ সালে আইয়ুব খানের ঘোষিত প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সেরই একটি অনুলিপি মাত্র। যেখানে সংবাদপত্রগুলোর ওপর সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণকে নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং ভিন্নমত প্রকাশের জন্য আটক সংবাদপত্র বেআইনী ঘোষণার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

পূর্বে জারি করা প্রেসিডেন্টের ৫০ নং আদেশ ও প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সবলে যথাক্রমে সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মহলে প্রতিবাদ ওঠে। সাংবাদিক সংগঠনসমূহ সোচ্চার হয় ও আন্দোলনের হুমকি দেয়। ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্মল সেন কালাকানুন বাতিল আন্দোলনের এক প্রস্তুতি সভায় বলেন, 'হাইজ্যাকার, চোরাচালানী, কালোবাজারী, মজুতদার দমনের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের ৫০ নং আদেশ জারি করা হয়। কিন্তু উক্ত দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে এ আইনের সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না। ব্যবহার হচ্ছে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে। এ আইনে উক্ত দুস্কৃতকারীরা গ্রেফতার হলেও উচ্চ মহলের তদবিরে মুক্তি বা জামিন পাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'স্বাধীন দেশে কালাকানুন বহাল রাখা শহীদদের রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। শহীদদের নাম উচ্চারণের কোন অধিকার তাদের নেই।' *(সূত্রঃ দৈনিক জনপদ, ১৫ আগস্ট, ১৯৭৩)*

১ সেপ্টেম্বর আজাদ সুলতানের সম্পাদনায়, শামসুল হক কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রেমরঞ্জন দেব কর্তৃক প্রচারিত হয়ে জনসাধারণের হাতে আসে সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের প্রচারপত্র গ্রেট বাংলা-২ সংখ্যাটি। সে প্রচারপত্রে ১৯৭২-এর ১৯ অক্টোবর মওলানা ভাসানী

www.pathagar.com

কৃষক সমিতির সাংগঠনিক কমিটির সভায় প্রদত্ত বক্তব্য এবং 'সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের তথ্য সংগ্রহ অভিযান-এক' শীর্ষক একটি বিভাগের এক জায়গায় জনসাধারণের নিকট মতামত জানতে চাওয়া হয় '(ক) আপনার এলাকায় ধান-চাল, সরিষার তেল, কেরোসিন তেল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বর্তমান দর কত, (খ) মুজিব বাহিনী কতজন নিরীহ লোক ও মুক্তিবাহিনীকে হত্যা করিয়াছে? (গ) কতজন লোক অভাবের তাড়নায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে, (ঘ) মুজিব বাহিনী অথবা রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার চলিতেছে কিনা, কিভাবে চলিতেছে।' গ্রেটবাংলা প্রকাশিত হওয়ার পরপরই সরকার প্রেমরঞ্জন দেবকে গ্রেফতার করে চার বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে।

১৯ সেপ্টেম্বর সংসদ অধিবেশনে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সটি পেশ করলে জাসদের এমপি আব্দুল্লাহ এর বিরোধিতা করেন। তিনি এই অর্ডিন্যান্সকে আইয়ুবের কালাকানুনের সাথে তুলনা করেন। স্পীকার আব্দুল মালেক জানান যে, এ বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে বিএফইউজে আলোচনার কথা অস্বীকার করে। এক পর্যায়ে স্পীকার আব্দুল মালেক সাংবাদিক কম্যুনিটির প্রতি অশালীন বাক্য ছুঁড়েন।

২৩ নভেম্বর সাপ্তাহিক 'ওয়েভ' পত্রিকাকে আদালতের ইনজাংশন উপেক্ষা করে সরকার বন্ধ ঘোষণা করে। একই সাথে প্রেসিডেন্টের ৫০ নং আদেশবলে দেশবাংলার সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট (আইপিআই)-এর এক রিপোর্টে বলা হয়, 'বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই। দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশেও সরকার সংবাদপত্রের ওপর কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছেন। কে কত বেশি প্রভুকে সন্তুষ্ট করছে, ভক্তি দেখাচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে এসব দেশে সরকারি বিজ্ঞাপন যায়, নিউজপ্রিন্ট পর্যন্ত বরাদ্দ করা হচ্ছে।' আইপিআই-এর ওই রিপোর্টটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমভাগে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে ৭ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে স্থান-কাল-পাত্র উপ-সম্পাদকীয় 'লুব্ধক' লিখেছিলেন 'সবাই জানেন, আইয়ুব আমলে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে বলে পরিষদ কক্ষ বর্জন করেছিলেন, আমরা আরো জানি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার প্রশ্নে জেল-জুলুমসহ বিভিন্ন নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম ও মর্যাদা কুড়িয়েছিলেন। আর আজ সেই আওয়ামী লীগের শাসনামলে বাংলাদেশের বুকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই, কথাটা শুনতেও লজ্জায় মাথা কাটা যায় না কি?'

১৯৭৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পাস করা বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ দ্বারা সরকার প্রেস সেন্সরশীপের ব্যবস্থা নেয়ার অধিকারপ্রাপ্ত হয়। এই আইনে এমন সব বিধি-নিষেধ অন্তর্ভুক্ত হয় যার ফলে পত্র-পত্রিকায় প্রায় কোন কিছুই লেখা সম্ভব ছিল না। ১৯৭৩-এর প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স এ্যাক্টে আইয়ুবী আমলের বেশ কিছু ধারা ঢুকিয়ে দেয়া হলেও বিশেষ ক্ষমতা আইনে শুধুমাত্র আইয়ুব আমলের কালাকানুন নয়, বৃটিশ আমল থেকে আইয়ুব আমল পর্যন্ত সংবাদপত্র দলনের জন্য যত আইন প্রণীত হয়েছিল তার সবগুলো ধারা এ আইনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। *(সূত্রঃ দৈনিক বাংলার বাণী, ১৪ জুলাই, ১৯৭৪)*

সরকারের এরূপ আইন সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে কতটুকু যুক্তিসঙ্গত ছিল তা বুঝা যায় ১০ ফেব্রুয়ারিতে প্রদত্ত বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের বিবৃতি থেকে।

www.pathagar.com

বিবৃতিতে তারা বলেন, 'বিএফইউজে অতীব ক্ষোভ ও দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছে যে, অধুনা সমাপ্ত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ পাস করে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর নয়া বিধি-নিষেধ আরোপের ব্যবস্থা করেছেন। এতে কুখ্যাত আইয়ুবের প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সের জঘন্যতম ধারাগুলো অব্যাহত রয়েছে। এই আইনে সংবাদ প্রকাশের বাধা আরোপ, যে কোন সংবাদ প্রকাশের জন্য এমনকি এই আইন রচনার পূর্বে প্রকাশিত কোনো সংবাদের জন্যও ছাপাখানার মুদ্রাকর, প্রকাশক, রিপোর্টার এবং সম্পাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে, পত্রিকার জামানত তলব করা যাবে। এই আইনের শর্তানুযায়ী সরকার দৃশ্য, অদৃশ্য-সত্য বা মিথ্যা যে কোন সংবাদ আইন-শৃঙ্খলার বিরোধী মনে করলে ব্যবস্থা নিতে পারবেন। বিএফইউজে একদিকে আইয়ুবী কালাকানুন বাতিল, অপরদিকে বি েষ ক্ষমতা আইনের নামে কালাকানুনটি আবার চাপিয়ে দেয়ার এই ব্যবস্থাকে প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ বলে মনে করে এবং সরকারের এই দ্বিমুখী নীতির তীব্র নিন্দা করছে। ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছে যে, বিশেষ ক্ষমতা আইন পাসের মাত্র একদিন পূর্বে প্রেস কাউন্সিল গঠন আইন পাস করা হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, বিশেষ ক্ষমতা আইন ও প্রেস কাউন্সিল গঠনের আইন পরস্পর বিরোধী। বিশেষ ক্ষমতা আইনে প্রতিটি সংবাদ প্রকাশের সূত্র নির্দেশের বিধান রয়েছে। অন্যদিকে প্রেস কাউন্সিল গঠন আইনে সংবাদপত্রের সূত্র গোপন রাখার আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সাংবাদিক নীতিমালার সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। এমনিভাবে বিশেষ ক্ষমতা আইনের খড়্গ ঝুলিয়ে রেখে প্রেস কাউন্সিল গঠন আইনের কোনো সার্থকতা নেই। বিএফইউজে অবিলম্বে বিশেষ ক্ষমতা আইন তুলে নেবার আহ্বান জানাচ্ছে।'

১৭ মার্চ জাসদ কর্তৃক আয়োজিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওয়ের পরের দিন দৈনিক গণকণ্ঠের অফিসে আওয়ামীপন্থীরা হামলা চালায়। পুলিশ হামলাকারীদের গ্রেফতার না করে গণকণ্ঠ সম্পাদক আল মাহমুদকে গ্রেফতার করে। ১৯ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'গণকণ্ঠ সম্পাদক গ্রেফতার' শীর্ষক সংবাদে বলা হয়, 'দৈনিক গণকণ্ঠের সম্পাদক কবি আল মাহমুদকে গতকাল সোমবার ভোর সাড়ে তিনটায় তাহার বাসভবন হইতে গ্রেফতার করা হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। সকাল ১০টার দিকে তাহাকে রমনা থানা হইতে কেন্দ্রীয় কারাগারে লইয়া যাওয়া হয়। জানা গিয়াছে যে, ঐ একই সময়ে রক্ষীবাহিনী টিপু সুলতান রোডস্থ দৈনিক গণকণ্ঠ অফিস হইতে কাগজপত্র এবং সিদ্ধেশ্বরীস্থ গণকণ্ঠের মুদ্রণালয় হইতে সোমবারের পত্রিকার সিলোপিন সিজ করে। ফলে সোমবার পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ থাকে। গণকণ্ঠ কার্যালয় হইতে তরিকুল্লাহ নামক এক প্রেস শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়।'

গণকণ্ঠ সম্পাদককে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ডিইউজের এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯ মার্চ। সভার এক প্রস্তাবে গণকণ্ঠ সম্পাদক কবি আল মাহমুদের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং তার আশু মুক্তির দাবি করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র ও বার্তা সংস্থাসমূহের কর্তৃপক্ষের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়, তারা গত কিছুদিন যাবত এমন ধরনের সংবাদ পরিবেশনে বাধ্য করেছেন সাংবাদিকদের যার ফলে-সাংবাদিক ও জনগণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি জনগণ থেকে সাংবাদিকদের বিচ্ছিন্ন করারও সুপরিকল্পিত চেষ্টা চলছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা ও সংবাদ সংস্থাসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কর্তব্যরত সাংবাদিকরা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে পারছে না বলে অভিযোগ করেন। *(সূত্রঃ দৈনিক বাংলা, ২০ মার্চ, ১৯৭৪)*

www.pathagar.com

২১ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে দৈনিক গণকণ্ঠ কর্তৃপক্ষের আরো একটি ভাষ্য প্রকাশিত হয়। ভাষ্যটি 'দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকার কর্তৃপক্ষের এক প্রেস রিলিজে দৈনিক গণকণ্ঠ প্রকাশিত না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয়, গত ১৭ মার্চ রাত তিনটার সময় তিন ট্রাক বোঝাই রক্ষীবাহিনী ও পুলিশ কোনরূপ সরকারি নির্দেশ ছাড়াই গণকণ্ঠ কার্যালয়ে প্রবেশ করে এবং সোমবার প্রকাশিতব্য শেষ ফর্মা মেশিন হইতে নামাইয়া ফর্মাটি ভাঙ্গিয়া ফেলে। তাহারা কার্যালয়ের প্রতিটি কক্ষের জিনিসপত্র তছনছ করে। একই সময় বাসভবন হইতে গণকণ্ঠ সম্পাদক কবি আল মাহমুদকে গ্রেফতার করা হয়। একই সময়ে ছাপাখানা হইতে সোমবারের শেষ ফর্মার সিলোফিন পেপারসহ প্লেটটি আটক করে। সোমবারের পত্রিকার প্রকাশ কার্যত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সোমবার ও মঙ্গলবার রাত ধরিয়া পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী কিছুক্ষণ পরপর গণকণ্ঠ কার্যালয়ে যাইয়া সেখানে কর্মরত সাংবাদিক ও কর্মচারীদেরকে হুমকি দেয় এবং রাতের কম্পোজ ম্যাটার ভাঙ্গিয়া সিলোফিন ও প্লেট লইয়া যায়। ইহা ছাড়াও টেলিফোনে ও প্রকাশ্যে সাংবাদিক ও কর্মচারীদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হইয়াছে। পত্রিকার বার্তা সম্পাদকসহ অন্যান্য সাংবাদিকরা প্রাণভয়ে অন্যত্র রাত কাটাইতে বাধ্য হইতেছেন, রিপোর্টাররা সংবাদ সংগ্রহ করিতে যাইয়া হুমকির সম্মুখীন হইতেছেন, কারাগারে গণকণ্ঠের সম্পাদকের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাহাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে সাধারণ কয়েদীদের সাথে রাখা হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া মফস্বল সংবাদদাতাসহ গণকণ্ঠ কার্যালয় হইতে গ্রেফতারকৃতদের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।'

সরকারি বিজ্ঞাপন সাময়িকপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র-পত্রিকাগুলোকে সরকারের মুখাপেক্ষী হতেই হয়। সরকার এই সুযোগ তাদের নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করেন। বিরুদ্ধ মতাবলম্বী পত্রিকার জন্য সরকারি বিজ্ঞাপনের পথ হয় রুদ্ধ। এই প্রক্রিয়ায় দৈনিক জনপদে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রদান বন্ধ হয়। দৈনিক জনপদ সম্পাদক আব্দুল গাফফার চৌধুরী বিজ্ঞাপন বরাদ্দের সরকারি নীতির নিন্দা করে বলেন, 'জনপদকে যেভাবে সরকারি বিজ্ঞাপন কারণ না দর্শিয়ে, অলিখিতভাবে বন্ধ করা হয়েছে, তা শুধু অগণতান্ত্রিক নয়, অসাধু পন্থাও। দলীয় স্বার্থে সরকারি বিজ্ঞাপন ব্যবহারের এই নিন্দিত পন্থাও কেন সরকার গ্রহণ করলেন, তা আমরা জানি না। সরকারের উগ্র সমালোচনা করার অপরাধে নয়, উত্তেজনা বৃদ্ধিকারী বা হিংসাত্মক মত প্রকাশের অভিযোগেও নয়, ঢাকার বুকে পর পর দু'দিন যে ঘটনা ঘটেছে তা প্রকাশ করার অপরাধে জনপদের এই শাস্তি।' *(সূত্রঃ দৈনিক জনপদ, ২৯ মার্চ, ১৯৭৪)*

৩০ জুন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মওলানা ভাসানীর জনসভা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পুনরায় গণকণ্ঠ অফিসে পুলিশ হামলা চালিয়ে প্রেস ম্যাটার ভেঙ্গে ফেলে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই হামলাকে 'পুলিশ গণকণ্ঠের ম্যাটার ভাঙ্গতে যায়নি-পলাতক আসামী খুঁজতে গণকণ্ঠে গিয়েছিল' বলে অভিহিত করেন।

৬-৮ জুলাই বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের তিন দিনব্যাপী অধিবেশন নির্মল সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় 'ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের বক্তব্য হচ্ছে দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ পাকিস্তান আমলে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাংবাদিকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছে। সাংবাদিকদের রুটি-রুজির সংগ্রামে সমর্থন যুগিয়েছে, সাংবাদিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং আইয়ুব আমলের কালাকানুন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সাথে সংগ্রাম করেছে। তাই স্বাভাবিকভাবে সাংবাদিকরা আশা করেছেন যে, দেশ স্বাধীন হবার পর আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা কুণ্ঠিত হবে না, সাংবাদিক নির্যাতন বন্ধ হবে, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বাতিল হবে, সরকার কোন সিদ্ধান্তই একতরফা সাংবাদিকদের ওপর চাপিয়ে দেবে না। কিন্তু তা হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মধ্যে আইয়ুবের কালা-কানুনের আশ্রয় নিয়ে সরকার কতিপয় সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ করেছেন। সম্পাদকদের কারাগারে নিক্ষেপ করেন। দৈনিক গণকণ্ঠকে বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করেন। স্বাধীনতার দেড় বছরের মধ্যেও প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বাতিল সম্পর্কে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। অথচ এই কালাকানুন বাতিল করা ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যতম অঙ্গীকার। আর এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে সরকার সভ্য জগতের সকল নিয়ম-নীতি ভেঙ্গে দৈনিক বাংলার সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী সম্পাদককে ওএসডি করেন।'

১৯৭৪ সালে সরকার নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করেন। ৯ জুলাই এ আদেশ কার্যকর হয়। তদুপরি ঘোষিত হয় বিজ্ঞাপন নীতি। নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ ও বিজ্ঞাপন নীতির ফলে শুধু সংবাদপত্রের স্বাভাবিক প্রকাশনাই ব্যাহত হয়নি; সাহিত্য ও গবেষণামূলক সাময়িকী প্রকাশনা তথা সংস্কৃতি চর্চার উপরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, সংবাদ প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে এই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। নিউজপ্রিন্টের অভাবে কতকগুলো পত্রিকা বন্ধ হয়েছিল সঠিকভাবে সে তথ্য জানা না গেলেও একটি পত্রিকা বন্ধের খবর পত্রিকা মারফত জানতে পারা যায়। নিউজপ্রিন্টের অভাবে ৩১ জুলাই দৈনিক 'নবজাত'-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। নিউজপ্রিন্ট সংক্রান্ত সর্বশেষ সরকারি ব্যবস্থাই এর কারণ। উল্লেখ্য যে, দৈনিক নবজাতকে নিউজপ্রিন্টের কোন কোটা দেয়া হয়নি। কাজেই বাজার হতে নিউজপ্রিন্ট ক্রয় করে পত্রিকা ছাপানো হতো। কিন্তু সরকারি আদেশ অনুযায়ী কেউ বাজার হতে নিউজপ্রিন্ট ক্রয় বা সাময়িকভাবে ধার করার বিধান ছিল না। ফলে দৈনিক নবজাতের প্রকাশনা বন্ধ হয়। *(সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ আগস্ট, ১৯৭৪)*

জুলাই মাসে সরকার মওলানা ভাসানীর সাপ্তাহিক 'প্রাচ্যবার্তার' সম্পাদক ফজলে লোহানীকে গ্রেফতার করে। এই সময় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'ইস্টার্ণ একজামিনার' পত্রিকা সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক কৃতকর্মের আওতায় পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ-১৯৭৪ জারির ফলে সরকার নিউজপ্রিন্টের সরবরাহ কমিয়ে দেন, বরাদ্দ হ্রাস করেন এবং বই-পুস্তকে নিউজপ্রিন্ট ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। সরকারের এই হটকারিতার জন্য দৈনিক ইত্তেফাকের ১৯ নভেম্বর সংখ্যা এক রিপোর্টে দেখা যায়, 'নিউজপ্রিন্ট মিলে ৪৬ লাখ টাকার নিউজপ্রিন্ট অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে আছে।'

২০ নভেম্বর সংসদে সদ্য জারিকৃত অর্ডিন্যান্সের সাথে আরো বিষয়াদি যুক্ত করে বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের সমালোচনা, বিরোধিতা ও ওয়াকআউটের মুখে 'ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ডিক্লারেশন ও রেজিস্ট্রেশন) (সংশোধনী) বিলটি কণ্ঠভোটে পাস হয়। সংশোধিত আইন অনুযায়ী এমনকি অশোভন ও অশ্লীল বা অবমাননাকর মন্তব্য প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিলের ব্যবস্থা ছিল। এর জন্য কোনরূপ কারণ দেখাবার সুযোগ দেবারও প্রয়োজন ছিল না। বস্তুত, এই বিল পাসের মাধ্যমে সংবাদপত্রের যে স্বাধীনতা অবশিষ্ট ছিল, তাকে পুরোপুরিভাবে হরণ করা হয়। বিলটিতে নতুন যে ধারা

www.pathagar.com

সংযোজিত হয় সেখানে বলা হয়, 'যদি কোন সংবাদপত্রে এমন কিছু প্রকাশ করা হয়, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইনের প্রশাসন বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বা কোনো অপরাধ সংগঠনে কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করে অথবা বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে অথবা যে কোন বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রীতির সম্পর্ক বিনষ্টের চেষ্টা করা হয়, তাহলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করতে পারবে।'

১৬ ডিসেম্বর সর্বহারা পার্টির নেতা সিরাজ সিকদারের উপর সাপ্তাহিক 'অভিমত' একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করলে সরকার সম্পাদক আলী আশরাফের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে। ডিসেম্বর মাসে দেশে জারি হয় জরুরি আইন। এই আইনে অসংখ্য ধারা-উপধারা সন্নিবেশিত হয়। যেমন-

(ক) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কলামে কিছু ছাপানো যাবে না,
(খ) দুর্নীতি সম্পর্কে কোন সংস্থার বিরুদ্ধে কিছু ছাপা যাবে না,
(গ) মিছিল সভা (যদি সরকার সমর্থক না হয়) সম্পর্কে কিছু ছাপা যাবে না,
(ঘ) দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে কোন সংবাদ ছাপানো যাবে না,
(ঙ) অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে কোন কিছু ছাপানো যাবে না,
(চ) থানা লুট, পিটিয়ে মারা সম্পর্কে কিছু ছাপানো যাবে না,
(ছ) দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কিছু ছাপানো যাবে না,
(জ) সীমান্তে পাচার সম্পর্কে কিছু ছাপানো যাবে না,
(ঞ) কোন রিলিফ সংস্থার বিরুদ্ধে কোন কিছু ছাপানো যাবে না,
(ট) কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করা যাবে না,
(ঠ) পুলিশ বাহিনী বা রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে কোন কিছু ছাপানো যাবে না,
(ড) শ্রেণী বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এমন কিছু ছাপানো যাবে না,
(ঢ) সরকারের কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা যাবে না,
(ণ) প্রতিরক্ষা সম্পর্কে কোন কিছু ছাপানো যাবে না'।

এই আইনে লিখিত ছাড়াও অলিখিত নির্দেশ ছিল অসংখ্য। আইনের ধারাগুলো না মানলেও চরম দণ্ড দেয়ার বিধান ছিল। ফলে সাংবাদিকদের 'চামড়া বাঁচিয়ে' চলতে হয়েছে এবং এজন্য তাদের ধিক্কারও শুনতে হয়েছে। 'চামড়া বাঁচিয়ে' চলার নীতির পাশাপাশি কোন কোন সাংবাদিক সরকারের তল্পীবাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এজন্যই এরা সহকর্মীদের নিকট থেকে পেয়েছিলেন কদমবুসি সম্পাদক সংক্ষেপে কে.বি সম্পাদক' ও 'হেঁ হেঁ' সাংবাদিক এর খেতাব।

২৭ জানুয়ারি ১৯৭৫ শেষবারের মতো গণকণ্ঠের প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং একই সাথে গণকণ্ঠে মুদ্রক প্রতিষ্ঠান ৪৫৩ নং বড় মগবাজারস্থ 'শতাব্দী প্রিন্টিং পাবলিকেশন্স এন্ড প্যাকেজেস ও 'সিজ' করে দেয় পুলিশ। *(সূত্র ঃ দৈনিক বাংলার বাণী, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৭৫)*

দৈনিক গণকণ্ঠ আর প্রকাশ রাতে না দেয়া হলেও আল মাহমুদকে প্রায় এক বছর কারাভোগের পর ৯ মার্চ মুক্তি দেয়া হয়। *(সূত্র ঃ দৈনিক বাংলা, ১০ মার্চ, ১৯৭৫)*

১৩ জুন The newspaper (Annulment of Declaration) Ordinance, ১৯৭৫ জারি করা হয়। অধ্যাদেশটির বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

The Bangladesh Gazette
Extraordinary

www.pathagar.com

Published by Auuthority

Friday, June 13,1975

Government of the Peoples Republic of Bangladesh Ministry of Law, Parliamentary Affairs and Justice (Law and Parliamentary Affairs Division)

Notification

Dacca, the 13 th June, 1975

No. 421 Oub. The Following Ordinance made by the President of the People's Republic of Bangladesh on the 13th June, 1975 is hereby published for general information- The Newspapers (Annulement of Declaration) Ordinance, 1975.

Ordinance No. XXXIII of 1975

An

Ordinance

to annual the declaration of certain newspapers

WHEREAS it is expedient in the public interest to annul the declaration of certain newspapers:

AND WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render immediate action necessary Now, THEREfore, in exercises of the powers conferred by clause (I) of rule 93 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, the President is pleased to make and promulgate the following ordinance :-

1. Short title and commencement – (1) This ordinance may be called the Newspapers (Annulment of Declaration) Ordinance, 1975, (2) It shall come into force on the 17th day of Jun, 1975.

2. Annulment of Declaration of certain newsppapers- Notwithstanding any thing contained in the printing presses and publications (Declaration and registration) Act, 1973 (XXIII) of 1973) hereinafter referred to as the Act), of in any other law for the time being in force-

(a) The declaration made and subscribed under the said Act in respect of any newspaper, except the newspapers mentioned, stand annuled; and

(b) After the commencement of this ordinance, no declaration under the said Act for the printing and publication of any newspaper shall be made and subscribed except by or on behalf of the government or with the premission of the government which may be granted subject to such conditions as it may deem necessary in the public interest to impose.

3. Cancellation of declartion for breach of conditions- Where a declaration is respect of newspaper has been made with permission inder section 2 (b), the government may, by order, cancel the declaration for the

www.pathagar.com

breach of, or failure to comply wity, any condition subject to which the premission was granted

Dacca: The 13th June, 1975

Sheikh Mujibur Rahman
President

Justice M. H. Rahman
Secretary

শেখ মুজিব বাকশাল কায়েমের পর ১৬ জুন সংবাদপত্র (ডিক্লারেশন বাতিল) অর্ডিন্যান্স-এর আওতা প্রথমে মাত্র সরকারি মালিকানাধীন দৈনিক বাংলা ও The Bangladesh Observer পত্রিকাকে রাখা হয়। এরপর এই আইনের বলে দৈনিক ইত্তেফাক ও Bangladesh Times-এর মালিকদের ডিক্লারেশন বাতিল করে সে দু'টি পত্রিকাও সরকারি মালিকানায় নিয়ে আসা হয়। এভাবে মাত্র ৪টি সরকারি দৈনিক সংবাদপত্র রেখে আর সব দৈনিকের ডিক্লারেশন বাতিল করে দেয়া হয়। অর্ডিন্যান্সে ১৭ জুন হতে দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক বাংলা এবং দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস-এই চারটি দৈনিক প্রকাশের কথা ঘোষণা করা হয়। নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী, ওবায়দুল হক, শেখ ফজলুল হক মনি ও এহতেশাম হায়দার চৌধুরী যথাক্রমে দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশ অবজারভার, বাংলাদেশ টাইমস ও দৈনিক বাংলার সম্পাদক নিযুক্ত হন। জারিকৃত অর্ডিন্যান্সের আওতায় ২২২টি সংবাদপত্রের প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। সরকার আরো ১২২টি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার ডিক্লারেশন বহাল রাখেন। যে ইত্তেফাকের জন্মই হয়েছিল আওয়ামী লীগকে সমর্থনের জন্য এবং তাদের ক্ষমতায় আরোহণের পেছনে যে পত্রিকার অবদান সর্বাধিক, সেই ইত্তেফাকের প্রায় দু'যুগের ইতিহাস মুছে ফেলে আওয়ামী-বাকশালী সরকারের নির্দেশে ১ম পৃষ্ঠায় লিখতে হয়েছিল '১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা'।

সংবাদপত্র অর্ডিন্যান্স জারি করে বলা হয়, 'সরকার ইদানীং লক্ষ্য করছে দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা সংবাদপত্রগুলো দেশের স্বাধীনতাবিরোধী সব শক্তিগুলোর সাথে আঁতাত করে সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের উস্কানি দিচ্ছে। মিথ্যে, বানোয়াট ও অতিরঞ্জিত গল্প ফেঁদে জনগণের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। সেই সঙ্গে জনগণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। তাই দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

গণতন্ত্রের কথা বলে শেখ মুজিব ক্ষমতায় এলেন, কিন্তু ক্ষমতাসীন হয়েই সেই গণতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটালেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমদ লিখেছেন (সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন, দৈনিক জনকণ্ঠ ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১), 'এরই মধ্যে ১৬ জুন সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সংবাদপত্রের ব্যাপারে শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ঘোষণার নাম "নিউজ পেপার ডিক্লারেশন এনালমেন্ট অর্ডিনেন্স"। এর আওতায় দেশের মাত্র ৪টি দৈনিক পত্রিকা থাকল সরকারি নিয়ন্ত্রণে, ইত্তেফাক, অবজারভার, দৈনিক বাংলা আর বাংলাদেশ টাইমস। আর সব কাগজ বিলুপ্ত। বিএসএস বার্তা সংস্থাও থাকল। ইত্তেফাক ও টাইমস সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেয়া হলো। অবজারভার আর দৈনিক বাংলাতো ছিল পরিত্যক্ত সম্পত্তি। যেসব কাগজ বন্ধ হলো সেগুলোর সব সাংবাদিক-কর্মচারীর চাকরি সরকারে ন্যস্ত হলো। চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত ভাতা দেয়ার বিধান রাখা হয়। সাংবাদিকদের সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্য গিয়াস কামাল চৌধুরী, আজাদী সম্পাদক অধ্যাপক খালেদ এবং আরো কয়েকজনকে নিয়ে একটি কমিটি হলো। দেশে ভিন্নমতের সর্বশেষ বাহন শেষ হয়ে গেল। এক দল নিয়ন্ত্রিত বিচারব্যবস্থা আর চারটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে গণতন্ত্রের অবসান হলো।' -০-

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের পতন

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা মাত্র সোয়া ২ মাস আগে ৭ জুন শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল কেন্দ্রীয় কার্যালয় (বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্ম এ্যান্ড পাবলিকেশন্স-এর পুরনো ভবন) দাঁড়িয়ে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করেন। এদিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দীর্ঘ ৬ ঘণ্টাব্যাপী শেখ মুজিব সেই ভবনের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক-শুভাকাঙ্ক্ষিদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার জবাব দেন হাত নেড়ে। কাউকে আবার হাত ইশারায় দোতলায় ডেকে নিয়ে যান। আগত মানুষ মিছিল সহকারে ফুলের স্তবক, বরমাল্য প্রভৃতি নিয়ে আসছিলেন। অল্প কয়েকজন ছাড়া প্রায় সবাই সেই বাকশাল ভবনের সামনে একটি অস্থায়ী বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। ভাগ্যবান কয়েকজনকে দোতলায় নিয়ে পুষ্পমাল্য গ্রহণ করেন। সেদিনের সেই বৃষ্টি-কাদা মাড়িয়ে আসা হাজার হাজার নারী-পুরুষের উৎফুল্ল হর্ষধ্বনি শ্লোগান না দেখলে বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব। ৬/৭ ঘণ্টা ফুল জমতে জমতে বেদীটি একটি বিশাল পুষ্প পাহাড়ে পরিণত হয়।

২০ জুলাই বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ কুমিল্লা পৌরসভা মিলনায়তনে এক সভায় বলেন, 'বাকশাল পদ্ধতি জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্বের যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য নবদিগন্তের উম্মোচন করবে।'

শেখ মুজিবুর রহমান ২১ জুলাই বঙ্গভবনে জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন। শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বলেন (দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবর): 'নতুন ব্যবস্থার সুফল জনগণের দ্বারে পৌঁছাইতে হবে।' তিনি আরো ৪টি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন। ১. দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ চাই, ২. প্রতিটি জেলায় একটি করে বিশেষ সমবায়, ৩. থানা পর্যায়ে বিচারের সুযোগ, ৪. বাংলাদেশ উপমহাদেশে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন।

২৩ জুলাই ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবর, 'বন্যা পরিস্থিতির ক্রমোন্নতি, তবে রংপুর ও সিলেটে বন্যার আশঙ্কা রয়েছে।' ২৪ জুলাই ইত্তেফাকে প্রকাশিত সংবাদ 'বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য (সাবেক ন্যাপ নেতা) সৈয়দ আলতাফ হোসেন রেলওয়ে বিভাগের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন।' ২৫ জুলাই ইত্তেফাকে খবর প্রকাশিত হয়, 'বিধিবদ্ধ এলাকার বাইরে রেশনিং ব্যবস্থা সম্প্রসারণ। প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য মাসে ৩৫ সের গম'। এ ঘোষণা দেন খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল মোমেন। ২৬ জুলাই হবিগঞ্জের জেলা গভর্নর মোস্তফা আলী এমপি ইন্তেকাল করেন।

২৯ জুলাই ইত্তেফাকে ছাপা হয়, 'সিলেট ও চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত। সংসদ সদস্য মানিক চৌধুরীকে হবিগঞ্জের নতুন জেলা গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছে।' ৭ থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত অবৈধ অস্ত্র জমাদানের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

৩ আগস্টে ইত্তেফাকে ছাপা হয়, 'বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ ইসলামিক একাডেমী মিলনায়তনে চাঁদপুর জেলা সমিতির সংবর্ধনা সভায় ভাষণে জনগণের প্রতি সততা ও নিষ্ঠার সাথে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।'

৩ আগস্ট বাকশালের ৬১ জেলা সাধারণ সম্পাদক ও ৫৯ জেলার যুগ্ম সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হয়। ৬ আগস্ট ইত্তেফাকের প্রধান সংবাদ শিরোনাম ছিল, 'ওয়াগন

www.pathagar.com

ভাঙ্গিয়া ব্যাপকহারে খাদ্য পাচার'। ৭ আগস্ট সমাজতান্ত্রিক ব্যাংকিং সম্পর্কে ধারণা লওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর একেএন আহমদের নেতৃত্বে একটি ব্যাংকার প্রতিনিধি দল মস্কোর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। ৮ আগস্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান।

১৩ আগস্ট জাতীয় শ্রমিক লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রম, সমাজকল্যাণ, সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামন্ত্রী এম ইউসুফ আলী বঙ্গভবনে নব নিযুক্ত জেলা গভর্নর ও ম্যাজিস্ট্রেটদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'নতুন পরিস্থিতির আলোকে শ্রমনীতির খসড়া প্রণীত হয়েছে, প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের পরেই তা প্রকাশ করা হবে।' বঙ্গভবনে প্রশিক্ষণ গ্রহণরত বাকশাল জেলা গভর্নরদের উদ্দেশ্যে একই দিনে ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় তিন জন সম্পাদক যাদের অবস্থান ছিল সাধারণ সম্পাদক প্রধানমন্ত্রী এম মনসুর আলীর পরই। এই তিন সম্পাদক ছিলেন জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মনি ও আব্দুর রাজ্জাক। তাদের বক্তব্যের শিরোনাম ছিল, 'প্রভু নয়, সেবক হিসেবে কাজ করুন'- জিল্লুর রহমান, 'সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বস্তুনিষ্ঠ পরিবেশন করতে হবে'-শেখ ফজলুর হক মনি, 'ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য নিজেদের গড়িয়া তুলুন'-আব্দুর রাজ্জাক।' *(সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ আগস্ট, ১৯৭৫)*

পুঁথিঘর ও মুক্তধারা প্রকাশনীর মালিক চিত্ত সাহা ১৪ আগস্ট রাতে ৭৪ নম্বর ফরাশগঞ্জে তার প্রকাশনা ভবনে ৬১ জন জেলা গভর্নরের সম্মানে এক জমকানো ব্যয়বহুল নৈশভোজের ব্যবস্থা করেন। এটা ছিল মুজিব সরকারের আমলের সর্বশেষ বড় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে তিন কেবিনেট মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ৬১ জন জেলা গভর্নরের ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন। ভোজে ছিল বিশালাকার রুই, চিতল, মুরগী, খাসির মাংস। ঐ সময়কার বাজারের দর অনুযায়ী জনপ্রতি ১ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হয়েছিল। রান্না করা খাবারের ৩০ ভাগও অতিথিগণ খেতে সক্ষম হননি।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল মতিন চৌধুরী রাত প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পরের দিন (১৫ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চ্যান্সেলরের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদানের বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সব তৎপরতা নিয়ে আলোচনা করেন। তবে প্রেসিডেন্টের প্রধান নিরাপত্তা অফিসার মহিউদ্দিন কিছুটা চিন্তিত ছিলেন। ইতিমধ্যে বাজারে গুজব ছড়িয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলর আক্রান্ত হতে পারেন। রাত সাড়ে ১০টার কিছু পরে মহিউদ্দিন বঙ্গভবন ছাড়েন।

১৫ আগস্ট সকালে কথা ছিল প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিদর্শন করবেন। দৈনিক ইত্তেফাক-এর ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সংখ্যাটি ছাপা হয়, যদিও তা ইত্তেফাক অফিস থেকে আর বাইরে বেরোতে পারেনি। সংবাদটি ছিল, 'চ্যান্সেলর হিসেবে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রথম আজ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন। বঙ্গবন্ধু প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে শহীদ শিক্ষকদের মাজার জিয়ারত ও পুষ্পমাল্য অর্পণ করবেন। পরে তিনি কলাভবন প্রাঙ্গণে ইউওটিসি সদস্যদের কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করবেন। সেখান থেকে তিনি যাবেন বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে। এরপর তিনি যাবেন সমাজবিজ্ঞান পরিষদের যাদুঘর পরিদর্শনে (মুজিবের বড় পুত্র শেখ কামাল সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন), পরের কর্মসূচি হচ্ছে জগন্নাথ হল মাঠে শহীদদের

www.pathagar.com

গণকবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ। সেখান থেকে তিনি যাবেন সায়েন্স অ্যানেক্স ভবনে ডাটা প্রসেসিং ইউনিট পরিদর্শনে। বিজ্ঞান ভবন ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগও তিনি পরিদর্শন করবেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে শিক্ষক ও কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। এই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বাকশালে যোগদানের আবেদন সম্বলিত গণস্বাক্ষর পত্র পেশ করা হবে দলের চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধুর কাছে। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী, শিক্ষামন্ত্রী ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ থাকবেন।'

১৫ আগস্টের ইত্তেফাকে আরেকটা খবরের সার সংক্ষেপ হলো, 'বঙ্গবন্ধু আগামীকাল (১৬ আগস্ট) বিকেলে গণভবনে নব নিযুক্ত জেলা গভর্নরগণ (৬১ জেলার ৬১জন গভর্নর) ও বাকশাল জেলা সম্পাদকদের সাথে বৈঠকে মিলিত হবেন। এ অনুষ্ঠানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং পুলিশ সুপারগণ উপস্থিত থাকবেন।'

প্রেসিডেন্টের ক্যাম্পাস পরিদর্শনের ব্যাপারটি নিয়ে শিক্ষক কর্মকর্তাদের প্রগতিবাদী ও মুক্ত চিন্তার অনুসারীদের মধ্যে যথেষ্ট আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। বাকশালে সদস্যপদ গ্রহণে অসম্মত পেশাদারদের মধ্যে চাকরি ও জানমালের নিরাপত্তা প্রশ্নে ভয়ানক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশাল অংশই বাকশাল চেতনার বিরোধী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আব্দুল মতিন চৌধুরী ও তার কিছু সমর্থক শিক্ষক মুজিবকে ক্যাম্পাসে এনে এসব শিক্ষকদের বাকশালে যোগদানের ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হন। বাকশালবিরোধী শিক্ষকদের নীতিচ্যুত করার প্লান করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ক্যাম্পাসে আসছেন এই ভয়েই সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতো স্বনামধন্য শিক্ষকও বাকশালে যোগদানের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন।

১৫ আগস্টের ভোরে ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে ভোর পাঁচটায় বিদ্রোহী মেজরদের পক্ষের অভ্যুত্থানকারী সৈন্যরা মুজিবের প্রধান নিরাপত্তা রক্ষী ও অন্য এক রক্ষীকে গুলি করে হত্যা করে এবং অন্য নিরাপত্তা রক্ষীদের নিরস্ত্র করে। *(সূত্রঃ '৭৫'র পনের আগস্ট, মেজর মোখলেছুর রহমান)*

আক্রমণের বিরুদ্ধে মুজিব পুত্র সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন শেখ কামাল কয়েকজন নিরাপত্তা রক্ষী নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এ প্রতিরোধের মুখে অভ্যুত্থানকারীদের ২ জন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। সেই সময়ই শেখ কামাল ও অন্য একজন নিরাপত্তা রক্ষী নিহত হন। মেজর মহিউদ্দিন ও মেজর বজলুল হুদা মুজিবকে দোতলা থেকে নেমে আসতে বলেন, তিনি অভ্যুত্থানের বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং কিছুক্ষণ বিদ্রোহী দুই অফিসারের সাথে বিতণ্ডা করেন। মুজিব তাদেরকে সিনিয়র অফিসারদেরকে তার সামনে আনতে বলেছিলেন এবং আরো বলেছিলেন, 'সেনাবাহিনী যদি দেশ চালাতে পারে ক্ষমতা নিয়ে নিক, আমি হস্তান্তর করবো, তবে তোমাদের কাছে নয়। তোমাদের সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে এসো।'

এরই মধ্যে মুজিব নিজে টেলিফোনে কথা বললেন বেশ কয়েকজনের সঙ্গে। কেউ কেউ তাকে টেলিফোন করেন। সেনাবাহিনী প্রধান এম শফিউল্লাহ, প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী তোফায়েল আহমদ (রক্ষীবাহিনী পরিচালনার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব তার হাতে ছিল), সামরিক সচিব কর্নেল জামিল এবং আরো কোন কোন ব্যক্তির সাথে মুজিবের কথা হয়। মুজিব আক্রান্ত হওয়ার কথা বলে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। কিন্তু কেউ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণে সফল হননি। কেবল সামরিক সচিব কর্নেল জামিল ঝুঁকি নিয়ে মুজিবের

www.pathagar.com

বাসভবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তার জীপের ভিতরেই সোবহানবাগের মসজিদের কাছে নিহত হন বিদ্রোহী সৈন্যদের গুলিতে। প্রায় আধা ঘণ্টার বেশি সময় ধরে মুজিব বিভিন্ন স্থানে টেলিফোন করে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে ৫-৪০ মিনিটের দিকে রিসালদার মোসলেম উদ্দিনের আগ্নেয়াস্ত্র 'বাস্ট অব ফায়ারে' শেখ মুজিবুর রহমান লুটিয়ে পড়েন সিঁড়ির ওপরে। মুজিব নিহত হওয়ার পর বিদ্রোহী সেনারা একে একে বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, শেখ জামাল, দুই পুত্রবধূ, শেখ রাসেল, শেখ নাসেরকে হত্যা করে।

মুজিবের ভগ্নিপতি ও মন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ও তার পরিবারের অন্যান্য কয়েকজনকে মন্ত্রীপাড়ার বাড়িতে এবং বাকশাল সেক্রেটারী শেখ ফজলুল হক মনি এবং তার স্ত্রী বেগম আঞ্জুমানকে তাদের ধানমণ্ডির বাড়িতে 'বাস্ট অব ফায়ারে' হত্যা করা হয়। তিনটি বাড়িতে মুজিবের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, মেহমান, নিরাপত্তারক্ষী ও কর্মচারী মিলিয়ে মোট ৩১ জন নিহত হয় বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে দাবি করা হয়।

মেজর মোখলেছুর রহমানের 'পঁচাত্তরের পনের আগস্ট' গ্রন্থে বলা হয়, 'বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর কমান্ডাররা দ্রুত বেতার ভবনে আসেন। পরিকল্পনা মোতাবেক মেজর মহিউদ্দিন বেতার দখল করেন। মেজর ডালিম ভোর ৬টা ১ মিনিটে ঘোষণা করলেন, আমি মেজর ডালিম বলছি-স্বৈরাচার শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। জননেতা খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে। সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল এম শফিউল্লাহ স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছেন। তার জায়গায় সেনাপ্রধান নিয়োজিত হয়েছেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) পিএসসি, তিন বাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা হয়েছে ব্রিগেডিয়ার খলিলুর রহমানকে এবং তাকে মেজর জেনারেল পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।'

ডালিমের এ ঘোষণা অবশ্য সকাল ৭টা ১০ মিনিটের আগে অধিকাংশ লোক জানতে পারেনি। আগামাসি লেন থেকে খন্দকার মোশতাক আহমদকে রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা কেন্দ্র (যা অভ্যুত্থানের আগে বাংলাদেশ বেতার নামে পরিচিত ছিল) সেই সকালে নিয়ে আসা হয়। তারপর সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ, বিমানবাহিনী প্রধান এ.কে খন্দকার ও নৌবাহিনী প্রধান এম.এইচ খান আসেন সেখানে। আরো আসেন বাংলাদেশ রাইফেলসের মহাপরিচালক খলিলুর রহমান, পুলিশের আইজি নূরুল ইসলাম ও রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লেঃ কর্নেল আবুল হাসান খান (রক্ষীবাহিনীর পরিচালক কর্নেল নূরুজ্জামান খান তখন বিদেশে)। সবাই নিজ নিজ বাহিনীর পক্ষ থেকে খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানান এবং নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এসব কিছু রেডিও মারফত দেশবাসী জানতে পারেন। পরের দিন দৈনিক পত্রিকায়ও সেসব প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় সাংবাদিক রিয়াজ উদ্দিন আহমদ লিখেছেন, 'হিমালয়ের পতন ॥ ১৫ আগস্ট সকাল বেলা আমার ছোট শ্যালিকা ইয়াসমিন দৌড়ে আমার ঘরে ঢুকে কী যেন বলল। বুঝতে পারিনি। ঘুমের ঘোরের মধ্যে ছিলাম। একটু পরেই আমার এক মামা শ্বশুর এসে বললেন, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠলাম। মনে হলো এ যেন হিমালয়ের পতন। খুব দুঃখ লাগল তাঁর মৃত্যুর জন্য। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তাই তাঁর মৃত্যুর খবরে মনটা ভারাক্রান্ত হলো। কিন্তু অনেকেই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে আবার বহুদলীয় গণতন্ত্র হবে,

www.pathagar.com

কাগজ বের হবে ভেবে আশ্বস্থ হলো, এবার অখণ্ড একদলীয় শাসনের অবসান হবে। অবশ্য তখনও জানি না ঢাকায় কী ঘটছে। রেডিওতে খবর শুনলাম মোশতাক সাহেব রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। আওয়ামী লীগের লোকজন নিয়েই মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। চট্টগ্রামে কার্ফ্যু ছিল। কিন্তু রাস্তায় মানুষের ঢল। কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই। অথচ মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করতে গেলে বঙ্গবন্ধুকে এক নজর দেখার জন্য রাস্তার পাশে ছিল অসংখ্য লোকের ভিড়, দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতিযোগিতা। কিন্তু এতবড় ঘটনার পর তাদের কাউকে আর কোথাও দেখা গেল না। পরের দিন ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। ট্রেনে উঠেই কামরায় দেখলাম বসে আছেন তাহের উদ্দিন ঠাকুরের একান্ত সচিব মোহাম্মদ আলী এবং তদানীন্তন ডিআইজি হাবিবুর রহমান। হাবিবুর রহমানকে চিনতাম। চিত্রালীর সম্পাদক মরহুম সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ ও বাংলাদেশ টাইমসের একজন সম্পাদক সৈয়দ আলম চৌধুরী বেবী ভাইয়ের বন্ধু ছিলেন তিনি। সেই সূত্রেই পরিচয়। ট্রেনে বসে তার সাথে অনেক কথা হলো। বাংলাদেশে এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল অথচ চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত কোথাও কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখা গেল না।' *(সূত্রঃ সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯)*

হত্যা কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না-তা ব্যক্তিবিশেষ হত্যা হোক আর গণতন্ত্র হত্যা হোক। প্রতিটি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে; হত্যার পরিণতি হত্যা, খুন করলে রাষ্ট্র তাকে হত্যা করে-খুনীর ফাঁসি হয়। গণতন্ত্র হত্যা করলে গণতন্ত্রকামীরা তাকে হত্যা করে-ইতিহাসে তার নজির আছে। বিশ্বের সর্বত্র গণতন্ত্র হত্যাকারী নিন্দিত। তাই বোধ হয় শেখ মুজিব হত্যার পর কেউ প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেনি।

-০-

www.pathagar.com

মুজিবের পতনের পর আর্ন্তজাতিক প্রতিক্রিয়া

মার্টিন উলাকট, গার্ডিয়ান, লন্ডন, ১৬ই আগস্ট, ১৯৭৫

সামরিক অভ্যুত্থানের বিস্তারিত খবর স্পষ্ট না হলেও এর কারণ মোটামুটি সুস্পষ্ট। শেখ মুজিবের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কারসাজি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। একমাত্র বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মুজিবের প্রখ্যাত রাজনৈতিক দক্ষতা এ তীব্র অসন্তোষ অনুধাবন করতে কিংবা তা নিষ্ক্রিয় করতে সহায়ক হয়নি। মুজিবের মৃত্যুর নির্মম পরিহাস এই যে, পাকিস্তানিরা তাকে হত্যা করেনি, তার দেশবাসীই তাকে হত্যা করেছে। এতে বুঝতে পারা যায়, কত দ্রুত বাংলাদেশ আশার উচ্চ শিখর থেকে হতাশা ও নৈরাশ্যের অতল গহ্বরে নেমে এসেছে, যার ফলে এই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। এর জন্য বহুলাংশে দায়ী মুজিব নিজে। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র চলাকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুজিব কোনো সংস্কার সাধনে এমনকি একটি যোগ্য, সৎ প্রশাসন গড়ে তুলতেও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এবং দেশে কিছুটা প্রগতি আনার জন্য তার শেষ পদক্ষেপই তার পতন ডেকে এনেছে। বামপন্থী আদর্শে তিনি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সেনাবাহিনী তার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। অথচ তাদের সমর্থনেই তিনি প্রথম ক্ষমতায় এসেছিলেন। গত বছরের মাঝামাঝি মুজিব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার সরকার দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। শোচনীয় জীবনযাত্রার মান আরো শোচনীয় হয়ে পড়েছে। সপ্তাহে গড়ে সাতটি করে রাজনৈতিক খুন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। আর দেশে ব্যাপক দুর্নীতি চলছিল, যার জন্য মুজিব ও তার পরিবারকে দায়ী করা হতো। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরে স্বাধীনতার পর থেকে ১২ হাজার মিলিয়ন পাউন্ড বিদেশি সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির অবক্ষয় কমেনি। কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের কারসাজিতে দেশের কৃষিনীতিও পঙ্গু হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আওয়ামী লীগের চাঁই। এ অবস্থায় মুজিব নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজতে ছিলেন। তাতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য মস্কোপন্থী দলগুলো উৎসাহ যুগিয়েছে। গত বছর ডিসেম্বর মাসে মুজিব দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। এ বছর জানুয়ারি মাসে তিনি শাসনতন্ত্র সংশোধন করে কার্যত এক নতুন সংবিধান সৃষ্টি করলেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুজিবের হাতে সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা ন্যস্ত হলো, এমনকি বিচার বিভাগের কর্তৃত্বও। জাতীয় দল ছাড়া আর সব রাজনৈতিক দল বেআইনী ঘোষিত হলো। কয়েক মাস বিশেষ কিছু ঘটেনি। মুজিব মধ্যযুগীয় নৃপতির মতো অফিসে দরবারে বসতেন, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতেন, গল্প বলতেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের বিদায় করতেন। তার নতুন মন্ত্রিসভায় পুরানো মন্ত্রীরাই ছিলেন। দু'একজন প্রকৌশলীকেও নেওয়া হয়েছিল। মে মাসে মুজিব ঘোষণা করলেন যে, গ্রামে গ্রাম বাধ্যতামূলক কৃষি সমবায় গঠন করা হবে, গ্রামাঞ্চলে প্রশাসনিক পরিবর্তন করা হবে এবং জাতীয় দল গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। সংক্ষিপ্ত হলেও এ কর্মসূচি আওয়ামী লীগ, সেনাবাহিনী, পেশাদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেককেই আতঙ্কিত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, মুজিব তার বরাবরের সমর্থকদের যেমন– পেশাদার, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাদ দিয়ে কৃষকদের সমর্থন

www.pathagar.com

লাভের প্রয়াস করেছেন এবং আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে এমন একটি দল গঠনের চেষ্টা করেছেন যা তার হুকুম অন্যভাবে তামিল করবে। এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠন করে তিনি আমলাতন্ত্রকেও ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন। আগেই বিরোধীদলগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। জুন মাসে সংবাদপত্রগুলোও সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হলো। আওয়ামী লীগের চাঁই ও মন্ত্রীরা বুঝতে পারলেন যে, সম্ভবত তাদেরও দিন ঘনিয়ে এসেছে। আওয়ামী লীগের ঊর্ধ্বতন নেতৃবর্গ মুজিবকে জানতেন। তারা আরো জানতেন কি করে মুজিব একে একে দলের ভিতরকার বিরোধী গ্রুপগুলোকে ধ্বংস করেন। ফেব্রুয়ারি মাসেই আওয়ামী নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, নতুন মন্ত্রিসভা একটি সাময়িক 'ব্যবস্থা' মাত্র এবং এর ব্যাপক 'পরিশোধনের' জন্য মুজিব সুযোগের অপেক্ষা করছেন। এসব মন্ত্রীদের একজন হচ্ছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ, যিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে সদ্য ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। ১৯৭১ সালে কলিকাতায় অস্থায়ী বাংলাদেশের তিনি বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন। খন্দকার ডানপন্থী বলে পরিচিত। সহকর্মী তাজউদ্দিনের ভাগ্য বিপর্যয় থেকে হয়ত তিনি ছবক নিয়েছিলেন। তাছাড়া আদর্শগত প্রশ্নও ছিল। মুজিব নতুন জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনেক মস্কোপন্থী রাজনীতিবিদকে স্থান দিয়েছিল। ফলে আওয়ামী লীগের ভিতরে ও বাইরে প্রাচীনপন্থী মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, নতুন শাসকরা বাংলাদেশকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করেছেন। সর্বোপরি, স্বাধীনতার পর থেকেই মুজিব সেনাবাহিনীকে আঘাত করে আসছিল। শুরু থেকেই ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনীর অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। রক্ষীবাহিনী একই সঙ্গে প্রেসিডেন্টের প্রহরী, গোয়েন্দা-পুলিশ ও বিকল্প সেনাবাহিনী ছিল। আয়ারল্যান্ডের ব্ল্যাক এন্ড টেন্স ও জার্মানির ব্রাউন শার্টের সঙ্গে এদের তুলনা করা যায়। ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীতে ভারতীয় উপদেষ্টা ছিল। এর পরেও রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা ট্রেনিং-এর জন্য ভারতের দেরাদুনে যেত। রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা ২০ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্য ছিল আরো অনেক বেশি। রক্ষীবাহিনীর সংখ্যার জন্য নয়, যেভাবে সরকার তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাত তাতেই সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়েছিল। প্রচুর টাকা খরচ করা হতো রক্ষীবাহিনীর ব্যারাক তৈরি করার জন্য। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের বেশিরভাগই পেত রক্ষীবাহিনী। আর সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট থাকতে হতো সেকেলে অস্ত্রপাতি নিয়ে। রক্ষীবাহিনীকে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল-এ সজ্জিত করার আলাপ-আলোচনা চলছিল। অথচ সেনাবাহিনীর হাতে পুরনো ৩০৩ রাইফেলের বেশি কিছু নেই। সামরিক অভ্যুত্থানে রক্ষীবাহিনীর ভূমিকা স্পষ্ট নয়। যদি তারা সমর্থন করে থাকে-হয়ত করেছে তা এজন্যে যে, রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের অনেকেই সেনাবাহিনীর ভূতপূর্ব অফিসার এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে একমত হয়েছেন যে, দেশে একটিমাত্র সামরিক বাহিনী থাকবে। যেভাবেই হোক, রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অসন্তোষই হচ্ছে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ এবং এক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আর এক সেনাবাহিনী গঠন করে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার যে নীতি মুজিব গ্রহণ করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছে।

দ্যা টাইমস, ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫

সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হয়েছেন বলে ঢাকা রেডিও সরকারিভাবে ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করার ক্ষেত্রে শেখ মুজিবই প্রাথমিকভাবে দায়ী ছিলেন ঠিক

www.pathagar.com

সেভাবে সে ব্যবস্থা ভেঙ্গে এ বছরের শুরুতে একদলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি চালু করার ব্যাপারেও প্রাথমিকভাবে তিনিই দায়ী। তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং তার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার কারণে সবচেয়ে কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, অদক্ষতা ও প্রশাসনে ব্যাপক দুর্নীতির কঠোর সমালোচনার মাঝেও তিনি উৎরে গেছেন। তিনি সমালোচনার মোকাবেলা করেছেন, নিজ হাতে ক্ষমতাকে আরো কেন্দ্রীভূত করে এবং কার্যকরভাবে সরকার পরিচালনায় পদক্ষেপ হিসেবে কর্তৃত্ববাদী প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। বাংলাদেশে সংবাদপত্রে সমালোচনা রোধ করা হয়েছিল। কিন্তু এটা স্পষ্ট ছিল না যে, ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে তার বিরোধিতা কত প্রবল হয়েছিল, যা তার পতনে ভূমিকা রাখে। এসব সত্ত্বেও শেখ মুজিবকে স্মরণ করা হবে, যাকে ছাড়া বাংলাদেশ কখনো সৃষ্টি হতো না। ঢাকা থেকে পশ্চিমদিকে এক গ্রামে মধ্যবিত্ত পরিবারে শেখ মুজিব জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পর কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনে পড়াশুনা করেন। ইতোমধ্যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনাসমৃদ্ধ শেখ মুজিব নতুন রাষ্ট্রে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ সংগঠনের নেতৃত্ব দেন। এই তৎপরতার কারণে তাকে ছয় দিনের কারাদণ্ড দেয়া হয়। মুক্তি লাভ করার পর তিনি দেখতে পান যে, তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন এবং পুনরায় গ্রেফতার হয়ে আড়াই বছরের কারাদণ্ড লাভ করেন। তার কারাগারে অবস্থানকালেই তিনি একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। সমগ্র পাকিস্তানভিত্তিক দল মুসলিম লীগ হতে বেরিয়ে আসা বিখ্যাত রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক সরকারে শেখ মুজিব শিল্প মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ার জন্য দায়িত্বশীল ছিলেন, কিন্তু তার মেধা ছিল দলকে সংগঠনে। ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব পাস করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকাই ছিল অধিক। পূর্ব পাকিস্তানকে দেশের বাকি অর্ধেক অংশ অব্যাহতভাবে শোষণ করছে এর বিরুদ্ধে তিনি পূর্ববঙ্গকে মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রকাশ্যে নিজেকে নিবেদন করেন। ১৯৫৮ সালে সেনাবাহিনী পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করার পর শেখ মুজিব নয়া শাসকগোষ্ঠীর জননিরাপত্তা আইনে প্রথম কারাবরণকারীদের একজন ছিলেন এবং তাকে বিনা বিচারে দেড় বছর কারাগারে থাকতে হয়। 'পাঁচ বছরের জন্যে তিনি রাজনীতিতে অংশ নেবেন না'-এ ধরনের মুচলেকা দিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে ১৯৬২ সালে তাকে পুনরায় গ্রেফতার করে ছয় মাস কারাগারে রাখা হয়। কারাগারের বাইরে অবস্থানকালে শেখ মুজিব অব্যাহতভাবে জ্বালাময়ী এবং বিদ্রোহাত্মক বক্তৃতায় পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশবাদী শাসনের অবসান ঘটানোর আহ্বান জানাতেন। ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। সেনাবাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানিরাই ছিল বেশি। পূর্ব পাকিস্তানের যারা ছিল তাদের অনেকে শেখ মুজিবের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। পরবর্তী বছর তিনি ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন, যাতে ১৯৫৪ সালের স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাবের চাইতে আরো ব্যাপক স্বায়ত্তশাসনের কথা ছিল। পাকিস্তান সরকার এরপর তাকে আরেক দফা গ্রেফতার করে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে কারাগার থেকে বের করে তাকে পাঁচ মাস মিলিটারি পুলিশের প্রহরায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা হয়। এরপর আরো পঁয়ত্রিশ জনের সাথে তাকে

www.pathagar.com

একটি সামরিক আদালতে হাজির করা হয়, যা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। অভিযোগ করা হয় যে, তিনি এবং অন্য অভিযুক্তরা ভারতীয়দের যোগসাজশে বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। এই মামলা মুজিবের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে এবং তাকে জাতীয় বীরে পরিণত করে। ছাত্রদের বিক্ষোভে ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পতন ঘটে। তাদের প্রধান দাবি ছিল শেখ মুজিবের মুক্তি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার। শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা যে কি বিপুল পরিমাণ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭০ সালে নতুন গণপরিষদ নির্বাচনে। পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে তার দল ১৬৭টিতে জয়ী হয়ে গোটা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রধানমন্ত্রী এবং পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার আলোকে দেশের সংবিধান প্রণীত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো মুজিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ছয়দফার উপর তার দৃঢ় অবস্থান এবং প্রেসিডেন্ট ও তার মধ্যে আলোচনা মতৈক্য না হওয়া এবং পাকিস্তানে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতিতে ভুট্টো এবং অন্যান্যের চাপে ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগকে দমন করার জন্য। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বিশৃঙ্খলা দমন করে সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু উদ্ভুত পরিস্থিতিতে লাখ লাখ শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়। বিক্ষুব্ধ বিশ্ব জনমত এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে ভারতীয় অভিযানে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হয়। এসব ঘটনার সময় শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানের এক দুর্গে আটক রাখা হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার পর শেখ মুজিবকে তার অনুপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারতের সাথে যুদ্ধ বিরতির পর ভুট্টো ইয়াহিয়া খানের নিকট হতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবকে তখন গৃহবন্দি অবস্থায় আনা হয় এবং প্রেসিডেন্ট ভুট্টো পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই পূর্ববঙ্গকে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান। শেখ মুজিব পরে বলেছেন যে, গোপন বিচারে তার ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছিল এবং যখন তার কবর খোঁড়া হচ্ছিল তখন একজন দয়াদ্রচিত্ত জেলার তাকে রক্ষা করেন। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিবকে লন্ডনগামী একটি প্লেনে তুলে দেয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকায় ফিরে এলে তাকে অভূতপূর্ব সংবর্ধনা জানানো হয়। ফিরে আসার কয়েকদিনের মধ্যে তিনি প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি অবস্থায় দেখেন দেশকে। নতুন দেশে প্রশাসন বলতে কিছু ছিল না এবং অসংখ্য গেরিলা যোদ্ধা সারাদেশে ছড়িয়ে ছিল। নয়া রাষ্ট্র সৃষ্টির কাজে শেখ মুজিবকে বিপুল জনপ্রিয়তা দিয়েছিল, কিন্তু তার বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল কম। তার রাজনৈতিক দর্শন ছিল বৃটিশ শ্রমিকদলীয় ধাঁচের নমনীয় গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, যার জন্যে তিনি প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। এমনকি তার প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম কয়েক মাসে শেখ মুজিব মারাত্মক খাদ্য সংকটের মোকাবেলার পাশাপাশি সন্তোষজনকভাবে সরকারও পরিচালনা করেন। জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের মত করে সরকার পরিচালনা করতে চাইছিল বলে কাজটা আরো কঠিন হয়ে পড়েছিল। এমনও অভিযোগ ছিল যে, টাইপরাইটারের অভাবে কাজ করা যাচ্ছে না এবং বাইরের কারিগরি ও ব্যবস্থাপনার সহযোগিতা নেয়ার ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা ছিল। ১৯৭৩ সালের মার্চে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে আওয়ামী লীগ একমাত্র দল হিসেবে

www.pathagar.com

আত্মপ্রকাশ করে। গুটিকয়েক আসন ছাড়া আওয়ামী লীগ সর্বত্র জয়লাভ করে। ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি পায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিরোধীদের অস্তিত্ব মুছে যায়। আরেকটি বিজয় শেখ মুজিবের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক সময়ের তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ভুট্টোর সাথে লাহোরের এক মিলন দৃশ্যে তিনি কোলাকুলি করেন। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদিন দু'জনকে কাছাকাছি আনতে ভূমিকা পালন করেন। এই দর্শনীয় বিজয়ের সুখকর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরের মাসে শেখ মুজিব মস্কো গমন করেন চিকিৎসার জন্যে এবং ব্রংকাইটিস চিকিৎসার্থে হাসপাতালে ভর্তি হন। দেশকে আরো সংকটে পতিত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য অক্টোবরের মধ্যে সর্বদলীয় সরকার গঠনের দাবি ওঠে এবং বছর সমাপ্তির পূর্বেই দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা ও নাশকতামূলক তৎপরতা দমনের জন্যে। প্রশাসনে দুর্নীতির বিস্তার সম্পর্কিত অভিযোগ ছিল সর্বব্যাপী। সংবিধানে বিধিবদ্ধ সকল মৌলিক অধিকার যেমন–বাক স্বাধীনতা, হেবিয়াস কর্পাস রহিত করা হয় এবং তখন থেকে দেশকে একনায়কত্বের নিয়ন্ত্রণে নেয়া ছাড়া আর কোন দৃষ্টিভঙ্গি অবশিষ্ট ছিল না। দিল্লী থেকে টাইমসের সংবাদদাতা এ ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন 'গণতন্ত্রের পরীক্ষায় অতি উচ্চাভিলাষী শেখ মুজিবের বিলুপ্তি।' আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যদিও রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে আওয়ামী লীগের তিন হাজার সদস্য নিহত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। নিরাপত্তা বাহিনীও হত্যাকাণ্ডে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

কেভিন রেফার্টি, ফিনানসিয়াল টাইমস, লন্ডন, ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির সূত্রপাত হয় গত বছরের মাঝামাঝি সময়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মুজিব ভারতে ধান, চাউল ও পাট পাচারের বহর দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছিল। অপরদিকে যখন লাখ লাখ বাঙালি না খেয়ে মরেছে তখন মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহচররা চোরাচালানের ব্যবসায় মোটা অঙ্ক কামাই করেছে-রাতারাতি ধনী হয়ে উঠেছে। চোরাকারবার থামাবার জন্য মুজিব সেনাবাহিনীকে তলব করলেন, কিন্তু তাদের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিতে রাজি হলেন না; বরং রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য চাপ দিলেন। বিশেষ সুবিধাভোগী রক্ষীবাহিনী মুজিবের প্রতিরক্ষার জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীর প্রতি সেনাবাহিনীর বিশেষ বিরাগ ছিল। সেনাবাহিনীর জনৈক অফিসার মন্তব্য করেছিলেন যে, 'রক্ষীবাহিনী শুধুমাত্র ঢাকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম। কেননা, তারা স্থানীয় গুণ্ডাদের তুলনায় উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ঠগদের নিয়ে গঠিত।' সেনাবাহিনীর অসন্তোষ চাপা দেওয়ার জন্য মুজিব একদিকে কোনো কোনো অফিসারকে প্রমোশন ও অপরদিকে সময় সময় মেজর লেঃ কর্নেল ইত্যাদি মাঝারি পদমর্যাদার অফিসারদের অপসারণে নীতি গ্রহণ করেন। চোরাচালানকারী দমনের অভিযান সফল হয়নি। কারণ, বেশিরভাগ দোষী ব্যক্তি সরকারের আশ্রয় লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু এই অভিযান চলাকালে সেনাবাহিনী ক্ষমতার কিছুটা আস্বাদ পেয়েছিল। এতে তাদের অসন্তোষ আরো বেড়ে যায় এবং তারা সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎপেতে থাকে। পরের অঙ্ক শুরু হয় গত বছরের শেষ দিকে। শেখ মুজিব দেশের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র পাল্টিয়ে, জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করলেন এবং সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে দিয়ে তিনি একটি নতুন একদলীয় শাসন প্রবর্তন করলেন। চারটি ছাড়া বাদবাকি

www.pathagar.com

সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হলো। সারাদেশকে ৬১টি নতুন জেলায় বিভক্ত করা হলো। নিজের বিশ্বাসে অটল থাকার মতো সৎসাহস শেখ মুজিবের কোনো দিন ছিল না। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের চাপে একক দল পুরাতন পাপীদের ভিড়ে নতুনত্ব লাভ করতে ব্যর্থ হলো। এদের অনেকেই সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে পুঁজি করে রাতারাতি সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল। সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মুজিব নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করে নিয়ে ছিলেন। ফলে নিতান্ত সামান্য ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিতে মাসের পর মাস লেগে যেত। কারণ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তার কাছে না পৌঁছলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর ছিল না। শাসনব্যবস্থার এ দুর্বলতা সব সময়েই সুস্পষ্ট ছিল। মুজিব তোষামোদ প্রিয় ছিলেন এবং ক্রমেই চাটুকারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে উঠেছিলেন। এই চাটুকারদের দল সযত্নে তার কাছ থেকে অপ্রিয় সত্য গোপন করে রাখত। সংবাদপত্রের উপর নির্দেশ জারি করা হয়েছিল মুজিবের বড় ফটো ফলাও করে ঘন ঘন ছাপাবার জন্য। তার নিজের পরিবারের লোকজনের আর্থিক স্বার্থ আদায়ের প্রতি তার নজর ছিল। তিনি নিজে ঘুষ নিয়েছেন কিনা এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। কারণ তা নেওয়ার তো তার প্রয়োজন ছিল না। বাংলাদেশের কাগজের নোটের উপর তার ছবি ছাপা হয়েছিল। সবচেয়ে গরিব দেশের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট পদের সঙ্গে যেসব ব্যয়বহুল সুযোগ-সুবিধা সম্পৃক্ত তার সবই তার করায়ত্ত ছিল। তবে অনেকেই তার ছেলেদের এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। ইদানীং ঢাকার লোকমুখে একটা গল্প প্রায়ই শুনা গেছে। তা হলো ঃ পুলিশ দু'জন কম বয়সী গুণ্ডাকে ধরেছে। গ্রেফতারকারী পুলিশ অফিসার তার উপরের অফিসারের কাছে জানতে চাইলেন গুণ্ডা দুটিকে বিচারে সোপর্দ করা ঠিক হবে কিনা। উপরের অফিসার তার উপরের অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তার উপরের অফিসারকে এবং এভাবে বিষয়টি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মুজিবের কাছে আসল। শেখ মুজিব তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কামাল-জামাল কি ঘরে ফিরেছে'? বেগম সাহেবা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, ফিরেছে।' একথা শোনার পর শেখ পুলিশকে তরুণ গুণ্ডা দুটিকে বিচারের জন্য সোপর্দ করতে অনুমতি দিলেন। এ গল্পটি সত্য না বানানো তার বিচার করতে যাওয়া অবান্তর, কারণ বহুলোক এ গল্পের সত্যতায় বিশ্বাস করে এবং গল্প বহুলোকের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িয়েছে। কিছুকাল আগে শেখ পরিবারের দু'অংশের মধ্যে ঘরোয়া সংঘাত দেখা দেয়। তার ফল হিসেবে বেশ কয়েকটি জীবন বিনষ্ট হয়েছে। একটি বিবদমান অংশের প্রধান ছিলেন মুজিবের ছেলে কামাল এবং অপরটির প্রধান ছিলেন তার ভাগিনা শেখ মনি। শেখ মনির পেছনে বেগম মুজিবের সমর্থন ছিল। স্বজনপ্রীতির প্রশ্নটি এ বছরে বড় হয়ে ধরা পড়ে। শেখ মুজিবের বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন যে, শেখ তার ভাবী উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাগিনা শেখ মনিকে গড়ে তুলেছেন। প্রতিটি ব্যাপারে তিনি ভাগিনার পরামর্শ নিতেন। দেশব্যাপী সংবাদপত্র নিধন অভিযানের মুখে যে কয়টি পত্রিকা টিকে থাকতে পেরেছে তার একটি হল শেখ মনির পত্রিকা। কার্যত মাস কয়েক আগেই অবশ্যম্ভাবী পথের দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন দিয়ে শক্তিশালী করা হচ্ছে দেখে সেনাবাহিনী শঙ্কিত হয়ে পড়ল। কয়েকটি রাজনৈতিক উপদলও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কেননা, একদিকে তাদের অপসারিত করা হচ্ছে, কিন্তু অপরদিকে তাদের চেয়েও বেশি দুর্নীতিবাজদের অবাধ লুটতরাজের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। পদে পদে ভারতের উপর নির্ভরশীলতা বাড়তে দেখে সাধারণ মুসলমানরাও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। তাদেরকে পাশ কাটিয়ে একটা পারিবারিক বাদশাহীর ভিত গড়ে তোলা হচ্ছে দেখে মন্ত্রিসভার সদস্যরাও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।

www.pathagar.com

রিচার্ড হ্যারিস, দ্য টাইমস, ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫

বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল দুর্যোগ, দুর্বিপাকের মধ্যে। স্বাধীনতা পরবর্তী চার বছরেও দুর্দশা পিছু ছাড়েনি দেশটার। ১৯৭১-এ এক কৃষক বলেছিলেন, 'আমাদের দেশটি এমন একটি দেশ যার ওপর থেকে সৃষ্টিকর্তা তার করুণা ফিরিয়ে নিয়েছেন।' যুদ্ধে মানুষ দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। তার ওপর বন্যা, সাইক্লোন, দুর্ভিক্ষ-কৃষকদের কাছে যা অতিপরিচিত। প্রায় প্রতিবছরই এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর রাজনৈতিক ঘটনাবলীও প্রায় অভিন্ন। সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অক্ষম। শুধু বৈদেশিক সাহায্য পাবার জন্য হাত পাতে। এতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, এই সরকার তার জনগণকে ন্যূনতম শান্তি-শৃঙ্খলা, সততা, দক্ষতা এবং নিরাপত্তা দিতে পারেনি। ১৯৭৩-এর নির্বাচনে শেখ মুজিবের দল আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদের ৩১৫টি আসনের মধ্যে ৩০৭টিতে জয়ী হয়েছিল। বিজয়টি ছিল নিরঙ্কুশ। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি দেশে ভোটারদের এই সাড়া সহজে পশ্চিমা মতামতকে বিভ্রান্ত করতে পারে। আওয়ামী লীগের দুর্নীতি শিগগির ঘৃণা কুড়াতে শুরু করে। ঢাকা ও অন্যান্য শহরে শিক্ষিত মহলে শেখ মুজিবের দ্যুতি দ্রুত কমতে থাকে। বছর শেষে প্রেসিডেন্ট, যিনি ছিলেন সকল মহলের শ্রদ্ধাভাজন, পদত্যাগ করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৪ সালও ভাল যায়নি। এ বছরটি ছিল দুর্ভিক্ষের। গুজব ছিল, শেখ মুজিব একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। এপ্রিলে তিনি দুর্নীতি, অবৈধ অস্ত্র এবং খাদ্য কালোবাজারীর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। যথারীতি শিগগির এটা আবিষ্কৃত হয় যে, আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট সদস্যরা সহজে শাস্তি এড়িয়ে গেছেন। অভিযান মুখ থুবড়ে পড়ে। এরপরই অপ্রীতিকর ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়। ফলে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এবং যুবলীগের মধ্যে নিহত হবার ঘটনা ঘটে। মার্শাল ল' জারি করা হয় এরপর। সেনাবাহিনীর সাথে শেখ মুজিবের সম্পর্ক কখনোই ভাল ছিল না। তিনি বরাবরই তার নিয়ন্ত্রণাধীন আধা-সামরিক বাহিনীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে প্রস্তুত থাকতেন। রক্ষীবাহিনী ছিল একটি মিলিশিয়া গ্রুপ। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে এই গ্রুপটিকে সংগঠিত করা হয়েছিল ভারতীয় প্রশিক্ষণের দ্বারা। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করা হয়নি। সেসব অস্ত্র বাংলাদেশে সকল বিরোধী গ্রুপের মাঝে সমানভাবে চলে গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা গ্রুপগুলো সব ধরনের অপারেশনে অংশ নিয়েছিল। অপরদিকে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী সৃষ্টি করেছিল রাজাকার, আল-বদর বাহিনীর মতো আধা-সামরিক গ্রুপ। পাকিস্তানের পরাজয়ের পর রাজাকার এবং বিহারীদের অস্ত্র দখল করার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। সকল অস্ত্র যাতে জমা হয় শেখ মুজিবের এই চেষ্টা সত্ত্বেও লোকের হাতে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র রয়ে যায়। কারো কারো কাছে একাধিক অস্ত্র ছিল। শেখ মুজিব এসব অস্ত্র উদ্ধারের জন্য রক্ষীবাহিনীর সাহায্যে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অন্যেরাও একইভাবে সহিংস প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিত। এপ্রিলে জারি করা অকার্যকর মার্শাল ল'র প্রেক্ষিতে পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল ডিসেম্বরের জরুরি অবস্থা ঘোষণা। এটি ছিল শেখ মুজিবের একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রাথমিক পদক্ষেপ। গণতান্ত্রিক প্রথা বিলুপ্ত করা হচ্ছিল। ফেব্রুয়ারিতে গঠন করা হয় নতুন জাতীয় ঐক্য পার্টি। এতে যোগ দেন পুরনো আওয়ামী লীগ থেকে শেখ মুজিবের সতীর্থরা। এই নতুন পার্টির সাথে মিশে যায় মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এবং কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সিপিবি)। রাশিয়াও তাদের সমর্থন জানায়। শেখ মুজিবের জন্য আরো ক্ষতিকর কারণ হয়ে দাঁড়ায়, 'শূন্য নীরবতা'।

www.pathagar.com

যার প্রেক্ষিতে এই সম্ভাব্য 'রাজনৈতিক পুনর্জন্ম' হয়। নতুন ব্যবস্থার প্রতি কারো আস্থা ছিল না। কারো মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল না যে, এই ব্যবস্থা সাবেক সরকারের চেয়ে অকার্যকর হবে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আগের যে কোন সময়ের চাইতে বিবর্ণ মনে হয়।

দি টাইমস, কলকাতা, ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫

ভোরে ক্যু হয়ে গেল ঢাকায়। সেনাবাহিনী শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে। শেখ মুজিব নিহত হয়েছেন। দিল্লীতে পাওয়া খবরে বলা হয়, ক্যু পরবর্তী বিশৃঙ্খলায় শেখ মুজিবের দু'শ সমর্থক প্রাণ হারিয়েছে। পরে সেন্সরের অনুরোধে এই খবর প্রত্যাহার করে নেয় ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআই। ক্ষমতাচ্যুত সরকারের মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। অন্যান্য মন্ত্রীদের গৃহবন্দি করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর নাম পাল্টে হয়েছে ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ। অনির্দিষ্টকালের জন্য জারি করা হয়েছে সামরিক শাসন। ২৪ ঘণ্টার সান্ধ্য আইন বলবৎ রয়েছে। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ঢাকা বিমানবন্দর। রক্ষীবাহিনীর সকল সদস্যকে কাছের ঘাঁটিতে রিপোর্ট করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশেষ রাজনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্ত এই আধা-সামরিক বাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছিল মুজিবের শাসনামলে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম ভাষণে মোশতাক আহমদ ঘোষণা করেন যে, শেখ মুজিবের 'স্বৈরশাসন'-এর অবসান ঘটিয়ে দেশের সেনাবাহিনী বীরোচিত নৈপুণ্য দেখিয়েছে। এই পরিবর্তন ছিল একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন, 'আল্লাহ'র ওপর বিশ্বাস রেখে, জাতি ও জনগণের স্বার্থে।'

সেনাবাহিনী, 'গৌরবদীপ্ত ভূমিকায়' তার সতায়তায় এগিয়ে এসেছে। তিনি সবাইকে নতুন 'বিপ্লবী সরকার'-এর অধীনে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। সাবেক আওয়ামী লীগের একজন সিনিয়র সদস্য ছিলেন মোশতাক আহমদ। ১৯৭১-এ মুজিবনগরে গঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম মন্ত্রিসভায় তাকে সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। পরে মন্ত্রিসভায় রদবদল ঘটানো হয়। শেখ মুজিব নিজে প্রধানমন্ত্রী থেকে প্রেসিডেন্ট হন। এবার মোশতাককে করা হয় বাণিজ্যমন্ত্রী। সেনাবাহিনীর কোন কোন সিনিয়র ও মধ্যম সারির কর্মকর্তা মনে করতেন যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ভূমিকাকে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ খাটো করে দেখেছেন।

১৫ আগস্ট, দিল্লীঃ মধ্যরাতের পর ঢাকায় গুলিবর্ষণের আওয়াজ শোনা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, শেখ মুজিবের বাসভবনে পাহারায় নিয়োজিত গার্ডরা ক্যু প্রতিহত করেছে। পিটিআই এ খবর দেয়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার আগে ঢাকা থেকে যে দু'একটি খবর এসেছিল এই খবরটি ছিল তার অন্যতম। নতুন প্রেসিডেন্ট মোশতাক তার ভাষণে এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেন যে, একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি সাবেক প্রশাসনের অনুসৃত দুর্নীতিগ্রস্ত নীতির কারণে। সীমাহীন স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির ফলে মুষ্টিমেয় লোক সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিল। অপরদিকে, আপামর জনসাধারণ দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট প্রায় ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। 'কোটাভিত্তিক শাসন'-এর ফলে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। জনগণ পরিবর্তন চেয়েছিল। খন্দকার মোশতাক সাবেক ভূমিমন্ত্রী মোহাম্মদ উল্লাহকে তার ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত

www.pathagar.com

করে একটি বেসরকারি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কলকাতায় মনিটরিং করা বাংলাদেশ রেডিওর খবরানুযায়ী, ৯ জন নতুন মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হয়। তারা হলেন-বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, ফণি ভূষণ মজুমদার, মনোরঞ্জন ধর, আব্দুল মোমিন, আসাদুজ্জামান খান, ড. এ আর মল্লিক, মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী এবং আব্দুল মান্নান। ১৫ আগস্ট রাতে মোশতাকের সভাপতিত্বে নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক হয়। কার্যত সামরিক নিয়ন্ত্রণের অধীন বাংলাদেশ রেডিও ক্যু এবং তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহ ঘোষণা করে। সরকারিভাবে বিকেলে ঘোষণা করা হয়, ৫৫ বছর বয়সী শেখ মুজিব নিহত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী এবং শেখ মুজিব ভাগ্নেরাও নিহত হয়েছেন-এ মর্মে খবরের সত্যতা তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। দিল্লীতে কূটনৈতিক সূত্রগুলো জানায়, ঢাকার ধানমণ্ডিতে শেখ মুজিবের বাসভবনে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের খবর পাওয়া গেছে। তবে সকালে প্রায় ২০ লাখ লোকের শহর ঢাকা মূলত শান্ত ছিল। দুপুরে কার্ফ্যু তুলে দেয়া হয়। ৯০ মিনিটের জন্যে, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী জুমার নামায আদায় করতে পারেন। আজ সন্ধ্যায় ৬ জন প্রতিমন্ত্রীও শপথ গ্রহণ করেন। তারা হলেন-তাহের উদ্দিন ঠাকুর, ফরিদ গাজী, অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী, নূরুল ইসলাম মনজুর, কেএম ওবায়দুর রহমান এবং শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ছাড়া বাকি সবাই মন্ত্রী অথবা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভায় ছিলেন। শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার যে সকল সদস্যকে মোশতাকের মন্ত্রিসভায় নেয়া হয়নি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-ড. কামাল হোসেন (বিদেশে অবস্থানরত পররাষ্ট্রমন্ত্রী), আব্দুস সামাদ আজাদ, এএইচএম কামরুজ্জামান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম। বাংলাদেশের সৃষ্টিতে ভারত প্রধান ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানের সাথে ভারতের দু' সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের ফলে শেষতক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। শেখ মুজিবকে মনে করা হয় ভারতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি এমন একটি দেশের নেতা ছিলেন যেখানে জনমত চলে গিয়েছিল ভারতের বিপক্ষে। শেখ মুজিবের ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হওয়ার ঘটনা উপমহাদেশে ভারতীয় কূটনীতির জন্যে একটি আঘাতস্বরূপ। যদিও কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা এ ব্যাপারে পূর্বাভাস দিতে দ্বিধান্বিত যে, নতুন সরকার কি নীতি গ্রহণ করবে। দিল্লীতে যখন অভ্যুত্থানের খবর পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তখন ভারতের স্বাধীনতার ২৮ তম বার্ষিকী উপলক্ষে নগরীর ৩শ' বছরের পুরনো লাল কেল্লায় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ক্যু সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি। এটা জানা যায়নি যে, তিনি অভ্যুত্থান পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন কি-না। হিন্দিতে ভাষণ দানকালে ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় জনগণকে, 'ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সাহসিকতা'র পরিচয় দিতে বলেন। দেশের স্বাধীনতার প্রতি যে কোনো হুমকি মোকাবেলায় ভারতবাসীকে সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান তিনি। ইন্দিরা গান্ধী সমবেত জনতাকে স্মরণ করিয়ে দেন তার পিতা জওহরলাল নেহেরুর একটি উক্তি-'স্বাধীনতা সংকটাপন্ন। তাকে রক্ষা করো সকল শক্তি দিয়ে।'

তিনি ২৬ জুন জারি করা জরুরি অবস্থার সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। বিরোধীদলগুলোর বিরুদ্ধে তিনি এই বলে অভিযোগ করেন যে, তারা তার সরকারের বিপক্ষে বেসামরিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিল। তার প্রতিপক্ষরা যদি সফল হত, তাহলে ভারত দুর্বল হয়ে যেতো। তাতে 'এমনকি বাইরের শক্তির পক্ষেও হস্তক্ষেপ করার পথ প্রশস্ত হতো।' তবে এ সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত বলেননি। তবে তিনি এই অভিযোগকে, 'ইচ্ছাকৃত অপপ্রচার' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন যে, 'অন্য কোন শক্তির ইচ্ছাপূরণে ভারত মদদ

www.pathagar.com

দিচ্ছে না।' ইন্দিরা গান্ধী ভারতকে রাশিয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন-এই সমালোচনার জবাবে তিনি ওপরের মন্তব্য করেন।

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে পিটার গিল, দ্য টেলিগ্রাফ, লন্ডন, ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫

৫৫ বছর বয়স্ক বাংলাদেশ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী হিসেবে রক্ষীবাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ হাজার। তারা ছিল আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। ভারতীয় সেনাবাহিনীর জলপাই সবুজ রঙের যুদ্ধ পোশাক পড়ে তারা রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য শহরে টহল দিতো। গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা মিশনগুলোতে তাদের ব্যবহার করা হতো। শাসকবিরোধীদের বিরুদ্ধে তল্লাশি ও আটক অভিযানে তাদের কাজে লাগানো হতো। গত বছর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ আনা হয়, রক্ষীবাহিনীরা চরম নির্যাতন চালাচ্ছে। এসব অভিযোগের বেশিরভাগ আদালত বাতিল করে দিতো। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অনেকের সাথে আমি কথা বলেছি। তাদের অনেকে অভিযোগ করেছে, সরকার রক্ষীবাহিনীকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তাদের আরো অভিযোগ ছিল, পেশাদার সেনাবাহিনীকে ভারতের সাথে বাংলাদেশের ১৪শ' মাইল সীমান্ত এলাকায় কেবল চোরাচালান রোধের ক্লান্তিময় ও একঘেঁয়েমী মার্কা কাজে নিয়োজিত রাখা হয়। ঢাকায় গতকালের অভ্যুত্থানের সাথে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ ও তার চীপ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান জড়িত বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে। উভয় মেজর জেনারেলের বয়স ৪০-এর ঘরে। চার বছর পূর্বে তারা মেজর র‍্যাংক থেকে পদোন্নতি পান। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে হামলার সময় তারা দু'জনেই ছিলেন সেনাবাহিনীর ব্যাটেলিয়ান কমান্ডার। তারা পাকিস্তানবিরোধী গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। মেজর শফিউল্লাহ ছিলেন পূর্বাঞ্চলে কুমিল্লার সেক্টর কমান্ডার। উত্তরাঞ্চলে মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন সিলেটের সেক্টর কমান্ডার। খন্দকার মোশতাক (৫৭) গতকাল বাংলাদেশের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষিত হয়েছেন। তাকে মূলত সামরিক শাসকদের ফ্রন্ট ম্যান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। গতকাল ঢাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, অভ্যুত্থান পরিকল্পনার কোন অংশের সাথে তার ভূমিকা ছিল না। খন্দকার মোশতাক একজন রক্ষণশীল বাঙালি। পাশ্চাত্যের ঢং-এর পোশাক তিনি পরিহার করতেন। শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন খন্দকার মোশতাক। ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশভাবে জয়ী হয়। খন্দকার মোশতাক বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে তার অবস্থা ঘোষণা করেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে অনৈসলামিক বলে আখ্যায়িত করেন এবং গতকাল ঘোষণা দেন, পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশও একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হবে। ১৯৭১ সালের মার্চে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অভিযান চালালে অনেক আওয়ামী লীগ নেতার মতো খন্দকার মোশতাক ভারতের আশ্রয় নেন। নয় মাস গেরিলা যুদ্ধের পর তিনি ভারতের মাটিতে প্রথম প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানের জেল থেকে শেখ মুজিব মুক্ত হয়ে দেশে ফেরার পর খন্দকার মোশতাক গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে বাদ পড়েন। শেখ মুজিব সরকার ধর্মনিরপেক্ষ সরকার-এই বোধটুকু ভারত সরকারকে প্রদর্শনের জন্যেই সম্ভবত তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

নৃশংস হত্যাঃ শেখ মুজিবের নৃশংস হত্যা কোটি কোটি বাঙালির জন্যে অপূরণীয় ক্ষতি। যদিও তিনি ছিলেন আপাত অর্থে একজন বাজে প্রশাসক। দেশব্যাপী পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির সীমাকে তিনি সহ্য করে গেছেন। তবুও শেখ মুজিবকে এখনো তার দেশের লোক শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। 'বঙ্গবন্ধু' এবং 'জাতির পিতা'র সম্মানিত উপাধি পাওয়া শেখ মুজিব পিতৃপ্রতিম স্বৈরাচার দিয়ে বাংলাদেশ শাসন করেন। দেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে তার ঢাকায় প্রত্যাবর্তন একটি ঐতিহাসিক গণ জমায়েতের সৃষ্টি করে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ উপর্যুপরি দুর্যোগ, ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অদক্ষ আমলাতন্ত্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়। শেখ মুজিব শহুরে বুদ্ধিজীবীদের অনেকের সমর্থন হারাতে থাকেন। অন্যদিকে একই সময়ে নিরক্ষর কৃষককুল কিন্তু তাদের নেতা শেখ মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধা ঠিকই বজায় রাখে। সুবক্তা শেখ মুজিবের উদ্দীপ্ত ভাষণ, বক্তৃতায় তারা আশা খুঁজে পায়। গত জানুয়ারিতে ওয়েস্ট মিনিস্টার ঢং-এর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে তার প্রত্যাখ্যান এবং বাংলাদেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা দেশব্যাপী খুব কম প্রভাব ফেলে। শেখ মুজিব স্থানীয় সরকারের প্রশাসন পুনর্গঠন করার যে 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' ডাক দিয়েছিলেন তার কর্মকাণ্ড আগামী মাস থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল।

অমিত রায়, সানডে টেলিগ্রাফ, লন্ডন, ১৭ আগস্ট, ১৯৭৫

বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রধান নিয়ন্তা হলো শহরের বাসিন্দা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের সমর্থনই মুজিবকে নেতা বানিয়েছিল, ক্ষমতায় বসিয়েছিল। কিন্তু শাসনতন্ত্র বদলাবার ফলে মুজিব তাদের সমর্থন হারিয়ে ফেলেন এবং সেদিন থেকেই নিজেকে অতীতের পাতায় তুলে দিয়েছিলেন। চারিদিকে চাটুকার পরিবেষ্টিত মুজিব সর্বব্যাপী গণঅসন্তোষ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বরং উল্টো 'আমার জনগণ আমাকে ভালবাসে, আমি তাদেরকে ভালবাসি'-এ কথা আওড়িয়ে মিথ্যা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেয়েছিলেন। তার মেরুদণ্ডহীন সমর্থকরা তাকে বুঝিয়েছিল যে, অর্থনৈতিক দুঃখ-দুর্দশা, শিল্প কারখানা অব্যবস্থা, অপরিমেয় মজুতদারী ও চোরাকারবার এবং ক্রমাবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যাদি মুজিবী খ্যাতির মুখে কিছুই নয়। সমস্যার মোকাবেলা না করে মুজিব গুণ্ডা-বদমাইশ নিয়ে ২৫ হাজার লোকের রক্ষীবাহিনী খাড়া করেছিলেন, যাতে সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস না পায়। সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রথম অসন্তোষ দেখা যায় যখন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসাররা পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে দেখতে পেলেন যে, তাদের অধীনস্থ অফিসাররা কয়েক ধাপ ডিঙিয়ে কর্তা হয়ে বসে আছেন। গত বছর এ অসন্তোষ প্রায় প্রকাশ্যে বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে পড়েছিল। সেনাবাহিনীকে মজুতদার ও চোরাকারবারী খুঁজে বের করার কাজে নিয়োগ করা হলো। কিন্তু তাদের অনুসন্ধানের ফলে যখন স্বয়ং মুজিবের ঘনিষ্ঠজনেরা জড়িত বলে প্রমাণিত হতে লাগল তখন তাড়াতাড়ি করে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে পাঠিয়ে সব কিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হলো। মুজিবের সেসব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন হলেন গাজী গোলাম মোস্তফা যিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চোর বলে কুখ্যাত। দুনিয়ার মানুষ বাংলাদেশের দুস্থজনের জন্য রেডক্রসের মারফতে উল্লেখযোগ্য সাহায্য-সামগ্রী পাঠিয়েছেন, আর বাংলাদেশ রেডক্রসের প্রধান হিসেবে গাজী গোলাম মোস্তফা এসব আত্মসাৎ করে ব্যক্তিগত ধনসম্পদ বানিয়েছেন। মোস্তফাকে রেশন-বণ্টন কমিটিরও প্রধান বানানো হয়েছিল। রেশন দোকানের মালিকরা তারই প্রত্যক্ষ মদদ নিয়ে রেশনের খাদ্যসামগ্রী কালোবাজারে বিক্রি করে দু'হাতে টাকা লুটেছে এবং কালো

www.pathagar.com

টাকার মোটা অংশ তারা নজরানা হিসেবে মোস্তফার পকেটে তুলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ঢাকার ইমপ্রুভমেন্ট এলটমেন্ট কমিটির প্রধান এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি বোর্ডের সদস্য হিসেবেও তিনি খালি জমি ও বাড়ি বিলি বন্দোবস্ত ও নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এসবের বিনিময়ে তিনি ঘুষ নিয়েছেন দু'হাতে। উপরন্তু ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের প্রধান হিসেবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের উপর তিনি কর্তৃত্ব খাটিয়েছিলেন। মুজিবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন আইনের উর্ধ্বে। ব্যাংকে ডাকাতি করে ডাকাতরা পালিয়ে যাচ্ছিল, পুলিশ গুলি ছুঁড়ল। দেখা গেল স্বয়ং মুজিবের বড় ছেলে কামাল এর মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি সারাদেশে ১৫৩টি পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং শুধু ৪টি পত্রিকা চালু রাখা হয়েছে। এ চারটি পত্রিকার একটি হল মুজিবের ভাগিনা শেখ ফজলুর হক মনির মালিকানাধীন বাংলাদেশ টাইমস। বিগত বছরে শেখ মুজিবের আপন ভাই শেখ আবু নাসের যতবার ঢাকা থেকে স্বীয় আদি ব্যবসা কেন্দ্র খুলনা গিয়েছেন তার চেয়ে বেশি বার লন্ডনে এসেছেন। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান লন্ডনে আগমন করেন। ফিরার সময় তিনি ২৩টি বড় বড় বাক্স বোঝাই করে সওদা নিয়ে গেছেন। অপরদিকে মুজিব তার সামান্য সমালোচনাকারীদেরকে কোনরূপ বিচার-বিবেচনার তোয়াক্কা না করে নাস্তানাবুদ করেছেন। এমনকি এসব মৃদু সমালোচনাকারীদের অতীত অবদানটুকুও বিবেচনায় আনা হয়নি। ১৯৭১ সালে একটা গোটা ট্রেন বোঝাই করে টাকা পয়সা নিয়ে তৎকালীন পাবনার ডেপুটি কমিশনার নূরুল কাদির খান কলিকাতায় চলে এসেছিলেন। এ টাকা তৎকালীন নির্বাসিত সরকারের অনেক কাজে এসেছিল। কিন্তু কূটনীতিবিদের এক মজলিসে কথায় কথায় সামান্য বিরূপ মন্তব্য করায় তাকে পর্যটন কর্পোরেশন থেকে অপসারণ করা হয়।

এন্থনী ম্যাসকারেনহাস, সানডে টাইমস, লন্ডন, ১৭ আগস্ট, ১৯৭৫

১৯৭২ সালে নব-প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান বীরের সংবর্ধনা পেয়েছিলেন। তিনি তখন সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। গত সপ্তাহে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হয়েছেন। দু'টি ঘটনার মাঝখানের ক'বছরে তার সম্পর্কে আমাদের জনগণের মোহ কেটে গেছে এবং সোনার বাংলার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। কিসে ভুল হলো? মুজিবের ট্রাজেডি এই যে, চার বছরেরও কম সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর উচ্চতম মর্যাদা হারিয়ে বঙ্গদুশমনে পর্যবসিত হলেন। তার বিপর্যয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রধানত তিনটি উপকরণ মিশে আছে। প্রথমত সামরিক বাহিনীর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও মুজিব সেনাবাহিনীকে অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা করতেন। সেনাবাহিনীর এবং বাংলাদেশ আন্দোলনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে এমন অনেক সামরিক অফিসারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার কোনো সুযোগ তিনি ছাড়তেন না। স্পষ্টতই তাদের উপর তিনি গোয়েন্দাগিরি চালাতেন। মুজিবের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অনুগত উচ্চ ট্রেনিংপ্রাপ্ত, সুসজ্জিত, ইউনিফরমধারী রক্ষীবাহিনীকে অস্ত্রেশস্ত্রে, বেতন-ভাতায়, ব্যয় বরাদ্দে সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতো। উভয়ের মধ্যে স্বার্থের অনেক সংঘাতেই মুজিব অন্ধভাবে রক্ষীবাহিনীকে সমর্থন করতেন। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, সেনাবাহিনী সম্পর্কে দীর্ঘদিনের সন্দেহ ও ভীতি থাকা সত্ত্বেও মুজিব গত পাঁচ বছরে পাচার ও দুর্নীতি উচ্ছেদ অভিযানে সেনাবাহিনীকেই নিয়োগ করেছিলেন। তার এই রাজনৈতিক চাতুরী মারাত্মকভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। এতদিন সেনাবাহিনী সরকার অবৈধ কার্যকলাপের কথা গল্প গুজবে শুনেছে মাত্র।

www.pathagar.com

এবার তারা এ ব্যাপকতার মুখোমুখি দাঁড়ালো। দুর্নীতি নির্মূল অভিযানে বাধা আসল রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে। এতে তাদের অসন্তোষ আরো বেড়ে গেল এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের আক্রোশ নিবদ্ধ হলো মুজিবের উপর। সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুজিবের বিরোধের ফলে একটি ঘটনা ঘটে যাতে গত শুক্রবারের সামরিক অভ্যুত্থানের মুখপাত্র মেজর ডালিম জড়িত ছিলেন। এক বিয়ের অভ্যর্থনা মজলিসে 'মুক্তিবাহিনী'র এই বীরযোদ্ধার পত্নীকে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের প্রধান ও মুজিবের বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্র গাজী গোলাম মোস্তফার ভাই একদল গুণ্ডা এনে সমবেত মেহমানদের সামনে ডালিম দম্পতিকে বলপূর্বক উঠিয়ে মোস্তফার বাড়িতে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে অবিলম্বে তিনটি লরী বোঝাই তরুণ সিপাহী মোস্তফার বাড়ির উদ্দেশে ধাওয়া করে। গোলমাল আশঙ্কা করে মোস্তফা মেজর ডালিম ও তার পত্নীকে নিয়ে মুজিবের বাসভবনে উপস্থিত হন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দু'পক্ষ মুখোমুখি হলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ডালিম দম্পতিকে মুক্তি দিলেও মুজিব তরুণ অফিসারদের 'বিশৃঙ্খলার' জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করেন। এখানেই শেষ নয়। ক'মাস পর মুজিব নয় জন অফিসারকে বরখাস্ত করেন এবং প্রশংসনীয় সার্ভিস রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও মেজর ডালিমকে মাত্র ২৮ বছর বয়সে অবসর করিয়ে দেন। এই ভূতপূর্ব মেজরই গত শুক্রবার ভোরে মুজিবের 'স্বৈরতন্ত্রের' অবসানের খবর ঘোষণা করেন। মুজিবের পতনের দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ শাসনতন্ত্রে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেওয়া। ইসলামের মর্যাদার এই অবনয়ন অনিশ্চয়তা সূচক প্রমাণিত হয়েছে। 'এক হাজার মসজিদের শহর' বলে ঢাকা বরাবরই গর্ব করেছে এবং বাঙালিরা ঐতিহ্যগতভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে বেশি ধর্মানুরাগী। অপরদিকে বাঙালি মুসলমানরা উপমহাদেশে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অবিচলিতভাবে সমর্থন করেছিল বলেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। এই পশ্চাদভূমিতে মুজিবের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তম অংশকে আহত করেছিল। তাই নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করে রাতারাতি জনসমর্থন লাভ করেছেন। গত শুক্রবার জুমা'র নামাযের জন্য কারফিউ উঠিয়ে দিলে মসজিদে এই জনসমর্থন অভিব্যক্তি হয়েছে। তৃতীয়ত, মুজিব ক্রমেই জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। আওয়ামী লীগের মোসাহেবরা তার চারদিকে এমনি বেষ্টনী গড়ে তুলেছিলেন, যার ফলে জনসাধারণের সঙ্গে তার কোনো সংযোগ ছিল না। স্পষ্টতই এই বিচ্ছিন্নতা চরমে পৌঁছল যখন এ বছর তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র বিলোপ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল ও রাশিয়ার একদলীয় ব্যবস্থার সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। মূলত ব্যক্তিগত শাসন পাকাপোক্ত করার জন্য তা করা হয়েছিল। বাংলার মানুষ যারা তিন পুরুষ ধরে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছে তা তারা বরদাশত করতে পারেনি। গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যই প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও মুজিব তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনে অবিচলিত ছিলেন। পরিহাস এই যে, এর কোন প্রয়োজন ছিল না। পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায়ও মুজিবের কথায়ই বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে এবং তার কথাই ছিল দেশের আইন। এ ক্ষমতা ও মর্যাদা বাংলার মানুষ জাতির জনককে সরল মনেই দান করেছিল। মুজিব যখন এ দান আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যক্তিগত করে নিতে চাইলেন তখনই তারা বিদ্রোহ করলো। ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তার উপর আঘাত আসল। আর কোনো পথ ছিল না। মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখা ভয়ানক বিপজ্জনক হতো।

www.pathagar.com

লুই সিনসন, ওয়াশিংটন পোস্ট, ১৮ আগস্ট, ১৯৭৫

বাংলার জ্বলন্ত চুলায় হাত ঢোকাবার জন্য একদিন মিসেস গান্ধীকে অনুশোচনা করতে হবে-গত বছর এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এ ভবিষ্যদ্বাণী যে এভাবে ফলে যাবে তা হয়ত স্বয়ং ভুট্টোও কল্পনা করেননি। হঠাৎ এই গতি পরিবর্তন শুধু মিসেস গান্ধীকে নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নকেও চিন্তান্বিত করতে বাধ্য। এতদিন তারা চীনকে আগলে রাখার প্রয়াসে বাংলাদেশকে ব্যবহার করে এসেছিলেন। যদিও এ অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ হিসেবে মুজিবের স্বৈরাচারী শাসন, তার অযোগ্যতা ও দুর্নীতিপরায়ণতার কথা তুলে ধরা হয়েছে, তবু প্রথম থেকেই দিল্লী-মস্কোর সাথে বেশি মাখামাখির জন্য জনগণ মুজিবকে দোষী সাব্যস্থ করেছিল। অতীতের যেমন সব দুঃখ-দুর্দশার জন্য বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানকে দায়ী করেছে, তেমনি বাংলাদেশের সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যেই অর্থনৈতিক শোষণ চালু করার জন্য ভারত সরকার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীকে অভিযুক্ত করেছে। পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে উদ্ভুত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে, ঘাত-প্রতিঘাতের জন্ম দিয়েছে তারই ফল হচ্ছে শেখ মুজিবের পতন ও মৃত্যু। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংঘাত মিসেস গান্ধীকে তার বিবদমান প্রতিবেশীকে ঘায়েল করার এক চমকপ্রদ সুযোগ এনে দিয়েছিল। সরাসরি পাক-ভারত যুদ্ধ লাগার আগে নয়মাস বাঙালি গেরিলারা সক্রিয় ছিল বটে, কিন্তু ভারতই তাদের অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়েছে। ভারত কর্তৃক সরাসরি পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান পাশ্চাত্য দেশগুলোতে সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু বাঙালিদের স্বাধীনতা স্পৃহা সহজেই সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেয়। ইসলামাবাদ, পিকিং এবং ওয়াশিংটন তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের নতুন সরকারের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা করবে বলে মনে হয়। পাকিস্তান যে তার এককালীন পূর্বাংশের সাথে একটি কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী তার প্রমাণ এই যে, ইসলামাবাদ বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দান করেছে। অবশ্য বাংলাদেশের স্বার্থের দিক থেকে ভুট্টো সরকারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন অনেক বেশি লাভজনক হবে। স্বাধীন হওয়ার ফলে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ বাজারই শুধু হারায়নি, রফতানি বাণিজ্য পরিচালনার উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা এবং প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্যের প্রধান উৎসও হাতছাড়া করেছে।

ক্লুস লভন, বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে, দ্য টেলিগ্রাফ, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫

গত সপ্তাহে শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর একটি দল জড়িত বলে জানা গেছে। বাংলাদেশের সুরক্ষিত সীমান্ত থেকে বলা হয়, সশস্ত্র বাহিনী ক্ষমতা দখলের তিনদিন পর দেশ শান্ত আছে এবং নতুন শাসকদের কোন বিরোধী পক্ষ নেই। অধিকাংশ স্থানে কার্ফ্যু পালিত হয়েছে। তবে ঢাকা রেডিও থেকে বলা হয়েছে, সরকারি কর্মসূচি এমনকি অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল পুনরায় চালু হয়েছে। সীমান্তে চলাচল অথবা আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের বিষয়ে কোন কথাবার্তা হয়নি। টেলিযোগাযোগ কঠিন অবস্থায় আছে। ক্ষমতা রদবদলের প্রাক্কালে যে অল্পসংখ্যক লোক সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এসেছে তারা বলেছে, ৬০ হাজার সেনা সদস্য যার দুই-তৃতীয়াংশ পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে ফিরে এসেছে তারা সবাই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ফেরত আসা লোকজন বলেছে, সামরিক শাসকদের বাধা দেবার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। তারা খন্দকার মোশতাক আহমদকে সরকারে বসিয়ে দেশে সাধারণ শাসন জারি করেছে।

www.pathagar.com

যুদ্ধের নায়কঃ এ ঘটনার সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের পরিচিতি রোমাঞ্চকর। পশ্চিমা অধিকাংশ কূটনীতিক মনে করছেন ২৮ বছর বয়সী মেজর ডালিম এ ঘটনার কেন্দ্রে আছেন। মেজর ডালিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন নায়ক ছিলেন। তিনিই শুক্রবারে ঢাকা রেডিও থেকে দ্রুততার সাথে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণ এবং শেখ মুজিবকে হত্যার কথা ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তার নেতৃত্বের জন্যে জনগণের কাছে তিনি প্রশংসিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের অন্যান্য অনভিজ্ঞ কর্মকর্তার মত তিনিও শেখ মুজিব যখন রক্ষীবাহিনী গঠন করেন তখন ভীত হয়ে ওঠেন। রক্ষীবাহিনীতে ২০ হাজার অনিয়মিত চরমপন্থী ছিল। রক্ষীবাহিনীকে ব্যাপক প্রশিক্ষণ এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করে ভারত। লক্ষ্য আধুনিক অস্ত্র পাওয়া এবং উঁচু বেতন পাওয়া। এদেরকে মুজিবের রাজপ্রাসাদে প্রহরায় দেখা যেত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিত। এ কারণে দ্রুত অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে অধিকাংশ পশ্চিমাপন্থীর মধ্যে। ভীতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এ ঘটনার সূত্রপাত হয়।

মুজিবকে দিয়ে পরিসমাপ্তিঃ মেজর ডালিমকে কখনো কখানো রাগান্বিত দেখা যায়। শেখ মুজিব থেকে দূরে সরে থাকেন। বাংলাদেশ রেডক্রসের সভাপতি গাজী গোলাম মোস্ত ফা এবং শেখ মুজিবের একজন অনুরক্তের সাথে গণ্ডগোল করার দায়ে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কূটনীতিকরা বলেন, সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ক্ষমতা দখলে এদের নাম সহসা বেরিয়ে আসবে। মেজর ডালিম তাদের মধ্যে উঁচু আসন পাবার প্রত্যাশা করছেন। সূত্র বলেছে, এ দলটিকে পশ্চিমা একটি শক্তি মদদ যোগাচ্ছে। আর আছে ১০ জন কেবিনেট সদস্য। তারা শেখ মুজিব সরকারের সাবেক সদস্য। ভারত বা সোভিয়েতপন্থী না হওয়ায় দু'জন মন্ত্রী সেখানে টিকলেন না। রাশিয়া বাংলাদেশের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ঢাকা রেডিও থেকে বলা হয়, শেখ মুজিবকে তার গ্রামের বাড়িতে সপ্তাহ শেষে দাফন করা হয়েছে।

হার্ভি স্টকউইন, ফার ইষ্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ, হংকং, ২৯ আগস্ট, ১৯৭৫

বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায়ই যে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিবার্তা বাংলাদেশে অবতীর্ণ হয়, শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তারই মানবীয় রূপ। রাজনৈতিক মঞ্চে তার দৃপ্ত পদচারণার সঙ্গে, তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও আবেগের উচ্ছ্বাসে সবকিছু তলিয়ে গেলো। আজ মুজিব মঞ্চ থেকে চিরকালের মতো সরে গেছেন। কিন্তু দেশকে রেখে গেছেন রিক্ত, উৎসন্ন করে। কি ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার চূড়ান্ত হিসাব কেবল এখনই শুরু হতে পারে। মূলত শেখ ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি ঘটনাবলীর পশ্চাতে এগিয়ে গেছেন। বিক্ষোভকারীদের সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই তিনি জন্ম নিয়েছিলেন। বিক্ষোভকারীর ভূমিকা থেকে নিজেকে কখনও তিনি বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি এবং পরিণামে বিক্ষোভকারী মৃত্যুই বরণ করেছেন। শেখের মধ্যে তার অভিভাবক সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক সূক্ষ্মতা ও চাতুর্য ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীরূপে সোহ্‌রাওয়ার্দী পৃথক বাঙালি জাতীয় রাষ্ট্রের কথা তুলেছিলেন। ২৪ বছর পর শেখ মুজিবের কর্তৃত্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো। কিন্তু সারা জীবন না সূচক রাজনীতি করার ফলে নতুন জাতিকে বাস্তব কিছু দেয়ার মতো সামর্থ্য হলো না। এই রায় কর্কশ শোনাবে হয়তো। আংশিকভাবেই এই কঠোর মন্তব্যের উদ্ভব হয়, ১৯৫৭ সালে এক কাঁদুনে গ্যাসভিত্তিক সিক্ত পরিবেশে মুজিবের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তিনি যখন

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রিসভার সদস্য (আমার যদি ঠিক স্মরণ থাকে, তিনি বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী ছিলেন)। আওয়ামী লীগের মোকাবিলা করার জন্য তখন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করা হচ্ছিলো। সিন্ধু প্রদেশ থেকে আসলেন জিএম সৈয়দ। মুজিব বরাবরই প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখেছেন। কেননা, তিনি তার একমাত্র সমতুল্য গণ-বক্তা। সকলেরই জানা যে, ঢাকার ন্যাপের এই উদ্বোধনী সভা পণ্ড করতে শেখ মুজিব মনস্থ করেছেন এবং ঠিকই, যেই ন্যাপের উৎসাহী সমর্থকরা পল্টন ময়দানে জমায়েত হতে লাগলো, অমনি শেখের ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা গোলযোগ সৃষ্টি করতে শুরু করলো। মুহূর্তের মধ্যেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারি করে সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং পুলিশ লাঠিচার্জ করতে ও কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়তে লাগলো। পাকিস্তানি সাংবাদিকদের কাছ থেকে সম্যক অবহিত হয়ে অল্পকাল পরে অনুষ্ঠিত এক প্রেস কনফারেন্সে আমি শেখকে প্রশ্ন করলাম, গত রাতে ঢাকার প্রধান সিনেমা হলের পেছনে তিনি গুণ্ডাদের ঠিক কি বলেছিলেন। তিনবার পুনরাবৃত্তি করার পরও শেখ আমার প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করলেন এই বলে যে, তিনি আমার ইংরেজি বুঝতে পারেননি। এই ঘটনা ও অন্যান্য ঘটনা থেকেও শেখের বিকৃত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও একনায়কসুলভ মনোভাব কিছুসংখ্যক চিন্তাশীল বাঙালির কাছে বরাবরই পরিষ্কার ছিল। তবে বিগত কয়েক মাসেই কেবল তা অধিকসংখ্যক লোকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল ঘটনা প্রবাহ শেখের অনুকূলে ধাবিত হয়ে উপরোক্ত উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বাঙালিদের অধিকারের প্রধান প্রবক্তারূপে প্রতিভাত হওয়ার উত্তম সুযোগ করে দিল। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে সাইক্লোনজনিত বিপর্যয়ের পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি নির্লজ্জ অবহেলা তার একটি উদাহরণ। বিপর্যয়ের ভয়াবহতার মধ্যে মওলানা ভাসানী প্রথম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলেন। শেখ মুজিব পিছিয়ে পড়ার লোক নন। ভাসানীর বিরতির পর দিনই তিনি সাইক্লোনকে ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের আওয়ামী লীগের বিপুল সাফল্যের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করলেন। তারপর থেকে সবাই দেখতে পেলো যে, পাকিস্তানের ভাঙন অবশ্যম্ভাবী। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা অবশ্য এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের জন্য সূক্ষ্ম পদক্ষেপ নিতে শেখ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য সম্ভাবনাও তেমন ছিল না। কিন্তু একথা ঠিক যে, জুলফিকার আলী ভুট্টো সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সন্দেহ ছিল, যেমন ছিল শেখ মুজিব সম্পর্কে কিছুসংখ্যক বাঙালির। ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তানের সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। শেখ মুজিব তা ব্যাহত করতে পারতেন। যারা তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক সফরে উপদেশ দিয়েছিলেন তাদের কথা না শুনে তিনি ভুট্টোর হাতেই ধরা দিলেন। বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের ধারণা এবং আত্মবিশ্বাস কোনটাই শেখের ছিল না। প্রচলিত মতের বিরোধী হলেও শেখকে যারা জানতেন তাদের কেউ কেউ জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি বিশ্বাস করতেন না যে পাকিস্তানের ভাঙন অবশ্যম্ভাবী ছিল। দেশের ভাঙনকে ঠেকাবার কোনো পদক্ষেপ নিতে তিনি যেমন ব্যর্থ হয়েছেন, তেমনি ব্যর্থ হয়েছেন এমন কোনো সদিচ্ছা দেখাতে যা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৫ মার্চের আকস্মিক অভিযান নিবৃত্ত করতে পারতো। এরপর যে ট্র্যাজেডির সূত্রপাত হলো তারজন্য পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও ভুট্টো নিঃসন্দেহে দায়ী। তা হলেও বলতে হবে যে, শেখের বাগ্মীতার ফলেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও রক্তপাত শুরু হয় এবং তাতেই পশ্চিম পাকিস্তানের কঠোর মতাবলম্বীরা নৃশংসতার অভিযান আরম্ভ করার অজুহাত পায়। ১৯৭১ সালের ঘটনাবলী শেখকে জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু যে আশা-আকাঙ্ক্ষায় তিনি

www.pathagar.com

উদ্দীপ্ত করেছিলেন তা কার্যত পূরণ করার তার সামর্থ্য ছিল না। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট হলেন, তারপর প্রধানমন্ত্রী এবং এ বছরের জানুয়ারি মাসে আবার প্রেসিডেন্ট হলেন। শেখ ক্ষমতা ও খেতাব নিয়ে খেলা করেছেন, বাংলাদেশের আর্থিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার জন্য আদৌ কিছু করেননি। বাহ্যত সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার কর্তৃত্ব ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছিল। ঢাকা সম্পূর্ণ ঘুরে গেলো। পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রাস্ফীতির মুক্ত সেদিনগুলোর জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পেলো। জনৈক বাঙালি বুদ্ধিজীবী তিক্তভাবে বললেন, ১৯৭২ সালে শেখকে কেন ভুট্টো ছেড়ে দিয়েছিলেন জানেন? ভুট্টো সুচতুর। তিনি জানতেন যে, মৃত মুজিবের চেয়ে জীবিত মুজিবকে নিয়ে বাংলাদেশ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যা হোক মুজিবের স্মৃতি হয়ে বাংলাদেশে একটা কিছু দিতে পারতো। শেখ কেন কিছুই করতে পারলেন না এর কয়েকটা কারণ রয়েছে-প্রথমত ক্ষমতা সম্পর্কে তার অত্যধিক নিজস্ব মতবাদ ছিল। দ্বিতীয়ত, তার মধ্যে একটা গভীর হীনমন্যতার ভাবছিল যা আংশিকভাবে তার শিক্ষার অভাববোধ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তৃতীয়ত, শেখ কখনই বাংলাদেশের সুশিক্ষিত তর্কপ্রিয় বুদ্ধিজীবীদের কিংবা বুদ্ধিমান সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। যার ফলে শেখ ও বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা ব্যবধান বিদ্যমান ছিল। কোন পক্ষই তা দূর করার প্রয়াস পায়নি। বুদ্ধিজীবীদের প্রয়োজন ছিল শেখের, যেহেতু তার বিপুল জনসমর্থন ছিল। আর শেখেরও প্রয়োজন ছিল বুদ্ধিজীবীদের। কেননা, একাকী দেশের সমূহ সমস্যাবলী মোকাবিলা করার সাধ্য তার ছিল না। কিন্তু গত জানুয়ারি মাসে একচ্ছত্র ক্ষমতা দখল করে, বুদ্ধিজীবীদের আক্রমণ করে, তিনি তাদের আরো দূরে ঠেলে দিলেন। পরবর্তী ঘটনাবলী এবং ঘটনাবলীর অভাব-আরো স্পষ্ট করে তুললো, মুজিব তখনি গণসংযোগ হারিয়ে ফেলেছেন। তার একচ্ছত্র ক্ষমতা আত্মম্ভরিতায় রূপ পেলো, বাংলাদেশের অপ্রতুল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপায়ে পরিণত হলো না। বিপুল সময় ব্যয় করে প্রেসকে পঙ্গু করা হলো। শেখের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বলতে গিয়ে যারা ফেব্রুয়ারি মাসে মিত্র ছিলেন, মে অথবা জুন মাসে তারা শত্রু হয়ে পড়েন। শেখের একটানা চাটুকারিতা নিত্যকার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ালো। ক্রমবর্ধমান পুষ্টিহীনতা ও মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপারে চাটুকারিতার কিছুই ছিল না। অনেকেই একমত যে, শেখের যা করণীয় ছিল তা এই সামান্যতম সাফল্যের মাধ্যমে আরো একটু আশা জাগিয়ে তোলা। কিন্তু তিনি যে উপায় বেছে নিলেন তা তার ব্যর্থতাকেই সুনিশ্চিত করে দিলো। এরপর যা রইল তা তার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ। কিছুসংখ্যক লোককে এই আকর্ষণ টেনে নিয়ে গেলো বিপর্যয়ের মুখে। জনসাধারণের জন্য তার অনুগামী অনেক। এরা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। কেননা, মুজিবের সম্মোহনী শক্তি এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যা, বহুবিধ জটিল সমস্যার মধ্যে কোনো প্রকার শূন্যতা পূরণ করতে পারতো। তার ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে সে শূন্যতা আরো বেড়ে গেলো।

-o-

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি হিসেবে মোশতাক : মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগ

শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর আওয়ামী লীগের ৯৫ শতাংশ নেতা-কর্মীই মোশতাকের ক্ষমতা গ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ১৫ আগস্ট রাতেই খন্দকার মোশতাক আহমদ তাঁর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম বেতার ভাষণ দেন।

মোশতাক যে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন তাতে সবাই আওয়ামী লীগের ছিল। ১৫ আগস্ট মোশতাক প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করে তার নিয়ন্ত্রণে প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রেখেছিলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন মোহাম্মদ উল্লাহ। মোহাম্মদ উল্লাহর পর মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন-

(১) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী (হাসিনার সময়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হোসেন চৌধুরীর পিতা),

(২) অধ্যাপক ইউসুফ আলী, পরিকল্পনা মন্ত্রী,

(৩) ফনিভূষণ মজুমদার, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী,

(৪) মোঃ সোহরাব হোসেন, গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী,

(৫) আব্দুল মান্নান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী, (হাসিনার সময়ে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য),

(৬) মনোরঞ্জন ধর, আইন, সংসদীয় ও বিচারমন্ত্রী,

(৭) আব্দুল মোমেন, খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী, (হাসিনার সময়ে আওয়ামী লীগ নেতা),

(৮) আসাদুজ্জামান খান, বন্দর, জাহাজ চলাচল ও নৌ পরিবহন মন্ত্রী,

(৯) ড. এ.আর. মল্লিক, অর্থমন্ত্রী,

(১০) ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, শিল্প-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা এবং আণবিক শক্তি মন্ত্রী,

(১১) দেওয়ান ফরিদ গাজী, বাণিজ্য, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী, (হাসিনার সময় হবিগঞ্জ-৪ আসন থেকে নির্বাচিত এমপি ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা),

(১২) অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী, শিল্প প্রতিমন্ত্রী,

(১৩) শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, বিমান চলাচল, পর্যটন, ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার প্রতিমন্ত্রী,

(১৪) তাহের উদ্দিন ঠাকুর, তথ্য ও সম্প্রচার, শ্রম, সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী,

(১৫) মোঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, রেল যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী,

(১৬) কে.এম. ওবায়দুর রহমান, ডাক, টেলিফোন ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী।

২০ আগস্টে আরো পাঁচ জন নেতা মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন। তারা হলেন-

(১) মোমেন উদ্দিন আহমদ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সম্পদ ও বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী,

(২) মোসলেম উদ্দিন খান, পাট প্রতিমন্ত্রী,

(৩) ডাঃ ক্ষিতীশচন্দ্র মণ্ডল, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী,

(৪) রিয়াজ উদ্দিন আহমদ (ভোলা মিয়া), বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ প্রতিমন্ত্রী,

(৫) সৈয়দ আলতাফ হোসেন, সড়ক যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী।

www.pathagar.com

মোশতাক মন্ত্রিসভায় কোন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। ঐতিহাসিকভাবে এ কথাই সত্য যে, শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর পর গঠিত সরকার সকল বিচারেই ছিল আওয়ামী-বাকশালী সরকার। মন্ত্রিসভার একজন মাত্র সদস্য তথা প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ আলতাফ হোসেন ছিলেন বাকশাল উপলক্ষে বিলুপ্ত রুশপন্থী ন্যাপের নেতা, অন্যদিকে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানী বাকশাল গঠনের প্রতিবাদে দলত্যাগ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে খন্দকার মোশতাকের একটি বক্তব্য খুবই উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৪ সালের ১০ আগস্ট একজন ভারতীয় সাংবাদিককে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, '.....দেশকে সেই গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচাবার জন্য আমি ক্ষমতা নিয়েছিলাম। সেদিন তো ফণি বাবুও আমার পাশে ছিলেন .....আপনারা দেখেছেন সবই ছিল।'

খন্দকার মোশতাক আরো বলেছেন, 'পার্লামেন্ট থাকার দরুন আমি তিনটার সময় ওথ (শপথ) নিয়েছি। ক্যাবিনেটের অন্য সদস্যরা সাড়ে তিনটায় ওথ নিয়েছেন। সেদিন আওয়ামী লীগ-বাকশালের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা ছিলেন তারাই ওথ নেননি। তিনটার সময় ওথ নেয়ায় দায়িত্বটা আমার ওপর এসে পড়ল, আর যারা সাড়ে তিনটার সময় ওথ নিলেন তাদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই না কি?.....'।

শেষদিকে খন্দকার মোশতাক বলেছেন (ইংরেজি বক্তব্যের অনুবাদসহ), 'আমি জাতিকে রক্ষা করেছি। আমি আওয়ামী লীগের নেতাদের এবং প্রতিনিধিদের বাঁচিয়েছি। ক্ষুব্ধ জনতার ভয়ে একজন লোকও সেদিন প্রকাশ্যে ছিল না। সবাই ইঁদুরের গর্তে ছিল। (প্রতিপক্ষ) আমার বিরুদ্ধে উল্টো চার্জ (এনেছে যা) আওয়ামী লীগের লোক হওয়ায় আমার মন্ত্রিসভার সবাইকেও আমি আওয়ামী লীগ থেকে নিয়েছিলাম।' *(সূত্রঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেশে দেশে', পৃষ্ঠা. ২০২-২০৬)*

দেখা গেলো, শেখ মুজিবোত্তরকালের প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ নিজেও স্বীকার করেছেন যে, তিনি নিজে শুধু নন, তার মন্ত্রিসভারও সকলে বাকশাল তথা আওয়ামী লীগের নেতা ও প্রতিনিধি ছিলেন। ১৬ আগস্ট সরকারি মালিকানাধীন দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম সংবাদের মূল হেডিং ছিল 'খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ' (অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি সৈয়দ এবি মাহমুদ হোসেন রাষ্ট্রপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান)।'

প্রথম সংবাদের রিপোর্ট 'রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী জাতির বৃহত্তম স্বার্থে গতকাল (১৫ আগস্ট) প্রত্যূষে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া দেশের শাসনভার গ্রহণকালে শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় বাসভবনে নিহত হইয়াছেন। **বাসস'র সংবাদঃ** সমগ্র দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য সামরিক আইন জারি ও সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হইয়াছে। তবে মুসল্লীদের জুম্মার নামায আদায়ের সুযোগদানের জন্য গতকাল (১৫ আগস্ট) দুপুরে দেড় ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন শিথিল করা হয়। পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত জনসাধারণকে নিজ নিজ গৃহে অবস্থানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয় এবং সকল দেশপ্রেমিক ও শান্তিপ্রিয় নাগরিককে নতুন সরকারের সহিত সহযোগিতা করার অনুরোধ করা হয়।'

১৬ আগস্ট ইত্তেফাকের ১ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল 'ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণে গতকাল (১৫ আগস্ট শুক্রবার) প্রত্যূষে প্রবীণ জননায়ক খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সরকারের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ববর্তী সরকারের ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছেন এবং এক ভাবগম্ভীর অথচ

www.pathagar.com

অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের আইন-শৃঙ্খলা সংস্থাসমূহ যথাঃ বাংলাদেশ রাইফেলস, পুলিশ এবং রক্ষীবাহিনীর প্রধানগণও নতুন সরকারের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন....আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের দায়িত্ব অনেক। বাংলাদেশের এক মহাক্রান্তিলগ্নে জননায়ক খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী যে, ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে সুসংগঠিত করিতে হইলে জনগণের প্রতি অর্জিত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে আমাদের সকলকে আজ ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া যাইতে হইবে।'

১৬ আগস্ট আরও কয়েকটি অর্থবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৬ আগস্ট মওলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং ওই পরিবর্তনকে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেন। ১৭ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবর, 'মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী নয়া সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। বাসস জানায়, গতকাল (১৬ আগস্ট শনিবার) রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত এক তারবার্তায় তিনি এই পরিবর্তনকে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলিয়া উল্লেখ করেন। এই দেশ হইতে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অবিচার দূর করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নতুন সরকার ও আপনার (মোশতাকের) উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক।'

খন্দকার মোশতাক ক্ষমতা গ্রহণ করায় পাকিস্তান, সৌদি আরবসহ বেশিরভাগ মুসলিম দেশ আনন্দিত হয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জেড এ ভুট্টো বাংলাদেশকে ৫০ হাজার টন চাল ও দেড় কোটি গজ কাপড় উপঢৌকন পাঠানোর ঘোষণা দেন। ১৬ আগস্ট সৌদি আরব ও সুদান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৬ আগস্ট ভারতীয় সরকারি মুখপাত্র বাংলাদেশের ক্ষমতায় পরিবর্তন সম্পর্কে বলেন, 'প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতিধারার প্রতিক্রিয়া আমাদের উপর না হওয়ার কোন অবকাশ নাই। কিন্তু এইগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।' *(সূত্রঃ ডেইলী বাংলাদেশ টাইমস, ১৭ আগস্ট, ১৯৭৫)।*

এই দিন এক নির্দেশে রেডক্রসের চেয়ারম্যানের পদ থেকে গাজী গোলাম মোস্তফাকে অপসারিত করে নয়া চেয়ারম্যান হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বি.এ সিদ্দিকীকে নিয়োগ করা হয়।

১৭ আগস্ট বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোশতাক-এর সঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী এম মনসুর আলী বৈঠক করেন। তথ্য দফতর থেকে প্রেরিত আলোচ্য বৈঠকের ফটো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আলোচনার বিস্তারিত কোন বিবরণ দেয়া হয়নি। ১৮ আগস্ট রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সাক্ষাত করেন। সাথে সাথে মাহবুব আলম চাষী রাষ্ট্রপতির মুখ্যসচিব এবং উপদেষ্টা হিসেবে শরিফুল হক ও জহিরুল হকের নিয়োগ করা হয়।

১৮ আগস্ট ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী সমর সেন দিল্লী থেকে বিমানযোগে কলিকাতা এবং সেখান থেকে মোটরযোগে বেনাপোল হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। পরদিন তিনি সরাসরি বঙ্গভবনে গমন করে নয়া রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাককে অভিনন্দন জানান। কোলাকুলির এই ফটো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

১৯ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছিল 'সংস্থাপন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ হোসেন অপসারিত।' ১৯ আগস্ট ইরান ও কাতার আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। ২১ আগস্ট টিসিবির ডিরেক্টর গোলাম আকবর চৌধুরীকে অবসর দান করা হয়। নিহত প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা নিরাপত্তার ভয়ে ২১ আগস্ট ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয়গ্রহণ করেন। তিনি

www.pathagar.com

তার স্বামী ড. এম.এ. ওয়াজেদ মিঞা ও দুই সন্তানসহ তখন পশ্চিম জার্মানিতে ছিলেন। ড. ওয়াজেদ সেখানে গবেষণা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তারা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে ভারত সরকার তা অনুমোদন করেন। *(সূত্রঃ জাতীয় রাজনীতি ১৪৫-১৯৭৫, অলি আহাদ)*

শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানাও তখন তার স্বামী ড.সফিক সিদ্দিকীর সঙ্গে বিদেশে ছিলেন। খন্দকার মোশতাক আহমদ ২২ আগস্ট রাষ্ট্রপতির অগণতান্ত্রিক ৯ নং আদেশ বাতিল ঘোষণা করেন এবং ইত্তেফাক পত্রিকা তার মালিককে ফেরত দেন। সাথে সাথে সংবাদ পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়। দৈনিক সংবাদ ফিরিয়ে দেয়া হয় আগের মালিক আহমেদুল কবিরকে। ঐ দিনই সংবাদ কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতির কাছে পত্রিকাটি তাদের হাতে প্রত্যর্পণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ২২ আগস্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পেরু যাত্রা করেন। ২৪ আগস্ট জেনারেল ওসমানী খন্দকার মোশতাকের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন। একই দিন ভাসানী ন্যাপের মশিয়ুর রহমান ও বাংলা জাতীয় লীগের অলি আহাদকে মুক্তি দেয়া হয়। এই ক'দিনে চালের দর মণপ্রতি ১৬০ টাকা অর্থাৎ সের প্রতি চার টাকা কমে যায়। মানুষের মনে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে। প্রেসিডেন্ট মোশতাক ২৪ আগস্ট সেনাবাহিনী প্রধান সফিউল্লাহর চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেন। সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত করেন প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট বিমান বাহিনীর প্রধানকেও সরিয়ে দিয়ে তার চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করেন এবং পশ্চিম জার্মানি থেকে ডেকে এনে এয়ার ভাইস মার্শাল এম.জি তাওয়াবকে বিমান বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেন। আরো কিছুদিন পর ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণরত ব্রিগেডিয়ার হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে দেশে এনে মেজর জেনারেল পদোন্নতি দিয়ে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ করা হয়। প্রেসিডেন্টের অপর একজন উপদেষ্টা নিযুক্ত হন সাবেক পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক।

২৪ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকের সংবাদ শিরোনাম ছিল 'দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগের সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীসহ মোট ২৬ জন গ্রেফতার।' এরা হচ্ছেন, ১. সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ২. এম মনসুর আলী, ৩. তাজউদ্দীন আহমদ, ৪. এএইচএম কামরুজ্জামান, ৫. আব্দুস সামাদ আজাদ, ৬. আব্দুল কুদ্দুস মাখন, ৭. শেখ আব্দুল আজিজ, ৮. এম কোরবান আলী, ৯. আনোয়ার জং এমপি, ১০. মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, ১১. মোঃ হায়দার আলী, ১২. ডাঃ আহসাবুল হক এমপি, ১৩. মোঃ আফজল ওরফে নান্টু, ১৪. জিনাত আলী, ১৫. ডা. হায়দার আলী, ১৬. গাজী মোস্তফা কামাল গামা, ১৭. আলেকজান্ডার রোডারিকস, ১৮. আব্দুল হাই, ১৯. মানিক চৌধুরী ওরফে ভূপতি মজুমদার ২০. এটিএম সৈয়দ হোসেন, ২১. দেলোয়ার হোসেন এবং ২২. মোসাদ্দেক আলী খান বাবলা প্রমুখ। ২৪ আগস্টই দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বাংলাদেশের হাই কমিশনার খান শামসুর রহমান সাক্ষাত করেন। সাক্ষাত শেষে ভারতীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী শুক্লা ঘোষণা করেন, 'ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণার সুযোগ দেয়া হবে না।'

২৬ আগস্ট সামরিক আইনে আরও ২ জন সচিব যথাক্রমে ক্যাবিনেট সচিব টি ইমাম এবং বন সচিব নুরুদ্দীন আহমদকে গ্রেপ্তার করা হয়। খন্দকার মোশতাক আহমদ সামরিক আইন জারি করলেও সংবিধান কিংবা সংসদ বাতিল করেননি বলে ঘোষণা দেন এবং

www.pathagar.com

সংসদ সদস্যদের দিয়ে নিজের রাষ্ট্রপতিত্ব বৈধ করিয়ে নেবার জন্য কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হন। তাতে কোনো ফল হয়নি। প্রচণ্ড বিতর্ক হয় বঙ্গভবনে। প্রেসিডেন্ট ২৮ আগস্ট ৬১ জেলা গভর্নর নিযুক্ত আদেশ বাতিল করেন। বলা হয়, '১৯টি জেলা পূর্বের মতোই কাজ করবে।' একই সঙ্গে ২টি বিশেষ সামরিক আদালত গঠন করা হয়। ২৯ আগস্ট বিআরটিসি'র চেয়ারম্যানকে গ্রেফতার করা হয়। ওয়াপদার গণসংযোগ পরিচালক তাজুল ইসলাম রাষ্ট্রপতি মোশতাক আহমদের প্রেস সেক্রেটারী মনোনীত হন।

৩০ আগস্ট বাকশাল গঠনের অধ্যাদেশ বাতিল করে দেন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ। সঙ্গে সঙ্গে দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ৩১ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকের সংবাদে বলা হয়, 'গতকাল (শনিবার) এক অর্ডিন্যান্সবলে সরকার কোনরকম রাজনৈতিক দল গঠন, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান আয়োজন অথবা উহার সদস্য হওয়া অথবা অন্য কোনভাবে তৎপরতায় শরিক হওয়া অথবা সংশ্লিষ্ট থাকা নিষিদ্ধ করেছে।' 'আগামীকাল ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার দৈনিক সংবাদ-এর প্রকাশনা পুনরায় শুরু।'

৩১ আগস্ট গণচীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। আগস্টের শেষ দিকে এবং সেপ্টেম্বরে টাঙ্গাইলের বাকশাল পদ্ধতির জেলা গভর্নর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী মুজিব হত্যার প্রতিবাদে একটি যুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়গ্রহণ করেন। ৪০ জন সংসদ সদস্য এবং প্রচুরসংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মী, সমর্থক কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার জেনেশুনেই তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। এমনকি এদেরকে নতুন করে অস্ত্র এবং অস্ত্রের প্রশিক্ষণও দেয়। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় কিছু আক্রমণও পরিচালিত হতো তাদের দ্বারা। তাতে উভয়পক্ষ বেশকিছু হতাহতও হয়। তবে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হওয়ায় ভারত সরকারও জোরেশোরে ওইসব ব্যক্তিদের সমর্থনদানে অক্ষমতা প্রকাশ করে। *(সূত্রঃ সাপ্তাহিক রোববার, ৯ নভেম্বর, ২০০৩)*

২১ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট সামরিক আইন আদেশবলে সংসদের শূন্য আসনগুলোতে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান পরবর্তী ৬ মাস পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করেন। ২২ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সাক্ষাৎ করার এই ঘটনাকেই পরবর্তীতে আওয়ামী সমর্থিত পরজীবী মহলের পক্ষ থেকে খন্দকার মোশতাকের প্রতি মওলানা ভাসানীর সমর্থনের প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। প্রেসিডেন্ট মোশতাক কেন মওলানা ভাসানীর কাছে গিয়েছিলেন এবং ঐ যাওয়াটা আদৌ অস্বাভাবিক ছিল কি না, সে প্রসঙ্গে আলোচনায় যাওয়ার দরকার।

মওলানা ভাসানীর মতো মহান নেতার জন্য এ ধরনের ঘটনা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। পাকিস্তান যুগে মুহাম্মদ আলী ও লিয়াকত আলীর পর এমন কোন গভর্নর জেনারেল, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রাদেশিক গভর্নরের নামোল্লেখ করা যাবে না যিনি কোন না কোন সময়ে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাত না করেছেন। অন্য সকলকে পাশে রেখে শুধু মুজিবুর রহমানের প্রসঙ্গে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল সমস্যায় তিনি মওলানা ভাসানীর কাছে গেছেন। গেছেন অত্যন্ত স্নেহভাজন

www.pathagar.com

হিসেবে, যাঁকে মওলানা ভাসানী 'নিজের ছেলের মতো' বলতেন প্রকাশ্যেই। কিন্তু পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে সবসময় শেখ মুজিব প্রকাশ্যে যাননি। প্রকাশ্যে যখন গেছেন, তখন সকলের সামনে মওলানা ভাসানীকে তিনি পায়ে হাত দিয়ে কদমবুচি করেছেন এবং সে ছবিও সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সহজবোধ্য কারণে শেখ মুজিব বেশিরভাগ গেছেন গোপনীয়তার সঙ্গে। তথ্যাভিজ্ঞদের মতে রাজধানীতে এবং সন্তোষে তো বটেই, দু'জনের সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়েছে এমনকি ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মতো অচিন্তনীয় অনেক স্থানেও। কিন্তু সঙ্গত কারণেই এ বিষয়ে কোনো সংবাদ প্রচার করা হয়নি। ভাসানী-মুজিবের এ ধরনের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে চমৎকার একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী। ভাসানীকে যেমন জেনেছি, গ্রন্থে তিনি লিখেছেন (পৃষ্ঠা. ৭৮-৭৯), '....গভর্নরদের নাম ঘোষণার তিন-চারদিন আগে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে গণভবনে গেছি। দেখি বঙ্গবন্ধু বের হচ্ছেন। দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, কোনো কাজ আছে নাকি? বললাম, না, এমনিই আপনাকে দেখতে এসেছিলাম। বঙ্গবন্ধু আর ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেব একটা টয়েটা গাড়িতে উঠলেন। সাধারণত বাড়িতে ফেরার সময় তিনি মার্সিডিজে ফেরেন এবং একা। আমি ভাবলাম, বঙ্গবন্ধুর, পিছু পিছু তাঁর বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে বাসায় ফিরবো। ওমা! গণভবনের গেট ছেড়ে গাড়ি ডানে না গিয়ে বায়ে মোড় নিলো। আমরাও পিছু নিলাম। ভাবলাম অন্য কোথাও যাবেন। ফার্মগেট থেকে শহরের দিকে না গিয়ে গাড়ি ঘুরলো টাঙ্গাইলের দিকে। অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে আমরা যখন চৌরাস্তা পর্যন্ত এলাম, তখনো বুঝতে পারিনি যাচ্ছেন কোথায়। চৌরাস্তায় এসে পরে বুঝলাম টাঙ্গাইল যাচ্ছেন। সত্যিই তাই। উনি সন্তোষ গেলেন। বাড়ির সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো। বঙ্গবন্ধু ও মনসুর ভাই হুজুরের ঘরে গেলেন। আমি প্রায় তিনশ' গজ পেছনে রাস্তা থেকে দূরে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। খুব সম্ভবত তাদের মিনিট চল্লিশেক আলাপ হলো। আবার ছুটলেন ঢাকার দিকে। আমি পিছু নিলাম। সন্তোষ থেকে সোজা ধানমণ্ডি। হাওয়ার বেগে বাড়ি ফিরে এলো। ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির মোড়ে গাড়ি থামালাম আর এগুলাম না। কাণ্ড কারখানা দেখার জন্য গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে ছিলাম। যেভাবে গাড়িটা বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিলো, মিনিট চারেক পর সেভাবেই আবার বেরিয়ে এলো। আমি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে, তাই গাড়ির আলো সোজাসুজি আমার চোখে পড়েছিল। গাড়ি এসে আমার সামনে থামলো। দেখি পেছনে মনসুর ভাই বসা। মুখ বের করে জিজ্ঞেস করলেন, কাদের তুমি এখানে?

কি আর করবো? আপনারা ওভাবে একা একা গেলে দাঁড়িয়ে না থেকে উপায় কি?

-ও তাহলে ড্রাইভার যে বারবার বলছিলো, কেউ আমাদের ফলো করছে সেটা ঠিক? তুমি আমাদের পিছু নিয়েছিলে?

–না নিয়ে উপায় কি বলুন। হাত চেপে ধরে বললেন, খবরটা যেন বাইরে না যায়।'

ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়েছে মূলত ভাসানীর মহানুভবতা এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাঁর গুরুত্বের দিককে উপস্থাপিত করার প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে। বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে পরামর্শ দিয়েছেন এবং কখনো তিনি 'পাছে লোকে কিছু বলে' প্রবাদকে গুরুত্ব দেননি। গোপনীয়তা রাখা হয়েছে শেখ মুজিবের স্বার্থে। প্রেসিডেন্ট মোশতাককেও মওলানা ভাসানী একই জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবের মতো না হলেও খন্দকার মোশতাক আহমদও

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীর স্নেহভাজন ছিলেন। প্রাসঙ্গিক অন্য তথ্যটি হলো, ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট হিসেবে মোশতাকই 'সরকারিভাবে' মওলানা ভাসানীকে গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী এ.আর. মল্লিকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ ৩ অক্টোবর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণ দেন। ভাষণে ১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট থেকে দেশব্যাপী রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ১৯৭৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নতুন সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। ঐ ভাষণে প্রেসিডেন্ট মোশতাক আরো বলেন, 'সব রাজবন্দিকে বিনা শর্তে মুক্তি প্রদান করা হবে এবং রাজনৈতিক কারণে কারো বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হবে না।'

২৬ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমদ ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানে মুজিব ও অন্য যারা নিহত হয়েছেন তাদের হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রার্থনা করে কোন আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে না এমন বিধানসম্বলিত 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' জারি করেন। ঈদুল ফিতরের পর ১৬ অক্টোবর বঙ্গভবনে জাতীয় সংসদ সদস্যদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট মোশতাক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে ২৬০ জন সংসদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কেউ কেউ প্রেসিডেন্ট মোশতাকের ক্ষমতা দখলের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁকে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন।

www.pathagar.com

৭ নভেম্বরের বিপ্লব

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর জুড়ে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। ৩১ অক্টোবর থেকে প্রকাশ হতে থাকে এর আলামত। সে এক দুঃস্বপ্নের সময়। গুজব রটতে থাকে যে, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান গৃহবন্দি অথবা নিহত হয়েছেন। বঙ্গভবন থেকে রাষ্ট্রপতির নামে যেসব নোট ইস্যু হতে থাকে, তাতে রাষ্ট্রপতির নাম বা স্বাক্ষর ছিল না। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, ক্ষমতা দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোশতাক। দেশের বেতার বা সংবাদপত্রে রাষ্ট্রপতি মোশতাকের বরাত দিয়ে কোনো খবর প্রচার বা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়।

৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান নিহত হন। ৪ নভেম্বর সকল মস্কোপন্থী দল এবং বাকশালীরা শেখ মুজিবের বাড়ির দিকে এক শোক মিছিল করে এগিয়ে যায়। মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন জহুরুল হক হলে একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করে, সেখান থেকে বেতারে সংবাদপত্রে নানা ধরনের নির্দেশ দিতে থাকে। সেদিনই খন্দকার মোশতাক মন্ত্রিসভার তাহের উদ্দিন ঠাকুর ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। নভেম্বর মাসের প্রথমদিকে দেশে আসলে কি ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে তা দেশবাসী বা মিডিয়া আঁচ করতে পারেনি।

৩ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর ছিল দেশ ও জাতির জন্য সুকঠিন, সংকট-সন্ধিকাল। ৩ থেকে ৬ নভেম্বর মূলত দেশে কোন সরকারই ছিল না। ৩ থেকে ৬ নভেম্বর বাংলাদেশের মানুষ বাস করেছে এক অসহনীয় আশঙ্কাঘেরা পরিবেশে। রাস্তা দিয়ে তাদের চলাফেরা দেখলে মনে হত যেন মৃত লাশ রাস্তায় চলাফেরা করছে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতিতে পুলিশ সবকিছুতে নিয়ন্ত্রণ রাখতে ব্যর্থ হয়। গোটা রাজধানী একটি ভৌতিক এলাকায় পরিণত হয়। চারদিকে শোনা যায় নানা গুজব। রাজনৈতিক-সামাজিক পট পরিবর্তনের আভাসে একটি অস্বস্তিকর থমথমে ভাব বিরাজ করতে থাকে।

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী-বাকশালী সরকারের পতন ঘটলে জনমনে স্বস্তির ভাব ফিরে এলেও যেহেতু এ অভ্যুত্থান ছিল মাত্র কিছুসংখ্যক দুঃসাহসী সেনানায়কের একটি অসমাপ্ত বিপ্লব, সুতরাং এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছিল অনিবার্য। ৩ নভেম্বর সেই অনিবার্য বিপ্লব তথা অভ্যুত্থান সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ব্যক্তি খালেদ মোশাররফ আর একটি পাল্টা ক্যুয়ের মাধ্যমে ঘটান। ৩ নভেম্বরই ঢাকা সেনানিবাসে এক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তিনি সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াকে পদচ্যুত ও গ্রেফতার করেন। তিনি জিয়াকে অন্তরীণ করে রাখেন এবং তার ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখার ব্যবস্থা করেন। জিয়ার টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তার সাথে বাইরের সকল যোগাযোগ বন্ধ করা হয়। একই সঙ্গে তিনি নিজে পদোন্নতি নিয়ে সেনাবাহিনী প্রধানের পদটি দখল করে বসেন। ৪ নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের কাছ থেকে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সম্ভাব্য সংঘাত এড়ানোর পর ৬ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ বঙ্গভবনের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেন, প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদকে গ্রেফতার করেন এবং তার মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন।

www.pathagar.com

খালেদ মোশাররফ প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোঃ সায়েমকে দেশের প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্তি দেন এবং প্রেসিডেন্ট সায়েম জাতীয় সংসদকে বাতিল ঘোষণা করেন। যে কোন ব্যাখ্যায় খালেদের সকল কর্মকাণ্ড ছিল অবৈধ, ক্ষমতাও তিনি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দখল করেছিলেন। কিন্তু সে সময় যেমন, পরবর্তীকালেও তেমনি একথা প্রচার করা হয়েছে যে, সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা তথা চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই নাকি তিনি অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। বাস্তবে এই প্রচারণা সত্ত্বেও খালেদের অভ্যুত্থানটি রাজনৈতিক পরিচিতি পেয়েছিল এবং সঠিকভাবেই বাকশালপন্থী অভ্যুত্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। ভারতীয় বেতারে সমর্থনমূলক পরোক্ষ প্রচারণা, আওয়ামী-বাকশালীদের প্রকাশ্য তৎপরতা এবং তার নিজের মা ও ভাই-এর অংশগ্রহণ অনুষ্ঠিত 'শোক মিছিল'সহ বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে একথা প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, নতুন পর্যায়ে আবারও একটি বাকশালী ও ভারতপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল খালেদের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাকশালী ও ভারতপন্থী পরিচিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অন্য একটি প্রধান কারণ। সেনাবাহিনীর সকল পর্যায়ে জনপ্রিয় জিয়াকে পদচ্যুত ও গ্রেফতার করে সেনাপ্রধানের পদ দখল করায় খালেদের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যেও খালেদবিরোধী মনোভাব প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল। এ সময় একটি গুজব ছড়িয়ে যায় যে, খালেদ আওয়ামী লীগ ও একটি বিদেশি রাষ্ট্রের পক্ষে পাল্টা ক্যু ঘটিয়েছেন। এরূপ অবস্থায় সেনা ছাউনির হাজার হাজার সাধারণ সৈনিক ও জনতা একত্র হয়ে একটি অভ্যুত্থান ঘটান। নিহত হন খালেদ মোশাররফ। রাষ্ট্রপতি সায়েম হন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান পুনরায় সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালে নেতৃত্বহীন জাতিকে নেতৃত্ব দিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই সাহসী মেজর, ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তন হলে ৭ নভেম্বর বিপ্লবের পর সিপাহী জনতার ঠিকানা হয়েছিলেন সেই মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। সায়েম রাষ্ট্রপতি হলেও দেশবাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় জিয়াউর রহমানের প্রতি। বিশেষ করে প্রগতিশীল তরুণ সমাজের কাছে তিনি আবির্ভূত হলেন আলোর দিশারী হিসেবে। সারা দেশে নগরে নগরে উল্লাসমুখর সিপাহী আর জনতা প্রদক্ষিণ করে। সেনাবাহিনীর জওয়ানকে বুকে জড়িয়ে ধরে চাষা, আলিঙ্গন করে নাগরিক, ট্যাঙ্কের গলায় ওঠে মালা। যেন ঘুমন্ত নগরী হঠাৎ জেগে উঠে উৎসবে মুখরিত হয়ে। জনগণ আর একবার আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেয়।

৭ নভেম্বরের ঘটনার সাথে কর্নেল তাহেরের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে বেশ তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে। কর্নেল তাহেরের বিষয়ে আমি কোন নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরতে চাই না। তবে শাহ আহমদ রেজার '৭ নভেম্বরঃ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম' শীর্ষক লেখা পড়লেই সহজেই অনুমান করা সম্ভব প্রকৃত ঘটনা কি? শাহ্ আহমদ রেজা লিখেছেন, '.....বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'-এর প্রতিষ্ঠা ছিল ৭ নভেম্বরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অর্জন। সৈনিক-জনতার এই অর্জন পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং স্থাপিত হয়েছে সংবিধানের প্রারম্ভে। ৭ নভেম্বরের বিপ্লব অবশ্য স্বাধীনভাবে সংঘটিত হয়নি, এর সাফল্য ও অর্জনের জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। নিন্দিত ও জনসমর্থনহীন খালেদের পতনের পর মুহূর্তেই শুরু হয়েছিল নতুন ষড়যন্ত্র এবং সে পর্যায়ে দৃশ্যপটে এসেছিলেন লেঃ কর্নেল আবু তাহের। জাসদ এবং তাহের ভক্তদের পক্ষ থেকে এমন একটি প্রচারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে যে, কর্নেল তাহের নাকি ৭ নভেম্বর সংঘটিত বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তার নেতৃত্বাধীন গণবাহিনী ও সৈনিক

www.pathagar.com

সংস্থার সদস্যরাই নাকি খালেদের পতন ঘটিয়ে জিয়াকে মুক্ত করেছিলেন। প্রচারণায় দাবি করা হয়, জিয়া তাহেরের কাছে তার জীবন বাঁচানোর জন্য 'আবেদন' জানিয়েছিলেন এবং মুক্তিলাভের পর নাকি তাহেরের সঙ্গে 'বিশ্বাসঘাতকতা' করেছিলেন। জাসদ এবং তাহেরে ভক্তদের এসব দাবি ও বক্তব্য কিন্তু তথ্যনির্ভর পর্যালোচনায় গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। বন্দি জেনারেল জিয়া আদৌ টেলিফোনে বা অন্য কোনভাবে 'আবেদন' জানানোর মতো অবস্থায় ছিলেন কি-না এ প্রশ্নের কোন বিশ্বাসযোগ্য সদুত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। এদিকে জাসদের পাশাপাশি কর্নেল তাহেরকে কৃতিত্বদানকারী বামপন্থী নেতাদেরও অনেককে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, ৭ নভেম্বরের সফল বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী সৈনিকরা এমনকি গণবাহিনীর নামটি পর্যন্ত জানতেন না। সৈনিকরা বরং গণবাহিনীর কথিত সদস্যদেরকে "মুজিববাদী" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেয়েছেন.....বস্তুত প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনায় বরং এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে যে, সাধারণভাবে আংশিক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে কর্নেল তাহের আসলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার উদ্দেশ্যে ঘটনাপ্রবাহে জড়িত হয়েছিলেন। জেনারেল জিয়াকে বিপাকে ফেলার এবং সাধারণ সৈনিকদের বিভ্রান্ত ও আকৃষ্ট করার কৌশল হিসেবে এমন এক অরাজক পরিস্থিতিতে তিনি ১২ দফা দাবি উপস্থিত করেছিলেন, যখন জিয়ার স্থানে তাহের নিজে থাকলেও তার পক্ষে ঐসব দাবি পূরণ করা সম্ভব হতো না। কর্নেল তাহের একই যোগ তথাকথিত 'শ্রেণী সংগ্রামকেও' সর্বাত্মক করেছিলেন। জিয়াসহ অফিসার মাত্রের বিরুদ্ধেই তিনি সৈনিকদের উস্কানি দিয়েছিলেন এবং এর ফলে দেশের সকল সেনানিবাসে অসংখ্য অফিসারকে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যখন কর্নেল তাহেরকে গ্রেফতার করা ছাড়া সরকারের জন্য আর কোন পথ থাকেনি। '৭৫ সালের ২৪ নভেম্বর তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার শেষে ফাঁসিতে তার মৃত্যু হয় '৭৬ সালের ২১ জুলাই। পর্যালোচনায় দেখা যাবে, প্রধান তিনটি কারণে কর্নেল তাহের কোন জনসমর্থন পাননি এবং নিজেই নিজের মর্মান্তিক পরিণতিকে অবশ্যম্ভাবী করেছিলেন। (এক) তেমন কার্যকর ভূমিকা পালন না করেও তিনি নেতৃত্বের অধিকার দাবি করে বসেছেন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের অন্য কোন পর্যায় উদ্যোগ পর্যন্ত না নিয়ে শুধু সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে তথাকথিত "শ্রেণী সংগ্রাম" শুরু করেছেন। অফিসারমাত্রকে "ধনিক শ্রেণীর সন্তান" হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের হত্যার যে ভয়ানক কৌশল তিনি নিয়েছিলেন, তার বাস্তবায়ন ঘটলে দেশের সেনাবাহিনী অফিসারবিহীন হয়ে পড়তো এবং একমাত্র কর্নেল তাহের ছাড়া আর কোন অফিসার জীবিত থাকতো না। পরিণতিতে সেনাবাহিনীই ধ্বংস হয়ে যেতো। (দুই) সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব ধ্বংসের লক্ষ্যে প্রণীত এই কৌশল ও পরিকল্পনাকে জনগণ এবং দেশপ্রেমিক সৈনিকরা সে সময় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ববিরোধী এবং ভারতপন্থী নতুন ষড়যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখেও দাঁড়িয়েছে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে। (তিন) কর্নেল তাহেরের আপন ভাইসহ চারজন যুবক ভারতীয় হাই কমিশনারকে অপহরণের নামে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে বাংলাদেশের ওপর ভারতের সামরিক আক্রমণ পর্যন্ত ঘটতে পারতো (২৬ নভেম্বর, ১৯৭৫)। এই ঘটনাকে উস্কানিমূলক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের আক্রমণকে অবশ্যম্ভাবী করা, বাংলাদেশে ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং ৭ নভেম্বরের সকল অর্জনকে ধ্বংস করে দেয়া। বিশ্লেষণের এই দৃষ্টিকোণ থেকে একথা মানতেই হবে যে, কর্নেল তাহেরের সে সময়ের ভূমিকা দেশের

www.pathagar.com

স্বার্থ এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। আর তাই তাহের ভক্ত অনেককেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, কর্নেল তাহেরকে গ্রেফতার করা এবং ফাঁসি দেয়া হলেও কোন পর্যায়ে কোন "বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়নি"। কর্নেল তাহেরের দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এবং ৭ নভেম্বরের বিপ্লব পরিপূর্ণতা পেয়েছিল এবং দেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল নতুন এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে। বাংলাদেশে এরপর বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বাধাগ্রস্ত হয়েছে ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টা। সৈনিক-জনতার অসাধারণ ঐক্যের ফলে ভারতের পক্ষে সামরিক অভিযান চালানোও সম্ভব হয়নি.... ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল তাহেরের ব্যর্থতা ও পরিণতি আওয়ামী লীগ ও জাসদকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, দল দু'টির নেতৃবৃন্দ এমনকি এক মঞ্চেও এসেছেন। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় দেখা যাবে, আওয়ামী লীগ ও জাসদের ঐক্য শুধু বিচিত্র নয়, এ ঐক্যের মধ্যে রয়েছে জনগণের সঙ্গে প্রতারণার অঘোষিত উদ্দেশ্যও। দু'টি মাত্র তথ্যের উল্লেখ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। (এক) আওয়ামী লীগ সরকারের নীতি ও কার্যক্রম সমর্থন করেননি বলেই স্বাধীনতার পর পর ১৯৭২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কর্নেল তাহের সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। সেই সাথে তিনি জাসদেও যোগ দিয়েছিলেন-যে দলটির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল আওয়ামী লীগ সরকারের বিরোধিতা করার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে। (দুই) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল একটি বাকশালী সরকারকে ক্ষমতাসীন করা। অন্যদিকে কর্নেল তাহের চেয়েছিলেন খালেদ মোশাররফকে উৎখাত করতে। অর্থাৎ, খালেদ ও তাহেরের সম্পর্ক ছিল চরমভাবে শত্রুতাপূর্ণ এবং তারা ছিলেন পরস্পরবিরোধী অবস্থানে। সুতরাং খালেদ মোশাররফ ও আবু তাহেরের সমর্থকদের জন্যও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোন সুযোগ নেই, যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। কিন্তু তারপরও তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন বলেই আরো একবার সামনে এসেছে পুরনো একটি অভিযোগ। অতি বিপ্লবী শ্লোগান ও হটকারী কর্মকাণ্ডের কারণে প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই অভিযোগ উঠেছিল যে, জাসদ আসলে সমাজতন্ত্রের শ্লোগানমুখে সমাজতন্ত্রকে ঠেকাতে চায়, দেশপ্রেমিক ও বামপন্থীদের ধ্বংস করতে চায় এবং টিকিয়ে রাখতে চায় আওয়ামী লীগ সরকারকে। '৭৫ সালের নভেম্বরসহ পরবর্তী দিনগুলোতে এই অভিযোগ আরো শক্তিশালী হয়েছিল। সেই সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, রুশ-ভারতের বিরোধিতার আড়ালে জাসদ বিশেষ করে ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে এবং সে লক্ষ্যেই কর্নেল তাহেরকে সামনে নিয়ে এসেছে।' *(সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব, ৮ নভেম্বর, ১৯৯৯)*

এক নজরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত মন্তব্য
প্রাণবন্যায় উচ্ছল নগরী
(দৈনিক ইত্তেফাক, বিশেষ সংখ্যা, ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫)

ইত্তেফাক রিপোর্ট ঃ পথে পথে আজ জনতার কলরোল, পথে আজ বিজয়ের আনন্দ। তমসাচ্ছন্ন রাত্রির ঘনঘোর অমানিশার অবসান ঘোষণা করিয়া হেমন্তের প্রভাতসূর্যের আগমনের সাথে সাথে পথে নামিয়াছে আনন্দোচ্ছল অজস্র মানুষের ঢল। মানুষের নিকট স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব কতখানি প্রিয়তম সম্পদ তাহার প্রমাণ মিলিয়াছে আজ। ঢাকার রাজপথে সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ির শব্দ আর জয়ধ্বনি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসধ্বনির সহিত একত্রিত হইয়াছে। রাত্রি হইতে একটানা গোলাগুলির শব্দে রাজধানীর মানুষগুলি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় প্রহর গুনিতেছিল-অকস্মাৎ সেনাবাহিনীর শ্লোগান আর

www.pathagar.com

অভয়বাণীতে তাহাদের সমস্ত জড়তাকে মুছিয়া ফেলিয়াছে। সেই ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের মত একইভাবে একই উল্লসিত প্রাণচাঞ্চল্যে মুখরিত হইয়াছে ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বরের প্রত্যূষ। ভোর হইতে রাস্তায় রাস্তায় মানুষ নামিয়াছে, মিছিল করিয়াছে-জিয়া ও মোশতাকের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়াছে। ট্রাকের পর ট্রাক বোঝাই হর্সোৎফুল্ল সৈনিক-জনতা জিয়া ও মোশতাকের ছবি লইয়া প্রদক্ষিণ করিয়াছে রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক। গাড়িতে করিয়া সেনাবাহিনী প্রত্যকটি মহল্লায় গিয়া জনগণকে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার অনুরোধ জানাইয়াছে, দেশের সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আকুল আবেদন রাখিয়াছে-কামনা করিয়াছে জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা। সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার, তথা সমস্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহিত জনগণের আন্দোলন প্রাণের স্পন্দন একইলয়ে স্পন্দিত হইয়াছে।

উল্লাসে উদ্বেল ঢাকা নগরী
(দৈনিক বাংলা, টেলিগ্রাম, ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫)

স্টাফ রিপোর্টার ঃ রায়ের বাজার, নিউমার্কেট এলাকা থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার লিখেছেন, রায়ের বাজার, ঝিগাতলা, ধানমণ্ডি, নিউমার্কেট, এলিফ্যান্ট রোড, শাহবাগ সেই কাকডাকা ভোর থেকেই এই সমস্ত এলাকা লোকে লোকারণ্য। ঘর আর কাউকে বেঁধে রাখতে পারেনি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসেছে সবাই। বেরিয়ে এসেছে ছাত্র-যুবক-বৃদ্ধ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও, এমনকি মহিলারও বেরিয়ে এসেছেন কোথাও কোথাও। পথে পথে সে আর এক অভাবিত দৃশ্য। গাড়িতে গাড়িতে বিপ্লবী সিপাহী জনতার এক দুর্জয় উল্লাস। এদিকে-ওদিকে চারদিকে ছোটাছুটি করছে সামরিক বাহিনীর খোলা গাড়ি, হাফট্রাক জীপ। ছুটে চলছে ট্যাঙ্ক। সহস্র বিপ্লবী সিপাহীর সাথে এসব গাড়িতে স্থান নিয়েছে বিপ্লবী জনতা। কণ্ঠে তাদের শ্লোগান-বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সিপাহী-জনতা ভাই ভাই, জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ। আর সেই সাথে প্রাণের উম্মাদনায় আকাশমুখী ফুটিয়ে চলেছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রের গুলি। সারা শহরে শুধু গুলির আওয়াজ। আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয়া প্রাণের বাঁধভাঙা উল্লাসের আওয়াজ। এ যেন সেই '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের দৃশ্য। জনতা-সেনাবাহিনী মিলনের এক তুলনাহীন দৃষ্টান্ত। শুধু সামরিক বাহিনীর গাড়িতে নয়, বেসামরিক যানবাহনেও উঠেছে সেই উল্লাস, একই শ্লোগান। এখানেও সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর বিপ্লবী সিপাহীরা। মেজর জেনারেল জিয়ার বীরত্বপূর্ণ প্রত্যাবর্তনে আনন্দে উদ্বেলিত ঢাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের করেছে মিছিল। ট্রাকে ট্রাকে উল্লসিত জনতার গগনবিদারী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে ৭ নভেম্বরের সকাল। মেজর জেনারেল জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই দুর্যোগময় দিনে যেভাবে উদ্বেলিত করেছিল বাংলার মানুষকে, ঠিক তেমনিভাবে যেন আবারও সৃষ্টি করেছে উম্মাদনার জোয়ার। এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত শহরের পথে পথে চলছে উল্লসিত জনতার আনন্দ মিছিল। জনতা জোয়ারে যে প্রাণ জেগেছে সেই কাকডাকা ভোর থেকে তা অব্যাহত রয়েছে। এগিয়ে চলেছে বিপুল গতিতে। মতিঝিল ও হাটখোলা থেকে লিখেছেন আমাদের স্টাফ রিপোর্টার-কাকডাকা ভোর। দূরে বহু দূরে শ্লোগানের ধ্বনি মিলিয়ে যাচ্ছে। রেডিওতে ঘোষণা করা হচ্ছিল, সিপাহী বিপ্লব সফল হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করা হয়েছে। বিপ্লবী সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। এ ঘোষণায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। আনন্দের উচ্ছ্বাস। রাস্তায় রাস্তায় শুরু হল খণ্ড খণ্ড

www.pathagar.com

মিছিল। সেনাবাহিনীর জোয়ানরা লরি, ট্যাঙ্ক ও বাসে করে মতিঝিলের রাস্তা ধরে যাচ্ছেন। এ যেন এক অপূর্ব দৃশ্য। এ ঘটনা বিরল। শুধু স্মৃতিপটেই ধরে রাখা যায় তা। মহিলারাও বাড়ির ছাদে উঠে দেখছিলেন সে দৃশ্য। শুধু শ্লোগান আর শ্লোগান। রাতে ঝিমিয়ে পড়া মতিঝিলের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোতেও যে নতুন দিনের হাতছানি। ভোরের আকাশে উঁকি দিচ্ছে রক্তিম লাল সূর্য।

জিয়ার নেতৃত্বে সিপাহী-জনতার বিপ্লব
(দৈনিক বাংলা, টেলিগ্রাম,
৭ নভেম্বর, ১৯৭৫)

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সিপাহী ও জনতার মিলিত বিপ্লবে ৪ দিনের দুঃস্বপ্নের প্রহর শেষ হয়েছে। এর কিছুক্ষণ পর জেনারেল জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে তার ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। মিছিল আর মিছিল। বিপ্লবের বিজয়ের উল্লাসের মিছিল। শ্লোগান আর শ্লোগান, কণ্ঠের আর বুলেটের মিলিত শ্লোগান। করতালি আর করতালিতে প্রাণের দুন্দুভি। আকাশে উৎক্ষিপ্ত লাখো হাত একের পর এক হচ্ছে প্রত্যয়ের স্বর্ণঈগল। পথে পথে সিপাহী আর জনতা আলিঙ্গন করছে, হাত নেড়ে জানাচ্ছে অভিবাদন-কাঁধে কাঁধ, হাতে হাত এক কণ্ঠে একই আওয়াজ-সিপাহী জনতা ভাই ভাই, জোয়ান জোয়ান ভাই ভাই; বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ, খন্দকার মোশতাক জিন্দাবাদ, আমাদের আজাদী-রাখবই, রাখব, স্বাধীনতা স্বাধীনতা-রাখবই রাখব, হাতের সাথে হাত মিলাও এক কাতারে শামিল হও, হাতের সাথে হাত মিলাও-সিপাহী জনতা এক হও। এত আনন্দ, এত উল্লাস সিপাহী ও জনতার হৃদয়ের কোরাস, শ্লোগানের সাথে কামানের এমন অর্কেস্ট্রা-এ এক অনন্য ইতিহাস। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার-এই ৪ দিনের দুঃস্বপ্নের প্রহর পেরিয়ে এসেছে শুক্রবারের সোবেহ সাদেক, সিপাহী ও জনতার মিলিত বিপ্লব এনেছে শুক্রবারের বিজয়ের সূর্য। ঢাকা উল্লাসে টালমাটাল, বাংলাদেশ আনন্দে উদ্বেল। এই রিপোর্ট আমরা যখন লিখছি তখনও পথে পথে একের পর এক বিজয় মিছিল যাচ্ছে ট্রাকে চেপে, পায়ে হেঁটে, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, পুলিশ, আনসার ও দমকল বাহিনীর একেকটি দল যাচ্ছে- অতিক্রম করছে রাজধানীর পথ পরিক্রমা। তাদের সাথে এক ট্রাক সারিতে রয়েছে নানা স্তরের মানুষ। পথে পথে ঘুরছে ট্যাঙ্ক আর আর্মর্ডকার। পেছনে পেছনে জনতা। কোন কোন ট্যাংক ও আর্মর্ডকারেও জনতা ওঠে বসেছে, শ্লোগানে-আনন্দে প্রাণের ঢল। ঢাকা নগরে তখন ছড়িয়ে গেছে বিজয়ের বার্তা। পথের পাশে মোড়ে মোড়ে জনতা। সিপাহীরা ট্রাকের পর ট্রাক, লরির পর লরিতে যাচ্ছে। তারা উচ্চকণ্ঠে বলে যাচ্ছে জয়ের কথা-পথের পাশে দাঁড়িয়ে তারা বক্তব্য রাখছে, শ্লোগান দিচ্ছে আর তারপর সাথে সাথে শ্লোগান জনগণের। বহু মহিলা এসে রাস্তার পাশে এখানে-সেখানে জড়ো হয়েছে। স্কুলড্রেস পড়া ছেলেমেয়েগুলো এখানে-সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে লোকজন আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করছে। কোথাও কোথাও সড়ক নিক্ষিপ্ত সিপাহীদের গুলিতে আনন্দে উল্লাসে উদ্বেল নগরী। শুরু অনেক আগে থেকেই-বৃস্পতিবার দিবাগত রাত প্রায় দু'টো আড়াইটা থেকে ঢাকার জনগণ যখন বুঝতে পারলেন দুঃস্বপ্নের প্রহর শেষ হয়ে আসছে-শুরু হয়েছে সিপাহী বিপ্লব. তখন থেকেই তারা রাজপথে নামতে শুরু করলেন। একপর্যায়ে দেখা গেল, ময়মনসিং রোডে হাজার হাজার মানুষ, নানা স্তরের নানা বয়সী। শ্লোগান দিতে দিতে জনতা এগু

www.pathagar.com

ফার্মগেইটের দিকে, রেডিও ট্রানজিস্টারের পাশে জনতা উৎকর্ণ মেজর জেনারেল জিয়া কখন ভাষণ দেবেন। ভোর হল। পথে পথে তখন জনতার জোয়ার। দ্বীপে পথচারীরা মিলিত হয়েছেন মিলাদ মাহফিলে।

প্রাণবন্যায় উচ্ছল নগরী
(দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫)

ইত্তেফাক রিপোর্ট ঃ তখনও আকাশে অন্ধকার ছিল গোলাগুলির শব্দে প্রকম্পিত শেষ রজনীর ঢাকা। শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্তগুলি ছিল যুগের মত। বিনিদ্র রাত্রিতে আতঙ্কিত নগরবাসী হয়ত ভাবিতেছিল, '৭১ এর সেই পাষাণ ঢাকা দিনগুলির কথা। এমনি সময়ে রেডিও বাংলাদেশের ঢাকা কেন্দ্রের ঘোষকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল শ্লোগান-'সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ' উৎকণ্ঠ নগরবাসীর শ্রবণেন্দ্রিয়। এই সময়ে রেডিও কি বার্তা শুনাইবে? ঘোষকের কণ্ঠে ঘোষিত হইল ঃ 'সিপাহী বিপ্লব সফল হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করা হয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন।' ভোরের আলোর উঠিবার আগেই জনতা নামিল রাস্তায়। প্রচণ্ড গুলির মুখেও নিঃশঙ্ক দুঃসাহসী পদবিক্ষেপে। রাস্তায় সেনাবাহিনীর গাড়ি আর ট্যাঙ্কের ঘরঘর শব্দ। ইহার পর মিছিল, মিছিল আর মিছিল। সিপাহীদের প্রতি উৎফুল্ল অভিনন্দন বা হৃদয় নিংড়ানো আলিঙ্গন। সেনাবাহিনী পরিণত হইল জনগণের সেনাবাহিনীতে। পথে পথে জনতার কলরোল আর সিপাহী-জনতার সম্মিলিত শ্লোগানের ধ্বনির মাধ্যমে যেন পুনরাবৃত্তি ঘটিল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের সেই ফেলিয়া আসা দিনটির। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সকাল মুখরিত হইল জনতার জয়নিনাদে। সামরিক বাহিনীর গাড়িতেই নহে, বাসে-ট্রাকে সেই একই দৃশ্য। খন্দকার মোশতাক আহমদ আর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের ছবি লইয়া রাস্তায় মিছিলের ঢল। গাড়িতে করিয়া সেনাবাহিনী প্রতিটি মহল্লায় গিয়া জনগণকে আদব ও শৃঙ্খলা রাখিবার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানাইয়াছেন। দেশের সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আকুল আবেদন রাখিয়াছেন-কামনা করিয়াছেন জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা। সিপাহীদের সহিত জনতার আনন্দোচ্ছল প্রাণের স্পন্দন একইলয়ে স্পন্দিত হইয়াছে গতকাল।

নারায়ণগঞ্জে বিজয়োল্লাস
(দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫)

গতকাল সকালে সশস্ত্র বাহিনীর জোয়ানরা বিভিন্ন যানবাহনে করিয়া নারায়ণগঞ্জে পৌছিলে শহরের হাজার হাজার উৎফুল্ল জনতা রাস্তায় নামিয়া আসে এবং সিপাহী-জনতা এক হইয়া শ্লোগানে শ্লোগানে শহর মুখরিত করিয়া তোলে। নারায়ণগঞ্জ বাসযাত্রীসহ টার্মিনালের লঞ্চযাত্রীরাও বিভিন্ন ধ্বনি দিয়া বিজয়োল্লাস প্রকাশ করিতে থাকে।

রাজধানীর পথে পথে লাখো জনতার আনন্দ মিছিল
(দৈনিক সংবাদ, ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫)

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ রাজধানী ঢাকা গতকাল শুক্রবার ছিল বিজয় উল্লাসের আনন্দে উদ্বেল এক উৎসবমুখর নগরী। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ২টায় রেডিও বাংলাদেশ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর চীপ অব স্টাফ-এর দায়িত্বভার গ্রহণের সংবাদ ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে বাঁধভাঙ্গা বন্যার স্রোতের মত রাজপথে নেমে আসে করতালি আর শ্লোগানে মুখর স্বতঃস্ফূর্ত লাখো জনতার ঢল আর আনন্দ মিছিল। সে এক অবর্ণনীয় অভূতপূর্ব দৃশ্য। শহরের পথে পথে অলিগলিতে ফুল, মালা আর হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ্য দিয়ে জনসাধারণ বরণ করে নেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার নিরাপত্তা রক্ষাকারী অকুতোভয় সেনাবাহিনীর সিপাহীদের। আগের দিন গভীর রাত থেকে গতকাল প্রায় সারাদিন ধরে সেনাবাহিনী আর জনতা একাত্ম হয়ে মিশে গিয়ে হাতে হাত রেখে সারা শহরকে প্রকম্পিত করে রাখে গগনবিদারী শ্লোগানে। সিপাহী আর জনতার সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে-বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ, সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ, মোশতাক আহমদ জিন্দাবাদ, সিপাহী-জনতা ভাই ভাই ইত্যাদি। শুধু মিছিল আর মিছিল। ট্যাঙ্কের মিছিল। বাস, ট্রাক, জীপ, রিকশার মিছিল। পায়ে হাঁটা জনতার। এ মিছিল সেনাবাহিনী আর জনতার মিলিত মিছিল, আবালবৃদ্ধবণিতার মিছিল। পাশাপাশি আনন্দ করতালি, কাওয়ালী, গান, ব্যান্ড পার্টি আর নৃত্যে মুখর সিপাহী জনতার গাড়ি আর মিছিল ঘুরছে সারা শহরে। মুহূর্তে মুহূর্তে সেনাবাহিনীর ভাইয়েরা তাদের স্টেনগান-রাইফেল থেকে উৎসবের আনন্দে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে ফাঁকা আওয়াজ করছেন আর রাস্তার দ্বারে, বাড়ির দরজা, জানালায়, ছাদে দাঁড়ানো জনতাকে আরও উল্লসিত করে তুলছেন। যে পথ দিয়ে সেনাবাহিনীর বীর সিপাহীরা অতিক্রম করেছেন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাদের ফুলের মালা দিয়ে আর হাত তুলে জানিয়েছেন আন্তরিক অভিনন্দন। সূর্যসারথি সেনাবাহিনীর ভাইয়েরা শুধু গাড়িতে চেপেই শহরে ঘোরেননি, তারা কলোনীতে, পাড়ায়-মহল্লায় গিয়ে ঈদের আনন্দে জনগণের সাথে আলিঙ্গন করেছেন, হাত মিলিয়েছেন। এ সময় তাদের মুখে কেউ তুলে দিয়েছেন মিষ্টি, করেছেন আদর আর আপ্যায়ন। '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পরে ঢাকার রাজপথে জনতা-সেনাবাহিনীর মিলনের এমন তুলনাবিহীন দৃষ্টান্ত আর অযুত জনতার আনন্দমুখর মিছিল দেখা যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, অফিস-আদালতের কর্মচারী, শিল্প-কারখানার শ্রমিক, ব্যবসায়ীসহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ থেকেই গতকাল ঢাকা শহরে আনন্দ আর বিজয় মিছিল বের করা হয়। আমাদের নারায়ণগঞ্জ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, গতকাল সেনাবাহিনীর বীর সিপাহীরা শহরে প্রবেশের সাথে সাথে শহরের শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রী, নর-নারী সর্বস্তরের মানুষ তাদের ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে ও সিপাহীদের অভিনন্দন জানায়। এরপর জনসাধারণ সিপাহীদের গাড়িতে ওঠে এক সাথে শহর পরিভ্রমণ করে আর বিভিন্ন আনন্দ ধ্বনি প্রদান করেন।

আনন্দ উদ্বেল মানুষের ঢল নেমেছিল
(দৈনিক বাংলা, ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫)

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আনন্দ উদ্বেল মানুষের এক অভূতপূর্ব জোয়ার নেমেছিল গতকালের ঢাকায়। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সিপাহী-জনতার সফল বিপ্লবে এবং বেতারে জিয়ার কণ্ঠস্বর শুনে হাজার হাজার মানুষ নেমে এসেছিল রাজপথে। বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে যে সিপাহী বিপ্লবের শুরু তার সার্থক পরিণতি সর্বস্তরের জনতায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে। জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে বিপ্লবের সাফল্যের বার্তা নিয়ে সামরিক ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসেছিল হাজার হাজার বীর সেনা। তাদের হাতে হাত মিলিয়ে সকল

www.pathagar.com

শ্রেণীর মানুষ ঘোষণা করেছে সর্বাত্মক একাগ্রতা। কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ধ্বনি তুলেছে বিপ্লবের সপক্ষে, এ উল্লাসের শুরু সেই ভোর থেকে। চলেছে সারাদিন। বেলা ২টার দিকে জেনারেল জিয়ার আহবানে সিপাহীরা ছাউনিতে ফিরে যাবার পরও জনতার এই উল্লাস চলতেই থাকে। অসংখ্য মিছিল আর সভার মধ্য দিয়ে জনতা এই বিপ্লবের প্রতি জানায় তাদের সমর্থন। জেনারেল জিয়ার প্রতি জানায় আন্তরিক অভিনন্দন। গতকালের ঢাকা নগরী সম্পর্কে বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টাররা লিখেছেন। রায়েরবাজার, ঝিগাতলা, ধানমণ্ডি, নিউমার্কেট, এলিফ্যান্ট রোড, শাহবাগ-সেই কাকডাকা ভোর থেকেই এ সমস্ত এলাকা লোকে লোকারণ্য। ঘর আর কাউকে বেঁধে রাখতে পারেনি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসেছে সবাই। বেরিয়ে এসেছে ছাত্র, যুবক, বৃদ্ধ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও, এমনকি মহিলারাও বেরিয়ে এসেছেন কোথাও কোথাও। পথে পথে সে আর এক অভাবিত দৃশ্য। গাড়িতে গাড়িতে বিপ্লবী সিপাহী। জনতার এক দুর্জয় উল্লাস। এদিকে-ওদিকে চারদিকে ছোটাছুটি করছে সামরিক বাহিনীর খোলাগাড়ি, হাফট্রাক জীপ। ছুটে চলছে ট্যাঙ্ক। সশস্ত্র বিপ্লবী সিপাহীদের সাথে এসব গাড়িতে স্থান নিয়েছে জনতা। কণ্ঠে সবার শ্লোগান-বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সিপাহী-জনতা ভাই ভাই, জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ। আর সেই সাথে প্রাণের উম্মাদনায় আকাশমুখী ফুটিয়ে চলেছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রের গুলি। সারা শহরে শুধু গুলি আর গুলির আওয়াজ। আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয়া প্রাণের বাঁধভাঙা উল্লাসের আওয়াজ। এ যেন সেই '৭১-এর ডিসেম্বরের দৃশ্য। জনতা-সেনাবাহিনীর মিলনের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। শুধু সামরিক বাহিনীর গাড়িতে নয়, বেসামরিক বাহনেও উঠেছে একই উল্লাস, একই শ্লোগান। এখানেও সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর বিপ্লবী সিপাহীরা। মেজর জেনারেল জিয়ার বীরত্বপূর্ণ প্রত্যাবর্তনে আনন্দে উদ্বেলিত ঢাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের করেছে মিছিল। ট্রাকে ট্রাকে উল্লসিত জনতার গগনবিদারী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে ৭ নভেম্বরের সকাল। মেজর জিয়ার কণ্ঠস্বর স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই দুর্যোগময় দিনে যেভাবে উদ্বেলিত করেছিল বাংলার মানুষকে, ঠিক তেমনিভাবেই যেন আবারও সৃষ্টি করেছে উম্মাদনার জোয়ার।

মতিঝিল ও হাটখোলা এলাকা থেকে লিখেছেন আমাদের স্টাফ রিপোর্টার-কাকডাকা ভোর। দূরে বহু দূরে শ্লোগানের ধ্বনি মিলিয়ে যাচ্ছে। রেডিওতে ঘোষণা করা হচ্ছিল, সিপাহী বিপ্লব সফল হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করা হয়েছে। বিপ্লবী সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। এ ঘোষণায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। আনন্দের উচ্ছ্বাস। রাস্তায় রাস্তায় শুরু হল খণ্ড খণ্ড মিছিল। সেনাবাহিনীর জোয়ানরা লরি, ট্রাক ও বাসে করে মতিঝিলের রাস্তা ভরে যাচ্ছেন। এ যেন এক অপূর্ব দৃশ্য। এ ঘটনা বিরল। শুধু স্মৃতিপটে ধরে রাখা যায় তা। মহিলারাও বাড়ির ছাদে উঠে তখন দেখছিলেন সে দৃশ্য।

শুধু শ্লোগান আর শ্লোগান। রাতে ঝিমিয়ে পড়া মতিঝিলের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোও যেন পেল নতুন দিনের হাতছানি। ভোরের আকাশে উঁকি দিচ্ছে রক্তিম লাল সূর্য। বিভিন্ন বয়সী লোক শ্লোগানে শ্লোগানে মুখর করে তুললেন আকাশ-বাতাস। তাদের কণ্ঠে তখন বজ্রধ্বনি জনতা-সিপাহী ভাই ভাই। জেলের তালা ভেঙেছি, জেনারেল জিয়াকে এনেছি। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নিপাত যাক। জনতার দুই হাত তুলে বিপ্লবী অভিবাদন জানাল তাদের প্রিয় সৈনিক ভাইদের। ইস্কাটন এলাকা থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার-রাত ২টা থেকে একজন দু'জন করে লোক জমতে শুরু করে রাস্তার মোড়ে।

www.pathagar.com

রাত ৩টায় জনতায় ভরে উঠতে শুরু করে। আনন্দে উদ্বেল জোয়ানদের সাথে একাত্ম হয়ে যায় জনতা। শ্লোগান ওঠে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ। সিপাহী-জনতা ভাই ভাই। জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ। খন্দকার মোশতাক জিন্দাবাদ। জনতার আনন্দ চিৎকার আর ফাঁকাগুলির আওয়াজ একাকার হয়ে যায়। ফার্মগেট, তেজতুরী বাজার, হাতিরপুল, সেন্ট্রাল রোড সর্বত্র সাধারণ মানুষ সেনাবাহিনীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের সাথে মিশে যায়। ভোরে রেডিওতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক বীর নায়ক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে চীফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর এবং সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে তার দায়িত্ব গ্রহণের খবর শোনার পর মোহাম্মদপুর, রায়েরবাজার, ধানমণ্ডি এলাকার জনসাধারণ এক অভূতপূর্ব আনন্দে মেতে ওঠে। পূর্বের আকাশ ফর্সা হওয়ার সাথে সাথে বিজয়ী বীরসৈনিকরা বাস ও ট্রাকে করে মিছিলে বের হলে মুক্তিপাগল মানুষও ঘর ছেড়ে পথে বের হয়ে তাদের সাথে যোগ দেন। মিছিলকারী সিপাহীদের জনগণ মুহুর্মুহু করতালি ও হর্ষধ্বনি দিয়ে অভিনন্দিত করেন। বাড়ির মেয়েরা আঙিনায়, বাড়ির ছাদে ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে বীর জোয়ানদের অভিনন্দন জানান। তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। সূর্য ওঠার সাথে সাথে রাস্তা মুক্তিপাগল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলে ছেয়ে যায়। সিপাহীদের সাথে একই বাস ও ট্রাকে করে মিছিলে যোগ দেন। তাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে জয়ধ্বনি দেন। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সিপাহী-জনতা ভাই-ভাই, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ। বীর সিপাহীদের হাতের রাইফেল, মেশিনগানগুলো মুহুর্মুহু গর্জে ওঠে অধিকার বঞ্চিত মানুষের বিজয় বার্তা ঘোষণা করে। এই অস্ত্রশস্ত্রের গর্জন কাউকে ভীত করেনি, যেন বঞ্চিত মানুষের পুঞ্জীভূত আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে। বাস্তিলের কারাদুর্গ ভেদ করে শৃঙ্খলিত মানুষ যেন শাশ্বত মুক্তির স্বাদ লাভ করেছে। মুক্তিকামী মানুষের পক্ষ থেকে যেন স্বৈরাচার- স্বেচ্ছাচারের জগদ্দল পাথর নেমে গেছে। সিপাহীদের এই মিছিলে ছিল নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, রাইফেলস বাহিনী, পুলিশ ও আনসার। তাদের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছেন আনন্দ উল্লসিত মানুষ। শুক্রবার ভোর থেকেই মোহাম্মদপুর, ধানমণ্ডি এলাকায় চলে বাঁধভাঙা জোয়ারের মত উচ্ছল জনতার বিজয় মিছিল। এখন স্বাধীনতার মহোৎসব। মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন পরম সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছে। মিছিলে ট্যাঙ্কও চলেছে। মুক্তিপাগল জনতা ও সিপাহীদের সশস্ত্র মিছিল চলার সময় কোথাও স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়নি। মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ বঞ্চিত মানুষের বিজয় ঘোষণা করেছে, বিভীষিকার সৃষ্টি করেনি। জনগণ সৈনিকদের সাথে আলিঙ্গন করেছেন। অস্ত্রশস্ত্রকে মনে করেছেন তাদের শাশ্বত মানবিক অধিকার রক্ষার হাতিয়ার। মুক্তিপাগল সৈনিক-জনতার এই আনন্দস্রোত নিউমার্কেট, সায়েন্স ল্যাবরেটরী, শাহবাগ এলাকায় এসে উর্মিমুখর জনতার মহাসমুদ্রে মিলিত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ, বাসস'র খবর- সেনাবাহিনীর জোয়ানরা গতকাল ভোরের দিকে নারায়ণগঞ্জ শহরে প্রবেশ করলে সর্বস্তরের লোক তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভ্যর্থনা জানান। পথে পথে শুরু হয় আনন্দ মিছিল। রাস্তার পাশে পাশে এবং আশপাশের বাড়ির ছাদ ও বারান্দা থেকে আবালবৃদ্ধবণিতা সিপাহী-জনতার এই মিছিল দেখেন। নারায়ণগঞ্জে নিয়োজিত পুলিশ ও আনসার বাহিনীর লোকজনও সিপাহী-জনতার আনন্দ মিছিলে যোগ দেন।

মানিকগঞ্জ থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান-মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে মুক্ত করে বিপ্লবী সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল

www.pathagar.com

করেছে-এই সংবাদ রেডিওতে প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয় খণ্ড খণ্ড আনন্দ মিছিল। মিছিলে শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। আরিচা-মানিকগঞ্জ, ধামরাই, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও সাভার থেকে ট্রাকযোগে আনুমানিক ৮ হাজার ছাত্র, যুবক ও সামরিক বাহিনীর বীর জোয়ান দেশাত্মবোধক শ্লোগান দিয়ে ঢাকার দিকে যান। শুক্রবার মিছিলের নগরী ঢাকায় ২৪ ব্যক্তি আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে এ খবর জানা গেছে। এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। আনন্দোৎসবে যোগ দিতে গিয়ে বাস ও ট্রাক দুর্ঘটনায়ও ১০ ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এদেরও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত কিছু কিছু ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়।

নবউত্থান
(সম্পাদকীয়, দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫)

রাজনীতিতে শেষ কথা বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু মানব প্রকৃতি মানুষের মতই স্টেবল বা স্থিতিশীল-একথাটা বলিয়াছেন সমাজতত্ত্ববিধ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাক আইভার। এই কথার অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতিফলন ঘটিয়াছে গতকাল শুক্রবার (৭ নভেম্বর '৭৫) দেশের বীর সিপাহী ও জনতার অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়া। প্রত্যূষে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। দায়িত্বভার গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে জিয়াউর রহমান বলিয়াছেন ঃ 'বাংলাদেশের জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং অন্যদের অনুরোধে আমাকে মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এ দায়িত্ব ইনশাআল্লাহ আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। সর্বস্তরে জনগণের প্রতি একই ভাষণে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান স্ব স্ব শান্তিপূর্ণ অবস্থানের মাধ্যমে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাইয়াছেন। গতকল্য ৭ই নভেম্বরে যে প্রভাতের সূচনা হইয়াছে তাহা ছিল দেশের বীর ও আপামর জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণঢালা আনন্দোচ্ছ্বাসে মুখর। গত ৩রা নভেম্বর এ্যাডভেঞ্চাররিস্ট ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের পতনের সংবাদ পাওয়া মাত্র রাজধানীর জনতা আনন্দ কলরবে ছুটিয়া আসিয়াছে রাজপথে। দেখা গিয়াছে লরী ও ট্রাকের অন্তহীন মিছিল। শোনা গিয়াছে মোশতাক ও জিয়ার নামে অভিনন্দনসূচক ধ্বনি ও কণ্ঠবিদারী শ্লোগান। লরী ও ট্রাকের মিছিল বা জমায়েতের সর্বত্র পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া অবস্থান করিয়াছেন বীর সিপাহী ও সাধারণ জনগণ। একই সাথে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে অর্জিত বিজয়ের আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। দেশ, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের প্রতি বিভিন্ন স্তরের লোক কতখানি যে সজাগ, সচেতন, তাহা হর্ষোৎফুল্ল সৈনিক-জনতার কণ্ঠধ্বনিতে বারবার সমুদ্র কল্লোলের মত মন্দ্রিত স্বরে বাজিয়া উঠিয়াছে।

গতকল্যকার ঘটনার কার্যত ইতিহাসের স্বাভাবিক ধারা ও শিক্ষাই উচ্চকিত হইয়া উঠিয়াছিল। জনগণের আস্থা ও সমর্থনই যে দেশের শাসন ক্ষমতার একমাত্র সোপান, এই সত্যের প্রতিফলন ঘটিয়াছে বহুবারের মত আর একবার। প্রমাণিত হইয়াছে এই সত্যই যে, জনগণের অধিকার এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনরুজ্জীবনের পথে যে কোন চক্রান্তই অন্তরায় সৃষ্টির চেষ্টা করুক, তাহা শেষ পর্যন্ত নস্যাৎ হইয়া যাইবে। গত ১৫

www.pathagar.com

আগস্ট তারিখে নব-পরিবর্তনের ধারায় খন্দকার মোশতাক আহমদের সরকার জনগণের অধিকার ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে যে কার্যসূচি ঘোষণা করেন, গতকল্যকার সৈনিক-জনতার বিশাল-ব্যাপক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উহার প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ও আস্থা ঘোষিত হইয়াছে।

গতকল্যকার বীর সৈনিক ও জনতার অভ্যুত্থানকে বিবেচনা করিতে হইবে বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামী ইতিহাসের আলোকে এবং নিতে হইবে সেই ইতিহাস হইতে পরিপূর্ণ শিক্ষা। দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বাদ দিয়া তাহাদের অধিকারের কথা চিন্তা না করিয়া, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি যথোচিত দৃষ্টি না দিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতি কোনটাই হইতে পারে না। মানুষ লইয়াই দেশ এবং মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ চেষ্টার মধ্য দিয়াই গড়িয়া ওঠে দেশের সার্বভৌম আত্মা। এই হিসাব ও বিবেচনার এতটুকু ব্যত্যয়, এতটুকু বিচ্যুতি ঘটিলেই অনিবার্যভাবে দেখা দেয় জনতার রোষবহ্নি ও প্রতিরোধ শক্তি। সময় আপন গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। সাথে সাথে বহিয়া চলিয়াছে জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারাও। যে কোন দেশের উত্থান ও পতনের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সত্যেরই প্রতিফলন দেখা যায়। গতকল্যকার সৈনিক-জনতার বিশাল-ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের পতন হইয়াছে, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জনগণের সার্বভৌমত্বের ঘোষণা। এই ঘোষণা এখন যথোচিত ব্যবস্থা ও কার্যসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হইবে। জাগ্রত করিতে হইবে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে গভীর দায়িত্ববোধ। গতকল্যকার উত্থানের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক সৈনিক-জনতা জনাব মোশতাক আহমদ ও মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রতি যে প্রত্যাশা, আস্থা ও সমর্থন প্রকাশ করিয়াছেন উহা ইতিহাসের এক নজিরবিহীন অধ্যায়। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সৈনিক-জনতার এই রায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখিবে-ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

(বিশেষ সম্পাদকীয়, দৈনিক বাংলা, ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫)

শুক্রবার এক ঐতিহাসিক অভূতপূর্ব বিপ্লব সূচিত হলো জাতির জীবনে। স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরনায়ক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে অপার সাফল্যে জয়যুক্ত সিপাহী-জনতার মিলিত এই বিপ্লব। সশস্ত্রবাহিনী এবং জনগণের ইচ্ছায় সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্বের সঙ্গে সাময়িকভাবে প্রধান সামরিক শাসনকর্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন জেনারেল জিয়া। দেশের আপামর মানুষের সঙ্গে ঐতিহাসিক এই বিপ্লব, এই বিপ্লবী অভিযাত্রার শরিক সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, পুলিশ এবং আনসার বাহিনী। সিপাহী এবং জনতার এমন অভেদ্য নিশ্ছিদ্র ঐক্য তুলনাহীন। মুক্তি সংগ্রাম দিনের সেই দুর্লভ মুহূর্তগুলির সঙ্গেই শুধু এর তুলনা চলে। রাজধানী ঢাকার রাজপথ শুক্রবারের প্রথম কাকডাকা ভোরে প্রত্যক্ষ করেছে অনন্য, অতুলনীয় এক দৃশ্য। রাস্তায় রাস্তায় স্বতঃস্ফূর্ত গণমিছিল, সিপাহীদের সঙ্গে জনতার মিলিত উল্লাস, জয়ধ্বনি, আনন্দের কল-কল্লোল। কণ্ঠে উচ্চকিত নিনাদ ঃ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। অভিন্ন একটি অনুভূতিতে উদ্বেলিত সমগ্র রাজধানী নগরী-গোটা দেশ। প্রাণের সঙ্গে স্পর্শে একাত্ম হয়েছে সৈনিক এবং জনগণ। যে ঐক্য আকীর্ণ হয়েছিল এতদিন সংশয়ে তাকে আবার অবিনাশী সত্যে প্রতিষ্ঠিত করলো সেই জাগ্রত চেতনা যার নাম স্বাধীনতা। যার নাম

www.pathagar.com

দেশপ্রেম। জাতির ঐক্যবদ্ধ শক্তির এই নবউত্থান, তার বৈপ্লবিক সত্তার এই উদ্বোধন আবার প্রমাণ রাখলো বাঙালি জাতির স্বাধীনতাকে খর্বিত করার সাধ্য নেই কোনো চক্রান্তের, দেশী-বিদেশি কোনো প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থবুদ্ধির। কারো ক্ষমতা নেই, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে আঘাত করার, দুর্বল করার।

৬ নভেম্বর মধ্য রাত্রির ঘনতমসা ভেদ করে দেশপ্রেমিক, সৈনিকদের অকুতোভয় বৈপ্লবিক অভিযাত্রা নিষ্কম্প এই প্রত্যয়ের, অবিচল, এই অঙ্গীকারের ঘোষণা রেখেছে সাড়ে সাত কোটি মানুষের সংগ্রামী এই জাতির সামনে। ঘোষণা রেখেছে তাবৎ বিশ্ববাসীর কাছে। সে নিদারুণ উৎকণ্ঠায় বিভ্রান্তির কয়েকটি ঘণ্টা অতিক্রম করেছিল দেশবাসী, বিনিদ্র একটি রাত জেগে তার অবসান কামনায় প্রতিটি মুহূর্তে উন্মুখ উৎকর্ণ হয়েছিল তারা। সেই প্রতীক্ষার শেষ হলো প্রভাতের আলোর বিচ্ছুরণে আকস্মিক অন্ধকারের ঘোর কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। রাজপথে তখন স্বাধীনতার অতন্দ্র সিপাহীদের বিজয় পদধ্বনি। সেই বিজয়কে নন্দিত করার জন্য মুহূর্তে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলো অগণিত নর-নারী। রাজপথ হলো উদ্বেলিত একটি জনসমুদ্র, সারা শহর ক্লান্তিহীন মিছিল নগরী। বিজয় তোপধ্বনির সঙ্গে প্রভাতের বাতাসে সাড়া জাগালো জনতার উল্লাসধ্বনি। অজস্র কণ্ঠের কল্লোলে, প্রত্যাশার সচকিত নিনাদে ছিন্নভিন্ন হলো সেই তমসা যা হঠাৎ জাতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল এক আশাহত বিমূঢ়তায়। শুক্রবারের নির্মেঘ আকাশ এবং নতুন সূর্য-রশ্মিখচিত উজ্জ্বল প্রভাত আবার ছিনিয়ে আনলো জাতির পরাভবহীন বিশ্বাসকে। ছিনিয়ে আনলো তার অনির্বার আকাঙ্ক্ষা, আশা এবং আত্মচেতনার সূতীক্ষ্মবোধকে। বিভেদ এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তি আজ পরাভূত। সংশয় এবং আচ্ছন্নতার কুটিল মেঘ আলোকিত আকাশ থেকে নিষ্ক্রান্ত। তাহলেও আত্মতুষ্ট হলে চলবে না কাউকেই। অতীতের ভ্রান্তির সর্বনাশা পরিণাম থেকে নতুন করে শিক্ষা নিতে হবে। নতুন শপথ নিতে হবে ঐক্যের এই প্রেরণাকে নিয়ত জাগ্রত রাখতে। সতর্ক থাকতে হবে যাতে বিভেদের শক্তি কোনো দুর্বলতার ছিদ্রপথে আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। অসামান্য দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে হবে এই মুহূর্তে প্রতিটি দেশপ্রেমিক, প্রতিটি নর-নারীকে এবং গোটা জাতিকে। সুখী, সমৃদ্ধ এবং সুস্থ একটি গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই আমাদের সংগ্রামের চিহ্নিত লক্ষ্য। অবিচল আস্থা নিয়ে সেই লক্ষ্যের পথে আমাদের পা বাড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই জাতির অজেয় শক্তির উৎস হলো তার অচ্ছেদ্য জাতীয় ঐক্য এবং দেশপ্রেম। তার রক্ষাকবচ হলো স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব।

সিপাহী-জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লব, তাদের মিলিত কণ্ঠের 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ধ্বনি' এই বিশ্বাসকেই আজ সব কিছুর ওপর বড় করে তুলে ধরেছে। এ বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষাই আমাদের সকলের, দেশপ্রেমিক সশস্ত্রবাহিনী এবং জনগণের সুমহান দায়িত্ব। বাংলাদেশ চিরঞ্জীব, তার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব সকল অভিঘাতের ঊর্ধ্বে। অনাগত যুগে যুগে ধ্রুব এই সত্য থেকেই অনুপ্রাণিত এবং বলীয়ান হবে বাঙালি জাতি। সৈনিক-জনতার ঐক্য অমোঘ হোক। অমর হোক।

মসজিদে মসজিদে মোনাজাত

(দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫)

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ দেশকে রক্ষা করার জন্য গতকাল শক্রবার (৭ই নভেম্বর) শহরের বিভিন্ন মসজিদে পরম করুণাময়ের দরবারে শোকরিয়া আদায় করিয়া বিশেষ মোনাজাত

www.pathagar.com

করা হয়। মোনাজাতে খন্দকার মোশতাক আহমদ ও মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের দীর্ঘজীবন কামনা করা হয়। বায়তুল মোকাররম মসজিদে জুমার নামায শেষে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় এবং উহার পর একটি আনন্দ মিছিল বাহির করা হয়। বায়তুল মোকাররম হইতে শুরু করিয়া মিছিলকারীরা 'সৈনিক ভাই লও সালাম', 'খন্দকার মোশতাক জিন্দাবাদ' 'মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ' এবং 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ইত্যাদি শ্লোগান সহকারে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। গতকাল সাবেক প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ বঙ্গভবনে জুমার নামায আদায় করেন। জেনারেল এমএ.জি ওসমানীও তাহার সহিত ছিলেন এবং একই সাথে নামায আদায় করেন।

মুক্তির সংগ্রামের অগ্রনায়কের ভূমিকা
(সম্পাদকীয়, দৈনিক সংবাদ, ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫)

স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর অগ্রনায়ক জিয়াউর রহমান জাতির এক সংকট সময়ে এগিয়ে এসেছেন। অনিশ্চিয়তা ও দিশেহারা জাতির জীবনে সঠিক পথনির্দেশক সুস্থ ও সুস্পষ্ট কর্মধারার ভিত্তি রচনার সুকঠিন ও মহান দায়িত্ব সংকট উত্তরণের পথনির্দেশ দিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (৬ই নভেম্বর '৭৫ গভীর রাতে) রাতে সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ ও আনসারসহ সকলের অনুরোধে পূর্বাহ্নে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও চীফ অব স্টাফ হিসেবে দায়িত্বভার সাময়িকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সংকট মুহূর্তে গৃহীত পদক্ষেপের সাথে সাথে প্রশাসন কাঠামোতে স্বাভাবিক ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় ভূমিকা ও অবদান পালনে ক্ষণিকের জন্য দ্বিধান্বিত ছিলেন না। জনতার ভালবাসায় ও অভিনন্দনে সিক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নির্ভিক সেনানী হিসেবে তিনি মুহূর্তের জন্যও ক্ষমতাগর্বে আত্মহারা হননি। বাংলাদেশের মানুষের মনে মেজর জেনারেল জিয়ার নাম সুপ্রতিষ্ঠিত। একাত্তরের পঁচিশে মার্চে জাতি হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ার পর ২৬ মার্চের প্রাতে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে মেজর জিয়ার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে জাতির অন্তরে সংগ্রামের প্রেরণা যুগিয়েছিল। অকুতোভয় সেনানী সেদিনই সর্বপ্রথম উদাত্ত কণ্ঠে স্বাধীনতার জন্য দেশবাসী সংগ্রামে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে আহবানে সারা দিয়ে সারাদেশের মানুষ, বাংলার দেশপ্রেমিক বীর সৈনিকদের সাথে একাত্ম হয়ে জাতীয় মুক্তি অর্জন করেছে। উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়ার সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামী ভূমিকা চির অম্লান হয়ে থাকবে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ঘোষিত পদক্ষেপ থেকে এ কথাই আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দেশের স্বার্থ ও জনগণের কল্যাণ সাধনে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য মহৎ আদর্শের দৃষ্টান্তই জনগণকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে। গতকাল বেতারে জাতির উদ্দেশ্যে খন্দকার মোশতাক আহমদের ভাষণ দেশের গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এক সুস্থ পরিবেশের পটভূমি রচনা করেছে। পুনরায় প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত দাবি সত্ত্বেও তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের যে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা এ দেশের মানুষের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করবে। বাংলাদেশের অশান্তক্লিষ্ট মানুষের কাছে শান্তিই আজ সবচেয়ে বেশি কাম্য। এই আকাঙ্ক্ষিত শান্তির জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দেশের শ্রমিক ও কৃষকসহ সকল মেহনতি মানুষ, বুদ্ধিজীবী, সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য সমস্ত পর্যায়ের মানুষের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠার।

www.pathagar.com

রব-জলিলসহ ৫ জনের মুক্তির নির্দেশ
(দৈনিক বাংলা, ৯ নভেম্বর, ১৯৭৫)

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি জনাব এএসএম সায়েম পাঁচজনকে রাজনৈতিক বন্দি থেকে অবিলম্বে মুক্তিদানের আদেশ দিয়েছেন। শনিবার ঢাকায় সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়। বাসস'র খবরে প্রকাশ, রাষ্ট্রপতি ৬ই নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে যে নীতি ঘোষণা করেন এবং তার শুক্রবারের ভাষণে যে নীতির পুনরুল্লেখ করা হয় তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিদানের আদেশ দেয়া হয়েছে। যেসব রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তিদানের আদেশ দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছেন-অধুনালুপ্ত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) এম.এ. জলিল ও জনাব আ.স.ম আব্দুর রব, অধুনালুপ্ত জামায়াতে ইসলামীর সৈয়দ ফরিদ উদ্দিন আহমদ, অধুনালুপ্ত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) খন্দকার মুসা চৌধুরী ও সিরাত কমিটির মেজর (অবঃ) জয়নুল আবেদীন।

নবযাত্রা শুরু
(দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ নভেম্বর, ১৯৭৫)

গত শুক্রবার সেনাবাহিনী ও জনগণের সম্মিলিত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের শাসন ব্যবস্থায় ও জাতীয় পরিস্থিতিতে যে পটপরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে তাহা এক কথায় ঐতিহাসিক। সিপাহী জনতা-নির্বিশেষে দেশবাসী কি চায়, গত শুক্রবারের সম্মিলিত অভ্যুত্থানে তাহা আর একবার পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের ভাষায়, এই বিপ্লবের মাধ্যমে জাতীয় সত্তার সব অর্জিত মহিমা সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, স্বতঃস্ফূর্ত গণদাবি সোচ্চার থাকা সত্ত্বেও খন্দকার মোশতাক আহমদ পুনরায় প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণে সম্মত হন নাই। বরং তিনি বলিয়াছেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে এমন এক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যিনি সম্পূর্ণ নির্দলীয় এবং অরাজনৈতিক। এই কারণেই তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালনরত প্রেসিডেন্ট সায়েমকেই তাহার জাতীয় দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এদিকে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ছাড়িয়া দিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে অপর দুইজন বাহিনী প্রধানের সহিত অন্যতম উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুত, সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া দেশবাসীর স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আদর্শিক নিষ্ঠা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়াছে। আরেকবার প্রমাণিত হইয়াছে যে, অ্যাডভেঞ্চারিজমের হটকারিতা নয় বরং গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশবাসী দেশ শাসনের অধিকার চায়। তাহারা চায় কাহারও লেজুড়বৃত্তি না করিয়া স্বকীয় আদর্শের উজ্জ্বল আলোকে জগৎসভায় নিজস্ব ভূমিকা পালন করিতে। কথায় বলে, সঙ্কটের সময়ে ব্যক্তির মত জাতিরও সঠিক পরিচয় ধরা পড়ে। আমাদের মতে, সিপাহী-জনতার সাম্প্রতিক বিপ্লব অভ্যুত্থানে বাঙালি জাতির যে পরিচয় সমুদ্ভাসিত হইয়াছে তাহা জাতীয় সত্তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সিপাহী-জনতার এই অভ্যুত্থান প্রমাণ করিয়াছে যে, কোন হুমকির মুখে জাগ্রত জনতা তাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম। আমাদের স্থির বিশ্বাস, বর্তমানের এই আদর্শনিষ্ঠ আবেগ, মোহমুক্ত মানসিকতা এবং প্রাণচাঞ্চল্যের কর্মধারা যদি আমরা সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে অব্যাহত রাখিতে পারি, তবে জাতীয় ইচ্ছা পূরণের ক্ষেত্রে কোন বাধা হইয়া দেখা দিতে পারিবে না, কোন সংকট চলার পথের এই

www.pathagar.com

উদ্দামগতিকে রোধ করিতে পারিবে না। এজন্যই প্রয়োজন আজ নিয়ম-শৃঙ্খলার, প্রয়োজন আজ ঐক্য ও সংহতির এবং সর্বোপরি প্রয়োজন আজ জাতীয় জীবনের ঈমানসমৃদ্ধ অটুট মনোবলের। অতীতে খন্দকার মোশতাক আহমদের সরকারকে ঘরে ও বাহিরে অনেক অসুবিধা ও সংকটের মধ্য দিয়া পথ চলিতে হইয়াছে। বর্তমানেও সেসব সঙ্কট ও অসুবিধা-বাধা এবং বিপত্তি যে একেবারে অপসারিত হইয়াছে তাহা নয়। তবে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট সায়েমের এই নির্দলীয় অরাজনৈতিক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে বিভিন্ন সঙ্কট ও বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তাহা বাস্ত বায়নের পথে আভ্যন্তরীণ অসুবিধাই কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। বর্তমান সরকার অরাজনৈতিক নির্দলীয় হইলেও এই পথযাত্রায় গোটা জাতিকেই পরিচয় দিতে হইবে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার। দেশের শাসনব্যবস্থায় যাহারা রহিয়াছেন এবং থাকিবেন, তাহাদিগকে পরিচয় দিতে হইবে রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদৃষ্টির, বিচারকসুলভ ন্যায়পরায়ণতার এবং গণমুখী ভূমিকার। বলাবাহুল্য, শাসক ও শাসিতের সরকার ও জনগণের এই উভয়বিধ ভূমিকাই জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করার দাবিদার। এই পর্যায়ে দেশের শাসকমণ্ডলীর মধ্যে যে ঐক্য, যে সমঝোতা এবং যে দৃঢ়চিত্তের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, জাতীয় জীবনে উহার অনিবার্য প্রতিফলন ঘটাইতে হইবে। ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেকটি জোয়ানকে স্ব স্ব কর্তব্যস্থলে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদও বিপ্লবের ফলে সমুদ্ভাসিত জাতীয় সত্তার মহিমাকে কর্ম প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ, সংগঠিত এবং সমাজকে কলুষমুক্ত করার আহ্বান জানাইয়াছেন। আর প্রেসিডেন্ট সায়েম বলিয়াছেন, সুখী-সমৃদ্ধ সমাজগঠনে সর্বশ্রেণীর জনগণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অপরিহার্য। আমরা আনন্দিত যে, আমাদের জোয়ান ভাইয়েরা সেনাবাহিনী প্রধানের আহবানে সারা দিয়া নিজ নিজ কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। আমরা আশান্বিত যে, নব বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ শ্রমিক শ্রেণী স্ব স্ব কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন এবং আদর্শনিষ্ঠ ও অধিকার সচেতন জনগণ নিজ নিজ কর্মস্থলে নব উদ্দীপনার সহিত কাজকর্ম করিয়া চলিয়াছেন। এ কথা সত্য যে, দেশের সাধারণ মানুষের মত আমাদের সেনা, বিডিআর, পুলিশ বাহিনীর নানা রকম সমস্যা রহিয়াছে। পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবস্থা ও অন্যবিদ সমস্যা। আমরা আশা করিব, সরকার সীমিত সাধ্যের মধ্যেও সহানুভূতির সহিত উহা সমাধানের চেষ্টা করিবে। আমরা আগেও বলিয়াছি, আবারও বলিতেছি ইতিহাস বারে বারেই জাতিকে সঙ্কট সন্ধিক্ষণে নিপতিত করিয়াছে। বারে বারেই এ জাতি নব উদ্দীপনায় নব প্রাণ সঞ্জীবনী ধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। এবারেও প্রমাণিত হইয়াছে, উদ্বুদ্ধ এই প্রাণশক্তিকে অবদমিত করার সাধ্য কাহারও নাই। তাই স্বার্থান্বেষী চক্রের সকল পাঁয়তারা নস্যাৎ করিয়া জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্বার্থে সর্বস্তরে রক্ষা করিতে হইবে শান্তি-শৃঙ্খলা সেসব সঙ্কট ও অসুবিধা এবং একতা।

স্বাধীনতা, আমার স্বাধীনতা
(দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ নভেম্বর, ১৯৭৫)

বনের পাখির দুঃখ খাঁচার পাখি বুঝিলেও বুঝিতে পারে, কিন্তু বনের পাখির মুক্ত জীবনের আনন্দ খাঁচার পাখির বুঝার আওতার বাহিরে। কথাটা 'রিটোরিক' বা নিছক আবেদ-উচ্ছ্বাসপ্রসূত বলিয়া বোধ হইতে পারে, তবু স্বীকার করিতে হয়, জাতীয় স্বাধীনতার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে এই আবেগ-উচ্ছ্বাসটুকুই পরম সত্য। যে কোন দেশের যে কোন জাতির সবচাইতে বাঞ্ছিত ধন যাহা তাহা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। বাঙালি কবির প্রশ্ন ছিল, 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?' ইতিহাস ঘাঁটিয়া এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিলে দেখিতে পাই, যাহারা আত্মসম্ভ্রমহীন, যাহাদের মনুষ্যত্ববোধের অভাব, শুধু তাহারাই স্বাধীনতার হেন পরম ধনের মূল্য দেয় নাই। তাহার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ ঘটিয়াছে ইতিহাসের উপেক্ষা, ঘৃণা ও বিস্মৃতিতে। অপরপক্ষে যাহারা আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, সাত পুরুষে বহমান জীবনধারা, ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করা যাহাদের জীবনবোধ, মমত্ববোধ ও দায়িত্ব-কর্তব্যের অংশ, তাহারা জাতি হিসেবে ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়ের অধিকারী। শত বাধা-বিপত্তি, হাজার প্রতিকূলতা ও অন্তরায়ের মধ্যেও যাহারা দেশ ও জাতির স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে নিজ নিজ রক্ত ধমনীর প্রবাহে অনুভব করিয়াছেন, এই পবিত্র অনুভূতি ও উপলব্ধির জন্য অকুণ্ঠচিত্তে সবকিছু বিসর্জন দিয়াছেন, তাহাদের কেহ বা কোনকিছুই পরাজিত করিতে পারে নাই। না কোন বহিঃশত্রু, না কোন আভ্যন্তরীণ গোলযোগ। যে কোন দেশ, যে কোন জাতি একটি অনন্য সূত্রের উপর দাঁড়াইয়া এক ও অভিন্ন কণ্ঠে সোচ্চার করিয়া তুলিতে পারে এবং সেই সূত্রটির নাম জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। বাংলাদেশ হয়ত দরিদ্র দেশ। উন্নয়নশীল দেশ। শতাব্দীর নানা শোষণ ও লাঞ্ছনা-বঞ্চনার বহুবিধ সমস্যা এখানে জমিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এই দেশ, এই জাতি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও কীর্তির অধিকারী। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এই জাতি কখনও আপস করিতে শিখে নাই। এই দেশের গহীন নদী, নীল বিস্তৃত আকাশ, বৈচিত্র্যময় নিসর্গের মতই স্বাধীনতা এই জাতির প্রিয় উচ্চারণ, বহু বাঞ্ছিত প্রাণের ধন। বারবার হায়েনারা এই দেশের উপর লোভ-লালসার চকচকে সবুজ চোখ রাখিয়াছে। এই জাতি কখনও হায়েনাদের বিরুদ্ধে একমন একপ্রাণ হইয়া রুখিয়া দাঁড়াইতে দ্বিধা করে নাই। এই জাতির বহমান ইতিহাসের ধারায় সাময়িক ব্যর্থতা হয়ত আছে, দুনিয়ার কোন জাতির ইতিহাসেইবা তাহা নাই, দুঃখ-দুর্ভোগের চিহ্নও হয়ত আছে, কিন্তু নাই জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিচ্যুতিজনিত গ্লানি বা অপমানের কালিমা। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে দেশ-প্রাণ জাতি সকল সময় নিজেদের ক্ষুদ্র ভেদাভেদ, স্বার্থচিন্তা, আত্মকলহ ও পারস্পরিক হানাহানি ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, পর্বতের ন্যায় অটল ও বজ্রের ন্যায় তীব্র কঠোর হইয়াছে। ইহা জাতি হিসেবে আমাদের গর্বের বিষয়।

গত ৭ নভেম্বর সুপ্রভাতে সৈনিক-জনতার বিশাল-ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানে যে বক্তব্যটি পুনরায় কম্বুনাদে মুখরিত হইয়াছে, তাহা আর কিছু নহে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার বেগ-বিস্তারী ঘোষণা। যে কোন বাধা আসুক, যে কোন প্রতিকূলতা দেখা দিক, হায়েনার নখরে যত শক্তিই থাকুক, জাগ্রত জনতা সেই সবের পরোয়া করে না, ইহাই ৭ নভেম্বরের অনন্য অভ্যুত্থানের বক্তব্য। দেশে বর্তমানে বিরাজমান সাময়িক বিভ্রান্তি ইত্যাদি হইতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরোধী কোন শক্তি বা মহল যদি মনে করেন যে, আভ্যন্তরীণ শাঠ্যষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাইয়া ইহার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করার ইহাই মোক্ষম সময়-আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে তাহাদের জানাইয়া দিতে চাই যে, তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হইবে। কারণ বাঙালিরা শুধু স্বাধীনতা ছিনাইয়া আনিতেই জানে না, উহাকে রক্ষা করিতেও জানে।

-০-

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী ফারাক্কা মিছিল

৫৪টি আন্তর্জাতিক নদী বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীগুলোই এ দেশের বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের কোন অংশকেই নদী ব্যতীত কল্পনা করা যায় না। এ সমস্ত আন্তর্জাতিক নদীর মধ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা প্রধান। এ সমস্ত নদী একাধিক পথে একটি অন্যটির সাথে যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশকে যদি একটি মানব শরীর কল্পনা করা যায় তবে এদেশের নদীগুলো তার শিরা-উপশিরা। ভুটান, চীনের তিব্বত, ভারত, নেপাল এবং বাংলাদেশের ওপর দিয়ে এ সমস্ত নদী প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এই সংযুক্ত নদীগুলোর বিরাট অববাহিকা বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান দখল করে আছে। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান নদীর অববাহিকা আয়তনে বিশ্বে প্রথম। এই বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর প্রবাহিত বার্ষিক গড় পানি প্রবাহের পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে ১২৫০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার এবং এর নিষ্কাশন এলাকার পরিমাণ ১.৭৫ মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা অববাহিকায় প্রায় ৫৬০ মিলিয়ন লোক বসবাস করে। এর মধ্যে গঙ্গা অববাহিকায়ই বাস করে ৪২৮ মিলিয়ন। ব্রহ্মপুত্র এলাকায় বাস করে ৮৩ মিলিয়ন এবং মেঘনা অববাহিকায় ৪৯ মিলিয়ন।

ভারতের সাথে বাংলাদেশের নদীগুলোর সংযোগ সূত্র

সর্বনাশা ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে ভারতের সাথে বাংলাদেশের নদীগুলোর সংযোগ সূত্র আলোচনা করা প্রয়োজন। অবস্থানের দিকে থেক হিমালয় পর্বতে গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ ভাগীরথী নদীর উৎপত্তিস্থল। উল্লেখ্য, হিমালয়ের অলকানন্দা এবং ভাগীরথী এই দুইটি ধারায় মিলিত স্রোতের নাম গঙ্গা। এই দুই ধারার মধ্যে অলকানন্দা ধারাই প্রধান। হিমালয়ের নন্দাদেবী শৃঙ্গের (উচ্চতা ৭৮১৭ মিটার) ৪৮ কিলোমিটার উত্তরে তিব্বত সীমান্তের কাছে গুরওয়ালা নামক স্থানে অলকানন্দা উৎপত্তি হয়েছে। এই স্থলটি সিন্ধুনদ ও ব্রহ্মপুত্র (শাংপো) নদের উৎপত্তি স্থলের কাছাকাছি। ভাগীরথী এবং অলকানন্দা ভারতের উত্তর প্রদেশের তেহরী গুরওয়াল জেলায় গংগোত্রীর (উচ্চতা ৭০১০ মিটার) কাছে দেব প্রয়াণ নামক স্থানে মিলিত হয়েছে এবং ঐ মিলিত স্রোত গঙ্গা নামে হরিদ্বারের কাছে ভারতের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করেছে। এরপর গঙ্গা হরিদ্বারের এলাহাবাদ পর্যন্ত ৭২০ কিলোমিটার দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত হয়েছে। উত্তর প্রদেশের উত্তর কাশী হতে আরম্ভ করে পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত হিমালয়ের দক্ষিণে সমস্ত উত্তর ভারতের ওপর দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গার বাম এবং ডান তীরে উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে কিছুসংখ্যক উপনদী যুক্ত হয়েছে। রামডাঙ্গা, গোমতী, ঘাগরা, গন্ধক, রামগতি ও কুশী বামতীরের প্রধান উপনদী। অন্যদিকে ইয়ামোনা ও সোনাডাঙ্গা তীরের প্রধান প্রধান উপনদী। মহানন্দা বাংলাদেশের গঙ্গার একমাত্র উপনদী। এটা রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি নামক স্থানে গঙ্গার সাথে মিশেছে। উল্লেখ্য, নেপালে উৎপন্ন ঘাগড়া কর্ণালী, গন্ধক এবং কুশী উপনদী, শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীর প্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে আসছে। কুশী উপনদীর মোহনার পর গঙ্গা পূর্বদিকে ৪০ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাজমহল পাহাড়ে এবং রাজশাহী জেলায় (বাংলাদেশ) প্রবেশ করেছে। হরিদ্বার

www.pathagar.com

হতে রাজমহল পর্যন্ত গঙ্গার অবস্থাকে সমভূমি অবস্থা এবং রাজমহল হতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অবস্থাকে ব-দ্বীপ অবস্থা বলা হয়। ফারাক্কা হতে ১৬ কিলোমিটার নিম্ন দেশে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা ১৪০ কি.মি. ভারত এবং বাংলাদেশের সীমারেখা হিসেবে প্রবাহিত হয়েছে। ফারাক্কা বাঁধের ভাটি থেকে গঙ্গা দু'টি পৃথক ধারায় বিভক্ত হয়ে একটি ধারা পূর্বদিকে পদ্মা নামে বাংলাদেশের রাজশাহীতে প্রবেশ করে আরও ২৪০ কি.মি. প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দ নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে যুক্ত হয়েছে। গোয়ালন্দ থেকে আরও ১০৪ কি.মি. প্রবাহিত হয়ে এটা পদ্মা নাম ধারণ করে চাঁদপুর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নদীতে পতিত হয়েছে। এই মেঘনা আরও ২১৮ কি.মি. প্রবাহিত হয়ে ভোলার কাছে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। বরাল, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ, কুমার, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব ইত্যাদি গঙ্গার শাখা নদী। উৎস থেকে গঙ্গা নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫,২৮ কি.মি.। গঙ্গা নদীর নিষ্কাষণ এলাকার আয়তন প্রায় ১০,৭০,০০০ বর্গ কি.মি.। ৮,৬০,০০০ বর্গ কি.মি. ভারতে, ১,৪০,০০০ বর্গ কি.মি. নেপালে এবং ৪৬,০০০ বর্গ কি.মি. বাংলাদেশে অবস্থিত। বাকি এলাকা তিব্বতে অবস্থিত। বাংলাদেশে হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নিচে গঙ্গা নদীর বার্ষিক গড় পানি প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে ৩৮৩ বিলিয়ন কিউবিক মিটার এবং ফারাক্কায় প্রতি সেকেন্ডে ৩৮০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। গঙ্গা অববাহিকায় চাষাবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রায় ৬৬ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে ভারতে এই ভূমির পরিমাণ প্রায় ৬০ মিলিয়ন হেক্টর। গঙ্গা অববাহিকার নিম্নাঞ্চল তুলনামূলকভাবে খুব বেশি ঘনবসতিপূর্ণ। আনুমানিক ৪৩০ মিলিয়ন লোক গঙ্গা অববাহিকায় বাস করে।

ব্রহ্মপুত্র নদী : হিমালয় পর্বতের কৈলাশ শৃঙ্গে ৫১৫০ মিটার উচ্চে তিব্বতের মানস সরোবরে ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি। এটা চীনের তিব্বত অঞ্চলে অবস্থিত, যার স্থানীয় নাম শাংপো। উৎপত্তির পর ব্রহ্মপুত্র পূর্বদিকে ১৭০০ কি.মি. হিমালয়ের প্রধান শৃঙ্গের সমান্তরাল এবং তিব্বতের দক্ষিণাংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের সাথে বেশ কয়েকটি উপনদী যুক্ত হয়েছে। এরপর ব্রহ্মপুত্র তিব্বতের উত্তর-পূর্ব দিকে গায়ালা পাড়ি পর্বত এবং নামকি বারওয়া পর্বতের মধ্যে দিয়ে (উচ্চতা ৭৭৫৬) প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঘুরে প্রথমে সিয়াং এবং পরে দিহাং নামে ভারতের অরুণা প্রদেশে প্রবেশ করেছে। সাফিয়া শহরের কাছে দিহাং ও লোহিট দুইটি উপনদী, ব্রহ্মপুত্রের সাথে যুক্ত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নামে প্রবাহিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদী আসামের ভিতর দিয়ে ৭২৫ কিলোমিটার পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ পথে উত্তর এবং দক্ষিণ থেকে বেশ কয়েকটি উপনদী এর সাথে যুক্ত হয়েছে। উত্তর দিকের উপনদীর মধ্যে সোবানসিঁড়ি, কামেং, ধানসিঁড়ি, মানস, চম্পামতী এবং সঙ্কোশ প্রধান। দক্ষিণাংশে প্রধান উপনদীগুলো হচ্ছে নোয়া দিহিং, বুড়িদিহিং, দিসেং, ধানসিঁড়ি এবং কোপিলি। ভারতে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদী প্রচুর পলিমাটি বহন করে এবং এ নদীর প্রশস্থ অনেক বেশি, সর্বাধিক ১৮ কি.মি.। তবে স্থায়ী তীরের কাছে নদী বেশ সরু পথে প্রবাহিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদী আসামের গোয়ালপাড়ার কাছে গারো পাহাড়ের ওপর দিয়ে কুড়িগ্রামের মাজহিয়ালীতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গাইবান্ধা, বগুড়া, পাবনা, জামালপুর, টাঙ্গাইল জেলায় ২৭০ কি.মি. প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দ নামক স্থানে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের এই অংশে অনেক উপনদী যুক্ত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে দুধকুমার, ধরলা এবং তিস্তা প্রধান। কুড়িগ্রাম থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত এই নদীর নাম যমুনা। ব্রহ্মপুত্র নদ বাংলাদেশে প্রবেশের পর কিছু দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে ময়মনসিংহ ও জামালপুর জেলার

www.pathagar.com

ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরববাজারে মেঘনায় পতিত হয়েছে। ১৮৮৭ সালে তিস্তা নদীতে এক প্রবল বন্যার ফলে ব্রহ্মপুত্র নদী তার গতিপথ বদলিয়ে যমুনার দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। ফলে উক্ত নদী ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নামে পরিচিতি লাভ করে। গোয়ালন্দের পর ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গার মিলিত স্রোত ১০৫ কি.মি. দক্ষিণদিকে পদ্মা নামে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদী তিব্বতের উৎপত্তিস্থল থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত প্রায় ২৮১৭ কি.মি. লম্বা। এর মধ্যে ১৬২৫ কি.মি. তিব্বতে, ৯১৮ কি.মি. ভারতে এবং বাকি ২৭৪ কি.মি. বাংলাদেশে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র নদীর মোট নিষ্কাশন এলাকার আয়তন ৫,৮০,০০০ বর্গ কি.মি.। এর মধ্যে ২,৯৩,০০০ বর্গ কি.মি. তিব্বতে, ১,৯৫,০০০ বর্গ কি.মি. ভারতে, ৪৫,০০০ বর্গ কি.মি. ভুটানে এবং ৪৭,০০০ বর্গ কি.মি. বাংলাদেশে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র নদের বার্ষিক গড় পানি প্রবাহ বাহাদুরাবাদে প্রতি সেকেন্ডে ৬২০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রায় ৯.৩ মিলিয়ন হেক্টর, যার অধিকাংশই ভারত এবং বাংলাদেশে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় প্রায় ৮৬ মিলিয়ন লোক বাস করে। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক বাস করে বাংলাদেশে। এই নদীতে পানি প্রবাহের পরিমাণ খুব বেশি। দৈনিক সর্বোচ্চ ৮.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্রবাহের হিসাব করা হয়েছে। বার্ষিক স্বাভাবিক পলি প্রবাহের পরিমাণ প্রায় ৭৩৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

মেঘনা নদী : মেঘনা বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী এবং পৃথিবীর বৃহৎ নদীগুলোর অন্যতম। বরাক নদী মেঘনার প্রধান স্রোত। আসামের মনিপুর পাহাড়ের ২৯০০ মিটার উঁচুতে উৎপন্ন হয়ে ২৫০ কি.মি. পাহাড়ের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সিলেটের অমলসিদ সীমান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ওখানে বরাক, সুরমা এবং কুশিয়ারা নামে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে উভয় স্রোত বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। সুরমা সিলেটের উত্তরাংশে প্রবাহিত হয়েছে। এই অংশে পাহাড় থেকে অনেক উপনদী সুরমার সাথে যুক্ত হয়েছে। সুরমা সুনামগঞ্জে প্রবেশ করেছে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মদনী পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। মারকুলিতে কুশিয়ারা সুরমা নদীর সাথে যুক্ত হয়েছে। এই মিলিত স্রোত কালনী নাম ধারণ করে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। চলার পথে সুরমা নদী উত্তর দিক হতে বেশ কয়েকটি স্রোতধারা এসে মিশেছে। কুলিয়ারচরের কাছে গোড়া ও টিয়া নদী কালনী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এবং এখান থেকে মেঘনা নামে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরে পদ্মা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। কুলিয়ারচর এবং চাঁদপুরের মধ্যে ডান তীরে তিতাস ও গোমতী এবং বাম তীরের লক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা মোহনার সাথে মিলিত হয়েছে। উল্লেখ্য, মেঘনা নদী দুইটি অংশে বিভক্ত। কুলিয়ারচর হতে ষাটনল পর্যন্ত আপার মেঘনা এবং ষাটনল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত লোয়ার মেঘনা নামে পরিচিত। ষাটনলের কাছে অদ্ভুদ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্বদিক হতে আগত মেঘনা নদীর পানি স্বচ্ছ ও নীল এবং পশ্চিমদিক থেকে প্রবাহিত ধলেশ্বরীর পানি ঘোলা। এই দুই নদীর ধারা কি.মি. পর কি.মি. স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে স্বতন্ত্র দুই রঙের পানি। একটার সাথে অন্যটি মিলছে না। ষাটনলের ১৬ কি.মি. ভাটিতে চাঁদপুরের কাছে পদ্মা ও মেঘনার মিলিত স্রোত মেঘনা নামে মিলিত হয়েছে এবং চাঁদপুর পর্যন্ত মেঘনা নদীর মোট দৈর্ঘ্য ৯০০ কি.মি.। আমলসিদ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ৬৭০ কি.মি.। ভারতে মেঘনা নদীর মোট দৈর্ঘ্য ৫৬৪ কিঃমিঃ। কিন্তু এর বিস্তার ওপরের অংশ থেকে নিম্নাংশে অনেক বেশি। ভৈরব বাজারে এ নদীর বিস্তার ১ কি.মি., ষাটনলের কাছে ৫ কি.মি., চাঁদপুরের কাছে ১১

www.pathagar.com

কিংমিঃ এবং মোহনার কাছে ইলসা, তেঁতুলিয়া এবং শাহবাজপুরে ৪০ কি.মি.। মেঘনায় মোট নিষ্কাশন এলাকার আয়তন ৮৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৪৯,০০০ বর্গ কি.মি. ভারতে এবং ৩৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশে অবস্থিত। ভৈরব বাজারে মেঘনা নদীর বার্ষিক গড় প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে ১৫০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। এর চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৪ মিলিয়ন হেক্টর এবং লোকসংখ্যা ৪৯ মিলিয়ন। লোকসংখ্যার অধিকাংশ বাংলাদেশে বাস করে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন আমাদের পরম 'বন্ধু' হিসেবে ঘরে প্রবেশকারী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত সুদূর অতীতে অত্যন্ত সুকৌশলে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করেছিল। তখন বলা হয়েছিল হুগলী নদীর নাব্যতা রক্ষার জন্য ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ' করার মত বাংলাদেশকে শায়েস্তা করার জন্যই এই অপকর্মটি করা হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কারণ আমরা শুনতে পাই যে, এই অভিশপ্ত ফারাক্কার কারণে পশ্চিমবঙ্গে এবং তদসংলগ্ন জেলাগুলোতে নিয়মিত বন্যা ও নদীভাঙন লেগেই আছে। পশ্চিমবঙ্গ ও তদসংলগ্ন জেলার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণও এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর খুবই নাখোশ থাকেন বলে সংবাদপত্রে প্রকাশ। ফারাক্কা বাঁধের কারণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় এ যাবত কি ধরনের ক্ষতি ও বিপর্যয় ঘটেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ সঙ্গতকারণেই এখানে দেয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন সূত্র-উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ফারাক্কা বাঁধ চালু হওয়ার পর পর্যন্ত-

(১) মালদহ জেলার কালিয়াচক ১, ২, ৩ নং ব্লক এবং মানিকচক ব্লকের প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার একর জমি গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

(২) মুর্শিদাবাদ জেলার ৫০/৬০ হাজার এক জমি একই কারণে গঙ্গা গ্রাস করেছে।

(৩) গঙ্গা তীরবর্তী এলাকার ৪০ হাজার পরিবার রিক্ত-নিঃস্ব-ভিখারীতে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার লোক পেশা হারিয়েছে।

(৪) গঙ্গা তীরবর্তী এলাকায় আমনের ফলন, তুঁত ও আখ উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। মার খেয়েছে রবি ফসল।

(৫) সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে।

(৬) জনস্বাস্থ্য, প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর বেড়েছে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া।

(৭) দীর্ঘদিন ধরে ফারাক্কা বাঁধের ৫৬টি স্লুইস গেইট বন্ধ থাকার কারণে গেটগুলোর গোড়ায় পানি জমে আটকে গেছে। গেটগুলো না খোলার কারণে ফারাক্কার উজানে পলি ও বালি জমে চরের সৃষ্টি হয়েছে।

(৮) বাঁধের উজানে গঙ্গা নাব্যতা হারিয়েছে। ফলে ভাঙন হয়ে পড়েছে অবধারিত।

ফারাক্কা বাঁধের যখন পরিকল্পনা করা হয় তখন থেকে বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞরা এর বিরূপ ও ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন। ভারত এসব মতামত গ্রাহ্য করেনি। ভারত বর্তমান ফারাক্কা বাঁধের পরিকল্পনা করে ১৯৫১ সালে। নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৬১ সালের ৩০ জানুয়ারি। শেষ হয় ১৯৭০ সালের শেষ দিকে।

সুদূর অতীতে ১৮৫৮ সালের প্রথম দিকে স্যার আর্থার কটন নামের একজন বৃটিশ প্রকৌশলী রাজমহলের কাছে গঙ্গার ওপর বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। কিন্তু তৎকালীন বাংলার গভর্নর এটিকে `Whimisical and money-wasting' স্কীম বলে অভিহিত করেন। পরে ১৯১৬ সালে আর একটি উদ্যোগ নেয়া হয়। সে উদ্যোগও 'বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ' বলে পরিত্যক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির সময় বিষয়টি বৃটিশ কর্তৃপক্ষ

www.pathagar.com

ও হিন্দু নেতৃবৃন্দের নজরে ছিল। এ কারণেই মুসলমান প্রধান হওয়া সত্ত্বেও মালদহ ও মুর্শিদাবাদকে ভারতের অংশে দিয়ে দেয়া হয়। র‍্যাডক্লিক রোয়েদাদের প্রধান শর্ত ছিল, মুসলিমপ্রধান অঞ্চল যাবে পাকিস্তানে এবং হিন্দুপ্রধান অঞ্চল যাবে ভারতে। এক্ষেত্রে শর্ত উপেক্ষা করা হয়। অন্যান্য ফ্যাক্টরকে গুরুত্ব দিয়ে মালদহ-মুর্শিদাবাদকে ভারতভুক্ত করা হয়। ঐ অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশভুক্ত হলে ভারতের নদীব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, কলকাতা বন্দর ও কলকাতা নগরী সংকট সমস্যায় পড়তে পারে এই দোহাই বা অজুহাতে অঞ্চলটি ভারতকে দিয়ে দেয়া হয়। ভারত প্রধানত দু'টি অজুহাত তুলে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণে হাত দেয়।

এক. কলকাতা বন্দর রক্ষা এবং

দুই. ভাগীরথী ও হুগলী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি।

উপায় হলোঃ গঙ্গার পানি হুগলী নদীতে প্রবাহিত করা। এত দিনে এটা প্রমাণিত যে, কলিকাতা বন্দরের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বর্তমান অবস্থাই তার সাক্ষ্য দেয়। এ সময় আন্তর্জাতিক পানি বিশেষজ্ঞ ডা. আর্থার টি ইপেন বলেছিলেন, 'গঙ্গার মিঠা পানি হুগলীর লবণাক্ত পানিতে প্রবাহিত করে কলকাতা বন্দর সমস্যার সমাধান হবে না বরং এতে মিঠা পানি ও চর পড়ার সমস্যা সৃষ্টি হবে।'

ফারাক্কা বাঁধের যৌক্তিকতা নিয়ে তখন অনেকের মত ভারতের বিশিষ্ট পানি বিশেষজ্ঞ ও প্রকৌশলী কপিল ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। কারণ, এতে ফারাক্কা ও তার আশপাশের অঞ্চলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে।'

পাকিস্তান আমল থেকে এ পর্যন্ত ফারাক্কা বাঁধ প্রশ্নে ভারত ছলচাতুরী ও টালবাহানার আশ্রয় নিয়ে চলেছে। ১৯৫১ সালের ২৯ অক্টোবর পাকিস্তান প্রথম এ বিষয়ে ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ৫ মাস পর ১৯৫২ সালের ৮ মার্চ ভারত উত্তরে জানায় যে, প্রকল্পটি প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর্যায়ে রয়েছে এবং পাকিস্তানের উদ্বেগ সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। ১৯৫২ সালের ৮ মে পাকিস্তান ভারতকে ভারতীয় সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায় যে, পশ্চিমবঙ্গের একটি নয়, পাঁচটি নদীকে কেন্দ্র করে ভারত একটি বহুমুখী প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তান একটি টেকনিক্যাল রিপোর্টের উদ্ধৃতিও ভারতের কাছে তুলে ধরে। ঐ রিপোর্টে বলা হয় যে, গঙ্গার একটি শাখা নদী গন্ধক থেকে বিপুল পরিমাণ পানির দিক পরিবর্তন করা হচ্ছে বিহার ও উত্তর প্রদেশের সেচ সুবিধার জন্য। এর প্রত্যুত্তরে ভারত ১৯৫৩ সালের ২২ মে পাকিস্তানকে জানায় যে, ফারাক্কা এবং গন্ধক প্রকল্প এখনও অনুসন্ধানী পর্যায়ে রয়েছে এবং গঙ্গার পানি সম্পদ সম্মিলিতভাবে উন্নয়নের বিষয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে প্রস্তুত। এভাবে বছরের পর বছর পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে পত্র বিনিময় হয়েছে এবং পত্রের মাধ্যমে বাদানুবাদও হয়েছে। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান ভারতকে তিনটি প্রস্তাব দিয়েছিল।

এক. রাষ্ট্রসংঘের কোন সংস্থা থেকে পূর্বাঞ্চলের নদীব্যবস্থার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সহায়তা করার জন্য এডভাইজারি এবং টেকনিক্যাল সার্ভিস চাওয়া হোক।

দুই. দু'দেশের প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের আগে দু'দেশের বিশেষজ্ঞগণ যৌথভাবে পরীক্ষা করে দেখুক।

তিন. রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবকে অনুরোধ করা হোক তিনি যেন এক বা একাধিক প্রকৌশলী নিয়োগ করেন যিনি বা যারা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেবেন।

www.pathagar.com

ভারত তিনটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষ জুন, ১৯৬০ থেকে শুরু করে ১৯৬২ পর্যন্ত দু'দেশের মধ্যে পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞদের চারটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব বৈঠক চলাকালীনই ৩০ জানুয়ারি, ১৯৬১ সালে ভারত পাকিস্তানকে জানায় যে, সে ফারাক্কা বাঁধের কাজ শুরু করেছে। বিষয়টি পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর পত্রালাপেও গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত হয়। দুই সরকারপ্রধান এ মর্মে একমত হন যে, বিষয়টি মন্ত্রিপর্যায়ের বৈঠকে আলোচিত ও বিবেচিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকটি অবশ্য কখনো হয়নি। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে ৫ম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় দিল্লীতে ১৯৬৮ সালের ১৩ থেকে ২৬ মে। এরপর শুরু হয় সচিবপর্যায়ের বৈঠক। ডিসেম্বর ১৯৬৮, মার্চ ১৯৬৯, জুলাই ১৯৬৯ এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭০ সচিব পর্যায়ের চারটি বৈঠক পালাক্রমে দিল্লী ও ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকগুলোতে নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলে। তবে কোন সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের কারণে কিনা যদিও তা বোধগম্য নয়, তবুও স্বীকার করতেই হবে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত সচিবপর্যায়ের পঞ্চম বৈঠকটি আমাদের স্বার্থের হানি ঘটিয়েছিল। ঐ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় জুলাই ১৯৭০-এ। বৈঠকের সুপারিশমালার অন্যতম ছিল যে, উভয়পক্ষ গঙ্গার পানি ফারাক্কা পয়েন্টে যা পাওয়া যায় তাই ভাগাভাগী করে নেবে। এটিই হচ্ছে আপত্তিকর।

পাকিস্তান আমলে শুধু ফারাক্কা বাঁধের জন্যই নয়-বাংলাদেশে প্রবাহিত সকল নদীর পানিব্যবস্থা সম্পর্কে কথা উঠেছিল। ১৯৬৭ সালের ২৮ মে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'পানির ব্যবহারে শান্তি সম্মেলন'। ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে পাকিস্তানি প্রতিনিধির প্রস্তাব ছিল 'বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ওপর দিয়ে প্রবাহিত ভারত থেকে নদ-নদীগুলোর ব্যবহার একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি হওয়া দরকার।'

১৯১১ সালের আন্তর্জাতিক আইন ইন্সটিটিউটের মতে, 'প্রতিবেশী দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদীর পানি নদীর উৎসের দেশটি এমনভাবে ব্যবহার করতে পারবে না যাতে প্রতিবেশী দেশের কোনো ক্ষতি হয়।' আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানি ব্যবহার সংক্রান্ত হেলসিনকি রুলস-এর অনুচ্ছেদ IV-এ স্পষ্টভাবে বলা আছে 'Each basin state is entitled, within its teritory to a reasonable and equitable share in the beneficial use of the water of an international basin.'

১৯৬১ সালের Utilization on Non-maritime international waters (except for navigation-) এ বলা হয় 'Every state has the right to utilize waters of international rivers subject to the limits imposed by international law and in particular limited by the right of utilization of Co-riparian states'. রাষ্ট্র সংঘের Conference on the Human Environment এর Recommendation 51-এ বলা হয় 'The net benefits of hydrologic regions common to more than one national Jurisdication are to be shared equitably by the nation affected.' তাছাড়া Barcelona Convention মোতাবেক আন্তর্জাতিক নদীতে উজানের দেশ যে প্রকল্পই গ্রহণ করুক না কেন তা কোনভাবেই ভাটির দেশের স্বার্থকে বিঘ্নিত করতে পারবে না। উজানের দেশকে ভাটির দেশের সঙ্গে সমঝোতা করে আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক আন্ত র্জাতিক সংস্থাসমূহের সহায়তায় একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক সীমানার ১৮ মাইল দূরে গঙ্গা নদীর উজানে এই ফারাক্কা বাঁধ। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের বিরোধিতা এবং তা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গড়ালে বাঁধ নির্মাণ কাজ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ধীর গতিতে চলতে থাকে।

দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর একই বছর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান হতে বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে গেলে এবং ফারাক্কা সীমানা নব্য মানচিত্রে স্থান পেলে ভারত বাঁধ নির্মাণ ও চালুতে পুনরায় উৎসাহী হয়ে উঠে। ভারত এই সময়টিকে উপযুক্ত মনে করে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় দেয়। এরপর ইন্দিরা গান্ধী বিষয়টি শেখ মুজিবের নিকট উপস্থাপন করেন। ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি ফারাক্কা প্রকল্প নির্মাণ সপ্তাহ ও চালুসহ পানি বণ্টন প্রশ্নে নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ-ভারত সরকারের মধ্যে স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ ঢাকায় সম্পাদিত ইন্দিরা-মুজিব ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রীচুক্তির ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'উভয় দেশ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী অববাহিকা উন্নয়ন, জল বিদ্যুৎ ও সেচের ব্যাপারে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হয়েছে।'

ফারাক্কা বাঁধ চালুর আগে বাংলাদেশের স্বাভাবিক নদী প্রবাহে ৬১ হাজার কিউসেক পানি পেত। কিন্তু ভারত এই বাঁধ নির্মাণ করে আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির তোয়াক্কা না করে একতরফাভাবে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার করে নেয়। ভারত এই সর্বনাশা ফারাক্কা বাঁধ চালু করে ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে যখন ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব ছিল গলায় গলায় এবং এ বাঁধ ভারত চালু করে বাংলাদেশের সঙ্গে এক মহাপ্রতারণার মাধ্যমে। এ সংক্রান্ত বিবরণ পানি বিশেষজ্ঞ জনাব বিএম আব্বাস-এর 'ফারাক্কা ব্যারাজ ও বাংলাদেশ', জনাব এম রফিকুল ইসলামের "Dispute Overganges Water" এবং মিসেস খুরশীদা বেগমের "Tension over Farrakka Barage" বইয়ে দেয়া আছে।

ভারত আগাগোড়া দাবি করে আসছে যে, 'বাংলাদেশ বন্ধু দেশ।' এই বন্ধুত্বের বড় প্রমাণ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ভারত বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল। 'কেন ভারত সরকার আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে এলেন?' শীর্ষক সাপ্তাহিক হককথার এক প্রতিবেদনে (১৯ মে, ১৯৭২) বলা হয়, 'শুধু ভারতের নয়, সারা বিশ্বের নির্যাতিতরা আমাদের বন্ধু। বিশেষ করে রক্তাক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিগত নয় মাসে ভারতের জনগণ আমাদের প্রতি তাহাদের বন্ধুত্বের অকৃত্রিমতা প্রদর্শন করতে পেরেছেন। চরম বিপদের দিনে তারা আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, খাবার দিয়েছেন, দিয়েছেন যুদ্ধের প্রেরণা এবং ভবিষ্যতের অনাবিল ভরসা। তাদের সাহায্যে কোন দুরভিসন্ধি ছিল না, উদ্দেশ্যের পেছনেও ছিল না কোন স্বার্থান্ধতা কিন্তু ভারত সরকার জনগণ নয়। তবু সরকার আমাদের সাহায্য করেছেন- এক কোটি শরণার্থী এবং পলাতক সরকারকে আশ্রয় দিয়েছেন। মুজিবনগর এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছেন, অস্ত্রের সাহায্য করেছেন এবং সবশেষে সারা বিশ্বকে হতচকিত করে দিয়ে নিজের সেনাবাহিনীকে তৈরি যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে হানাদার পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করানোর মধ্য দিয়ে এনে দিয়েছেন আমাদের স্বাধীনতা। আজ তাই আমরা স্বাধীন। কিন্তু কেন এই সাহায্য? কৃতজ্ঞতার নামে বিগলিত অন্ধ দালালিতে নয় বরং যৌক্তিক পর্যালোচনায় বিশ্লেষণ করলে যে কথাটি বেরিয়ে পড়ে, তাহলো এডভান্স বুকের কথাঃ স্বার্থ বনাম মানবতার মহাজন বাক্যটি মনে রেখেই একটি বৃহৎ রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রের প্রতি তার নীতি নির্ধারণ করতে হয়। এ কথার সত্যতা প্রমাণ করবে মওলানা ভাসানীর বন্দিদশা, বামপন্থীদের প্রতি নিদারুণ অবিচার, অত্যাচার এবং নিজের সেনাবাহিনী দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেয়া। বাংলাদেশের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতাবস্থায়, জনতা যদিও প্রস্তুত থাকতে পারতেন, কিন্তু ইয়াহিয়া ও

www.pathagar.com

ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের আপোস আলোচনা এবং তার অগ্রগতির আশ্বাস বস্তুত জনগণকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। মওলানা ভাসানী এবং প্রগতিশীল বামপন্থীদের বারবার সাবধানবাণী সত্ত্বেও তাঁরা জনতাকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে দ্বিধা করেননি। তারপর পাকবাহিনীর সুপরিকল্পিত আক্রমণে অপ্রস্তুত জনতার রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হলো, নেতৃবৃন্দ ভারত অভিমুখে পলায়ন করলেন, জেল খেটে অভ্যস্ত শেখ সাহেব এবারো ধরা দিলেন। প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম কারো একার ছিল না-সর্বশ্রেণীর জনতাই অংশ নিয়েছেন-নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের সাহায্যে পরিচালিত এই যুদ্ধে বামপন্থীদেরকে সুকৌশলে কোণঠাসা করা হয়েছে। স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। মুক্তিবাহিনীতে এমন কাউকে নিতে দেয়া হয়নি যারা পরবর্তীকালে ভারত সরকারের যাচ্ছেতাই কার্যকলাপের বিরোধিতা করবেন। এ জন্যই গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে বামপন্থীদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে। এদের মধ্যে যারা কঠোর পরিশ্রম এবং বীরত্বের বিনিময়ে যুদ্ধ করেছেন, তাদের বেশিরভাগকেই বন্দি করা হয়েছে অথবা তারা নিহত হয়েছেন গুপ্ত ঘাতকের হামলায়। যুদ্ধের সময় যাদের পাওয়া যায়নি তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলসহ আরো অনেক দেশপ্রেমিকই তাই আজ বন্দি। এত করেও স্বার্থান্ধ ভারত সরকারের আতঙ্ক কাটেনি। যখন দেখা গেল বাংলাদেশে এলাকাভিত্তিক নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে এবং মুক্তিযোদ্ধারা বাস্ত বতার ভিত্তিতে ক্রমাগতভাবে বামপন্থীদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে তখনই দিশেহারা ভারত সরকার তার সেনাবাহিনীকে মুক্তিবাহিনীর তৈরি যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে দিয়ে স্বাধীনতা এনে দিলেন। কেননা, এই সশস্ত্র সংগ্রামকে আরো বেশি চলতে দিলে তা প্রকৃত গণযুদ্ধে পরিণত হয়ে অবশেষে সকল প্রতিক্রিয়াশীল উৎখাত করতো, অবসান ঘটাতো সকল শোষণের, প্রতিষ্ঠা হতো প্রকৃত শোষণহীন সমাজব্যবস্থার। তাছাড়া প্রথম থেকেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে ওঠা মুক্তিযুদ্ধের কৃতিত্বের সম্পূর্ণ অংশ ছিনিয়ে নেয়াও তাদের লক্ষ্য ছিল। পাকিস্তানি বৃহৎ পুঁজিপতিদের সাথে বাঙালি উঠতি পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে পরিণত হলে যখন জাতীয় স্বার্থের খাতিরে জনগণ সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হলেন, তখনই আজন্ম শত্রু পাকিস্তানকে ধ্বংস করার সুযোগ নিয়ে ভারত সরকার তার যাত্রা শুরু করলেন। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার মধ্য দিয়ে ভারত সরকার তার খাদ্য-সংকট থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন, প্রতি বছরের অসংখ্য উদ্বাস্তু সমস্যারও সমাধান করতে চেয়েছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং বিদ্রোহী পশ্চিমবঙ্গের নক্সাল বাড়ি থেকে শুরু হয়ে যে কৃষি বিপ্লব পরবর্তীকালে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল, তার হাত থেকেও মুক্তির প্রয়োজন ছিল। উপরের আলোচনায় যৌক্তিক প্রমাণ মিলবে যুদ্ধোত্তর ঘটনাবলী থেকেই। যে কোন দেশপ্রেমিক স্বীকার করেন, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য এবং ২৫ বৎসর মেয়াদী শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি বাংলাদেশের ওপর মরণাঘাত হেনেছে। বিগত ১৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন বাংলাদেশ সফরে। তিনি এসেছিলেন (পত্র-পত্রিকার ভাষায়) "বাংলার মানুষকে দাসত্বের নরক থেকে মুক্তিস্বর্গের সিংহদ্বারে পৌঁছে দেবার জন্য।" খোলাখুলি আশ্বাসবাণী এবং আশীর্বাদস্বরূপ ১৯ মার্চ স্বাক্ষরিত হয়েছে ভারত-বাংলাদেশ 'শান্তি-বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি"। চুক্তিটির নবম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ".....কোনো পক্ষ আক্রান্ত হলে অথবা আক্রান্ত হবার হুমকি আসলে উভয়পক্ষের কর্মকর্তারা অনতিবিলম্বে আশঙ্কা দূর করে শান্তির নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক আলোচনায় মিলিত হবেন।" অথচ,

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মানচিত্র ঘাঁটলে দেখা যাবে একমাত্র পূর্বদিকে সামান্য স্থান জুড়ে বার্মার সীমান্ত ছাড়া আর সব দিকেই ঘিরে রয়েছে আমাদের প্রতিবেশী ভারত। তাছাড়া বার্মার তরফ থেকেও কোনো আক্রমণ বা হুমকির সম্ভাবনা থাকতে পারে না। তবুও কেন চুক্তিটিতে এই শর্ত জুড়ে দেয়া হলো? এখানেই শেষ নয়, চুক্তিটির দশম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ "......চুক্তিকারী কোনো পক্ষই অন্য কোনো দেশের সাথে এমন কোনো গোপন বা প্রকাশ্য চুক্তি করার চেষ্টা করবেন না যা এই দুই পক্ষের কারো স্বার্থবিরোধী।" বাংলাদেশের জনগণের কি তাহলে সার্বভৌমত্ব নেই? এদেশের জনগণ নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়েই স্থির করার অধিকার রাখেন, কি হবে আর কী হবে না, কার সাথে চুক্তি করবেন বা করবেন না, সে সিদ্ধান্ত নেয়ার সর্বোচ্চ ক্ষমতাও জনতারই-অন্য কারো নয়। অথচ চুক্তিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বাংলাদেশকে দেশ রক্ষা এবং পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে সম্পূর্ণরূপে ভারতের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে-তার নির্দেশেই চলতে হবে সব সময়। প্রথমত, জাতীয় মিলিশিয়া গঠন করে আবার তা ভেঙ্গে দেয়ার কথাও বলতে হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের সুযোগ না দেয়ার কারণ এবং উদ্দেশ্য এখানেও কাজ করেছে। মুক্তিবাহিনীর যুবকদেরকে নিয়েই মিলিশিয়া বাহিনী গঠিত হয়েছে। তাছাড়া বীরযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত বর্তমান বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী জোয়ানদের ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে ভারতে। ১৯৬৯ সনের জুন মাসে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ "এশিয়ার যৌথ নিরাপত্তা" প্রস্তাবটির মাধ্যমে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যে সাধনায় নেমেছে, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত ২৫ বছর মেয়াদী এই চুক্তিটি তারই সহায়তা করবে। ফলে সারা বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদীদের আন্তর্জাতিক রণনীতির তাঁবেদার হয়েই বাংলাদেশকে থাকতে হবে। ভারত এবং সোভিয়েত সরকারদ্বয়ের বাণিজ্যের বাজার হিসেবে বিক্রি করতে হবে নিজেকে। এক কথায়ঃ বাণিজ্য বা শান্তি চুক্তি কোনটির মাধ্যমেই বাংলাদেশ সামান্য লাভবান হতে পারেনি; বরং এদেশের জনতার স্বার্থকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের নয়মাসে বাংলাদেশের জনগণের চরম দুর্যোগের দিনগুলোতে ভারতের নির্যাতিত জনগণের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। এই বন্ধুত্ব কোনো স্বার্থকে কেন্দ্র করে হয়নি; বরং আমাদের বিপদে ভারতীয় জনগণের অকৃত্রিম সাহায্য এবং সহযোগিতা দুদেশের জনতার বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করে দিয়েছে। নির্যাতিত জনগণের এই বন্ধুত্বকে প্রতিক্রিয়াশীল শোষকগোষ্ঠী স্বভাবতই সহ্য করতে পারছে না। এর অপপ্রয়োগ করে একে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার চেষ্টায় মেতে উঠেছে। কিন্তু পৃথিবীর কোনো শক্তিই দু'দেশের নির্যাতিত মেহনতি জনতার বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে পারবে না। তাদের অপচেষ্টা বরং তাকে আরো সংহত করবে।'

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর মার্চ ১৯৭২-এ অভিন্ন নদীর পানি উন্নয়নের লক্ষ্যে Joint Rivers Commission (JRC) স্থাপন করা হয়। JRC'র বৈঠকগুলোতে গঙ্গার পানি প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দুটি প্রস্তাব বারবার আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ভারতের একগুঁয়েমীর জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়নি।

শেখ মুজিব ১৯৭৪ সালের মে মাসে ৫ দিনের জন্য দিল্লী গমন করেন। বাংলাদেশের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিলেন যে, দুই প্রধানমন্ত্রীর (শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধী) শীর্ষ বৈঠকে ফারাক্কা প্রশ্নের সমাধান হবে। কিন্তু শীর্ষ বৈঠকে এ ব্যাপারে কোন আলোচনা হয়নি। তবে ১৬ মে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী নতুন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। এ চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ বেরুবাড়ি ভারতকে দেয়া হয়েছিল এবং একই সঙ্গে ভারত পেয়েছিল ফারাক্কা বাঁধ চালু করার প্রশ্নে বাংলাদেশের

www.pathagar.com

সম্মতি। ফারাক্কা প্রকল্পের কাজ শেষ হয় ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে (১৯৫১ সালে কাজ শুরু হয়)। শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মতিক্রমে এই চুক্তির ১৭ ও ১৮ নং ধারায় যা অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা কৌশলে বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় পানিপ্রাপ্তি হতে বঞ্চিত করা হয়। ১৭ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়, '......দুই প্রধানমন্ত্রী এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ১৯৭৪ সাল সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই ফারাক্কা প্রকল্প চালু হবে। গঙ্গা নদীতে সর্বনিম্ন প্রবাহের সময় কলকাতা বন্দর এবং বাংলাদেশের চাহিদা মিটানোর মতো পর্যাপ্ত পানি গঙ্গায় নাও পাওয়া যেতে পারে। কাজেই এই সময়ে উভয় দেশের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।'

ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সর্বনাশ সূচিত হয়। দেশ-জাতির সেই সংকটকালে অভয় ও আশ্বাসের বাণী মুখে এগিয়ে এসেছিলেন মওলানা ভাসানী। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ভারতের শাসকগোষ্ঠী বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে তিনি প্রথম থেকেই ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এবং দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশকে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা দেয়ার জন্য। এই প্রক্রিয়ায় তিনি মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির কঠোর বিরোধিতা করেছেন এবং ১৭ মে এক বিবৃতিতে ভারতকে বেরুবাড়ি না দেয়ার দাবি জানিয়েছেন। ঐ একই বিবৃতিতে ভাসানী বলেছিলেন, 'সাম্প্রতিক শীর্ষ সম্মেলনে ফারাক্কা বাঁধের পানি বন্টনের মীমাংসা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য হায়াত ও মউতের প্রশ্ন ছিল। কিন্তু উহার কোন মীমাংসা করা হয় নাই। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ফেলিয়া যাওয়া যে হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ হিন্দুস্থান সৈন্যরা হিন্দুস্থানে লইয়া গিয়াছে তাহা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে কোন আলোচনাই হয় নাই। হিন্দুস্থান বাংলাদেশের অসংখ্য ছিটমহল প্রশ্নেও কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। রেডক্লিফের রোয়েদাদ ও হিন্দুস্থানের সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী বেরুবাড়ি বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শেখ মুজিবুর রহমান তাহাও হিন্দুস্থানের হাতে তুলিয়া দিয়া সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে আঘাত হানিয়াছে। এইসবের পরিপ্রেক্ষিতে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। তাই এক মাসের জন্য আমার লন্ডন সফর স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলাম। বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আরব জাহানের বিষফোঁড়া ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া যে ভুল করিয়াছে তাহার খেসারত ইনশাআল্লাহ অল্পদিনের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীগণকেই দিতে হইবে। পাক-ভারতে সমস্ত বিষয় কম-বেশি মীমাংসা করিয়া তৎপর কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ করিয়া লইবার ফলে গত ছাব্বিশ বছরে যাহা ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহার জন্য হিন্দুস্থান সরকারকেই খেসারত দিতে হইবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লইয়া কাশ্মীরে গণভোট করিলেই সমস্ত ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যাইত। রেডক্লিপের রোয়েদাদ অনুযায়ী দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের হাতে বেরুবাড়ি ছাড়িয়া দিলেই ঝামেলা চুকিয়া যাইত। অবশেষে সাম্প্রতিক শীর্ষ সম্মেলনে ছলে-বলে-কৌশলে বেরুবাড়িকে হিন্দুস্থানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানানো হইয়াছে। ইহারও খেসারত হিন্দুস্থান সরকারকেই দিতে হইবে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের রায় বেরুবাড়ি বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইহা কিছুতেই হস্তান্তর করিবার নহে। এই অবিচ্ছেদ্য অংশ বাংলাদেশের মানুষ কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না।'

ভারতের কৃষি ও সেচমন্ত্রী মি. জগজীবন রামের নেতৃত্বে ভারতীয় দল এবং বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ. পানি সম্পদ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের

www.pathagar.com

নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিনিধি দল ১৯৭৫ সালের ১৬ এপ্রিল থেকে ১৮ এপ্রিল গঙ্গার পানি বণ্টন সম্পর্কে একটি এডহক চুক্তি সম্পাদন করে। ভারত ৪১ দিনের জন্য (২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ১৯৭৫) ফারাক্কা বাঁধ চালু করেছিল। চুক্তি অনুযায়ী ২১ এপ্রিল ফারাক্কা বাঁধ চালু হওয়ার দিন থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ভারত ১১ হাজার কিউসেক পানি পাবে। অনুরূপভাবে পরবর্তী ১০ দিন ১ মে থেকে ১০ মে পর্যন্ত ১২ হাজার কিউসেক, ১১ মে থেকে ২০ মে পর্যন্ত ১৫ হাজার কিউসেক এবং ২১ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ১৬ হাজার কিউসেক পানি ভারত পাবে। কিন্তু ৪১ দিনের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরও ভারত ফিডার ক্যানেল দিয়ে পানি প্রত্যাহার অব্যাহত রাখে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো সমঝোতা বা চুক্তি না করেই ১৯৭৬ সালের শুষ্ক মৌসুমে একতরফাভাবে গঙ্গার পানি নিয়ে যায়। ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পানির তীব্র সঙ্কট দেখা দেয়। এ সম্পর্কে ১৯৭৬ সালে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা বি.এম. আব্বাস বিশেষ এক সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, '১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে ফিডার খাল দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি প্রবাহিত করার কথা ছিল। কিন্তু উক্ত তারিখের পর উপরিউক্ত খালপথে পানি নিতে হলে উভয় সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠানের কথা ছিল। কিন্তু ভারত কোন আলোচনা ব্যতিরেকে বিপুল পরিমাণ পানি প্রত্যাহার করায় ইতিপূর্বেই শুকনো মৌসুম এসে গেছে। ফারাক্কার ফিডার খাল দিয়ে পানি প্রত্যাহারের রেকর্ড যৌথভাবে সমাধা করার জন্যও চুক্তিতে ব্যবস্থা ছিল। বাংলাদেশ ফারাক্কায় স্বীয় পর্যবেক্ষক দল মোতায়েনে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভারত সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। তাই ফারাক্কা দিয়ে কি পরিমাণ পানি বাংলাদেশে ছাড়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য বাংলাদেশের হাতে নেই।'

১৯৭৬ সালের শুষ্ক মৌসুমে পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। একদিকে ভারতের পক্ষ থেকে একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে সৃষ্ট সংকট এবং অন্যদিকে সীমান্তে সশস্ত্র আক্রমণ ও সামরিক তৎপরতার ফলে স্বল্পকালের মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক শীতল হয়ে পড়ে। একথা প্রচারিত হতে থাকে যে, ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পরিবর্তনকে ভারত সরকার সুনজরে দেখেননি এবং তার প্রেক্ষিতেই সুপরিকল্পিতভাবে সীমান্তে গোলযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রসারণবাদী তৎপরতার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ব্যাপকভাবে সীমান্ত এলাকা সফর করেন। সন্তোষে ফিরে ৮ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে তিনি অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে বলেন, 'আক্রমণের কলাকৌশল ও ধ্বংসলীলার ব্যাপকতা দেখিলে যে কোনো নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকই স্বীকার করবেন যে, সাধারণ দুস্কৃতকারীদের দ্বারা এই কাজ সম্ভব নহে; বরং ইহা অভিজ্ঞ ও দক্ষ সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই সংগঠিত হয়েছে।'

• ২৯ ফেব্রুয়ারি মওলানা ভাসানী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠানো এক খোলাচিঠিতে লেখেন, '.....বিশ্বের অন্যতম মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধীকে তোমার দেশের বিশ্বাসঘাতক নথুরাম গর্ডসে হত্যা করিয়া যে পাপ করিয়াছে তাহার চেয়েও জঘন্য পাপ তোমার দেশের দস্যুরা করিতেছে.....।' সীমান্তের গোলযোগ ও জনগণের ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা দিয়ে ভাসানী লেখেন, '.....আমার আন্তরিক আশা, তুমি স্বচক্ষে দেখিলেই ইহার আশু প্রতিকার হইবে এবং বাংলাদেশ ও হিন্দুস্থানের মধ্যে ঝগড়া-কলহের নিষ্পত্তি হইয়া পুনরায় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব কায়েম হইবে। ফারাক্কা বাঁধের দরুন উত্তরবঙ্গের উর্বর জমি কিভাবে শ্মশানে পরিণত হইতেছে, তাহাও স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে.....।'

www.pathagar.com

এ সময় ফারাক্কা সমস্যা জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়। দেশের বিভিন্ন সংগঠন গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের প্রতিটি জেলা কমিটি এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ভারত কর্তৃক এককভাবে গঙ্গার পানি প্রত্যাহারে গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফারাক্কার বিষয়টি জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও পানি প্রত্যাহারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করে। দেশের রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন গঙ্গার পানি প্রত্যাহারে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

মওলানা ভাসানী ২০ মার্চ সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করে বলেন, 'ভারত ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার বন্ধ না করলে এবং আপোস-মীমাংসায় রাজি না হলে ভারতের বিরুদ্ধে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে।' ৯ এপ্রিল অপর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'ভারত একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করে বিশ্বের ইতিহাসে এক অমানবিক আচরণের নজির সৃষ্টি করেছে। পরিণতিতে বাংলাদেশের ৩ কোটি লোক অবর্ণনীয় দুর্দশার শিকার হয়েছেন।'

এ সময় ফারাক্কার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে ফারাক্কা ও তার প্রতিক্রিয়া শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে বগুড়ায় এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে। বিএম আব্বাস ওয়াশিংটন সফরকালে ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদদাতা ও বিশ্বব্যাংকের গভর্নর রবার্ট ম্যাকনা মারার সঙ্গে আলাপকালে বলেন, 'আন্তর্জাতিক আইন, নীতি ও মানবতার দৃষ্টিকোণ-সব দিক দিয়ে গঙ্গার পানির ওপর বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার রয়েছে। ফারাক্কা সমস্যা বাংলাদেশের জীবন-মরণ সমস্যা। নদীনালা শুকিয়ে যাচ্ছে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মরু প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, নৌ চলাচল ব্যাহত হচ্ছে, মৎস্য সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সাগর থেকে নোনা পানি প্রবেশ করে লবণাক্ততা সৃষ্টি করছে। ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৫ কোটি মানুষের জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়।' *(সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ এপ্রিল, ১৯৭৬)*

আগস্টের পট পরিবর্তনের পর বাকশালীদের অনেকে সীমান্ত পার হয়ে গিয়ে ভারতে আশ্রয়গ্রহণ করেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মদদে প্রশিক্ষণ লাভ করে সীমান্তে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাতে থাকে। সমর্থন যোগাতে থাকে বিএসএফ। ২০ এপ্রিল ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট থানার বদরকাটা সীমান্ত চৌকির ওপর গোলাবর্ষণ করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতের এই নগ্ন হামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার নিন্দা ও প্রতিবাদের পরও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সীমান্ত হামলার ব্যাপারে কোন কথা বলতে অস্বীকৃতি জানায়। কোন নিন্দাবাদ করে না আওয়ামী লীগ, মোজাফফর-ন্যাপ, মণি সিং-এর কমিউনিস্ট পার্টি। এরপর ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী মাঝে মধ্যেই সীমান্ত হামলা চালায়। অপহরণ করে বাংলাদেশের নাগরিকদের।

মওলানা ভাসানী এবং দেশের সচেতন মহল থেকে উদাত্ত আহ্বান জানানো সত্ত্বেও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ার পরই মওলানা ভাসানী ফারাক্কা মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। ফারাক্কা কবলিত উত্তরবঙ্গ

www.pathagar.com

সফরশেষে ১৮ এপ্রিল ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে মওলানা ভাসানী এক জনসমাবেশের আয়োজন করেন। সমাবেশে তিনি ঘোষণা করেন, '.....গঙ্গা আন্তর্জাতিক নদী। ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিধান অনুযায়ী ভারত এককভাবে এই নদীর পানি ব্যবহার করতে পারে না.... ।' ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির তারিখ ১৬ মে ফারাক্কা মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করে সমাবেশে মওলানা ভাসানী বলেন, ".....ভারত সরকার পানি প্রত্যাহারের মাধ্যমে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের ন্যায্য অধিকারের উপর হামলা চালালে বাংলাদেশের আট কোটি মানুষ তা জীবন দিয়ে প্রতিরোধ করবে।" একই দিনে ইন্দিরা গান্ধীর নিকট প্রেরিত এক খোলা চিঠিতে ভাসানী বলেন, ".....দুর্ভাগ্যবশত এই অনুরোধ শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও তার সরকারের কাছে গৃহীত না হলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মরক্কো কর্তৃক অনুসৃত সাহারা নীতির ন্যায় আমি আগামী ১৬ মে রোববার রাজশাহী থেকে লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু মানুষসহ অহিংস শান্তিপূর্ণ মিছিল লইয়া ফারাক্কার দিকে অগ্রসর হইবো.... ।"

ইন্দিরা গান্ধী চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন ৪ মে। ভাসানীর চিঠিতে তিনি 'ব্যথিত ও বিস্মিত' হয়েছেন জানিয়ে ইন্দিরা গান্ধী লেখেন-

প্রিয় মওলানা সাহেব,

আপনার ১৮ এপ্রিল, ১৯৭৬-এর চিঠি পড়ে আমি ব্যথিত ও বিস্মিত হয়েছি। এ কথা কল্পনাও করা কষ্টকর যে, যিনি আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের নিজের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে দুঃখ ও আত্মত্যাগে শরীক হয়েছেন, সেই তিনি এখন কিভাবে এতটা গুরুত্ব সহকারে আমাদের ভুল বুঝেছেন। এমনকি প্রশ্ন তুলেছেন আমাদের উদ্দেশ্যের। আমি এ কথাই বিশ্বাস করতে চাই যে, অবিভক্ত ভারত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার বিভিন্ন প্রকাশ্য বিবৃতি এবং ফারাক্কা বাঁধ ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে মিছিলের নেতৃত্ব দেয়ার হুমকি-এসবই তাৎক্ষণিক উত্তেজনাপ্রসূত।

কোন একজন বাংলাদেশী কি সত্যিকারভাবে এ কথা বিশ্বাস করেন যে, ভারত নজিরবিহীন দ্রুততার সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে তার সশস্ত্র বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে, সেই ভারত তার প্রতিবেশীর প্রতি কোন শত্রুতামূলক উদ্দেশ্য মনে পোষণ করতে পারে? ভারতের সরকার ও জনগণ চায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাদের সমর্থন এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কাজে সহযোগিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে তাদের মূল্যায়ন করা হোক। আমাদের নিজেদের প্রয়োজন বিশাল এবং জনগণেরও বোঝার পরিমাণও বিপুল, কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে, আমাদের দুইদেশের জনগণের কল্যাণ পরস্পর সম্পর্কিত। আমাদের স্বার্থের জন্য প্রয়োজন এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা এবং দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা।

আপনি নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, ১৫৬ কোটি রুপী ব্যয়ে যে ফারাক্কা বাঁধ নির্মিত হয়েছে এবং পূর্ব ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা বন্দরকে বাঁচানোর একমাত্র মাধ্যম যে বাঁধটি সেই বাঁধ পরিত্যাগ করা ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি নিশ্চয়ই এ কথাও জানেন যে, শুধু গ্রীষ্মকালে দু'মাসের মত সময়ে প্রমত্ত গঙ্গায় পানির স্বল্পতা দেখা দেয়। পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতা থাকলে ভবিষ্যতে শুষ্ক মৌসুমে যৌথ প্রয়োজন মেটানোর উপায় নিশ্চিতভাবে খুঁজে বের করা সম্ভব। এজন্যই আমরা নিজেদের প্রয়োজন

www.pathagar.com

অস্বীকার করে, এমনকি হুগলীকে স্বল্পতম পরিমাণ পানিও না দিয়ে বাংলাদেশের ওপর ফারাক্কা বাঁধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আপনাকে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত এবং শুধু একটি দিকের তথ্য জানানো হয়েছে। যদি চান তাহলে আমাদের হাইকমিশনার নিজে গিয়ে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টির অন্যপিঠ সম্পর্কে অবহিত করবেন।

প্রতিবেশীদের মধ্যে মাঝে মাঝে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে এ গুরুততর বিষয়টি হল সমঝোতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে সমাধান লাভের চেষ্টা করতে হবে। পরস্পরের বিরুদ্ধে মোকাবিলা ও শত্রুতার পথ অনুসরণ করে আমরা কেবল একে অন্যের ক্ষতিই সাধন করতে পারি। সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে আমি আরো একবার বলতে চাই, বাংলাদেশ তার স্বাধীনতাকে সংহত করুক এবং শান্তিপূর্ণভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে যাক- আমাদের দিক থেকে প্রতিবেশী হিসেবে আমরা সবসময় এ ব্যাপারে অবদান রাখার চেষ্টা করব এবং বাংলাদেশের অগ্রগতিতে অংশীদার হব। আপনি হয়তো অবহিত আছেন যে, আমাদের দুই সরকারের পক্ষ থেকে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানি বণ্টন এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য প্রশ্নে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন উভয় দেশের শুভবুদ্ধি ও ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষের উৎসাহ ও সমর্থন। আমি আপনাকে বিশ্বাস দিয়ে বলতে চাই, যে কোনো যুক্তিসঙ্গত আলোচনার জন্য আমাদের দরজা খোলা থাকবে। কিন্তু কারো এ কথা মনে করা উচিত, ভারত কোন হুমকি বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অযৌক্তিক দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করবে না।

শ্রদ্ধাসহ-
আপনার একান্ত
স্বা/-ইন্দিরা গান্ধী

'শ্রদ্ধাসহ আপনার একান্ত ইন্দিরা গান্ধী' হিসেবে লিখলেও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চিঠিতে মওলানা ভাসানীর অনুরোধ উপেক্ষিত হয়েছিল এবং বিশেষ করে শেষ বাক্যে দেয়া হয়েছিল প্রচ্ছন্ন হুমকি। জবাবে ভাসানী লিখেছিলেন-

প্রিয় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী,

আপনার ৪ মে, ১৯৭৬-এর চিঠিটি নতুন কিছু নয় বরং ফারাক্কা প্রসঙ্গে ভারত সরকারের সরকারি ভাষ্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র, যা আমি খ্যাতনামা পূর্বপুরুষ মতিলাল নেহেরুর নাতনী এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যা হিসেবে আপনার কাছ থেকে কোন দিন আশা করিনি। আপনি নিজেও সব সময় বঞ্চিত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় এবং তাদের জন্য সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করেছেন।

আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সময় সাহায্য করার জন্য আমি আপনার এবং ভারতের মহান জনগণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ফারাক্কার প্রশ্নে আমি আপনাকে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলো সফর করার এবং আমাদের কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের সাধিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণ করার জন্য আরো একবার আমার অনুরোধের পুনরুল্লেখ করছি। কেবল সরকারি কর্মচারীদের দেয়া তথ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করার জন্য আপনার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি কারণ এ ধরনের তথ্যে সবসময় বিদ্যমান পরিস্থিতির সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয় না।

www.pathagar.com

এই কারণে গঙ্গার পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহার করার ফলে সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতি দেখার জন্য আমি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহ ব্যাপকভাবে সফর করেছি। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আমি আপনার মনোভাবের প্রশংসা করি। কিন্তু সে সমাধান হতে হবে স্থায়ী ও ব্যাপকভিত্তিক। এই সমাধান শুধু শুষ্ক মৌসুমের দুই মাসের জন্য হলে চলবে না, সারা বছরব্যাপী পানির প্রবাহ একই পরিমাণ হতে হবে। এই পন্থায় ও ভিত্তিতে ফারাক্কা সমস্যার সমাধান করার জন্য আমি আপনাকে ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার তারবার্তা পাঠিয়েছি। যার সঙ্গে বাংলাদেশের তিন কোটি মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত, সেই ফারাক্কা সমস্যার সমাধান আমলা বা সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে করা সম্ভব নয়। এজন্য দু'দেশের রাজনৈতিক নেতাদেরকে অবশ্যই আলোচনায় বসতে হবে এবং গ্রহণযোগ্য সমাধান অর্জন করতে হবে।

সংঘাত ও শত্রুতার কোনো প্রশ্নই উঠে না। আমি আরো একবার আপনার প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করুন এবং এমন একটি সমাধান খুঁজে বের করুন, যা আট কোটি বাংলাদেশীর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

আপনি যদি আমার এই অনুরোধ রক্ষা না করেন তাহলে সমস্যার সমাধান অর্জনের জন্য আমি নির্যাতিত জনগণের নেতৃবৃন্দ তথা আপনার পূর্বপুরুষ ও মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার ভিত্তিতে আমার ভবিষ্যৎ সংগ্রামের কর্মসূচি নির্ধারণ করতে বাধ্য হবো। আমি আরো একবার আমার দিক থেকে এই ভয়ঙ্কর সমস্যার সমাধান এবং দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সর্বতো সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিচ্ছি।

শুভেচ্ছাসহ-
আপনার একান্ত
স্বা/- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

ফারাক্কা মিছিল সম্পর্কিত ভাসানীর কর্মসূচি ঘোষিত হওয়ার পর সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, আওয়ামী লীগ এবং ভারতপন্থী কয়েকটি মাত্র রাজনৈতিক দল ছাড়া সকলে সমবেত হয়েছিল ভাসানীর নেতৃত্বে। ফারাক্কা লংমার্চ পরিচালনার জন্য ১১ মে ভাসানী রাজশাহী আসেন। রাজশাহী এসে পৌঁছলে দেশের দূরদূরান্ত থেকে মানুষ মিছিলে যোগদানের জন্য আসতে থাকে। দেশজুড়ে জনগণের মধ্যে চেতনা ও উদ্দীপনার জোয়ার সৃষ্টি হয়। ১৬ মে ছিল রোববার। সকাল ১০টায় শুরু হয় লংমার্চের অভিযাত্রা। এদিন রাজশাহী শহর ছিল লোকে লোকারণ্য। সুদূর টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া হতে লাখ লাখ মানুষ সমবেত হয় রাজশাহী শহরে। রাজশাহী শহর এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়। আগের দিন দেশের সর্বত্র থেকে মানুষ আসতে থাকে। এসব মানুষ রাতে মাদ্রাসা ময়দানে, আবার অনেকেই নগরীর স্কুল-কলেজগুলোতে অবস্থান নেয়। ভোর হতে না হতেই আরও মানুষ সভাস্থল মাদ্রাসা ময়দানে পৌঁছতে থাকে। দেশের বিভিন্ন শহর, বন্দর, গ্রামগঞ্জ থেকে আগত মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। 'মরণ বাঁধ ফারাক্কা ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও' 'ফারাক্কার লংমার্চ সফল কর' এসব শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। সবার মুখে এক আওয়াজ-'চলো চলো ফারাক্কা চলো।' এছাড়া প্রতিবাদী শ্লোগানসম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন মিছিলকারীদের হাতে শোভা পাচ্ছিল। সাথে গণসঙ্গীত, ড্রাম বাজছিল। মঞ্চ থেকে ফারাক্কা সংগ্রাম পরিষদের নেতা মশিয়ুর রহমান যাদু মিয়া, কাজী জাফর আহমদ, আজাদ সুলতান প্রমুখ বারবার মাইকের সামনে এসে জনতাকে ধৈর্য ও শৃঙ্খলা রক্ষার আহ্বান জানান। সেদিন

www.pathagar.com

সকালে রাজশাহী শহর রূপ নেয় সংগ্রাম ও প্রতিবাদের কেন্দ্রভূমিতে। সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে মওলানা ভাসানী সভামঞ্চে এসে উপস্থিত হওয়ার পর যাদু মিয়া লংমার্চের প্রস্তাব পাঠ করেন। এরপর ভাসানী বক্তব্য দিতে উঠে প্রথমেই কয়েকটি শ্লোগান উচ্চারণ করেন। এ সময় তাঁর ডান হাতে ধরা ছড়িটি কাঁপছিল। ভাসানীর দেয়া মাত্র ১০ মিনিটের বক্তৃতা ও সভায় গৃহীত প্রস্তাব পাস হওয়ার পর সকাল সাড়ে ১০টার মিছিলের অগ্রভাবে এসে দাঁড়ান তিনি। মাদ্রাসা ময়দান থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ অগ্রসর হতে থাকে মিছিল। মিছিল দেখার জন্য রাস্তার দুধারে প্রতিটি বাড়ির মেয়ে, বৃদ্ধ ও শিশুরা বাইরে বেরিয়ে আসে। তারা হাত নেড়ে মিছিলকে শুভেচ্ছা জানাতে দেখা যায়। চার মাইল দীর্ঘ মিছিলটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ অভিমুখে যাত্রার পর রাজশাহী শহর প্রায় ফাঁকা থাকে। রাজশাহী থেকে ৫৬ কি.মি. দূরে চাঁপাইনবাবগঞ্জে রাত যাপনের পর ১৭ মে সকালে যখন মিছিলটি পুনরায় যাত্রা শুরু করে তখন রাজশাহীর চেয়ে তিনগুণ বেড়ে পরিণত হয় এক বিশাল চলমান জন-সমুদ্রে। প্রবল ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিকেল ৪টায় সীমান্ত থেকে প্রায় ৩ মাইল দূরে কানসাট হাইস্কুল ময়দানে মঞ্চে এসে দাঁড়ান ৯৫ বছর বয়স্ক জননেতা মওলানা ভাসানী। ঘোষণা দেন বাংলাদেশের পানির ন্যায্য হিস্যার দাবি মেনে নিয়ে ফারাক্কা সমস্যা সমাধানের জন্য।

এরপূর্বে ভাসানী চাঁপাইনবাবগঞ্জের মনি উকিলের বৈঠকখানায় বসে কয়েকজন সাংবাদিকের সাথে কথা বলেছিলেন। তিনি স্মৃতিচারণ করছিলেন বিগত দিনের রাজনীতির। স্বপ্ন দেখছিলেন ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থার। বলেছিলেন, বৃটিশ-ভারতে সিরাজগঞ্জে কৃষক সম্মেলনের কথা। 'একটা পয়সা চাঁদা তোলা হয়নি। কৃষকরা সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়ে এসেছিল চাল, ডাল, তরিতরকারি, নুন-তেল-লাকড়ি। এক মুঠো চাল চুরি করার কথা কেউ ভাবেনি। এক বেলায় ১৮শ' মণ চাল-ডালের খিচুড়ি পাক হয়েছিল। তারপরও উদ্বৃত্ত ছিল ৯শ' মণ চাল। লাকড়ি, তেল-নুনের হিসাব বাদই থাক। নিজের কাছে নিজেই প্রশ্ন করলেন-কাকে বিশ্বাস করবো? পয়সা দেখলে কারো মাথা ঠিক থাকে না। কোন প্রোগ্রাম নিলেই বের হয় চাঁদা তুলতে। কে কত টাকা চাঁদা তোলে তার হিসাব চাইলে বলে রসিদ বই হারিয়ে গেছে। এদের বিশ্বাস করো না তোমরা। যারা হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক, যাদের বাড়ির কয়েক মাইল সীমানায় অন্যের জমি নেই, তারাই সব কৃষক-নেতা। এরা কৃষকের সমস্যা, কৃষকের দুঃখ বোঝে না। তোমরা যাও একটা গ্রাম বেছে কৃষকদের সঙ্গে আলাপ করে সার্ভে করো। দেখবে কৃষকদের মেরুদণ্ড নেই।' মওলানা ভাসানী বলেন, 'আজ আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমি গরিব কৃষকদের জন্য কি করে যেতে পারবো জানি না। তবে এখন মনে হয় এদের সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। এদের বিশ্বাস অর্জন করেছিলাম। তার মূল্য আমি দিতে পারিনি। এই গরিব মানুষদের ভোট এনে আমি বারবার গদিতে বসিয়েছি কতগুলো বেঈমানকে, যারা ওয়াদা করে ওয়াদা রাখেনি, যারা কৃষকদের কথা ভুলে নিজেরা সম্পদের পাহাড় তৈরি করেছে। আজ আর কিছু বলতে পারিব না, একটা কথা কৃষকদের বলে যাবো-এইসব নেতাকে তোমরা বিশ্বাস করো না, নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হও।' মওলানা বলেন, 'সব গ্রামে এই স্বাস্থ্য নিয়ে ঘুরতে না পারি, অন্তত আমার ১২ লাখ মুরিদকে একথা বলে যাবো।' সাংবাদিকদের তিনি জানিয়ে দেন, তিনি মুরিদদের দীক্ষা দেন। ছাপানো ফরমে লেখা থাকেঃ আমি আজীবন সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কৃষকরাজ কায়েমের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবো। আমি রোযা-নামায-হজ্ব-যাকাত নিয়মিত আদায় করবো। ডুপ্লিকেট কপির মওলানা ভাসানী স্বাক্ষরিত কপিটি থাকে মুরিদের কাছে। আর

www.pathagar.com

মুরিদদের স্বাক্ষরিত কপিটি থাকে মওলানা ভাসানীর কাছে। মওলানা ভাসানী বলেন, 'সুদিন সামনে রয়েছে, খুব দূরে নয়। দেখবে, এখন যারা নেতা তারা কেউ নেই। কৃষকরা এগিয়ে এলে তখন এরা পালাবে।' *(সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ মে, ২০০২)*

কনসার্ট হাইস্কুল ময়দানে মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণার আগে ভাসানী বলেছিলেন, "....গঙ্গার পানিতে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যার ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার জন্য আমাদের আন্দোলনের এখানেই শেষ নয়.....।" ফারাক্কা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানিয়ে ভাসানী আরো বলেন, ".....ভারত সরকারের জানা উচিত, বাংলাদেশীরা আল্লাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় পায় না, কারো হুমকিকে পরোয়া করে না.....যে কোন হামলা থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করা আমাদের দেশাত্মবোধক কর্তব্য এবং অধিকার।" এই মিছিলের আতঙ্কে ভারত সরকার রীতিমতো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং সে প্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, ".....বাংলাদেশের দরিদ্র নিরস্ত্র মানুষের ভয়ে ভারতকে যখন সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করতে হয়েছে, তখন তার অবিলম্বে ফারাক্কা সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসা উচিত.... ।"

একথা সত্য যে, ভারতের বৃহৎ প্রতিবেশীসুলভ এবং সম্প্রসারণবাদী মনোভাবের কারণে মওলানা ভাসানীর ফারাক্কা মিছিল সমস্যার স্থায়ী সমাধান অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু এই মিছিলের জনপ্রিয়তা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর ব্যাপক প্রচারণার ফলশ্রুতিতেই ভারতকে বহুদিন পর আলোচনার টেবিলে বসতে হয়েছিল। জনগণের ঐক্য সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সাহসী করেছিল, তিনি ১৯৭৬ সালেই জাতিসংঘের ৩১তম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো ফারাক্কা ইস্যু উত্থাপিত করেছিলেন। সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটির ২৪ নভেম্বরের সর্বসম্মত বিবৃতির ভিত্তিতে ভারত ও বাংলাদেশের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শুরু হয়েছিল এবং এই প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন পর ১৯৭৭ সালে ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়েছিল 'ফারাক্কা চুক্তি'। আংশিকভাবে হলেও স্বীকৃত হয়েছিল গঙ্গার পানির ওপর বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত, দাবি ও অধিকার। এই স্বীকৃতি ছিল মওলানা ভাসানীর ফারাক্কা মিছিলের প্রত্যক্ষ অবদান। এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ৩৪ হাজার কিউসেক প্রাপ্তি ও ফারাক্কা পয়েন্টে পর্যাপ্ত পানি না থাকলে সরবরাহের একটি গ্যারান্টিক্লজ ছিল।

১৯৭৭ সালের গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির বিবরণ ছিল এইভাবে-

ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বণ্টন এবং পানির প্রবাহ বৃদ্ধির ব্যাপারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যকার চুক্তি

বাংলাদেশ এবং ভারত সরকার তাদের জনগণের কল্যাণ সাধনের অভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে দু'দেশের ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানি বণ্টন এবং যৌথ উদ্যোগে পানি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে দু'দেশের জনগণের পারস্পরিক স্বার্থে পারস্পরিক সমন্বয় এবং গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধিসংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বণ্টনের একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি মেনে নেয়া হলো। উভয়পক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়ে সম্মত হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

এ. ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বন্টনের ব্যবস্থাপনা

ধারা-১ঃ ভারত ফারাক্কায় বাংলাদেশের জন্য যে পরিমাণ পানি ছাড়তে সম্মত হয়েছে।

ধারা-২ ঃ (i) প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ শে মে পর্যন্ত ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বন্টনের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত গঙ্গার রেকর্ডকৃত প্রবাহের ৭৫ শতাংশের ভিত্তিতে এ পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। এতদসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ২ নং কলামের তালিকায় উল্লেখিত পানির পরিমাণও দেখানো হয়েছে।

(ii) ভারতকে বাংলাদেশের জন্য ১০ দিনের মধ্যে যে পরিমাণ পানি অবশ্যই ছাড়তে হবে তা তালিকার ৪নং কলামে দেখানো হয়েছে। ১০ দিন সময়ের মধ্যে গঙ্গার ফারাক্কা পয়েন্টে যদি সত্যিকারভাবে তালিকার ২নং কলামে যে পরিমাণ পানি দেখানো হয়েছে তারচেয়ে বেশি অথবা কম হয়, তাহলে অবশ্যই সে সময়ে প্রযোজ্য অনুপাতে তা ভাগ করে নিতে হবে। আবার যদি ঐ সুনির্দিষ্ট ১০ দিনের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গার প্রবাহ এমন পর্যায়ে নেমে যায় যাতে বাংলাদেশ কলাম ৪-এ দেখানো পরিমাণ থেকে ৮০ শতাংশেরও কম পায়, তাহলে সেই ১০ দিনের সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে অবশ্যই কলাম ৪-এ দেখানো পরিমাণের ৮০ শতাংশের কমে পানি দেয়া যাবে না।

ধারা-৩ ঃ ১ নং ধারার আওতায় ফারাক্কায় বাংলাদেশের জন্য যে পরিমাণ পানি ছাড়া হবে তা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার ছাড়া ফারাক্কার নিচে হ্রাস করা যাবে না। ফারাক্কা এবং গঙ্গা পয়েন্টে উভয়ের তীর যদি বাংলাদেশে হয় তাহলে ভারত দুশ কিউসেকের বেশি পানি পাবে না।

ধারা-৪ ঃ দু'সরকারের মনোনীত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটি যৌথ কমিটি নামে পরিচিত হবে। যৌথ কমিটি ফারাক্কা বাঁধের নিচের এবং ফিডার ক্যানেল ও সাথে সাথে হার্ডিঞ্জ সেতুতে দৈনন্দিন প্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড করার জন্য ফারাক্কা ও হার্ডিঞ্জ সেতু এলাকায় একটি টীম গঠন করবে।

ধারা-৫ ঃ যৌথ কমিটি তাদের নিজস্ব কার্যপ্রণালী এবং কার্য সম্পাদনের পদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

ধারা-৬ ঃ যৌথ কমিটি দু'সরকারের কাছে তাদের সংগৃহীত ডাটা পেশ করবে এবং অবশ্যই উভয় সরকারের কাছে তাদের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবে।

ধারা-৭ ঃ চুক্তিতে বর্ণিত বিষয়াদি বাস্তবায়নের ব্যাপারে যৌথ কমিটি দায়ী থাকবে এবং উপরে বর্ণিত বিষয়াদির বাস্তবায়ন ও ফারাক্কা বাঁধ চালু করতে কোন সমস্যা দেখা দিলে যৌথ কমিটি তা পরীক্ষা করে দেখবে। এ পর্যায়ে কোন মতপার্থক্য অথবা বিরোধ সৃষ্টি হলে যৌথ কমিটি যদি তা সমাধান করতে না পারে তাহলে উভয় সরকার কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ ও ভারতের সমসংখ্যক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্যানেলের কাছে তা পেশ করা হবে। তারপরও মতপার্থক্য বা বিরোধের মীমাংসা না হলে বিষয়টি দু'সরকারের ওপরই ছেড়ে দিতে হবে। উভয় সরকার পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে যথাযথ পর্যায়ে জরুরিভিত্তিতে বিষয়টি সমাধান করবে। তাতেও সমাধানে ব্যর্থ হলে এ ধরনের অন্য কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা বিরোধ মীমাংসায় পরস্পর সম্মত হতে পারে।

বি. দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা

ধারা-৮ ঃ উভয় সরকার শুষ্ক মওসুমে গঙ্গার পানি প্রবাহ বৃদ্ধিসংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য একে অপরের সাথে সহযোগিতা করার প্রয়োজনীয়তার কথা মেনে নিয়েছেন।

www.pathagar.com

ধারা-৯ ঃ দু'সরকার ১৯৭২ সালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠন করে। এই নদী কমিশনকে শুষ্ক মওসুমে গঙ্গার পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত প্রকল্পের ব্যাপারে অবশ্যই তদন্ত অথবা সমীক্ষা চালাতে হবে। সরকার কর্তৃক প্রস্তাবপ্রাপ্ত হয়ে একটি সমাধান খুঁজে বের করার জন্য যৌথ নদী কমিশন এই তৎপরতা চালাবে। নদী কমিশনকে ৩ বছর সময়ের মধ্যে দু'সরকারের কাছে তাদের সুপারিশ পেশ করতে হবে।

ধারা-১০ ঃ দু'সরকারকে যৌথ নদী কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে একটি প্রকল্প বা কয়েকটি প্রকল্পের বিষয় বিবেচনা করে সম্মত হতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব একটি বা কয়েকটি প্রকল্পের বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ধারা-১১ ঃ চুক্তির এই পর্যায়ে যে কোন জটিলতা, মতপার্থক্য অথবা বিরোধ সৃষ্টি হলে যৌথ নদী কমিশন যদি তা সমাধান করতে না পারে, তাহলে বিষয়টি দু'সরকারের কাছে ন্যস্ত করতে হবে। উভয় সরকার অবশ্যই যথাযথ পর্যায়ে জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়ে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে বিষয়টির মীমাংসা করবেন।

সি. পর্যালোচনা এবং দায়িত্ব

ধারা-১২ ঃ উভয়পক্ষ আস্থার ভিত্তিতে এই চুক্তির শর্তাবলী বাস্তবায়ন করবে। চুক্তির ১৫ নং ধারা অনুযায়ী যখন চুক্তি কার্যকর থাকবে, তখন সম্মত চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশে ফারাক্কা পয়েন্টে যথাযথ পরিমাণ পানি ছাড়তে হবে। চুক্তি অনুযায়ী পানি হ্রাস করা যাবে না।

ধারা-১৩ ঃ চুক্তি বাস্তবায়ন শুরু করার তিন বছর পর উভয় সরকার চুক্তিটি পর্যালোচনা করবে। এ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ৬ মাস আগে আবার চুক্তিটি পর্যালোচনা করতে হবে অথবা দু'সরকারের সম্মতির ভিত্তিতে চুক্তিটি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

ধারা-১৪ ঃ ১৩ নং ধারায় যে পর্যালোচনা বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে তাতে কাজের বিষয় বিবেচনা করে এর প্রভাব এবং চুক্তির 'এ' ও 'বি' অংশে যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি অপরিহার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ধারা-১৫ ঃ এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তিটি কার্যকর হওয়া শুরু হবে এবং চুক্তিটির কার্যকারিতা শুরু হবার তারিখ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত সেটি বলবৎ থাকবে। ১৩ নং ধারা অনুযায়ী পর্যালোচনার ভিত্তিতে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে চুক্তিটি আবার একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট সরকার পক্ষ থেকে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিরা এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর ঢাকায় বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় এ চুক্তির প্রতিলিপি স্বাক্ষর করা হয়।

উপরে বর্ণিত ভাষায় লিখিত চুক্তিতে কোন জটিলতা দেখা দিলে ইংরেজি ভাষায় লিখিত টেক্সটিই গৃহীত হবে।

চুক্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন নৌ-বাহিনী প্রধান এবং প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও যোগাযোগ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সম্পদ এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রিয়ার এডমিরাল মোশারফ হোসেন খান এবং ভারত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে স্বাক্ষর করেন কৃষি ও সেচমন্ত্রী সুরজিৎ সিং বারনালা।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিয়াউর রহমানের দায়িত্ব গ্রহণ

১৯৭৫ সালের ২৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি সায়েম উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। তাতে যোগ দেন অধ্যাপক আবুল ফজল, ড. আব্দুল রশীদ, ড. এম এন হুদা প্রমুখ। ৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি সায়েম এক ভাষণে বলেন, 'স্বাধীনতা সফল করে তুলতে যে যোগ্যতা, সততা ও আন্তরিকতার প্রয়োজন আমরা গত চার বছরে তা দেখতে পাইনি।'

৩০ নভেম্বর জিয়া রাষ্ট্রপতি সায়েমের নিকট থেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব বুঝে নেন। ৩০ ডিসেম্বর সরকার ২৪টি পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশের অনুমতি দেন। ১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দলবিধি জারি করেন। সেই রাজনৈতিক দলবিধির শর্তমালা পূরণ করে ১৯৭৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৫৬টি দল অনুমোদনের জন্য আবেদন করে। এর আগে বাকশালে যোগদানকারী দলগুলো বাকশালের নামে কোন দল গঠন না করে আলাদা আলাদা দল গঠন করে। দলগুলো হলো খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে ডেমোক্রেটিক লীগ, মণি সিং-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর), আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয় লীগ।

বিচারপতি সায়েম অত্যন্ত মন্থরগতি-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তারপরও অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ায় জিয়াউর রহমানকেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটেনের চার্চিল, ফ্রান্সের জেনারেল দ্যাগল, জাপানের তোজো, ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পণ্ডিত নেহেরু, পাকিস্তানের হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, গণচীনের চু-এন্-লাই, মিসরের নাসের, যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটোর ন্যায় জিয়াউর রহমান সমস্যাকে অবজ্ঞা না করে, সমস্যাকে পাস না কাটিয়ে কিংবা অন্যের উপরে দোষ চাপানোর চেষ্টা না করে, বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়ান। জিয়াউর রহমান সমস্যার গভীরতা ও সমস্যার মৌলিকতা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের গতি-প্রকৃতি ও শক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জন করেন। তিনি আরো উপলব্ধি করেন জনগণকে দেশের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে, জনসম্পদ-জনশক্তিকে সংগঠিত করেই কেবল বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় সকল সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব।

ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৭৬ এবং ১৯৭৭ সাল জিয়াকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে আধিপত্যবাদ এবং সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। ১৯৭৭ সালে ২৪ এপ্রিল জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্পষ্ট ভাষায় বলেন-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম

বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সরকারের কর্মসূচি ও জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে আমি আপনাদের নিকট বক্তব্য রেখেছি। আজ রাষ্ট্রপতি হিসেবে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

www.pathagar.com

আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। তার আগে আমার পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবু সাদাত মোঃ সায়েম এতদিন পর্যন্ত যে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন সেজন্য তাঁকে আমি আমার নিজের ও আপনাদের সবার পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর অবসর জীবন সুখের ও শান্তির হোক-এই দোয়া করি। গৌরবদীপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান স্বপ্নকে অবিরাম কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়নের পথে দেশ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। স্বনির্ভর বাংলাদেশের আদর্শে অনুপ্রাণিত দেশবাসী ভাই-বোনেরা, আমার আন্তরিক মোবারকবাদ গ্রহণ করুন। আমি ও আমার সরকার আপনাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করে যাবো-এ আমাদের অটুট সংকল্প। দেশে জনগণের অধিকার সুনিশ্চিতভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়েছে। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে। সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর, আনসার, মুক্তিযোদ্ধা এবং বিশেষ করে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল ও জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা জনজীবনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে এবং মারাত্মক চোরাচালান রোধ করতে বহুলাংশে সফল হয়েছে। শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রদের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষাঙ্গনে সাধারণভাবে শান্তির পরিবেশ বিরাজ করছে। এভাবে আমরা দুর্যোগের দিন কাটিয়ে সৃজনশীল ও গঠনমূলক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। আমি ও আমার সরকার পূর্ণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং দেশে যথাসময়ে জনগণের নির্বাচিত সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ। জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং সরকারের প্রতিটি কাজে-নীতিতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। সে উদ্দেশ্যে সরকার কতিপয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণে এ বছরে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন স্থগিত রাখতে হয়-একথা সবারই জানা আছে। কিন্তু নীতি হিসেবে আমরা মনে করি অন্যান্য নির্বাচনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সাধারণ নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। তাই আমি ঘোষণা করছি যে, এ বছরের আগস্ট মাসে পৌরসভাসমূহের এবং ডিসেম্বর মাসে জেলা পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তারপর ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা আশা করব যে সর্বস্তরের নির্বাচনে দেশপ্রেমিক জনদরদী ব্যক্তিরা দেশগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবেন। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যরা ইতিমধ্যেই তাদের গঠনমুখী মনোভাব ও কর্মপন্থার পরিচয় দিয়েছেন। তা অব্যাহত থাক এই কামনা করি। শাসনতন্ত্রের কিছু কিছু মৌলিক আদর্শ ও বিধান সম্পর্কে জনমনে যথেষ্ট অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। তাই দেশের মানুষের মন ও মানসিকতা, আশা ও আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী জারি করা হচ্ছে। আমার স্থির বিশ্বাস এই ব্যবস্থা জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে দৃঢ়তর করবে এবং জাতি গঠনের কাজে সবাইকে সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হবো।

প্রিয় দেশবাসী,

১৯৭৫ সালের মহান ৭ নভেম্বর হতে বিভিন্ন সময়ে দেশ ও জাতি আমার উপর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। আমি আমার সাধ্যমত সে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়েছি এবং আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তি হিসেবে আপনাদের আস্থা ও সমর্থনের উপরই নির্ভর করেছি। দেশ পরিচালনার ব্যাপারে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য বিষয়ে ইতিমধ্যেই কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং আর কতিপয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

www.pathagar.com

গ্রহণ করা হবে। এখন আমার উপর দেশের রাষ্ট্রপতির গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ এবারও আমি আপনাদের সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করব। এই প্রেক্ষিতে আপনাদের আস্থা যাচাই করার জন্য আগামী মাসের ৩০ তারিখ প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশবাসীর একটি গণভোট অর্থাৎ রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হবে। আশা করি আপনারা আপনাদের মতামত ব্যক্ত করে সুখী সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সাহায্য করবেন। গ্রামবাংলাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ। সাধারণ মানুষকে সম্মান করে, তাদের খেদমত করে, উন্নত হবে সারা দেশ। এই নবরূপায়ণের পথেই আমাদের যাত্রা। তাই ইউনিয়ন পরিষদসমূহের উপর জাতির গভীর আস্থা ও ভরসা। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ থেকেই জন্ম নেবে জাতীয় নেতৃবৃন্দ যাতে জনসাধারণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক কখনও শিথিল না হয়। জনসাধারণকে গঠনমূলক কাজের দিকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির। সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির কথা মনে রেখে তারা জনগণের খেদমতে এগিয়ে আসবেন এই আমার বিশ্বাস। জাতি আশা করছে রাজনীতিবিদরা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি এবং জনসেবার ক্ষেত্রে এক গঠনমুখী আদর্শ স্থাপন করবেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সুশৃঙ্খল রাজনীতির পথ কখনও বিঘ্নিত হবে না এবং পর্যায়ক্রমে খোলা রাজনীতির পথ প্রশস্ত হবে। ক্ষেতে-খামারে, কল-কারখানায় উৎপাদন বাড়াতে হবে। লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে হবে এবং তা ছাড়িয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রমিক ও কৃষক ভাইদের দায়িত্ব অপরিসীম। নিজেদের অভাব মেটাতে হবে এবং দেশের দৈন্য ঘুঁচাতে হবে। দেশের খাতিরে প্রয়োজনবোধে সাময়িক কষ্ট স্বীকার করতে হবে। দেশ সমৃদ্ধ হলে সবাই সুখী হবেন। অভাব থাকলে তা সবাইকে ভাগ করে নিতে হবে। সরকার ও জনসাধারণকে কর্মের ও নীতির মাধ্যমে এই সত্যকে বাস্তব রূপ দিতে হবে। দেশের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ মজুদ আছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংগ্রহ করা হচ্ছে। আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল রয়েছে। বহিঃবাণিজ্য বেড়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের নীতির ও দাবি- দাওয়ার যৌক্তিকতা বাস্তবে স্বীকৃত হয়েছে। এই অনুকূল পরিস্থিতিতে সবাইকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। একাজে আল্লাহর উপর অবিচল ঈমানই আমাদের শান্তি ও সাহস জোগাবে। সর্বোতভাবে দেশের শান্তি বজায় রাখতেই হবে। যদি শুভযাত্রায় কেউ স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে বিঘ্ন ঘটাতে চেষ্টা করে তবে সরকার ও জনসাধারণ তা কোন অবস্থাতেই বরদাস্ত করবেন না এবং তার মোকাবেলার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে ও প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে অনেক মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি জাতিকে মর্মাহত করেছে। আবার সাথে সাথে সমবেদনা ও সহানুভূতি নিয়ে যারা জাতির সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে এবং নিজেদের প্রচেষ্টায় পুনর্বাসনের কাজে হাত দিয়েছে-এ অত্যন্ত গৌরবময় পথ নির্দেশক দৃষ্টান্ত। ধর্ম, গোত্র ও শ্রেণীগত বিভেদ ভুলে গিয়ে জাতি হিসেবে প্রত্যেকটি বাংলাদেশী একাত্মতা ঘোষণা করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ও সার্বিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবেন বলে আমি আশা করি।

আপনারা আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

খোদা হাফেজ
ধন্যবাদ।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পরই জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক শূন্যতা অনুভব করেন। একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জাতি হিসেবে গড়ে তোলার

www.pathagar.com

লক্ষ্যে একটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালের গোড়ার দিকেই তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি, ছাত্র-যুবক, শ্রমিক-কৃষক, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবীসহ আর্থ-সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। তিনি সকল ভেদাভেদ মুছে ফেলে জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ও তার নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালাতে থাকেন এবং জনসাধারণকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এ প্রক্রিয়ায় তিনি লক্ষ্য করেন যে, অতীতের স্বৈরশাসনের ফলে কোন রাজনৈতিক দলই জাতীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হতে পারেনি, গড়ে উঠতে পারেনি। শেরেবাংলা, মওলানা ভাসানী, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমানের মত ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দল, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং ব্যক্তির ভাবমূর্তিতে গড়ে উঠায় সেসব রাজনৈতিক দল ব্যক্তির তিরোধানের পর তিরোহিত হয়ে যায়। নিস্প্রাণ এসব দল তখন সাইন বোর্ডসর্বস্ব, মাজার পূজোর দলে পরিণত হয়ে রাজনৈতিক গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে। নিস্প্রাণ হয়ে ব্যক্তি, গ্রুপে বিভক্ত হয়ে জনগণের কাছে রাজনৈতিক আবেদন হারিয়ে ফেলে। তখন রাজনৈতিক অঙ্গনে এক চরম নেতৃত্বহীন শূন্যতা বিরাজ করতে থাকে। একটি সদ্য স্বাধীন জাতির জন্য এহেন পরিস্থিতি অমঙ্গলজনক। স্বাধীন জাতিসত্তার পরিপন্থী। এ কারণেই জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদের নিয়ে একটি জাতীয় ফ্রন্ট গঠনকে প্রাথমিক রাজনৈতিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করেন। এ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ১৯৭৭ সালের ৩ জুন উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে আহ্বায়ক করে 'জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)' গঠন করেন এবং জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী, জনাব এনায়েত উল্লাহ খান, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, ওবায়েদুর রহমান খুব অল্প সময়ের মধ্যে জাগদলকে দেশব্যাপী সংগঠিত করতে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা

প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণের পর ১৯৭৮ সালের ৩০ এপ্রিল জিয়া তাঁর বিখ্যাত ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। জিয়ার কর্মসূচিতে জনগণের রায়, শ্রমমুখী উদ্দীপনা, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় মরণপণ এবং শোষণ, অন্যায়কে উচ্ছেদ করে প্রগতিশীল কর্মমুখী এক জাতি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহই প্রতিফলিত হয়। জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচিতে ছিল-

১. সর্বোতভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

২. শাসনতন্ত্রে চারটি মূলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা।

৩. সর্ব উপায়ে নিজেদেরকে একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলা,

৪. প্রশাসনের সর্বস্তরে, উন্নয়নের কার্যক্রমে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫. সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ তথা জাতীয় অর্থনীতিকে জোরদার করা।

৬. দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং কেউ যেন ভুখা না থাকে, তার ব্যবস্থা করা।

৭. দেশের কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়ে সকলের জন্য অন্তত মোটা কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৮. কোন নাগরিক যেন গৃহহীন না থাকে তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা।

৯. দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

১০. সকল দেশবাসীর জন্য ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা।

১১. সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং যুবসমাজকে সুসংহত করে জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা।

১২. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দান।

১৩. শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সুস্থ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

১৪. সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে জনসেবা ও দেশ গঠনের মনোবৃত্তি উৎসাহী করা এবং তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

১৫. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা।

১৬. সকল বিরোধী রাষ্ট্রের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক বিশেষ জোরদার করা।

১৭. প্রশাসন এবং উন্নয়ন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা।

১৮. দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়নীতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা এবং

www.pathagar.com

১৯. ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ করা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা।

গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট গঠন

২ মে আওয়ামী লীগ, পিপলস লীগ, মোজাফফর ন্যাপ, সিপিবি, গণআজাদী লীগ, আর জেনারেল ওসমানীর জাতীয় জনতা পার্টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে ৬ দফার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট (গজ) গঠন করে। গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জাতীয় জনতা পার্টি প্রধান জেনারেল ওসমানী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট ৬-দফা ছিল-

স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

*বাংলাদেশের গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরা এবং ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।

*মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও জাতীয় সংস্কৃতির উপর সকল আঘাত প্রতিহত করা।

গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা

*গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট মনে করে যে, ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে যেরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে অনুরূপভাবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এমন একটি সার্বভৌম সংসদের নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করা, যাহার নিকট সরকার সরাসরিভাবে দায়ী থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি দেশের কার্যনির্বাহী প্রধান না হইয়া শুধুমাত্র সাংবিধানিক প্রধান হইবেন।

* প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, দল গঠন ও মতাদর্শ প্রচারের স্বাধীনতা, জনগণের বিভিন্ন অংশের সংগঠন গড়ার অধিকার এবং সভা-সমিতি ও মিছিল করার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

* সামরিক শাসন প্রত্যাহার। রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল। বেআইনী রাজনৈতিক দলসমূহের এবং সংবাদপত্রসমূহের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।

* বিনাশর্তে সকল রাজবন্দির মুক্তি দান। বিনা বিচারে রাজনৈতিক কর্মীদের আটক রাখার আইন রহিত করা। সকল আদালত কর্তৃক বিশেষত সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দেশের উচ্চতর আদালত পর্যন্ত আপিলের অধিকার প্রদান।

* প্রতিটি নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার নিশ্চিত করা। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করিতে না দেওয়া ও সাম্প্রদায়িকতা নিষিদ্ধ করা।

* অনুন্নত সম্প্রদায় এবং অনুন্নত এলাকার অধিবাসীদের বিশেষত তফসিলী সম্প্রদায় ও উপজাতীয় জনগণের দ্রুত উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

* সর্বস্তরে প্রশাসন হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা।

www.pathagar.com

আইনের শাসন

হত্যার রাজনীতি বন্ধ করা এবং আইনের শাসন প্রবর্তন করা।

প্রশাসন

* প্রশাসনের সকল পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

* সকল স্তরের কর্মচারীদের উপযুক্ত মর্যাদা ও বেতন, ভাতা নির্দিষ্ট করা।

* সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থান নির্বিশেষে দুর্নীতি দমন ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।

অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা

* কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য জমির সিলিং ক্রমান্বয়ে কমানো। উদ্বৃত্ত খাস জমি ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের মধ্যে স্থায়িভাবে বিতরণ করা এবং ক্ষেতমজুর ও ভূমিহীন কৃষকসহ সকল স্তরের কৃষকদের লইয়া স্বেচ্ছামূলক সমবায় গঠন।

* কৃষকদের সুলভে সার, বীজ, ঋণ প্রভৃতি সরকারি সাহায্য প্রদান।

* কৃষকরা যাহাতে কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় তাহার নিশ্চিত ব্যবস্থা করা।

* নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ঊর্ধ্বগতি রোধ করার জন্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কালোবাজারী, মজুতদারী, মুনাফাখোরী, খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধপত্রের ভেজাল প্রদানকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান।

* আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়িয়া তোলার জন্য দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শিল্পায়িত করা। শিল্পক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থে রাষ্ট্রীয় খাতকে মূল ও গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে সংরক্ষণ ও শক্তিশালী করার সাথে সাথে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতকেও সুবিধা প্রদান।

* গ্রামে কুটির শিল্পের প্রসারে যথাযথ গুরুত্ব ও সাহায্যসহায়তা প্রদান।

* শ্রমিককর্মচারীদের বাঁচার মত ন্যায্য মজুরি প্রদান ও ধর্মঘটের অধিকারসহ সকল ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের স্বীকৃতি। শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা। শ্রমিকদের জন্য একটি স্থায়ী মজুরি কমিশন নিয়োগ করা।

* শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌল পরিবর্তন সাধন ও বর্তমানের অব্যবস্থা, নৈরাজ্য ও চরম বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া ক্রমান্বয়ে গণমুখী সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান। সমস্ত শিক্ষকের অবস্থার উন্নয়ন।

* মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন এবং শহীদ ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে ভাতা প্রদান।

* মহিলাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সমঅধিকার নিশ্চিত করা।

বৈদেশিক নীতি

স্বাধীন সক্রিয় জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা এবং সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল নিপীড়িত জাতির প্রতি সমর্থন দেওয়া। সমতা ও সমঝোতার ভিত্তিতে সকল দেশের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন ও উহা বজায় রাখা। বিশ্বশান্তির সহায়ক বৈদেশিক কার্যক্রম গ্রহণ করা। *(সূত্রঃ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে 'গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের ঘোষণাপত্র' শীর্ষক পুস্তিকা। পুস্তিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নাম ছাপা হয়নি)*

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নির্বাচনী তৎপরতা

জাগদল প্রতিষ্ঠার পর এই দলটির জন্ম তাৎক্ষণিকভাবে রাজনীতিতে কোন প্রভাব ফেলতে না পারলেও ব্যাপক ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিল। ১৯৭৮ সালের জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট নামে একটি জোট গঠনে প্রধান ভূমিকা রাখে জাগদল। ১৯৭৮ সালে নির্বাচনের পূর্বে বাকশাল আমলে জারি করা রাজনৈতিক দলবিধি (পিপিআর) বাতিল করে নতুন রাজনৈতিক দলবিধি জারি করা হয়। বাংলাদেশের রাজনীতির এক চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে যখন বাকশাল একনায়কত্বের অবসানের পরও এদেশের রাজনীতি কোন সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারছিলো না, সরকারের অনুমোদনপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে বাইরে ক্রমাগত কোন্দলের দ্বারা ভেঙ্গে খান খান হচ্ছিলো তখনই জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে ৭ মে গঠিত হয় জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট। যেসব দল নিয়ে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠিত হয়-

১. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল;
২. মশিয়ুর রহমানের নেতৃত্বাধীন ন্যাপ ভাসানী;
৩. শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ;
৪. কাজী জাফরের ইউনাইটেড পিপলস পার্টি-ইউপিপি;
৫. মাওলানা আব্দুল মতীনের বাংলাদেশ লেবার পার্টি;
৬. শ্রীরসরাজ মণ্ডলের বাংলাদেশ তফশিলী ফেডারেশন।

কয়েকটি রাজনৈতিক দল, গ্রুপ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত এই ফ্রন্টে জিয়াউর রহমান কোন সংগঠনের পক্ষ থেকে নয়, ব্যক্তি হিসেবেই যোগদান করেন। জাগদল গঠনের ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমান নেপথ্যে থাকলেও জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট এবং পরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠনের মাধ্যমে জিয়া একজন ঝানু রাজনীতিবিদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। জাগদল, জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ও জাতীয়তাবাদী দল গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ভেতর যে ভাঙন দেখা দেয়, সে ভাঙন মেরুকরণের মধ্য দিয়ে বিরোধীদলগুলো দুর্বল এবং সরকারি দল সবল হতে থাকে। জিয়া দক্ষতা, প্রজ্ঞা বা চাতুর্যের সাথে নিজ দলকে শক্তিশালী পজিশনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এদিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলতে থাকে। দীর্ঘ প্রস্তুতির পর অবশেষে ৩ জুন, ১৯৭৮ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সামনে রেখে জিয়াউর রহমান সারা দেশ চষে বেড়ান। সেই সময় তিনি যেসব বক্তব্য রেখেছিলেন তা আজ এক মূল্যবান দলিল। জিয়াউর রহমানের উপর অনেকে বই লিখেছেন, আবার সংবাদপত্রে হরহামেশা নিবন্ধ লিখছেন। কিন্তু কেউ সেই সময়ে বিভিন্ন জনসভায় দেয়া জিয়াউর রহমানের ভাষণ উল্লেখ করছেন না। নির্বাচনী প্রচারণার সময় প্রেসিডেন্ট জিয়া বাকশালবিরোধী রাজনীতিকে ব্যাপকতা দান করেছিলেন। বাংলাদেশের জনগণ পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকেই দলীয় স্বৈরাচার বা সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের মতো জিয়াও উপলব্ধি করেছেন এদেশের জনগণ আর বাকশালী স্বৈরাচারের যুগে ফিরে যেতে চায় না। তাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল বাকশালের বিরুদ্ধে এবং স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে বাকশালী জোটকে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন।

www.pathagar.com

১৯৭৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের ঘোষণা ও কর্মসূচি ব্যাখ্যা করে ৭ মে তারিখে প্রেসিডেন্ট জিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন, 'স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সামাজিক প্রগতি তথা অর্থনৈতিক মুক্তিই হচ্ছে ফ্রন্টের লক্ষ্য।' ফ্রন্টের অন্যান্য কর্মসূচিতে ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা, সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতাসহ জনগণের মৌলিক অধিকার প্রদান ও তাকে আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করা, বিগত সরকারসমূহের আমলে জারিকৃত সকল জনস্বার্থবিরোধী আইনের অগণতান্ত্রিক বিধিসমূহ দূর করা, সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিদান, সকল ধর্মাবলম্বী জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং সকল ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ, শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনী বাতিল করে প্রেসিডেন্টকে সরকারের মূল ও প্রধান কর্মকর্তার ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের কার্য পরিধি সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় ধারা সংযোজন, শাসনতন্ত্রের সাধিত সংশোধনীসমূহ সংরক্ষণ এবং পর্যায়ক্রমে ১৯ দফার বাস্তবায়ন। *(সূত্রঃ দেশপ্রেমিক জিয়া, বজলুর রহমান, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১)*

এর পূর্বে ১ মে, মে দিবসের বাণীতে তিনি বলেন, "শুধুমাত্র জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্ষেতে, কারখানায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে রক্তপাতের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতাকে সুসংহত এবং অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে।"

২ মে ঠাকুরগাঁও এবং ৮ মে দিনাজপুরে এক জনসভায় তিনি বলেন, "অতীতে যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে এবং হাজার হাজার দেশপ্রেমিককে খতম করেছে তারা ফের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার মিথ্যা ধুয়া তুলে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। ঐসব আওয়ামী-বাকশালী হচ্ছে জনগণের দুশমন। তারা দেশের হাজার হাজার লোককে হত্যা, সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্টের জন্য দায়ী। শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত ফায়দা লোটার জন্য তারা দেশের সম্পদ বাইরে পাচার করে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। দেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হলে এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনতে হলে ঐসব আওয়ামী-বাকশালীদের চিরতরে নির্মূল করতে হবে।"

৭ মে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের ঘোষণা ও কর্মসূচি ব্যাখ্যা করার পর ৯ মে দিনাজপুরে এক সমাবেশে তিনি বলেন, "১৯৭১ সালের স্বাধীনতা অর্জনের পর আমাদের জনগণ দেশ গড়ার মহৎ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন সরকারের কু-শাসনের তারা নিরাশ হন। তারা হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে, দেশের সম্পদ লুণ্ঠন ও বিদেশে পাচার করেছে এবং গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্বকে হত্যা করে একদলীয় শাসন কায়েম করেছে। ঐসব চিহ্নিত ব্যক্তিকে দেশবাসীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে এবং কায়েমী স্বার্থে তাদের একদলীয় শাসন পুনরুজ্জীবিত করতে দেয়া যাবে না। গণদুশমনদের দেশের মাটি থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে হবে।"

১০ মে কালীগঞ্জে (রংপুর) তিনি বলেন, "সরকার দেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ এবং যারা জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন, হাজার হাজার নিরপরাধ লোক ও গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে তাদেরকে অবশ্যই জনগণের নিকট কৃত অপরাধের হিসাব দিতে হবে। শত শত বৎসর ঔপনিবেশিক শাসনের পর একটি রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকারী জনগণ অবশ্যই দেশ ও তাদের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের হিসাব চাইবে।"

www.pathagar.com

১১ মে বগুড়ায় তিনি বলেন, "১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও জনগণকে পাকিস্তানি বাহিনীর কামানের সামনে ফেলে দিয়ে আওয়ামী চক্র বিদেশে পালিয়েছিল। আওয়ামী-বাকশালী চক্র হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছে। জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, মিল কারখানা ধ্বংস করেছে এবং দেশের সম্পদ সীমান্তের ওপারে পাচার করেছে, তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।"

১২ মে সারিয়াকান্দিতে (বগুড়া) তিনি বলেন, "আমরা জনগণের ভিক্ষার হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করতে চাই। আমরা দেশকে সম্পদশালী করতে চাই, যাতে প্রতিটি লোক সুখ শান্তিতে বসবাস করতে পারে।"

১৪ মে নাটোরে তিনি বলেন, "বাংলাদেশকে পূর্বে আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুলি বলা হত কিন্তু বাংলাদেশ আজ আর আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুলি নয়। আমরা খাদ্য ভিক্ষা অব্যাহত রাখতে পারি না।"

১৫ মে মহাদেবপুরে (নওগাঁ) তিনি বলেন, "জনগণ আশা করেছিল যে, স্বাধীনতার পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কিন্তু প্রতিদিন তারা পেল অন্য কিছু। দেশ প্রত্যক্ষ করল বিশৃঙ্খলা, খুনখারাবি, লুণ্ঠন, চোরাচালান গণতন্ত্রের ধ্বংস ও দুঃস্বপ্ন। আমাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি অবশ্যই গণতন্ত্রের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও দ্রুত অগ্রগতির লক্ষ্যে পরিচালিত হতে হবে। এসব ছাড়া রাজনীতি অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং এতে জনগণ যারা তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য স্বাধীনতা অর্জন করতে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদের কোন কল্যাণ হবে না। জাতীয়তাবাদের চেতনাই হবে আমাদের সকলের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। এই চেতনাই একদিন দেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রাম পরিচালনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। জনগণের প্রতি গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির চক্রান্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করতে স্ব স্ব এলাকায় কমিটি গঠন করতে হবে।"

১৭ মে কুষ্টিয়ায় তিনি বলেন, "জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট দেশে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়েছে তা কৃষক শ্রমিকের গণতন্ত্র, মেহনতি মানুষের গণতন্ত্র। মজলুম গণমানুষের গণতন্ত্র। ইস্পাত কঠিন ঐক্য-দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আপামর জনগণের এই গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে দেশপ্রেমিক নিঃস্বার্থ কর্মীদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা এমন এক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যা জনতার রাজ প্রতিষ্ঠিত করবে, প্রতিষ্ঠিত করবে অধিকার। দেশ ও জনগণের জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি, জনগণ আমাকে যে বিপুল ভালবাসা দিয়েছে তার বিনিময়ে দেশ ও জনগণের কল্যাণ এবং দেশের অগ্রগতি সমৃদ্ধির জন্য আমি নিবেদিত প্রাণ। রাজনীতির রূপ আজ বদলে গেছে। আজকের রাজনীতি কর্মের রাজনীতি, অগ্রগতির রাজনীতি, সমৃদ্ধির রাজনীতি। প্রকোষ্ঠের রাজনীতি ফুরিয়ে গেছে। প্রাসাদ রাজনীতির কাল শেষ হয়ে গেছে। প্রাসাদ নয়, প্রকোষ্ঠ নয়, জনতার কাতারে এসে আজ রাজনীতি করতে হবে। জনগণকে নিয়ে, কর্মের মাঝ দিয়ে, সৃষ্টির মাঝ দিয়ে, অগ্রগতির সিঁড়ি ভেঙে সমৃদ্ধ জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।"

১৮ মে ফরিদপুরে তিনি বলেন, "প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং বছরের শেষ দিনে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে জনগণের রায় দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে।"

১৮ মে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের ১৩-দফা নির্বাচনী 'ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি' ঘোষিত হয়। ১৩ দফা পূর্ণবিবরণ ছিল এরূপ-

www.pathagar.com

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ

লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী সকল দুশমনকে প্রতিহত করা জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের অন্যতম মূল লক্ষ্য।

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট মনে করে যে, যারা একদিন আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে বহিঃশক্তির সম্প্রসারণবাদী লিপ্সার যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছিল, যারা আমাদের দেশের মহান জনগণের পবিত্র রায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে একদলীয় স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিল, যারা শান্তিপূর্ণ পন্থায় সামরিক শাসন থেকে সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় উত্তরণের প্রক্রিয়ার পথে অযৌক্তিক ও অবান্তর শর্ত আরোপ করে বিভ্রান্তি ও বিঘ্ন সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে, সেই সমস্ত চিহ্নিত শক্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। শুধু সতর্ক থাকলেই চলবে না, এদের অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্জয় শক্তি ও সংগঠন।

গণতান্ত্রিক অধিকার

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ ও অংশগ্রহণের মূল শর্ত হচ্ছে তার গণতান্ত্রিক অধিকার। গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ ও তাকে প্রয়োগ করার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌল দিক। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট তাই নিম্নোক্ত রূপরেখার ভিত্তিতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনির্দিষ্ট করার অঙ্গীকার ঘোষণা করছেঃ

১. নারী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, পেশা ও শিক্ষা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থাকবে।

২. বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশ করার, সভা-সমাবেশ করার অধিকারসহ জনগণের সকল মৌলিক অধিকার সুনির্দিষ্ট করা হবে।

৩. আইনের চোখে সবাইকে সমান বলে বিবেচনা করা হবে এবং সকলের আইনের আশ্রয়গ্রহণ করার সমান অধিকার থাকবে এবং তাকে নিশ্চিত করা হবে। জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহকে আদালতের এখতিয়াভুক্ত করা হবে।

৪. সকল জনস্বার্থবিরোধী আইন ও অগণতান্ত্রিক বিধিসমূহ দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাজনৈতিক দল বিধি আইনের অবশিষ্ট ধারাসমূহ পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হবে। সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ার সাথে সাথে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে। বর্তমান শ্রম আইনকে পুনর্বিন্যাস করে শ্রমিক-কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন ও সকল প্রকার মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৫. সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি প্রদান করা হবে এবং দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে বিগত সরকারের আমলে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পর্যালোচনা করা হবে এবং তা প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা করা হবে।

ধর্মীয় অধিকার ও স্বাধীনতা

আমাদের শাসনব্যবস্থায় ধর্ম একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ধর্ম সম্পর্কে আমাদের জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের নীতির ভিত্তি হবে জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা, প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালন, প্রচার ও প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করা। ফ্রন্ট সকল ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিকে স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও

www.pathagar.com

সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ যত্নবান হওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী। অনগ্রসর উপজাতীয় ও তফসিলী জনগণের জন্যে শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং বৃহত্তর জাতীয় জীবনে তাদের অধিকার সুবিধা ও অংশগ্রহণের সুযোগের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং তাদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

রাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক নীতি

ক. জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনী বাতিল করে প্রেসিডেন্টকে সরকারের মূল ও প্রধান কর্মকর্তার ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে সেই সাথে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের কার্যপরিধি সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় ধারা সংযোজন করা হবে। সাথে সাথে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত পার্লামেন্ট হবে সার্বভৌম। পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন, অপারগতাজনিত কারণে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ এবং ইমপিচ করা, সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন এবং প্রয়োজনবোধে শাসনতন্ত্র সংশোধন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হবে। উপরন্তু ভবিষ্যত সরকার পদ্ধতি নির্ধারণ ও পরবর্তী মেয়াদ থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পদ্ধতিও এই পার্লামেন্ট নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখবে।

খ. ১৯৭৭-এর মে মাসে অনুষ্ঠিত গণভোটের মাধ্যমে লব্ধ জনগণের ম্যান্ডেট অনুযায়ী এ পর্যন্ত শাসনতন্ত্রের যে সমস্ত সংশোধন করা হয়েছে তা রক্ষা করা হবে।

গ. প্রশাসনের সর্বস্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

পররাষ্ট্রনীতি

রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহের মধ্যে পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফ্রন্ট পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত রূপরেখা ঘোষণা করছেঃ

ক. পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা, পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি পূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা এবং সর্বক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের সংগ্রামরত জনগণকে সমর্থন করা এবং স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা।

খ. আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন বৈদেশিক শক্তির কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। তবে পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকেই রাজনৈতিক শর্তহীন অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে।

গ. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি, বিশেষ করে আরব বিশ্বের সাথে একাত্ম ঘোষণা করা, আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা, প্যালেস্টাইনী জনগণের সংগ্রাম, রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের বর্ণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামসহ সকল জাতি ও জনগণের ন্যায়-সঙ্গত জাতীয় মুক্তি ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে সমর্থন দান করা হবে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখা

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গত বছরের মে মাসে অনুষ্ঠিত গণভোটে ফ্রন্টের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচির প্রতি জনগণ যে সমর্থন জানিয়েছে তার

www.pathagar.com

উপর ভিত্তি করেই কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান প্রভৃতির উন্নয়ন সাধন করতে বদ্ধপরিকর।

কৃষিনীতি

প্রগতিশীল ভূমিনীতির ভিত্তিতে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হবে। এই সংস্কারের মূল লক্ষ্য হবে উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভাগ্য উন্নয়ন। ভূমিহীন, গরিব কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কৃষকের জীবনধারণের মান উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সামগ্রিক স্বার্থে আধুনিক যান্ত্রিক চাষ ও যৌথ সমবায় প্রথা প্রচলনের জন্য সরকার উৎসাহ প্রদান করবে।

কৃষক তার অর্থকরী ফসল পাট, ইক্ষু, তামাক, হলুদ, আলু প্রভৃতির ন্যায্য মূল্য যাতে পেতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। কৃষকদের সুলভে সার, বীজ, ঋণ প্রভৃতি প্রদান করা হবে।

মোদ্দা কথা, সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ যাতে স্বল্প সময়ে খাদ্যে স্বয়ংভর হয় তার ব্যবস্থা করা হবে এবং গ্রামীণ উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে জোরদার করা হবে।

শিল্পনীতি

দেশের নিজস্ব সম্পদ ও জনশক্তিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর উপর ভিত্তি করে শিল্পনীতি নির্ধারণ করা হবে। জনগণের জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করে এই ধরনের বৃহদায়তনের মূল ও ভারি শিল্প রাষ্ট্রের মালিকানায় রাখা হবে। শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প নিয়ামক হবে। সাথে সাথে ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা থাকবে এবং এ ব্যাপারে অর্থযোগান ও যুক্তিসঙ্গত মূল্যে কাঁচামাল প্রভৃতি ব্যবস্থা এবং তা বাজারজাত করার সর্ব প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা হবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি শক্তির দ্রুত বিকাশ করা হবে, যাতে সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র শহর ও গ্রামাঞ্চলকে বিদ্যুতায়িত করা সম্ভব হয়। কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প যথা ঃ তাঁত, রেশম, লবণ ও বিড়ি শিল্পের সংরক্ষণ, পুনর্গঠন ও বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রমিক-কর্মচারীদের সমস্যা

জাতীয় পে-কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পে-স্কেল কার্যকর করার ক্ষেত্রে যে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে তা দূর করার জন্য এগুলোর পুনর্বিন্যাস সাধন করা হবে।

শ্রমিকদের জন্য গঠিত মজুরি কমিশনের রিপোর্ট শিগগিরই প্রকাশ ও কার্যকর করা হবে। শ্রমিক-কর্মচারীরা যাতে স্বচ্ছন্দে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধানপূর্বক তাদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হবে।

শিক্ষা নীতি

বর্তমান উপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করে তোলা হবে এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল-কলেজ শিক্ষক ও ছাত্রদের সমস্যাবলীর ন্যায়সঙ্গত প্রতিবিধান করা হবে।

www.pathagar.com

নারীর অধিকার

নারী সমাজের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। নারীর সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহ দান করা হবে।

মুক্তিযোদ্ধা

১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা যথাঃ দেশের শ্রমিক-কৃষক, যুবক, সশস্ত্র বাহিনী, বি.ডি.আর, পুলিশ, আনসার ও তাদের সহযোদ্ধাদের জাতীয় মর্যাদা প্রদান করা হবে। সমাজে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানজনক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ও উৎপাদনশীল কার্যক্রমে নিয়োজিত করার কাজ জোরদার করা হবে।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী যাতে আধুনিক সমর উপকরণ সুসজ্জিত হয়ে এবং প্রয়োজনীয় সব রকম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় এবং দুর্ভেদ্য করে তুলতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে। *(সূত্রঃ মওদুদ আহমদ কর্তৃক জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের পক্ষে ৩২ নম্বর পুরানা পল্টন থেকে প্রকাশিত 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের নির্বাচনী ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি' শীর্ষক পুস্তিকা)*

১৯ মে গোলাপগঞ্জে নির্বাচনী প্রজারণকালে জিয়া বলেন, 'জনগণের মধ্যে গণতন্ত্র ও রাজনীতি দৃঢ়মূল হতে হবে। আমরা জনগণের গণতন্ত্র চাই এবং তা গ্রামমুখী হবে। ৬৪ হাজার গ্রামের উন্নতি ছাড়া দেশের অগ্রগতির সম্ভাবনা নাই। দেশ গড়ার কাজ আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। আমরা আর বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারি না। কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি এটা পছন্দ করে না। আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে এবং সঠিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।'

২০ মে ঢাকায় প্রাথমিক শিক্ষকদের সমাবেশে তিনি বলেন, 'মেহেরবানী করে দেশের একজন সাধারণ নাগরিক রূপেই আমাকে থাকতে দিন এবং তা হলেই কেবল আমি কিছু করতে পারব। শিক্ষকরা এক মহৎ ও মর্যাদার পেশায় নিয়োজিত। তারা বাংলাদেশের ৬৪ হাজার গ্রামে নিরক্ষরতার অন্ধকার দূর করে জাতি গঠনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। শিক্ষকতার পেশা কেবলমাত্র জীবিকা অর্জনের জন্য নয়; বরং এটা এমন এক পেশা যার অবদান জাতি গঠনের ক্ষেত্রে বিপুল।'

২১ মে টাঙ্গাইলে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ চিরকাল অবহেলিত ছিল। স্বাধীনতার পরও দেশ অবহেলিত হল, সম্পদ পাচার করা হল, গণতন্ত্র হত্যা করা হল। আজ সময় এসেছে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার। আজকের গণতন্ত্র জনগণের গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রের মাধ্যমে গ্রামে যেতে হবে, গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করতে হবে। আজকের রাজনীতি, ক্ষেত খামারের রাজনীতি, শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার রাজনীতি, দেশের সার্বিক উন্নয়নের রাজনীতি, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের রাজনীতি। বাংলাদেশের জনগণ কাজ করতে চায়, তারা ভিক্ষা করতে চায় না, দেশকে স্বনির্ভর করতে চায়। জাতীয়তাবাদী চেতনাই স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্ত্র যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছিল, তারই ভিত্তিতে এই জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন এই উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় নেতা। জননেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন আজ টাঙ্গাইল শহরের নাম হবে মওলানা ভাসানী নগর'।

www.pathagar.com

২২ মে ময়মনসিংহে তিনি বলেন, "জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট সে ধরনের গণতন্ত্রের তীব্র বিরোধিতা করে যাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য লুট, হত্যা, রাহাজানি, চোরাচালান এবং জনগণের উপর নির্যাতন চালানো হয়। গণতন্ত্র হবে জনগণের এবং একমাত্র জনগণই ইহার সুবিধা ভোগ করবে। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠী নয়।"

২৩ মে জামালপুরে তিনি বলেন, "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ থেকে অবশ্যই ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের উদ্ভব হতে হবে এবং তাতে অবশ্যই জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত থাকতে হবে।" একই দিনে খুলনায় সাপ্তাহিক বিচিত্রার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাতকারে জিয়া বলেন, 'আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট'। কথাটা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "আমি বলেছি গণতন্ত্রকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবো। সেক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়তে হবে শহরকেন্দ্রিক পেশাদার রাজনীতিবিদদের।" জাতীয়তাবাদী দলের উপাদান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা-জিয়ার এই কথাটি হয়তো উল্টো করে দিতে পারে এইসব উপাদান। প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেছিলেন, "কোন নেতাই সম্পূর্ণ নন। নেতারা কথা জানেন, কথা বলেন, বেশি করেই বলেন। কিন্তু ড্রইং রুমে বসে। এরা কাজ করেন না। অনেকের কাজ করার আগ্রহ আছে। সংগঠন নেই বলে পারে না। একদলের রাজনৈতিক পর্যায় শেষ হয়ে গেছে। আর একদলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সময় আসেনি। আমি জানি একদিন আমারও প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। তার আগেই আমার উপলব্ধিকে আমি গ্রামের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার, সমস্যার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাই।' তিনি বলেন, 'সমস্যা সমাধানে কোদালই হবে আমাদের বুলডোজার-ট্রাক্টর।' তিনি বলেন, 'আমাদের পরিশ্রমী শক্ত হাতই হবে আমাদের অর্থনীতি এবং সমস্যার সমাধান আসতে হবে জনগণের কাছ থেকে। এসব কথা কথাই মনে হবে না যখন এর প্রেক্ষিত জানা যাবে।' তিনি বলেন, 'গত কয়েক বছরে আমার কাছে যেটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হলো আমরা আমাদের দেশকে জানি না। দেশের সম্পর্কে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প। আমরা দেশকে ভালভাবে জানি না। চিনি না। দেশের মাটিতে কি লুকিয়ে রয়েছে তা জানি না। সেখান থেকে সমস্যার শুরু। গত এক দেড় বছর ধরে কাজ করেছি এই বাস্তবতা নিয়ে। আপনি যদি দেশটা ঘুরে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন বাংলাদেশে কি রয়েছে। যেহেতু দেশকে জানি না সেজন্য অতীতে বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম। তবে আমরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। দেশ-মানুষ-সম্পদ শক্তি সম্পর্কে নতুন করে বুঝতে শিখেছি, আবিষ্কার করেছি। নিজেদের যতক্ষণ না চিনব ততক্ষণ উন্নতি হবে না।

২৪ মে ফেনীতে তিনি বলেন, 'অর্থনৈতিক কর্মসূচিশূন্য রাজনীতি অর্থহীন, জনগণের কল্যাণ এবং দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সে রাজনীতি কোন কাজে লাগে না। সুস্থ গণতন্ত্র ও রাজনীতির লক্ষ হিসেবে এক বাস্তব অর্থনৈতিক কর্মসূচি অবশ্যই নিতে হবে।'

২৫ মে চট্টগ্রামে তিনি বলেন, "আমরা দেশে সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই যা আইন-শৃঙ্খলা শান্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যে গণতন্ত্র মানুষকে মানুষের মর্যাদায় বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করবে। আমরা সেই ধরনের রাজনীতি, গণতন্ত্র চাই, যা বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে শক্তিশালী ও সম্মানিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে। আমরা কখনও অপরের বশ্যতা স্বীকার করব না। আমরা জনগণের রাজনীতি ও জনগণের গণতন্ত্র কায়েম করব। যাতে ভবিষ্যতে কেহ স্বীয় ব্যক্তিস্বার্থে জনগণকে ব্যবহার করতে সমর্থ না হয়।"

www.pathagar.com

২৬ মে খুলনায় তিনি বলেন, "বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ও সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে দেশে প্রাসাদ রাজনীতিকদের গণতন্ত্র নয় জনগণের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য আমরা রাজনীতিকে মাটির কাছাকাছি নিয়ে যেতে চাই। প্রাসাদ রাজনীতির দিন শেষ হয়ে গেছে। আমরা যে রাজনীতি চালু করতে যাচ্ছি তা নির্যাতিত মানবতার সহায়ক হবে। এ রাজনীতি হবে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির জন্য। লুণ্ঠন, চোরাচালান ও রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণে হাজার হাজার নিরপরাধ লোকদের হত্যার দিনে ফিরে যেতে চাই না। আমাদের রাজনীতি হবে গণমুখী। এই রাজনীতিতে দেশ শান্তি, অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করবে। আমরা যে রাজনীতি প্রবর্তন করতে যাচ্ছি তাতে দেশবাসীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত হবে। গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্র হত্যাকারী জনগণের চিহ্নিত শত্রুদের যেকোন মূল্যে উচ্ছেদ করতে হবে। রাজনীতি-আইনানুগ পন্থার মাধ্যমে তাদেরকে দেশের মাটি থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে শান্তি ও অগ্রগতি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে দখলদার সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রেরণাদায়ক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমরা শক্তিশালী জাতীয় সংহতির রাজনীতি প্রবর্তন করতে চাই। অতীতের রাজনীতি ও গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতো গুটি কতক লোক ঢাকা বসে কিংবা জেলা শহরে বসে বসে। আমরা রাজনীতি ও গণতন্ত্রকে নিয়ে যেতে চাই গ্রামে গ্রামে জনগণের মাঝে। আমরা চাই রাজনীতি বা গণতন্ত্রকে যেন কেউ আর ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের কাজে ব্যবহার করতে না পারে। আমরা জনগণের গণতন্ত্র চাই, আমরা চাই মানুষ শান্তিতে বাস করুক। পেট পুরে খেতে পাক। আমরা চাই গ্রামে রাস্তাঘাট হোক, খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ হোক। সর্বত্রই কুটির শিল্প গড়ে উঠুক, সবাই কাজ পাক।"

২৭ মে পিরোজপুরে তিনি বলেন, "আমি দেশবাসীকে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার প্রশ্নে আহ্বান জানাচ্ছি। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ফ্রন্ট দেশে গণতন্ত্র ও শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করবে। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট জনগণের ফ্রন্ট। এই ফ্রন্ট কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার ফ্রন্ট। আমি গ্রামে গঞ্জে জাতীয়তাবাদী কমিটি গঠনের আহ্বান জানাচ্ছি।"

২৭ মে ভোলায় তিনি বলেন, "ভবিষ্যতে কোন রাজনীতিবিদ যাতে গণতন্ত্রকে নিজের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য গণতন্ত্রের শেকড় জনগণের মধ্যে প্রোথিত করতে হবে। আমরা দুর্নীতি, লুট এবং হত্যার রাজনীতি চাই না। আমরা এমন গণতান্ত্রিক রাজনীতি চাই যা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। আমরা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কৃষক- শ্রমিকসহ জনগণের গণতন্ত্রের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। অতীতে যারা গণতন্ত্রের নামে, রাজনীতির নামে এবং জনগণের দোহাই দিয়ে গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করেছিল তাদেরকে চিরতরে নির্মূল করতে হবে।"

২৭ মে বরিশালে তিনি বলেন, "গণবিরোধী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিরোধীদের অব্যাহত গণতন্ত্র সত্ত্বেও যে গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তা বাংলাদেশের মাটিতে চিরস্থায়ী স্থান লাভ করবে। সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন এবং দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আমরা শান্তি স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির রাজনীতি প্রচলন করতে চাই। জনগণের গণতন্ত্রই আমাদের লক্ষ্য। প্রাসাদ রাজনীতির দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন জনগণের কল্যাণকামী গণতন্ত্র প্রচলনের সময় এসেছে। আমাদের রাজনীতি ও গণতন্ত্র গ্রামমুখী। লুটপাট, চোরাচালান এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হাজার হাজার নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করার দিন এখন আর নেই। যেসব লোক তাদের

www.pathagar.com

শাসনামলে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল তারা আবার সুবিধাবাদী রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশের প্রয়াস পাচ্ছে। এই গণবিরোধী শক্তির সম্পূর্ণ পরাজয় নিশ্চিত করার জন্য নারী-পুরুষ, ছাত্র-শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণ সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই এক হয়ে সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য গঠন করতে হবে এবং এই গণবিরোধী গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করতে হবে। বাংলাদেশে যারা বাস করছেন তারা সবাই বাংলাদেশী। এ দেশের প্রতি সবারই জাতীয় কর্তব্য রয়েছে।”

২৮ মে পটুয়াখালীতে তিনি বলেন, “জনগণ ধ্বংস, লুটপাট, হত্যা ও লুণ্ঠনের গণতন্ত্র ও রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের অপকীর্তির মাধ্যমে যারা জনগণের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করেছিল সেই আওয়ামী-বাকশালীদের রাজনৈতিকভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। জনগণ এখন শান্তি, স্থিতিশীলতা ও জাতীয় অগ্রগতির রাজনীতি ও গণতন্ত্র চায়। জনগণ কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এর ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে চায়। দেশকে তারা দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও ব্যাধির জোয়াল থেকে মুক্ত দেখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে চায়। আমরা দেশে এমন গণতন্ত্র চাই যা হবে জনগণের গণতন্ত্র এবং যা আমাদের মাতৃভূমিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে গড়ে তুলবে এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে ভিত্তিকে-ঐক্যকে জোরদার করতে সাহায্য করবে। ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ভিত্তি হতে হবে নিজস্ব সম্পদসমূহের সম-ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামসমূহের সর্বাত্মক উন্নয়ন ও জনগণকে আরও কাজ করার অনুপ্রেরণা দান। দেশে শান্তি ও অগ্রগতিকে যারা ধ্বংস করতে এবং অতীতের মতো সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে উঠে পড়ে লেগেছে সেই বিভেদ সৃষ্টিকারী লোকজনের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি। চিহ্নিত গণদুশমনদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি এবং রাজনৈতিকভাবে তাদেরকে উৎখাত করার আহ্বান জানাচ্ছি। গণদুশমনরা আবার আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং জনগণের প্রতি বেঈমানী করার জন্য জঘন্য উদ্দেশ্য নিয়েই ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে।”

৩০ মে ঢাকা পল্টন ময়দানের সমাবেশে তিনি বলেন, “ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীর জনগণ সব সময় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য রক্ত দিয়েছেন। আপনাদের জন্য আমার সালাম। আর একটি সত্য কথা বলতে চাই ১৯৭১ সালে আওয়ামী-বাকশালীরা স্বাধীনতা চায়নি। আপনারা একথা স্বীকার করেন।” পল্টনের জনসমুদ্র গর্জন জবাব দেন। ‘হ্যাঁ’। ‘সেজন্য আওয়ামী-বাকশালীরা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারে না। তারা কেবলমাত্র দেশকে বিকিয়ে দিতে পারেন। আওয়ামী-বাকশালীরা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে না। যদি তারা বিশ্বাস করতো, তা হলে দেশকে লুট করতো না। নিরীহ জনগণকে হত্যা করতো না, সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিতে পারতো না, তাদের অতীত কার্যকলাপ প্রমাণ করেছে যে, তারা কোনদিন স্বাধীনতা চায়নি, চায়নি। আমরা স্বাধীনতা এনেছি, স্বাধীনতা রাখবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে ও আপনাদের সহায়তায় আজ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত। এদেশের উপর কেউ হাত উঠাতে পারবে না। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য যে ত্যাগ, প্রাণ ও রক্তদান করতে হয় তা দিতে জনগণ সর্বদা প্রস্তুত রয়েছেন। আমরা সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই। আমরা কারো আভ্যন্ত রীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও কেউ হস্তক্ষেপ করুক তাও চাই না। জনগণ আর হত্যার রাজনীতি চায় না, হত্যার গণতন্ত্র চায় না, জনগণ চায় শান্তির রাজনীতি, চায় শান্তির গণতন্ত্র, জনগণ চায়, চায় শান্তির গণতন্ত্র। জনগণ চায় দেশের উন্নতি। এসব উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে আমাদেরকে জনগণের রাজনীতি ও জনগণের গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে। আমরা আগামীতে জনগণের গণতন্ত্রের মাধ্যমে

www.pathagar.com

দেশ ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশ গড়ার কাজে লাগাতে চাই, যাতে দুনিয়ার উন্নতমুখী সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারি, মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। যাতে কেউ আমাদের গায়ে হাত লাগাতে না পারে।"

৩১ মে নারায়ণগঞ্জে তিনি বলেন, "আমরা দেশে অস্ত্রের রাজনীতি চাই না। আমাদের সেই রাজনীতি, গণতন্ত্র চাই, যাতে মানুষ পেট পুরে খেতে পারবে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করে বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধা ও জনতা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছে আওয়ামী-বাকশালীরা নয়। হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই আমরা ভাই ভাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সবাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫ এর সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী ও মজবুত করে দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি একজন শ্রমিক হিসেবে আজ বলছি যে, গত বছরে শ্রমিক-কৃষকেরা কঠোর পরিশ্রম করে দেশকে দাঁড় করিয়েছে। কৃষক-শ্রমিকদের দাবি দাওয়া প্রতিষ্ঠিত হবে।"

১ জুন সিলেটে তিনি বলেন, "আমরা সেই গণতন্ত্রকেই সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যার শক্ত ভিত্তি থাকবে জনগণের মধ্যে এবং জনগণের কল্যাণ ও সমদ্ধি সুনিশ্চিত করবে। গণতন্ত্রকে যারা তাদের ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহার করতে চায় জনগণের গণতন্ত্র হবে তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। জনগণ আজ আর সে ধরনের কোন রাজনীতি ও গণতন্ত্র চায় না যাতে লুটতরাজ, অস্ত্রের ব্যবহার, জাতীয় সম্পদের পাচার এবং নিষ্পাপ মানুষের উপর নির্যাতন চলে। দেশের মানুষ শান্তি চায়, নিরাপত্তা চায়, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি চায়। দেশের জনগণ যে স্বাধীনতার জন্য অসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষা সহ্য করেছেন তাদের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের জন্যই আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুদৃঢ় করতে চাই। জনগণের কল্যাণ ও দেশের দ্রুত অগ্রগতির জন্য জনগণের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনকারী গণতন্ত্রকে আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। জনগণ আর লুটতরাজ, অস্ত্র প্রয়োগ, জাতীয় সম্পদ পাচার, নিরীহ মানুষের উপর নির্যাতনে রাজনীতি ও গণতন্ত্র চায় না। গণতন্ত্রকে এমন দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে হবে, যাতে আমরা আর হুমকি না শুনি। জনগণ শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা চায়। স্বাধীনতার জন্য তারা ব্যাপক ত্যাগ স্বীকার করেছে। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আমরা জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে আরো জোরদার করতে চাই।' *(আমি জিয়া বলছি, সংকলনে আজাদ সুলতান, জাতীয়তাবাদী কর্মী শিবির, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)*

১৯৭৮ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে জনগণের সরাসরি ভোটে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে জিয়াউর রহমান সেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর বিপরীতে প্রার্থী ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের প্রার্থী মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এমএজি ওসমানী। জিয়া দেশের জনগণের শতকরা ৭৭% ভোটে জয়লাভ করেন এবং তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী ২২% ভোট পান। এতে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা প্রমাণিত হয় এবং জিয়া তৃতীয় বিশ্বে একজন গণতান্ত্রিক নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন। পণ্ডিত নেহেরুর পরে একমাত্র জিয়াই এ উপ-মহাদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনতার রায় নিয়েছেন বলে রাজনৈতিক মহল ও বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বাস করতে শুরু করেন।

-০-

www.pathagar.com

জিয়ার মন্ত্রিপরিষদ

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ২৯ জুন ২৮ সদস্যের একটি মন্ত্রিপরিষদ ও দু'জন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী) প্রধান জনাব মশিয়ুর রহমান যাদু মিয়া মন্ত্রিসভায় একমাত্র সিনিয়র মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। অন্য মন্ত্রীরা হলেন-

(১) এম এন হুদা (সাবেক পরিকল্পনা উপদেষ্টা),
(২) প্রফেসর শামস উল হক (সাবেক পররাষ্ট্র উপদেষ্টা),
(৩) শাহ্ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান (সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ),
(৪) কাজী আনোয়ারুল হক (সাবেক স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা),
(৫) আজিজুল হক (সাবেক কৃষি উপদেষ্টা),
(৬) এস এম শফিউল আযম (সাবেক পাট উপদেষ্টা),
(৭) আবদুল মোমেন খান, (সাবেক খাদ্য উপদেষ্টা),
(৮) মেজর জেনারেল (অবঃ) মাজেদুল হক (সাবেক যোগাযোগ উপদেষ্টা),
(৯) ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী (সভাপতি, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি),
(১০) বি এম আব্বাস এটি (সাবেক বন্যা নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা),
(১১) লেঃ কর্নেল (অবঃ) এ এস এম মুস্তাফিজুর রহমান (সাবেক উপদেষ্টা),
(১২) রসরাজ মণ্ডল (সভাপতি, বাংলাদেশ তফসিলী ফেডারেশন),
(১৩) এস এম সাইফুর রহমান (সাবেক বাণিজ্য উপদেষ্টা),
(১৪) অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী (সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা),
(১৫) কাজী জাফর আহমদ (সাধারণ সম্পাদক, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি),
(১৬) শামসুল হুদা চৌধুরী (সাবেক তথ্য উপদেষ্টা),
(১৭) ক্যাপ্টেন (অবঃ) নূরুল হক (সাবেক জাহাজ চলাচল উপদেষ্টা),
(১৮) এ জেড এম এনায়েত উল্লাহ খান (সাবেক ভূমিরাজস্ব উপদেষ্টা),
(১৯) ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ (সাবেক ডাক, তার ও টেলিফোন উপদেষ্টা),
(২০) এস এ বারি এটি, (সেক্রেটারী, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ভাসানী)
(২১) ড. আমিনা রহমান (জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল-জাগদল),
(২২) মীর্জা গোলাম হাফিজ,
(২৩ কে এম ওবায়দুর রহমান,
(২৪) আবদুল আলীম (বাংলাদেশ মুসলিম লীগ),
(২৫) হাবীবুল্লাহ খান,
(২৬) আবদুর রহমান (বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ভাসানী)।

প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ১. ডক্টর ফসিহ উদ্দীন মাহতাব (সাবেক সরকারি উপদেষ্টা) ও ২. ডাঃ এম এ মতিন। সংবিধানের ৫৮ নং অনুচ্ছেদের ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট এই ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। উপদেষ্টাদের মধ্য থেকে এই মন্ত্রিসভায় যারা বাদ পড়েন তারা হলেন, ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ, মিসেস বিনীতা রায়, সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ মুজাফফর আহমদ, আশফাক হোসেন খান, এয়ার ভাইস মার্শাল এ.জি. মাহমুদ, জাকারিয়া চৌধুরী ও এম আর খান।

www.pathagar.com

বি.এন.পি গঠন ও সাংবাদিক সম্মেলন

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর জিয়া উপলব্ধি করলেন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টকে একটি রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করতে হবে। কারণ অতীতে ফ্রন্ট সরকারের অভিজ্ঞতা বড়ই করুণ ও বড়ই বেদনাদায়ক। দ্বিতীয়ত, দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে জাতীয় আদর্শভিত্তিক এবং স্বাধীন দেশের ও জনগণের অবস্থা ও মন-মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতিপূর্ণ রাজনৈতিক দলের যে শূন্যতা বিরাজ করছে তা কোন রাজনৈতিক ফ্রন্ট বা ফ্রন্টের সরকার দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়-এই বাস্তব অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, অনুভূতি, বিশ্বাস নিয়ে তিনি ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর (শনিবার) সন্ধ্যার পর এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।

দল গঠনের প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করে প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, "জাতীয় ঐক্যের অভাব, বিশেষত দেশপ্রেমিক শক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা ও মৌলিক ঐক্যবোধের অভাব বাংলাদেশের মত আপাত দারিদ্র্য অথচ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রকে সহজেই বৈদেশিক আধিপত্যবাদ এবং আভ্যন্তরীণ বিধ্বংসী প্রক্রিয়ার শিকারে পরিণত করতে পারে। কয়েক বছর আগের ইতিহাস এই বিশ্লেষণে সত্যতাকে প্রমাণ করছে।"

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জিয়া দেশের তৎকালীন অবস্থা ও নতুন দল গঠন সম্পর্কে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। সেই সাংবাদিক সম্মেলনের বিস্তারিত প্রতিবেদন ২ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্র থেকে প্রাপ্ত তার নানা প্রশ্নের জবাব ছিল এরূপ-

প্রশ্ন ঃ দেশে কয়টি রাজনৈতিক দল থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

জিয়া ঃ আপনারাই বলে দিন।

প্রশ্ন ঃ আপনার অনুপ্রেরণায় জাগদল হয়েছিল। আপনার অনুপ্রেরণায় জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট হয়েছিল। তারপর আবার নতুন দল করলেন কেন?

জিয়া ঃ নির্বাচনের পর আমরা বেশ কয়েকবার আলাপ-আলোচনা করেছি। তারপর একটা ব্যাপকভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন করাই শ্রেয় মনে করলাম, যাতে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায়।

প্রশ্ন ঃ আপনার দল বামপন্থী না ডানপন্থী?

জিয়া ঃ যারা ডান-বাম, তারাই তাদের মত ব্যাখ্যা দিতে পারেন। আমরা দল করেছি জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে; আমরা কাজ চাই, উন্নয়ন চাই। সর্বাধিকসংখ্যক লোক দলে এনে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়তে চাই।

প্রশ্ন ঃ বাকশালী নেতাদের কি আপনার দলে নেবেন?

জিয়া ঃ না।

প্রশ্ন ঃ আপনার দল আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিস্তার রোধের জন্য কাজ করবে বলে ঘোষণাপত্রে লেখা হয়েছে। বাংলাদেশের উপর এখনও কি আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের প্রভাব রয়েছে?

জিয়া ঃ ভবিষ্যৎ প্রভাব খাটানোর চেষ্টা হতে পারে। এজন্যই লিখেছি।

প্রশ্ন ঃ ক্ষমতাসীন দলে যোগদানের হিড়িক অতীতে দেখা গেছে। আপনার দলেও অনুরূপভাবে যোগদানের হিড়িক পড়লে কি করবেন?

www.pathagar.com

জিয়া ঃ কারা দলে আসতে পারবেন, কারা পারবেন না, তা বলা হয়েছে। আপনারা এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন ঃ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও অধিকার সম্পর্কে আপনার দলের বক্তব্য কি?

জিয়া ঃ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও অধিকার মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ঃ আপনি সেনাবাহিনীর আইন সংশোধন করে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সেনাবাহিনীর প্রধান থাকা অবস্থায়ই আবার নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করলেন-এভাবে কি সমস্ত সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে জড়িয়ে ফেলছেন না?

জিয়া ঃ আমি সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নির্বাচন করিনি। তাছাড়া আমি এখন সেনাবাহিনীর প্রধান নই। প্রেসিডেন্ট হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

প্রশ্ন ঃ রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য জাগদল করা হয়েছিল, রাজনৈতিক শূন্যতা দূর করার জন্য ফ্রন্ট করা হয়েছিল। এবারও কি সেই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্যই নতুন দল করা হল?

জিয়া ঃ রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের কথা আমি কোথাও বলিনি।

প্রশ্নঃ সংসদে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার দাবি করলে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে তখন আপনার কি অবস্থা হবে?

জিয়া ঃ আইন অনুসারে যা হবে তা মেনে নেব।

প্রশ্ন ঃ স্বাধীনতার পর পাকিস্তানি সৈন্যদের পরিত্যক্ত বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ভারতীয় সৈন্যরা নিয়ে গেছে। অতীত সরকারের কাছে এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

জিয়া ঃ বেশ কিছু পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ফেরত আনা হয়েছে, যা কিছু বাকি আছে তা ফেরত আনার চেষ্টা চলছে।

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে অস্ত্র সংগ্রহের প্রতিযোগিতা চলছে-এ পরিস্থিতিতে আমাদের মত ছোট দেশের অবস্থা কি?

জিয়া ঃ আমরা আগের মত দুর্বল নই। শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলছি। আশা করি, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার হবে।

প্রশ্ন ঃ একটি নতুন রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে অন্য দলগুলোর প্রতি আপনার বাণী কি?

জিয়া ঃ আসুন, আমরা সবাই দেশের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য একসাথে কাজ করি।
(সূত্রঃ দৈনিক বাংলা, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

অবশ্য এই দল গঠন নিয়ে অনৈক্যের কারণে ইউপিপি সভাপতি ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী বিএনপিতে যোগ দিলেও দলের সাধারণ সম্পাদক কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বে একটি অংশ তাতে যোগ দেয়নি। মাওলানা মতিনও তার লেবার পার্টির একাংশ নিয়ে ফিরে যান। এভাবেই শুরু হয় বিএনপির পথচলা।

জাতীয়তাবাদী দলের ঘোষণাপত্র পর্যালোচনা করলেই তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও দর্শন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হবে। উক্ত ঘোষণাপত্রে বলা হয়-

১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অনুপ্রাণিত ও সংহত ইস্পাত কঠিন গণঐক্য;

২. জনগণভিত্তিক গণতন্ত্র ও রাজনীতি এবং

৩. ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত জনগণের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে লব্ধ জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তি, আত্মনির্ভরশীলতা ও প্রগতি। সুদৃঢ় এবং অভেদ্য জাতীয় ঐক্যবোধ এবং জাতীয়

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা না থাকলে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের গ্রাস থেকে জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করা দুঃসাধ্য। ঐতিহাসিক মুক্তি সংগ্রামের সোনালী ফসল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আমাদের পবিত্র আমানত এবং অলঙ্ঘনীয় অধিকার। প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাতৃভূমির এই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করে রাখাই হচ্ছে আমাদের কালের প্রথম ও প্রধান দাবি। বিবর্তনশীল ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত গণচেষ্টা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কালজয়ী রক্ষাকবচ, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অতন্দ্র প্রহরী.....।' *(সূত্রঃ দেশ জনগণ জিয়াউর রহমান, শেখ শওকত হোসেন নিলু, নভেম্বর, ১৯৮৪)*

জিয়াই এই উপমহাদেশের প্রথম রাজনীতিজ্ঞ যিনি বিকাশমান রাজনৈতিক প্রয়োজনে দল গঠনে অতীতের গতানুগতিকতা পরিহার করে দলকে গতিশীল, যুগের উপযোগী করে তোলার জন্য কাঠামোগত পরিবর্তন করেন। তাই তিনি জাতীয়তাবাদী দলের একটি সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটি 'স্ট্যান্ডিং কমিটি' গঠন করেন। জাতীয়তাবাদী দল যাতে একটি সুবিধাভোগী চরিত্রের শ্রেণী বা গোষ্ঠীর আখড়ায় পরিণত না হয়, দল যাতে সমাজের সকল শ্রেণীর সমস্যা ও তার সমাধানে যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় এজন্য পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্ব রাখার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করেন। এজন্য পার্টিতে অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, মহিলা, যুব মহিলা, জেলে, তাঁতি, মাঝি, শিশু, কিশোর সংগঠন গড়ে তোলেন। অতীতে এদেশের কোন রাজনৈতিক দলের কাঠামোতে এরকম পেশাজীবীদের অধিকার, প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করা হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। একে রাজনৈতিক দলের কাঠামোগত বিপ্লব বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

১৯৭৮ সালের (শেষার্ধে) বাকশালীরা চেয়েছে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচারণা চালিয়ে ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সত্যকে মুছে দিতে। তারা চেয়েছে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে তাদের বস্তাপচা রাজনীতি-যারা একনায়কত্ব তৈরি করেছিল দেশে, যারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেছিল, যারা দুর্নীতির ফাঁকে দেশকে ডুবিয়ে দেয়ার উপক্রম করেছিল তারাই আবার লজ্জাহীনভাবে তুলেছে গণতন্ত্রের শ্লোগান। দেশের সর্বস্তরের মানুষ যে পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে সে পরিবর্তনকে তারা করতে চেয়েছে অস্বীকার। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ সে ফাঁদে পা দেয়নি।

বিএনপি গঠনের সাড়ে ৫ মাসের মধ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে বিএনপি সংসদের ৩শ' আসনের মধ্যে ২শ' ৫টিতে জয়ী হয়। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ৩৯ টি আসন। মুসলিম লীগ ও জামায়াতের মিলিত জোট পায় ২০টি আসন। শাহ্ আজিজুর রহমান বিএনপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় ১৯৭৯ সালের ১৪ মার্চ বিএনপি সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী সংসদে পাস করে। যার ফলে সংবিধানে জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজিত হয়, চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'-এর নীতি প্রতিস্থাপিত হয়। একদলীয় বাকশালের পরিবর্তে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠনের পথ উন্মুক্ত হয়। এই নির্বাচনের পরপরই আওয়ামী লীগসহ সহযোগী দলগুলো সরকারের বিরোধী কার্যক্রম শুরু করে। পরে ১০ দলীয় জোট গঠন করে।

-০-

www.pathagar.com

জিয়া হত্যাকাণ্ড

রাষ্ট্রপতি জিয়ার সুনাম ছিল একজন ধীরস্থির প্রশাসক হিসেবে। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাঁর আমলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। ব্যক্তি হিসেবে জিয়ার সততার সুনাম লোকের মুখে মুখে ফিরতো। জিয়াউর রহমানের প্রশ্নাতীত ব্যক্তিগত সততার অজস্র প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত ছিল। জিয়া নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হওয়ায় দেশের রাজনৈতিক শিবির থেকে তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারে কোনদিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েনি। জিয়া খুবই জনপ্রিয় রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তার কারণে জিয়া নিজেই পাওয়ার স্ট্রাকচার হয়ে পড়েন। অনেকেরই প্রশ্ন, পাওয়ার স্ট্রাকচারই কি জিয়ার মৃত্যুর কারণ? জিয়ার ক্ষমতারোহণের পর থেকে ১৭টি অসফল অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ঘটেছে। প্রতিটি অভুথ্যান-প্রচেষ্টারই টার্গেট ছিলেন জিয়া। ক্ষমতায় স্থির একজনকে সরিয়ে দিতে পারলে বা খতম করতে পারলেই যখন ক্ষমতা হাতের মুঠোয় এসে যেতে পারে, তখন এহেন প্রচেষ্টা হওয়াই স্বাভাবিক। জিয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ড সেই গুঞ্জনকেই সত্য প্রতিপন্ন করলো।

জিয়া ২৯ মে চট্টগ্রামে আসেন দু'দিনের সফরে। অনেকের মতে, তাঁর এই সফর ছিল বিএনপি'র আভ্যন্তরীণ কোন্দল মীমাংসার উদ্দেশ্যে। জিয়ার চট্টগ্রাম সফরের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে নানা কথা বলাবলি হচ্ছিল। ১৯৭৯ সালে বিএনপি'র চট্টগ্রাম শহর শাখা কমিটি গঠন করা হলে সাধারণ কর্মীরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ইতিপূর্বে চট্টগ্রামে উক্ত দু'দল কর্মীর মধ্যে বেশ ক'বার বড় রকমের মারপিটও হয়েছিল। সম্প্রতি বিএনপি থেকে দুর্নীতিবাজদের বহিষ্কার শুরু হলে বিরোধ আরও চরমে ওঠে। জিয়া চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন মূলত বিএনপি'র শহর শাখার মতবিরোধ মেটাতে।

কারো কারো মতে, রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে মঞ্জুরের দীর্ঘদিনের মতবিরোধ ছিল। এ ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত ফয়সালা করার জন্য রাষ্ট্রপতি চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। শোনা যায়, এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম সেনানিবাসস্থ কতিপয় সামরিক কর্মকর্তার সাথে তিনি এক বৈঠকেও বসেছিলেন। একটি বিশেষ মহল বলেছেন, রাষ্ট্রপতি জিয়া মঞ্জুরকে বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ফলে মতবিরোধ চূড়ান্ত রূপ নেয়। ৪ জুনের দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি খবরে দেখা গেছে, রাষ্ট্রপতি নিহত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার পরপরই বিদ্রোহীদের একটি দল সার্কিট হাউসে আসে এবং রাষ্ট্রপতির কক্ষে একটি 'সিক্রেট প্ল্যান' খোঁজার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়।

জিয়ার সঙ্গে বিএনপি'র সেক্রেটারী জেনারেল প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরীও ছিলেন। ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১৬ জন। কর্নেল এহসান, ক্যাপ্টেন হাফিজ, একান্ত সচিব কর্নেল মাহফুজ উঠেছিলেন সার্কিট হাউসে। এছাড়াও সার্কিট হাউসে ছিলেন জনশক্তি ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ মহিবুল হাসান, মহিলাবিষয়ক মন্ত্রী ৬৫ বছর বয়স্কা ড. আমেনা রহমান। জিয়া ও সফরসঙ্গীদের বিমানবন্দরে জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানান। তখন মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরকে দেখা যায়নি। বিমানবন্দর থেকে রাষ্ট্রপতি সদলবলে সরাসরি চলে যান সার্কিট হাউসে। দলীয় কোন্দল নিরসনের জন্য রাষ্ট্রপতি স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং-এ বসেন। জেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তারা যারা প্রোটোকলের দায়-দায়িত্ব পালন করেছিলেন, রাষ্ট্রপতি তাঁদের বলেন, সার্কিট হাউসে

www.pathagar.com

অপেক্ষা করার দরকার নেই। তবু তারা ছিলেন। স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিংয়ের পর রাষ্ট্রপতি চন্দ্রপুরা মসজিদে জুমার নামায পড়েন এবং আমানত শাহ-এর দরগা জিয়ারত করেন।

বিকেল ৫-২০ মিনিট থেকে ৬-৪৫ মিনিট পর্যন্ত মিটিং করেন বুদ্ধিজীবী, স্থানীয় সাংবাদিক, এডভোকেট এদের সঙ্গে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও ঐ মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। এই মিটিং-এ জিয়া বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে বুদ্ধিজীবীদের তাঁর দলে যোগদানের আহ্বান জানান। তাঁর দলে যে 'কিছু' বাজে লোক রয়েছে তাদের খুঁজে বের করার এবং বহিষ্কারের কথা বলেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও বলেন। জীবনের শেষ অপরাহ্নে জিয়া সার্কিট হাউসে বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা আমাদের অনেক দিয়েছেন, এগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে এদেশ বিশ্বের অন্যতম সেরা দেশ হিসেবে পরিণত হবে।'

এই দীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি ক্ষমতায় আসার পটভূমি, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন, বৈদেশিক সাহায্য, মূল্য বৃদ্ধির কারণ, চট্টগ্রামের উন্নয়ন, শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ, জন্মনিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক, দলনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, তালপট্টি, সংবাদপত্র প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এ সমাবেশে জিয়া অত্যন্ত নম্রভাবে সরল মনে অকপটচিত্তে, নীচু স্বরে অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে অনেক বিষয়ের উপর তাঁর চিন্তাধারা ও দর্শন তুলে ধরেন। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন।

সারাদিনের মধ্যে জুমার নামায পড়া এবং আমানত শাহ'-এর দরগা জিয়ারতের জন্য একবারমাত্র বাইরে যাওয়া ছাড়া আর কোথাও যাননি। একফাঁকে (২৯ মে) জিয়া টেলিফোন করেছিলেন চট্টগ্রাম জেলা বিএনপির সমন্বয়কারী কর্মকর্তা আব্দুর রশীদের বাসায়। এটাই তাঁর সর্বশেষ টেলিফোন। রাত সাড়ে এগারোটায় রাষ্ট্রপতি নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটিতে অবস্থিত আব্দুর রশীদের বাসায় (২১০৮৭৪ নাম্বারে) ফোন করেন। টেলিফোন ধরেন আব্দুর রশীদের পিয়ন সুলতান আহমদ। রাষ্ট্রপতি গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিডিসি সাহেব বাসায় আছেন?' প্রথমে সুলতান আহমদ ভড়কে যান। জিয়া দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। সুলতান উত্তর দিলো, 'জ্বী না, উনি আজ রাতের ট্রেনে ঢাকা গেছেন।' জিয়া এবারে নরম গলায় বললেন, 'কি ভয় পেয়েছো?' সুলতান বললো, 'জ্বী-না স্যার।' জিয়া টেলিফোন রেখে দেন। শেষ ফোনটি করেন ঢাকায় তাঁর স্ত্রীর কাছে। স্ত্রীকে তিনি বলেন 'আমি ভাল আছি, তোমরা?'

জিয়াকে হত্যা করার জন্য যে গ্রুপটি গঠিত হয় তার সদস্যসংখ্যা হয়েছিল ২০। সদস্যরা সবাই সামরিক বাহিনীর অফিসার ছিলেন। জিয়ার হত্যাযজ্ঞের নীল নকশা প্রণয়নের চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কালুরঘাটের কোন এক গোপন স্থানে। সময় ছিল ২৯ মে'র মধ্যরাত। হামলাটি অত্যন্ত পরিকল্পিত ছিল। হত্যাকাণ্ড সমাধান করে সার্কিট হাউস চত্বর ত্যাগ করতে গ্রুপটি দশ মিনিটের বেশি সময় নেয়নি। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে ৩০ মে'র ভোর আনুমানিক পৌনে চারটার দিকে কিলিং স্কোয়াড সার্কিট হাউসের সন্নিকটবর্তী স্থান স্টেডিয়ামে সমবেত হয় এবং সার্কিট হাউস লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড মর্টারের গোলাবর্ষণ করে। এর পরপরই তিনটি পিক-আপ ভ্যানসহ আততায়ী গ্রুপের দুটো জীপ সার্কিট হাউসের প্রধান ফটকের দিকে গুলিবর্ষণ করতে করতে ছুটে আসে। আততায়ী গ্রুপটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এক গ্রুপের কাজ ছিল রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করা। অপর

www.pathagar.com

গ্রুপের কাজ ছিল প্রতিরোধকে শক্ত হাতে প্রতিহত করা। গ্রেফতারকৃত কর্নেল ফজলে হোসেন এবং ক্যাপ্টেন জামিলের স্বীকারোক্তিতে জানা গেছে, হত্যাযজ্ঞে সাধারণ সৈনিকদের কোনো ভূমিকা ছিল না। জিয়া হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক হিসেবে জেনারেল মঞ্জুরকে তখন চিহ্নিত করা হয়। চট্টগ্রাম সেনানিবাসের প্রধান হিসেবে তিনি তখন কর্মরত ছিলেন। ফলে যেহেতু সেনা বিদ্রোহীদের হাতে জিয়ার মৃত্যু ঘটে সেহেতু দায়-দায়িত্ব তার ওপরেই বর্তানোর কথা। তবে এখন অনেকে মনে করেন মঞ্জুরকে জালে আটকানো হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে গ্রেফতার হওয়ার পর তাকে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডের পর সংবাদপত্রে লেখা হয়, মঞ্জুরের এ মতিভ্রম ঘটলো কেন? যুদ্ধের সময় যে লোকটি সপরিবারে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিলেন সেই লোকটি এহেন সর্বনাশা পথ কেন বেছে নিলেন? এর পেছনে কি কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছে? মঞ্জুর মাওবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন? 'বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস' এ থিউরী কি মূলত তার মাথাটি খেয়েছে?

সেদিন রাত ১টার পর চট্টগ্রামে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হয়। রাত সাড়ে বারোটা থেকে ১টা পর্যন্ত কর্নেল মাহফুজ, রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সচিব আমিনুর রহমান, কর্নেল আহসান প্রমুখরা কফি খান। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর যে যার ঘরে চলে আসেন ঘুমাতে। রাত ৩-৪০ মিনিটের দিকে ভারি গোলাগুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে যায় তাঁদের। প্রাণভয়ে তারা যে যার খাটের নিচে লুকিয়ে পড়েন। মিনিট পাঁচেক প্রচণ্ড গোলাগুলি চলে। আধ মিনিটের বিরতি। আধ মিনিটের বিরতির পর আবার গোলাগুলি শুরু হয়। এরপর সব চুপচাপ। চারটার পরে গার্ড রেজিমেন্টের একজন সিপাই খালি পায়ে এসে আমিনুর রহমানকে জানালো, রাষ্ট্রপতি মারা গেছেন। আমিনুর রহমান ছুটে আসেন ৪ নম্বর ঘরের দিকে। এসেই দেখলেন রাষ্ট্রপতি জিয়ার মৃতদেহ পড়ে আছে অর্ধ উপুড় অবস্থায়। ডানহাত উপরে ছাদে ওঠার সিঁড়ির দিকে। বাঁ হাত পেছনে। শরীরের ডানদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শরীর ইত্যবসরেই শক্ত হয়ে গেছে। তিনি দোয়া-কালাম পডলেন। হঠাৎ নজরে পড়লো, রাষ্ট্রপতির বাঁ চোখ কোটর থেকে ছিটকে বের হয়ে পড়েছে। এটা দেখে আমিনুর রহমান বিকট চিৎকার করে ওঠেন। গার্ড রেজিমেন্টের সেই সিপাইটি বলে ওঠে, 'চেঁচাবেন না স্যার, ওদের কেউ থাকতে পারে।'

রাষ্ট্রপতির ঘরের উল্টো দিকের ঘরে ছিলেন অধ্যাপক বি চৌধুরী ও প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ মুহিবুল হাসান। তাঁদের বের হয়ে আসার জন্য ডাকাডাকি করা হয় এবং রাষ্ট্রপতি নিহত হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়। কিন্তু তাঁদের ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। তখন রাষ্ট্রপতির ঘর থেকে ইন্টারকমে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট পর অধ্যাপক বি চৌধুরী বের হয়ে আসলেন। রাষ্ট্রপতির মৃত্যু সংবাদ ঢাকায় কিভাবে ঘোষণা করা হবে এবং রাষ্ট্রপতির মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অধ্যাপক বি চৌধুরীকে অনুরোধ করা হয়। ঘটনার এই পর্বটি ঘটে সকাল ৫টার দিকে। সার্কিট হাউস থেকে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ক্যান্টনমেন্টে লাইন চাওয়া হয়। লাইন না পেয়ে এসটিডিতে বঙ্গভবনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। রাষ্ট্রপতির মৃতদেহ ঢাকায় নিয়ে আসার জন্য হেলিকপ্টার পাঠাতে বলা হয়। হেলিকপ্টার পাঠানো হচ্ছে জানিয়ে টেলিফোন কথাবার্তা শেষ হয়।

সকাল ছ'টার দিকে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার কিছু পুলিশসহ সার্কিট হাউসে আসেন। জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তারাও আসেন। সবাই হেলিকপ্টারের জন্য

www.pathagar.com

অপেক্ষা করতে থাকেন। সময় বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কপ্টার আসছে না। তখন সময় সোয়া ৭টা হবে। অধ্যাপক বি চৌধুরী বিএনপির অফিসে যাবেন বলে ডিসি'র কাছে গাড়ি চান। ডিসি তাঁকে একটা গাড়ি নিয়ে যেতে বলে দোতলার দিকে উঠে আসেন। কোন গাড়িটা নেবেন বুঝতে না পেরে অধ্যাপক বি চৌধুরী ও সৈয়দ মুহিবুল হাসান খালি পায়ে, আলুথালু পোশাকে হেঁটেই রওয়ানা হন। আমিনুর রহমান এর মধ্যেই কমিশনারকে একটা গাড়ি দিতে বলেন। কপ্টার আসছে না এবং যে কোন সময় ঘটনা সংগঠনকারীরা আবারো আসতে পারে বলে সবাই সার্কিট হাউস ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অধ্যাপক বি চৌধুরী ও তার সঙ্গী হেঁটে চলে যাচ্ছেন দেখে ডিসি তাঁদের জন্য একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেন। ৮টার দিকে দু'ট্রাক ভর্তি মিলিটারী সার্কিট হাউসের পাশ দিয়ে চলে যায়। কর্নেল মাহফুজ ও রাষ্ট্রপতির মেডিকেল অফিসার চট্টগ্রামের কমিশনারের বাড়িতে চলে আসেন। কমিশনারের বাড়ি থেকে ১১ টার দিকে তাঁদের আর্মি ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তারা আত্মসমর্পণের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বন্দি ছিলেন। এভাবে সার্কিট হাউস সকাল ৮টার মধ্যে জনশূন্য হয়ে যায়। বাইরে শুধু থাকে পুলিশের প্রহরা। সকাল ৮টা ৩০/৪৫ মিনিটে একটা মাইক্রোবাস, একটা জীপ ও একটা পিক-আপ সার্কিট হাউসে প্রবেশ করে। মাইক্রোবাসে ছিল ৪/৫জন, জীপে আনুমানিক ১০ জন এবং পিকআপে শুধুমাত্র ড্রাইভার। এরা প্রহরারত পুলিশকে কিছু বলেননি। অনুমান করা হয়, পিক-আপ করেই রাষ্ট্রপতি এবং কর্নেল আহসান ও ক্যাপ্টেন হাফিজের মৃতদেহ সরিয়ে নেয়া হয়। এই মোটরযান তিনটি ৪৮ ঘণ্টা অবরুদ্ধ চট্টগ্রামে ঘোরাঘুরি করেছে। সকাল ৯টা ২০ মিনিটের দিকে দু'ট্রাকে ভর্তি সৈন্য সার্কিট হাউসে আসে। এই বিদ্রোহী সৈন্যদের দখলেই ছিল চট্টগ্রাম ৪৮ ঘণ্টার জন্য।

৩০ মে সকাল থেকে ১ জুন সকাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম-ঢাকার মধ্যে একমাত্র সিআরবি ও কমলাপুর রেল স্টেশনে রেডিও-টেলিফোন যোগাযোগ ছাড়া আর সব রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। ঐ দু'দিন চট্টগ্রামের স্থানীয় টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। ৩০ মে দুপুর তিনটায় বিদ্রোহীরা চট্টগ্রামে প্রথমে কার্ফ্যু জারি করে। ৩১ মে ভোর ৬টা পর্যন্ত কার্ফ্যু বলবৎ ছিল। এ দু'দিন শহরে লোক চলাচল বলতে গেলে ছিলই না। কিছু লোককে আতঙ্কিত অবস্থায় শহর ছেড়ে চলে যেতে দেখা যায়। চট্টগ্রাম বেতারের প্রহরায় নিয়োজিত ছিল বিদ্রোহীদের মাত্র ৬ জন সৈনিক। নন্দন কানন টিএন্ডটি অফিসে ১০ জন ও আগ্রাবাদ টিএন্ডটি অফিসের প্রহরায় ছিল মাত্র ১৫ জন। সন্ধ্যা ৭টার পর শহরে বিপ্লবী পরিষদ ঘোষিত সান্ধ্য আইন কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও রাত ৯টা পর্যন্ত অল্প কিছু লোক রাস্তায় চলাচল করে। এই দু'দিনের ঘটনায় বিদ্রোহী সৈন্যদের তৎপরতা চট্টগ্রামের রাজপথে দেখা যায়নি। এই দু'দিনে কোনো গোলাগুলি শব্দও শোনা যায়নি।

৩১ মে রোববার সকাল ১০ টায় কোর্ট বিল্ডিং-এ জেলা প্রশাসনের সাথে জেনারেল মঞ্জুর একটি মিটিং করেন। মিটিং-এ জেনারেল মঞ্জুর জেলা প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নই, পরিষদের একজন হিসেবে কথা বলছি।' মিটিং-এ তিনি বলেন, 'দেশ থেকে দুর্নীতিবাজদের উৎখাতের জন্য, অর্থনৈতিক অসমতা দূর করার জন্যই এই বিপ্লব করা হয়েছে।' তিনি জেলা প্রশাসনকে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতেও বলেন। প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী পরিষদ কোনো সরকারি সার্কুলার জারি করেনি। এ মিটিং চলাকালে রেডক্রস প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতির লাশ ফেরত চেয়ে রেডক্রস চেয়ারম্যানের একটি চিঠি জেনারেল মঞ্জুর কাছে প্রদান করেন। মঞ্জুর রেডক্রস প্রতিনিধিকে

www.pathagar.com

বলেন, জিয়ার লাশ প্রদানের ক্ষমতা আমার নেই, বিকেলে জেনারেল মঞ্জুর স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। সাংবাদিকদের তিনি স্বাভাবিক কাজকর্ম ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের কাজ চালিয়ে যেতে বলেন।

জিয়ার লাশের দাফন প্রথম করা হয় চট্টগ্রাম থেকে ১৬ মাইল দূরে রাঙ্গুনিয়ার পাহাড়তলী এলাকায়। চট্টগ্রামের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কাছে কাতাল শাহ মাজারের মসজিদে মাত্র ৪০০ গজ দূরে শনিবার দুপুর ১২ টায় দুটো ভ্যান ও ১টি এম্বুলেন্সে করে ৯জন সামরিক বাহিনীর সদস্য গিয়ে ঐ মসজিদের ইমামকে ডেকে নেয়। পথের পাশে থেকে তারা ৩ জন শ্রমিককে নেয় মাটি খোঁড়ার জন্যে। উক্ত মসজিদের ইমামকে দিয়ে জানাযা পড়িয়ে তারা প্রেসিডেন্ট ও দু'জন দেহরক্ষীর লাশ একই সঙ্গে একটি ত্রিপলে মুড়ে কবর দিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ বেসরকারি এতিমখানা সমিতির মহাসচিব মকবুল হোসেনের বক্তব্য ছিল, '১৯৮১ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ২১ মে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাদের রিপ্রেসার কোর্সে আমি অংশগ্রহণ করি। ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শহীদ হন। ২ জুন সন্ধ্যায় মরহুম প্রেসিডেন্টের লাশের পাশে কুরআন শরীফ পড়ার জন্য রিপ্রেসার কোর্সের থেকে ২০ জন ইমামমের একটি দল নিয়ে তেজগাঁও সংসদ ভবনে যাই। আমরা কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। হাজার হাজার লোক ফুলের তোড়া নিয়ে মরদেহ দেখেন। রাত্র ৪টার সময় দেখার কাজ বন্ধ করে সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের ৬ জন সদস্য ও বায়তুল মোকাররমের প্রধান মুয়াজ্জিন শাহ আহম্মাদুল্লাহ আশরাফ ও আমি চট্টগ্রাম থেকে আনা কফিন নিয়ে অন্য একটি কক্ষে যাই। প্রথমে কাপড় তৈয়ারি করা হয়, এরপর সেনা সদস্যরা কফিন খোলেন। আমি মাথার কাছে ও আশরাফ সাহেব পায়ের কাছে। নতুন কফিনে প্রথমে কাপড় তারপর চা-পাতা বিছানো হয়। এরপর ৬ জন সেনা সদস্য কফিন থেকে লাশ তুলে নতুন কফিনে দেন। আমি ও আশরাফ সাহেব মরদেহের উপর কাপড় দিয়ে চা-পাতা দিয়ে ঢেকে দেই। মাথার কাছে নতুন কফিনের কাচ ছিলো। এর নীচে একখণ্ড কাপড় দেয়া হয়। এই কাপড় মানুষ দেখেছে। মরহুমের ডান পাশ ক্ষত-বিক্ষত থাকায় কাউকে দেখতে দেয়া হয়নি। মরহুমের বাম পাশ অক্ষত ছিল। বাম পা গোছানো থাকায় আড়াই গজ কাপড় বেশি লেগেছিল। ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা ও ৬ জন সেনা সদস্যসহ আমরা ২ জন মরহুম প্রেসিডেন্টের লাশ দেখেছি। সকাল ৮টা পর্যন্ত লাশ দেখার জন্য উম্মুক্ত ছিল। সকাল ৮টার সময় মানিক মিয়া এভিনিউতে মরহুমের জানাযার জন্য কফিনে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহত্তম এ জানাযায় প্রায় ৩০ লাখ লোক অংশ নেয়। জানাযা শেষে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টসহ সেনাপ্রধান এরশাদ, জেনারেল ওসমানী, কফিন বহনকৃত সকেটের দুই পার্শ্বে ধরে ধীরে ধীরে মাজারের দিকে আসেন। মাজারের পশ্চিম পার্শ্বে কফিন রাখেন। এ সময় তোপধ্বনি ও বিউগল বাজতে থাকে। মরদেহ কবরে রেখে উপরের কাজ শেষে সামরিক গার্ড অব অনার দেয়া হয়। এরপর দোয়া শেষে লোকজনফিরে যায়। *(জিয়ার মৃত্যু নিয়ে হাসিনার রাজনীতি, জিবলু রহমান, দৈনিক সংগ্রাম, ৭ জুলাই, ২০০২)*

বৃহত্তর চট্টগ্রামের জাগদল-এর প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ও পরবর্তীতে বিএনপি নেতা ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) এমএন ছফার বক্তব্য ছিল, '৩০ মে ১৯৮১ তারিখে দিনের বেলা তিনি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাথে অবস্থান করেন। ঐ দিন শেষ রাতে সার্কিট হাউজে গোলাগুলির খবর পেয়ে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বাধার কারণে ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি। পরে জানতে পারেন যে, জিয়াউর রহমানের লাশ রাঙ্গুনিয়া থেকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে নিয়ে আসা হয়েছে। সেনানিবাসে গিয়ে দেখেন লাখো জনতা সেখানে প্রবেশের চেষ্টা করছে।' ডাঃ ছফা বলেন, 'সে সময়ে তিনি

www.pathagar.com

জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং লাশ সনাক্ত করার জন্য সেনা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেন।' ক্যাপ্টেন ছফা দাবি করেছেন যে, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি চট্টগ্রামের লাখ লাখ লোকের প্রতিনিধি হয়ে সেনানিবাসে শহীদ জিয়ার লাশ সনাক্ত করেন।'

প্রকৌশলী একেএম শোয়েব বাশারী হাবলু বক্তব্য ছিল, '১৯৮১ সালে আমি চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলাম। ৩০ মে সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ছিল আমার ক্লাস টেস্ট পরীক্ষা। ক্লাস টেস্ট থেকে বের হয়ে রেডিওতে শুনতে পেলাম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যু সংবাদ। খবর শোনার পর কলেজের উল্টো দিকে পোমড়া গ্রামে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় যাওয়ার পথে দেখতে পাই ক্যাম্পাসের কিছু দূরে সৈন্য ভর্তি সাঁজোয়া গাড়ি কিছু দূর গিয়ে থেমে যায়। কৌতূহলবশত বিষয়টি দেখার জন্য আমি পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখতে থাকি। লুকিয়ে থেকে দেখতে পাই, প্রথমে তারা এ্যাম্বুলেন্স থেকে ত্রিপলে জড়ানো একটি বস্তু নীচে নামালো। এরপর দু'জন সৈন্য পার্শ্ববর্তী বাজারে চলে যায়। তারা সেখান থেকে দু'জন শ্রমিক নিয়ে আসে। এদের দিয়ে কবর খোঁড়া হয়। এরপর ত্রিপলে জড়ানো বস্তুটি কবর খোঁড়া হয়। এরপর ত্রিপলে জড়ানো বস্তুটি কবরে নামিয়ে মাটি দেয়া শেষে সকলে সেলুট দেয়। এতে আমার মনে সন্দেহ জাগে। সম্ভবত এটিই শহীদ জিয়ার লাশ। এরপর সেখানে চারজন সৈন্যকে পাহারায় রেখে গাড়িগুলো চলে যায়। বিষয়টি আমি কলেজের অন্য ছাত্রদের জানাই এবং রাতে কবর খুঁড়ে লাশ দেখার পরিকল্পনা করি। কিন্তু কবরের পাশে সৈন্যদের পাহারা থাকার কারণে তা করতে পারিনি। পরের দিন মঞ্জুর বাহিনীর পরাজয়ের খবর শুনে পার্শ্ববর্তী রাঙ্গুনিয়া থানায় যাই এবং বিস্তারিত জানাই। পরে একজন এসআইকে সাথে নিয়ে আমি ঘটনাস্থলে যাই এবং পুলিশের নির্দেশে কবর খোঁড়ার আয়োজন করি। এরই মধ্যে ঘটনাটি থানা থেকে চট্টগ্রাম সেনাবাহিনীকে অবহিত করলে ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহ ও লেঃ কর্নেল মাহফুজের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ঘটনাস্থলে আসে। সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে কবর থেকে ত্রিপল দিয়ে মোড়ানো তিনটি লাশ বের করা হয়। এর মধ্যে একটি লাশ ছিল শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের এবং অপর দু'টি হলো লেঃ কঃ আহসান ও ক্যাপ্টেন হাফিজের।

মঞ্জুর সপরিবারে ধৃত হয়েছিলেন ফটিকছড়ি থানার পাইনদং গ্রামে খৈয়াছড়া চা বাগানের এক উপজাতীয় কুলির ঘরে। মঞ্জুরের সাথে ছিলেন তার স্ত্রীসহ চার ছেলেমেয়ে। বড় মেয়েটির বয়স তখন তেরো। কর্নেল দেলোয়ার নামের অপর এক অফিসারের স্ত্রী ও তিন ছেলেমেয়ে মঞ্জুরের সাথে ছিল। ১ জুন বিকেল চারটায় চট্টগ্রাম থেকে ২৪ মাইল দূরে মেজর জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তম পিএসসিকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় মঞ্জুর তার বাচ্চাদের ভাত খাওয়াচ্ছিলেন। এমনি সময় পুলিশের আগমনী সংকেত মঞ্জুরের গৃহকর্তার মুখে টের পান। বাধা দেয়ার অভিপ্রায়ে মঞ্জুরও প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিতৃত্বের টানে মঞ্জুর তার অস্ত্র ফেলে দিয়ে পুলিশের কাছে বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করেন। অত্যন্ত সহজভাবেই মঞ্জুর পুলিশের কাছে ধরা দেন। এর পেছনে কনস্টেবল সুধীরের কৃতিত্ব কম নয়। ফটিকছড়ি থানার কনস্টেবল সুধীরই প্রথম মঞ্জুরকে ধরার জন্য এগিয়ে যান। মঞ্জুর তার দিকে রাইফেল উঁচিয়ে ধরলে সুধীর ত্বরিতগতিতে মঞ্জুরের এক কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। গ্রেফতারকৃত অবস্থায় মঞ্জুরকে সপরিবারে হাটহাজারী থানায় নিয়ে আসা হয় সন্ধ্যার দিকে। খৈয়াছাড়া চা বাগানে মঞ্জুরের আত্মগোপনের খবর প্রথম পান হাটহাজারী থানা কর্তৃপক্ষ। গ্রেফতার অভিযানে যারা ছিলেন তারা হলেন, হাটহাজারী থানার ইন্সপেক্টর কুদ্দুস, উখিয়া থানার সার্কেল ইন্সপেক্টর এম. রব, রিজার্ভ পুলিশের সুবেদার সৈয়দ হোসেন, ডিআইও আকামত আলী, ফটিকছড়ি থানার ওসি আমিনুল হক,

www.pathagar.com

হাটহাজারী থানার ওসি নূর হোসেন, রিজার্ভ পুলিশের সুবেদার সৈয়দ হোসেন প্রমুখ। জনৈক কন্ট্রাক্টরের জীপে করে হাটহাজারী থানায় মঞ্জুরকে সপরিবারে নিয়ে আসা হয়। সোমবার রাত সাড়ে দশটার দিকে পুলিশের কাছ থেকে সেনাবাহিনী মঞ্জুরসহ এগারোজনকে গ্রেফতার করেন। এরা হলেন বেগম মঞ্জুর, তার চার ছেলে-মেয়ে, মেজর রেজা এবং লেঃ কর্নেল দেলোয়ারের স্ত্রীসহ তার তিন শিশু কন্যা। এ সময় পুলিশের আইজি জনাব শাহজাহান উপস্থিত ছিলেন এবং হস্তান্তরের রসিদ নিয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর পক্ষে ক্যাপ্টেন এমদাদ মঞ্জুরসহ এগারোজনকে গ্রহণ করেন রাত আনুমানিক দশটার দিকে। দুটো জীপে অল্প কয়েকজন সৈন্য সমভিব্যহারে ক্যাপ্টেন এমদাদ থানা থেকে সেনানিবাসে যাওয়ার পথে পুলিশের লোকজন সেনানিবাস গেট পর্যন্ত মঞ্জুরের বহনকারীর জীপ ফলো করেছিল। উল্লেখ্য, হাটহাজারী থানা থেকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের দূরত্ব আট মাইল।

পরবর্তীতে প্রচার করা হয়, সেনানিবাসে গমনের পথে একদল বিক্ষুব্ধ সশস্ত্র লোক মঞ্জুরকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে এবং নিরাপত্তা প্রহরীদের সাথে গুলি বিনিময়ের সময় জেনারেল মঞ্জুর নিহত হয়। জেনারেল মঞ্জুরের মৃত্যু নিয়েও সাধারণ মহলের নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। ঘটনাস্থলে তার আরো দু'জন সহযোগী নিহত হন তারা হলেন কর্নেল মতিয়ুর রহমান, ও লেঃ কর্নেল মাহবুবুর রহমান।

৩০ মে ভোরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দুস্কৃতকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রধান নিরাপত্তা অফিসার, প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের একজন অফিসার এবং অপর ১৫ জন সৈনিক প্রাণপণ চেষ্টা করেন। দু'জন অফিসারসহ তাদের ছয়জন শহীদরূপে জীবন উৎসর্গ করেন। তারা চরম বিপদের মুখে তাদের কর্তব্যপরায়ণতা, দেশপ্রেম ও আনুগত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জাতি শ্রদ্ধা ও গৌরবের সাথে তাদের এই ত্যাগ স্মরণ করবে। এই শহীদরা হচ্ছেন

প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল সিকিউরিটি অফিসার লেঃ কর্নেল এ এস এম মঈনুল হাসান,
প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আশরাফুল হাফিজ খান,
প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের নং ৩৯৪০৮৭৭ নায়েক আবু তাহের,
প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের নং ৩৯৫৫৯৯৩ সিপাহী মোহাম্মদ শাহ আলম,
প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের নং ৩৯৭০৩৫৭ সিপাহী আব্দুর রব।

একমাত্র ক্যাপ্টেন হাফিজের লাশ ছাড়া সকলের লাশ পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় ঢাকা সেনানিবাসের গোরস্থানে দাফন করা হয়। তাদের জানাযায় সকল শ্রেণীর সৈনিকরা শরীক হন এবং তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন। ক্যাপ্টেন হাফিজের লাশ জানাযার পর তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

চট্টগ্রামের ঘটনায় সেনাবাহিনীর মধ্যে যাদের গ্রেফতার করা হয় তারা হলেন-মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর, ব্রিগেডিয়ার মহসিন উদ্দিন আহমদ, কর্নেল নওয়াজিশ উদ্দিন, কর্নেল আব্দুর রশীদ, কর্নেল দেলোয়ার হোসেন, লেঃ কর্নেল ফজলে হোসেন, লেঃ কর্নেল মতিউর রহমান, লেঃ কর্নেল মাহবুবুর রহমান, মেজর রেজা, মেজর লতিফুল আলম চৌধুরী, মেজর ফজলুল হক, মেজর মুজিবুর রহমান, মেজর রওশন ইয়াজদানী, মেজর দোস্ত মোহাম্মদ শিকদার, ক্যাপ্টেন গিয়াস, ক্যাপ্টেন মুনির, ক্যাপ্টেন জামিল, ক্যাপ্টেন ইলিয়াস, লেঃ মতি ও লেঃ মোসলেহ।

-o-

www.pathagar.com

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারের দায়িত্বভার গ্রহণ

৩০ মে সকালে জিয়াউর রহমানের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ামাত্র সারাদেশের মানুষ শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। সমগ্র দেশব্যাপী প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। মানুষের বীভৎস চিৎকার, একযোগে গাড়ির হর্ন আর রিকশার ঝনঝনানি। রাস্তা দিয়ে ছুটছে সব ঝড়ের বেগে। সাংবিধানিক শূন্যতা পূরণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(১) ধারার বিধানবলে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মন্ত্রিসভার এক জরুরি বৈঠক সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয় এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। শুধু তাই নয়, জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক বেতার ভাষণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন যে, প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুতে জাতি ৪০ দিনব্যাপী শোক পালন করবে এবং ঐ সময়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

৩০ মে তারিখেই সারা দেশে রাস্তায় রাস্তায় লক্ষ লক্ষ লোকের মিছিল বের হয়। চতুর্দিকে ধ্বনি ওঠে, 'প্রেসিডেন্ট জিয়ার রক্ত বৃথা যেতে দেবো না', 'বাংলাদেশের মহান নেতা জিয়া তুমি বেঁচে রবে' ইত্যাদি। ঐ দিনই সরকারিভাবে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পরদিন প্রেসিডেন্ট জিয়ার জানাযা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ৩১ মে ঢাকা স্টেডিয়ামে লাখো লাখো শোকার্ত মানুষ জানাযায় অংশ নেয়ার জন্য সমবেত হয়। বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান ছিলেন বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ। তিনি চট্টগ্রামের ডিসির কাছে অনুরোধ রাখলেন, 'প্রেসিডেন্ট জিয়ার লাশ ঢাকা রেডক্রস সোসাইটিতে পাঠানোর জন্য অনতিবিলম্বে যেন চট্টগ্রাম রেডক্রস ইউনিটের কাছে হস্তান্তর করা হয়।'

কিন্তু রেডক্রস সোসাইটি চট্টগ্রাম থেকে লাশ আনতে ব্যর্থ হওয়ায় সেদিন ১১ টায় সারাদেশে গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন বায়তুল মোকাররম মসজিদের ইমাম। নামাযে জানাযা শুরুর আগে ইমাম সাহেব সূরা 'আর রাহমান' পাঠ শুরু করলে সমগ্র স্টেডিয়াম জুড়ে এক বেদনা-বিধূর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সূরা 'আর-রাহমান' পাঠ শেষে ইমাম সাহেবের কণ্ঠে মিলিয়ে মানুষের মিলাদ পাঠ শুরু হলে উপস্থিত প্রতিটি মানুষের চোখ অশ্রু সজল হয়ে ওঠে।

মিলাদ শেষে আবেগ জড়িত কণ্ঠে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার বিশাল জমায়েতের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, 'জীবিত অবস্থায় আমাদের প্রিয় রাষ্ট্রপতি জিয়া আপনাদের কাছে কোন দোষ-ত্রুটি করা অস্বাভাবিক কিছু নয়'-অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির এ কথা স্টেডিয়াম ভর্তি লাখ লাখ মানুষ ডুকরে কেঁদে ওঠেন। সবার চোখে অশ্রুর ঢল নামে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকেও প্রবল বৃষ্টি নামে। এই অঝোর বৃষ্টির মধ্যেই জিয়ার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এক বিশেষ মোনাজাতে ক্রন্দনরত লক্ষ লক্ষ মানুষ কামনা করেন মহান নেতার রুহের মাগফেরাত। ঢাকার বায়তুল মোকাররম ছাড়াও ঐদিন বরিশাল, দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, ঘোড়াশালসহ দেশের সর্বত্র জিয়ার গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

১ জুন সেনাবাহিনীর একটি সবুজ রঙের মালবাহী বিমানযোগে প্রেসিডেন্ট জিয়ার লাশ ঢাকায় আনা হয়। বিমানবন্দর থেকে লাশ সরাসরি নেয়া হয় জিয়ার বাসভবনে। লাশ

www.pathagar.com

বাসায় পৌঁছামাত্রই বুকফাটা কান্নায় খালেদা জিয়া কফিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরে লাশ পুরাতন সংসদ ভবনে আনা হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়ার লাশ ঢাকায়-এ খবর রাজধানীতে বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। রাজপথে নামে শোকার্ত মানুষের ঢল। জিগাতলা থেকে দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে হাজারো মানুষ ছুটে চলে পুরাতন সংসদ ভবনের দিকে। যারা ফিরেছেন সবার চোখেই ছিল পানি। স্বজন হারানোর বেদনা। দেশবাসী যাতে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে এক নজর দেখতে পারেন সেজন্য লাশবাহী কফিন ভবনের সদর দরোজায় রাখা হয়। কালেমা পাঠের সাথে চারদিকে বুকফাটা কান্নার রোল। অজোর কান্নায় ভেঙে পড়ছে অনেকেই। কেউ কেউ বুক চাপড়ে মাতম করেছে। অজ্ঞান হয়েছেন অনেকেই। সে কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য। জিয়ার প্রতি মানুষের ভালবাসা কতখানি যে গভীরে পৌঁছেছিল তা সেদিন প্রমাণ পাওয়া গেল। ২ জুন জিয়ার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ভোর হতে শহর-গ্রাম-গঞ্জের লাখ লাখ মানুষ ছুটতে থাকে মানিক মিয়া এভিনিউর দিকে। সমগ্র মানিক মিয়া এভিনিউ, নতুন সংসদ ভবনের পুরো এলাকা, মিরপুর রোড, শুক্রবাদ, কলাবাগান, আসাদ গেট, পুরাতন এয়ারপোর্টের পার্শ্বপথ, রোকেয়া সরণি, এসবের অলিগলি পথ, বাড়ির ছাদ, গাছপালা সমস্ত জায়গায় শুধু মানুষ আর মানুষ। সকাল এগারোটার মধ্যে লাখ লাখ মানুষে সমগ্র বিশাল এলাকাটি ভরে উঠে। তারপরও সীমা-সংখ্যাহীন মানুষ আসতে থাকে। জিয়া ক্ষমতায় থাকাকালীন নতুন সংসদ ভবনের সামনের রাস্তাটির মাঝের প্রশস্ত ডিভাইডার তুলে দিয়ে এবং রাস্তার দু'ধার আরো প্রসারিত করে একে বিশাল এভিনিউতে পরিণত করেন। জাতীয় দিবসের কুচকাওয়াজের মত বিশাল অনুষ্ঠানাদির স্থান হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এমনটি করা হয়েছিল। কে জানতো নিজের হাতে গড়া জাতীয় স্থানটিতে তাঁরই নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে? জানাযার নামাযে লাখ লাখ মানুষ শ্রদ্ধাবনত। মাথার ওপর হেলিকপ্টার ঘুরছে। পর্যবেক্ষণ ও ছবি তোলার কাজ চলছে। জানাযার জন্য জিয়ার কফিনবাহী গাড়ি এভিনিউর পশ্চিম প্রান্তে মিরপুর রোডের সংযোগস্থলের কাছাকাছি রাখা হয়। জানাযার পর তাঁকে চিরদিনের মতো মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। *(সূত্রঃ বাংলাদেশ কেঁদেছিল, সামাদ সরকার, দৈনিক দিনকাল, ৩০ মে, ২000)*

প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করে দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল মহল শোকবাণী প্রদান করেন। মে মাসের ৩০ তারিখেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বাসভবনে যান এবং খালেদা জিয়া ও শোকাভিভূত পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি তাঁর শোক এবং সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছাড়াও পৃথক পৃথকভাবে অন্যান্য যারা শোক প্রকাশ করেন তাঁরা হচ্ছেন, স্পীকার গোলাম হাফিজ, ডেপুটি স্পীকার সুলতান আহমদ চৌধুরী, জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা আসাদুজ্জামান খান এবং মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ৩১ মে এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেন এবং বর্তমান সংকটের মোকাবিলা করার ও তা কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারের প্রতি গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। শেখ হাসিনা দেশের জনগণের প্রতি 'সহনশীলতার সঙ্গে' এই সংকটময় পরিস্থিতির মোকাবিলা করার আহ্বান জানান। তিনি প্রেসিডেন্টের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

www.pathagar.com

শোক প্রকাশ করে অন্যান্যদের মধ্যে বিবৃতি প্রদান করেন জাসদ নেতা মেজর জলিল, আসম আব্দুর রব, মুসলিম লীগ নেতা খান আব্দুস সবুর, সিপিবি প্রধান মণি সিং, ডেমোক্রেটিক লীগ প্রধান খোন্দকার মোশতাক আহমদ, ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, আওয়ামী লীগ (মিজান) প্রধান মিজানুর রহমান চৌধুরী, সাম্যবাদী দলপ্রধান মোহাম্মদ তোয়াহা, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান, সাবেক রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ উল্লাহ, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক হায়দার আকবর খান রনো ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাশেদ খান মেনন, জনমুক্তির পার্টির সভাপতি মাহফুজ ভূঁইয়া, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নূরুজ্জামান বীর উত্তম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটির মাহফুজুর রহমান, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আহমেদ হুমায়ূন ও রিয়াজ উদ্দিন আহমদ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী ও আমান উল্লাহ কবির, জাতীয় জনতা পার্টির প্রধান জেনারেল (অবঃ) এম.এ.জি. ওসমানী, ভাসানী ন্যাপ চেয়ারম্যান নূরুর রহমান প্রমুখ।

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমান সম্পর্কে বহির্বিশ্বের মূল্যায়ন

জিয়ার মৃত্যুতে দেশ-বিদেশের লোকজন গভীর শোকাভিভূত হন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুতে বিশ্বের যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ শোকবাণী পাঠান তা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হলো-

রাণী এলিজাবেথ

বৃটেনের মহামান্য রাণী এলিজাবেথ এক শোক বাণীতে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে আমি স্তম্ভিত ও শোকাহত।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত এক বার্তায় বলেন, 'প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে আমি শোকাভিভূত ও গভীরভাবে মর্মাহত। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁর জনগণের উন্নত জীবনমান অর্জনের জন্য প্রতিশ্রুত ও আইনের শাসনের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তাঁর প্রজ্ঞার অভাব বেদনার সঙ্গে অনুভূত হবে।'

জাতিসংঘ মহাসচিব

অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের নিকট জাতিসংঘ মহাসচিব ড. কুটওয়াল্ড হেইমের প্রেরিত বার্তায় উল্লেখ করেন, 'প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের সংবাদে আমি আতঙ্কিত ও দুঃখিত হয়েছি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ একজন বিজ্ঞ শাসক হারাল, বিশ্ব হারাল একজন প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক।'

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এক শোকবাণীতে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে বাংলাদেশের জনগণ একজন মহান নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক হারাল, যিনি তাঁর দেশে অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সমৃদ্ধির জন নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছেন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মর্যাদা নজিরবিহীনভাবে সমুন্নত করেছেন।'

প্রেসিডেন্ট জিয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ হারুনের নেতৃত্বে পাকিস্তান হতে একটি মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি দল প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আসেন। উক্ত পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের নেতা জানান, 'প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুতে পাকিস্তানি জনগণ হতবাক হয়েছে।' পাকিস্তানি মন্ত্রিবর্গ প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম আফিজা মামদূত জিয়ার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্তব্য করেন, 'প্রেসিডেন্ট জিয়া কোন বিশেষ জাতি বা রাষ্ট্রের নন, তিনি সমগ্র মানব সমাজের সম্পদ।'

সৌদি আরবের বাদশাহ

সৌদি আরবের বাদশাহ খালেদা জিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, 'তাঁর মৃত্যু শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য নয় সৌদি আরব তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য এক বিরাট ক্ষতি।'

www.pathagar.com

গিনির প্রেসিডেন্ট

গিনির প্রেসিডেন্ট আহম্মদ সেকুতুরে তাঁর প্রধানমন্ত্রী ল্যানসনা বিয়াভোগুই এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ তুরেকে জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে শোকবার্তা প্রেরণ করেন। ৮ জুলাই তাঁরা ঢাকায় আগমন করেন। বিয়োভোগুই বিমান হতে অবতরণের অল্পক্ষণ পরেই গিনির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলহাজ্ব আব্দুল্লাহ তুরেক বিমান হতে অবতরণকালে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, 'আর প্রেসিডেন্ট জিয়াকে দেখতে পাব না।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ শামসুল হক তখন তাঁকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করেন (গিনির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এর আগে প্রেসিডেন্ট সেকুতুরের সঙ্গে বাংলাদেশ সফর করছিলেন)। প্রেসিডেন্ট আহম্মদ সেকুতুরের বিশেষ দূত গিনির প্রধানমন্ত্রী জিয়ার মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেন এবং তাঁর চেহলামে যোগদান করেন। ইরাক-ইরান যুদ্ধ অবসানকল্পে গঠিত ইসলামী শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান জিয়ার সম্মানে উক্ত কমিটির বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত করার কথাও বাংলাদেশকে জানান।

মৌরিতানিয়ার প্রেসিডেন্ট

অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের কাছে প্রেরিত শোকবার্তায় মৌরিতানিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ইসলামী দেশ এমন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বকে হারালো, যিনি দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।' মৌরিতানিয়ার প্রেসিডেন্ট তার দেশের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জনগণ ও শহীদ প্রেসিডেন্টের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

কানাডার গভর্নর জেনারেল

কানাডার গভর্নর জেনারেল প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে ট্রুডো ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্ক মাকসুইসেন গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন এবং শোকবার্তা পাঠান। ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, কানাডার সর্বস্তরের জনগণ প্রেসিডেন্ট জিয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডে শোক প্রকাশ করেন। কানাডার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হকের কাছে প্রেরিত এক শোকবার্তায় জিয়ার নির্মম মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন।

নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী আরতি মুলডুন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় গভীর শোক প্রকাশ করেন। বার্তায় তিনি বলেন, তার দেশ জিয়ার নিহত হওয়ার ঘটনায় শোকে আকুল। মুলডুন বলেন, কমনওয়েলথ সম্মেলন জিয়ার উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হবে।

জ্যামাইকার প্রধানমন্ত্রী

জ্যামাইকার প্রধানমন্ত্রী এক বার্তায় প্রেসিডেন্ট জিয়ার মর্মান্তিক ও অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

পোপ জন পল

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডে পোপ জন পল বাংলাদেশের সরকার ও জনগণকে তাঁর গভীর সমবেদনা জানান। তিনি বাংলাদেশের সংকটময় মুহূর্ত কাটিয়ে উঠতে এবং মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করেন।

www.pathagar.com

আলজিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী

আলজিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ মোহাম্মদ বেন আহমদ আবদেল গনি আলজিয়ার্সের বাংলাদেশ দূতাবাসে রক্ষিত শোক বইতে স্বাক্ষর করতে গিয়ে বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যু সংবাদে আলজেরিয়ার সরকার ও জনগণ অত্যন্ত মর্মাহত। তিনি মরহুমের শোকাহত পরিবারের প্রতি তার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কোইন মিতেরাঁ অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেন, 'আমি ফ্রান্সের জনগণের পক্ষে গভীর শোক জ্ঞাপন করছি।'

তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রধান

তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল কেনান জিয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে এক শোকবার্তায় বলেন, 'জিয়ার মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত।' বার্তায় তিনি বলেন, 'জিয়া তাঁর দেশের ও জনসাধারণের শান্তি-সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতির জন্য একজন নিবেদিতপ্রাণ নেতা ছিলেন।' তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী মিঃ বুলেন্দদ খালেদা জিয়ার কাছে তার স্বামীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এক শোকবার্তা পাঠান। বার্তায় তিনি বলেন, জিয়া সত্যিকার একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে দেশে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেছেন।

নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট

নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আলহাজ শেহু সাঘারি অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের কাছে জিয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এক বার্তায় বলেন, তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের বিপুল ক্ষতি হলো।

থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী প্রেম তিন সুলানন্দ প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের কাছে প্রেরিত এক শোকবার্তায় প্রেসিডেন্ট জিয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, জিয়ার হত্যাকাণ্ডে থাইল্যান্ড তার একজন প্রিয় বন্ধুকে হারালো। থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী এয়ার চীফ মার্শাল সিদ্ধি সাতেশিলা পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হকের কাছে প্রেরিত পৃথক শাকবার্তায় জিয়ার দুঃখজনক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

ইন্দোনেশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইন্দোনেশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. আদম মালিক অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের কাছে প্রেরিত এক শোকবার্তায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যার সংবাদে তিনি গভীরভাবে শোকাহত বলে জানান.। আদম মালিক জিয়াকে 'এশিয়ার একজন যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক ও নেতা' বলে আখ্যায়িত করেন। ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোকতার কুসুমাত মাজ্জা পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হকের কাছে প্রেরিত এক শোকবার্তায় জিয়ার নির্মম মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন।

ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি

ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ বাংলাদেশ হাই কমিশন সফর করেন এবং শোক পুস্তকে স্বাক্ষর করেন। জিয়ার শাহাদাতবরণের পর এই পুস্তক হাই কমিশনে রাখা হয়। তিনি মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করেন। এর আগে ভারতের

www.pathagar.com

অসংখ্য নেতা ও ব্যক্তিত্ব এই শোক পুস্তকে স্বাক্ষর করেন। ভারতের যোগাযোগমন্ত্রী স্টিফেন জিয়ার হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছিলেন, মাত্র কয়েকদিন আগে আমি উনার সাথে এক ঘণ্টার জন্য মিলিত হয়েছিলাম। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে মনে হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে আমিই যেন ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। সাবেক শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ শোক পুস্তকে বলেন, আমি এই মহান নেতার কাছ থেকে ভবিষ্যতে আরো অনেক বড় কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম। ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল কৃষ্ণ রাও শোক পুস্তকে স্বাক্ষর করার সময় কেঁদে ফেলেন।

চীনের সহকারী প্রধানমন্ত্রী

চীনের প্রথম সারির নেতারা জিয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পিকিংস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে রক্ষিত শোক বইতে স্বাক্ষর করেন। শোক বইয়ে যারা স্বাক্ষর করেন তাদের মধ্যে চীনের সহকারী প্রধানমন্ত্রী মি. ওয়াং লিং, ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের স্ট্যান্ডিং কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান উই গোয়াগিং, স্টেট কাউন্সিলের সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও পার্টির বৈদেশিক লিয়াজোঁ ব্যুরো প্রধান মি. জিপেংফি, পিপলস লিবারেশন আর্মির সহকারী চিফ স্টাফ মি. জো জিং, বিদেশের সাথে চীনের মৈত্রী সম্পর্কিত সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. হাও ডুং, পিকিংয়ের সহকারী মোর গোয়ো জিয়ানরো এবং চীনের পররাষ্ট্র, বৈদেশিক বাণিজ্য, অর্থনৈতিক এবং শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক সহকারী মন্ত্রীরা রয়েছেন। তারা জিয়ার অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করেন এবং তাঁর এই আকস্মিক দুঃখজনক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১

পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস

ভূমিকা

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা আমরা কিভাবে প্রয়োগ করবো, আমাদের দেশের বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে? মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা হবে 'তীর' যা আমাদের নিক্ষেপ করতে হবে পূর্ব বাংলার বিপ্লবকে নিক্ষেপ করে। যারা আজ লক্ষ্যহীনভাবে তীর ছোঁড়েন, এলোপাথারি তীর ছোঁড়েন, তারা সহজেই বিপ্লবের ক্ষতি করতে পারেন। মার্কসবাদী নামধারী বহু ব্যক্তিই 'এলোপাথারি তীর' ছুঁড়ে সুবিধাবাদী ও প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা পালন করছেন।

সভাপতি মাওসেতুঙ বলেছেন, "অতীতের ভুলগুলো অবশ্যই প্রকাশ করে দিতে হবে। অতীতের খারাপ বস্তুকে বৈজ্ঞানিক মনোভাব দিয়ে বিশেষণ করা ও সমালোচনা করা প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতের কাজ আরো সতর্কভাবে সম্পন্ন করা যায়। এটাই হচ্ছে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যতের ভুল এড়ানোর অর্থ।"

প্রাক 'স্বাধীনতা' কালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি কেন ব্যর্থ হলো উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে এবং উপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে?

'স্বাধীনতা' উত্তরকালে পূর্ব পাকিস্তানি কমিউনিস্ট পার্টি কেন ব্যর্থ হলো উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করে সমাজতন্ত্রের পথ তৈরি করতে? এ ব্যর্থতার কারণগুলো ক্ষমাহীনভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উদ্‌ঘাটন করতে হবে, যাতে একই ভুল ভবিষ্যতে না হয় এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারীরা সক্ষম হন তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে।

সারা দুনিয়ার সর্বহারা এক হও।

প্রাক-স্বাধীনতা কাল

বৃটিশ শাসনকালে ভারতের সামাজিক বিকাশের জন্য নিম্নলিখিত মূল দ্বন্দ্বগুলো দায়ী ছিল ঃ

১। ভারতীয় জনগণের সাথে বৃটিশ উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

২। ভারতের বিশাল কৃষক জনগণের সাথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব।

৩। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব।

৪। ভারতের মুসলিম বুর্জোয়া, সামন্তগোষ্ঠী ও শ্রমিক-কৃষকদের সাথে অমুসলিম বিশেষত হিন্দু, বুর্জোয়া, সামন্তগোষ্ঠী ও শ্রমিক-কৃষকদের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব।

ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী (মুসলিম ও অমুসলিম বুর্জোয়া) নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থেই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার দাবি করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বিকশিত মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী অখণ্ড স্বাধীন ভারতে অপেক্ষাকৃত বিপুলভাবে বিকশিত অমুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী কর্তৃক

www.pathagar.com

বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখতে পায়। তারা নিজেদের বিকাশের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা দাবি করে। এভাবে শ্রেণীস্বার্থ তাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তোলে। একটা পর্যায়ে এ দ্বন্দ্ব বৈরীরূপ নেয় এবং মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য মুসলিম লীগ গঠন করে এবং নিজেদের অবাধ বিকাশের জন্য পৃথক স্বাধীন ভূখণ্ড পাকিস্তানের দাবি করে। মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী তাদের দাবির পেছনে মুসলিম শ্রমিক-কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার জন্য অবৈরী সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সুযোগ নেয় এবং তাদের মাঝে জঘন্য সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্র চালায়। অমুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার মানসে এবং ভারতের মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠীর পাকিস্তান আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য অমুসলিম শ্রমিক-কৃষকদের মাঝে জঘন্য সাম্প্রদায়িক প্রচারণা ও ষড়যন্ত্র চালায় যাতে তারা অমুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়।

বৃটিশ উপনিবেশবাদীরাও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত করে নিজেদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচারণা ও ষড়যন্ত্র চালায়।

এ সকল কারণে বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয় এবং অবৈরী সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বৈরী রূপ নেয়। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বিধাবিভক্তিতে বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার সুবিধা হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের অংশগ্রহণ এবং শ্রমিক-কৃষকদের চেতনার বিকাশ উপনিবেশবাদীদের বাধ্য করে তাদের সমর্থক ও সহযোগী বুর্জোয়া শ্রেণীর (মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস) নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে যাতে তারা এ নয়া শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে এ উপমহাদেশকে আধা উপনিবেশে পরিণত করতে সক্ষম হয়। এভাবেই পাকিস্তান ও ভারতের সৃষ্টি হয়।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অবিভক্ত ভারতকে মুক্ত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ

প্রাক 'স্বাধীনতা' কালে ভারতের সামাজিক অবস্থা ছিল উপনিবেশিক, সামন্তবাদী ও আধাসামন্তবাদী। উপনিবেশিক শক্তি সামন্তবাদকে জীবিত রেখে সামন্তশ্রেণীর মাধ্যমে বিশাল কৃষক শ্রেণীকে শোষণ ও নিপীড়ন করতো। কাজেই উপনিবেশবাদবিরোধী জাতীয় বিপ্লব এবং সামন্তবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্থাৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব হওয়া উচিত ছিল এ দেশের বিপ্লবের চরিত্র। এ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণী সম্পন্ন করতে অক্ষম। কাজেই ঐতিহাসিকভাবে সর্বহারা শ্রেণী ও তার পার্টির দায়িত্বও বিপ্লব সম্পন্ন করা। কাজেই এ বিপ্লব হওয়া উচিত ছিল জাতীয় গণতান্ত্রিক অথবা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যার লক্ষ্য সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম। বিশ্ব বিপ্লবের ইহা একটি অংশ। এ নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা ও সম্পন্ন করার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর পার্টির নিম্নলিখিত শর্ত পালনের প্রয়োজন ছিল ঃ

ক. সুশৃঙ্খলিত, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বে সুসজ্জিত, আত্মসমালোচনার পদ্ধতি প্রয়োগকারী ও জনগণের সাথে সংযুক্ত এমন একটি পার্টি;

খ. এমন একটি পার্টির নেতৃত্বাধীন একটি সৈন্যবাহিনী;

গ. এমন একটি পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণী ও বিপ্লবী দলের একটি যুক্তফ্রন্ট।

www.pathagar.com

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি উপরিউক্ত শর্ত পালনে ব্যর্থ হয়। ফলে বুর্জোয়া ও সামন্ত বাদীরা জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে অবৈরী সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীকে নিজেদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ করে এবং ভারতকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

সভাপতি মাওসেতুঙ বলেছেন, 'বিপ্লবী পার্টি হচ্ছে জনসাধারণের পথ প্রদর্শক'। বিপ্লবী পার্টি যখন তাদেরকে ভ্রান্তপথে চালিত করে তখন কোন বিপ্লবই সার্থক হতে পারে না।'

স্বাধীনতা-উত্তর কাল

পূর্ব বাংলার সামাজিক বিকাশের জন্য নিম্নলিখিত মূল দ্বন্দ্বগুলো বিদ্যমান ঃ

১. পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

২. পূর্ব বাংলার বিশাল কৃষক-জনতার সাথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব।

৩. পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে-

ক. সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের,

খ. সংশোধনবাদ বিশেষত সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ও

গ. ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

৪. পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব।

দ্বন্দ্বসমূহের বিশেষণ

প্রথম পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্বঃ

মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তবাদের মাঝে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, দিল্লী, লক্ষ্মৌ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের বৃটিশ সমর্থক বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা, বাঙালি বুর্জোয়া ও সামন্ত বাদীদের (যারা খুবই সংখ্যাল্প) চেয়ে বহুগুণ বিকশিত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে।

পূর্ব বাংলার হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণী ও সামন্তবাদীরা মুসলিম বুর্জোয়া, সামন্তবাদী, কৃষক-শ্রমিকের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়াও ধর্মীয় নিপীড়ন চালাতো। বঙ্গভঙ্গ আইনের মাধ্যমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা একটি আলাদা প্রদেশ হলে অর্থনৈতিক শোষণ ও ধর্মীয় নিপীড়নের কিছুটা লাঘব হবে জেনে বাঙালি মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা তা সমর্থন করে। কিন্তু নিজ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে বলে হিন্দু বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা এ বিভাগের বিরোধিতা করে; ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। কাজেই মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্ত শ্রেণীর বিকাশের দু'টি বাধা ছিল একটি হলো বৃটিশ উপনিবেশবাদ আর একটি হিন্দু বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ধর্মীয় নিপীড়ন। কাজেই স্বাধীনতা আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত না হওয়ায়, পূর্ব বাংলার সৃষ্টি ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজন ছিল।

পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা পাকিস্তানের মাধ্যমে নিজেদের শ্রেণী বিকাশ ঘটাতে সক্ষম মনে করে পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করে এবং মুসলিম শ্রমিক-কৃষকদের পাকিস্তান দাবির পিছনে ঐক্যবদ্ধ করে। তারা পাকিস্তানে যোগ দেয় এবং এভাবে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের প্রদেশে পরিণত হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব অবাঙালি বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের হাতে থাকায় বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা রাষ্ট্র ক্ষমতা তাদের নিকট হস্তান্তর করে। কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচিতে স্থাপন, বৃটিশ উপনিবেশবাদের সামরিক আমলা দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান উপাদান

www.pathagar.com

সশস্ত্র বাহিনী গঠন এবং বেসামরিক আমলা দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যান্য অংশ চালু করা (এই সকল সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের অধিকাংশই বৃটিশ উপনিবেশবাদ সমর্থক অবাঙালি ছিল) প্রভৃতির মাধ্যমে এই অবাঙালি বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা রাষ্ট্রযন্ত্রের একচ্ছত্র মালিকানা লাভ করে এবং নিজেদের শ্রেণী বিকাশের অবাধ সুযোগ পায়।

এ শাসকশ্রেণী পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র জাতীয় ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য স্বায়ত্তশাসন কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদানের পরিবর্তে একে অবাধ শোষণের জন্য প্রথম থেকেই প্রচেষ্টা চালিয়ে আসে। এ শাসকশ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার পাট, চা, চামড়া প্রভৃতির অর্থ দ্বারা বিকাশ লাভ করে এবং বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সিয়াটো, সেন্টো প্রভৃতি সামরিক চুক্তি ও বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করে। এভাবে পাকিস্তান আধা-উপনিবেশে পরিণত হয়। সম্প্রতি এ শাসকশ্রেণী সংশোধনবাদ বিশেষত সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে নানা প্রকার অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করেছে।

পূর্ব বাংলার পাট, চা, চামড়া, কাগজ প্রভৃতির অর্থ দ্বারা সস্তা শ্রমশক্তি দ্বারা, প্রায় সাত কোটি মানুষের বাজার এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে পাকিস্তানি বুর্জোয়াশ্রেণী একচেটিয়া পুঁজিপতিতে পরিণত হয়। তারা পূর্ব বাংলাকে শাসন ও শোষণের একটি স্থায়ী ক্ষেত্রে পরিণত করে।

পূর্ব বাংলাকে শাসন ও শোষণের একটি বিরাট বাধা হলো তার স্বতন্ত্র জাতিসত্তা এবং ভাষা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রধান উপাদান। জাতি হিসেবে পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য মুছে দেয়ার জন্য এ পাকিস্তানি শাসকশ্রেণী বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষা প্রচলনের হীন প্রচেষ্টা চালায়। এ হীন প্রচেষ্টাকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নস্যাৎ করে দেয়। বর্তমানেও এ শাসকশ্রেণী ভাষা পরিবর্তনের হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

এ পাকিস্তানি বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী শ্রেণীর বিকাশের জন্য ক্রমশ পূর্ব বাংলার সম্পদ, সস্তা শ্রমশক্তি ও প্রায় সাত কোটি মানুষের বাজার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবে বৃটিশ উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ উপনিবেশ থেকে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশ হিসেবে কিছু কালের জন্য আধা উপনিবেশে পরিণত হলেও এখানে প্রথম থেকেই পাকিস্তানি বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী শাসকগোষ্ঠীর জাতীয় নিপীড়ন ও শোষণ বিদ্যমান ছিল। ঐ শাসকশ্রেণী নিজেদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার ওপর জাতীয় নিপীড়ন বৃদ্ধি করে এবং তাদের বিকাশ একচেটিয়া রূপ গ্রহণের পর্যায়ে এলে তারা শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য তাদের শাসনব্যবস্থাকে ক্রমেই অধিকতর সমরবাদী করে এবং এভাবে পূর্ব বাংলার ওপর জাতীয় নিপীড়ন ঔপনিবেশিক শোষণের রূপ নেয় এবং পূর্ব বাংলা পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর উপনিবেশে পরিণত হয়। এ উপনিবেশিক শাসকশ্রেণী নিজেরাই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের স্বার্থ রক্ষা করছে। এ কারণে পাকিস্তান নিজেই একটি আধা উপনিবেশিক ও আধা সামন্তবাদীদেশ।

এই পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসকশ্রেণী পূর্ব বাংলার 'পাকিস্তানবাদী দালাল বুর্জোয়াদের' মাধ্যমে এবং গ্রামে সামন্তবাদকে জীবিত রেখে এদেশে শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। এ উপনিবেশিক শোষণের ফলে পূর্ব বাংলার মাঝারী ও ক্ষুদে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ ব্যাহত হয়েছে এবং গ্রামে সামন্তবাদী শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত বর্তমানে বিদেশি ঋণ পরিশোধের জন্য, বিদেশি ঋণ হ্রাসের ফলে কলকারখানার পুঁজি সংগ্রহের জন্য গ্রাম্য শোষণ প্রকট আকার ধারণ করেছে। কাজেই পূর্ব

www.pathagar.com

বাংলার শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদে বুর্জোয়া ও মাঝারী বুর্জোয়া শ্রেণীর এক অংশ তথা সমগ্র পূর্ব বাংলার জাতিও শোষণে শোষিত। এ পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসকশ্রেণী অখণ্ড পাকিস্তান, ধর্মের ভিত্তিতে এক জাতি, তথাকথিত ইসলামী সংস্কৃতি, পূর্ব বাংলা একটি প্রদেশ প্রভৃতি প্রচারের মাধ্যমে শোষণের উপনিবেশিক চরিত্র গোপন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশিক শক্তি শোষণের উপনিবেশিক চরিত্র গোপন করার জন্য এক দেশ-এক জাতি প্রভৃতি প্রচারের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ইতিহাস তার ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে। পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

দ্বিতীয়ত, পূর্ব বাংলার বিশাল কৃষক-জনতার সাথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্বঃ গ্রামের সরকারি কর্মচারী (পুলিশ, সার্কেল অফিসার), মৌলিক গণতন্ত্রী (বি.ডি), জমিদার, ধনীচাষী, অসৎ ভদ্রলোক (টাউট) ও মাঝারী চাষীর ওপরের স্তর, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী ও মাঝারী চাষীর ব্যাপক অংশের ওপর সামন্তবাদী শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানি উপনিবেশিক শ্রেণী গ্রামের সামন্তবাদীদের জিইয়ে রেখেছে এবং তাদের বিকাশের সর্বময় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ শাসকশ্রেণী তাদের বিকাশের নিমিত্ত পুঁজি ও সস্তা শ্রমশক্তি সংগ্রহের জন্য সামন্তবাদী শোষণ তীব্রতর করছে।

গ্রামে সামন্তবাদী শোষণের প্রকাশ হলো ভূমিকর ও অন্যান্য খাজনা বৃদ্ধি, গ্রামে রেশন চালু না করা, বুনিয়াদী গণতন্ত্র সৃষ্টি করা, মৌলিক গণতন্ত্রীদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রদান করা, বর্গা, পত্তনি, ঠিকা ও সুদ ব্যবস্থার অবসান করা, ঋণ প্রভৃতির মাধ্যমে চাষীদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ না করা, সেচ প্রকল্প কার্যকরী না করা, বিভিন্ন ধরনের ইজারাদারী প্রথা, পোকা ধ্বংসের ব্যবস্থা না করা, অবৈতনিক সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু না করা, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা প্রভৃতি।

তৃতীয়ত,

(ক) পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একদিকে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ও সহযোগিতা বজায় রাখছে, অন্যদিকে পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের এক অংশের সাথে আঁতাত রাখছে এবং এদের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকশ্রেণীর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। তারা ঋণ, প্রত্যক্ষ ব্যবসায় প্রভৃতির মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণকে শোষণ করছে। তারা পাকিস্তানি উপনিবেশবাদী ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিয়ে চীনবিরোধী, কমিউনিস্টবিরোধী ঐক্যজোট গঠনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানি উপনিবেশবাদীরা নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থেই ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে বর্তমানে আঁতাত করতে পারছে না এবং নিজেদের শ্রেণী বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে সমাজতান্ত্রিক দেশ বিশেষত চীনের সাথে বন্ধুত্ব করতে বাধ্য হচ্ছে।

অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পূর্ব বাংলার উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের সুযোগ নিয়ে তাদের সমর্থক পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের সাহায্য ও সমর্থন করছে। সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক এই দালাল বুর্জোয়ারা উপনিবেশিক শাসনবিরোধী আন্দোলন করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও আন্দোলনকে মূলধন করে দুইভাবে ব্যবহার করছে-একদিকে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে চীনবিরোধী পাক-ভারত যৌথ চুক্তি সম্পাদন করার জন্য। অন্যদিকে এই দালাল বুর্জোয়াদের দ্বারা পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে

www.pathagar.com

চীনবিরোধী পূর্ব বাংলা-ভারত যৌথ চুক্তি সম্পাদন ও পূর্ব বাংলাকে প্রত্যক্ষ মার্কিন উপনিবেশে পরিণত করার জঘন্য ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। বর্তমানে মার্কিন সমর্থক পূর্ব বাংলার দালাল বুর্জোয়ারা ছয়দফা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব করছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এদেশের সামন্তবাদীদের স্বার্থরক্ষাকারী ধর্মীয় পার্টিগুলোকে সাহায্য ও সমর্থন করছে। এরা সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র।

(খ) পূর্ব বাংলার জনগণের সংশোধনবাদ, বিশেষত সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব

পাকিস্তানি উপনিবেশবাদীদের নিয়ে চীনবিরোধী, কমিউনিস্ট বিরোধী ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠার জন্য তারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তারা সমর্থন করবে না। কারণ পাকিস্তানি উপনিবেশবাদীদের সাথে আঁতাত রেখে পাকিস্তানসহ তার উপনিবেশকে শোষণ করাই তাদের লক্ষ্য। এই জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নস্যাৎ করার জন্য তারা পাকিস্তানি উপনিবেশবাদীদের সাহায্য করবে যাতে পূর্ব বাংলাকে শোষণের একটা ভাগ তারা পায়।

প্রসঙ্গক্রমে বায়াফ্রা, বার্মা, ভিয়েতনাম ও অন্যান্য দেশের কথা উল্লেখযোগ্য। বায়াফ্রার জনগণ সংগ্রাম করছে জাতীয় অত্যাচার, নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির জন্য। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা নাইজেরিয়ার সামরিক সরকারকে অস্ত্র, অর্থ ও লোক সরবরাহ করে বায়াফ্রার জনগণের মুক্তির সংগ্রামকে ধ্বংস করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যাতে তারা সমগ্র নাইজেরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে শোষণ চালাতে পারে। তারা বার্মার মুক্তি সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখার, ভিয়েতনামের মহান সংগ্রামকে মুছে দেয়ার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

(গ) পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব

ভারতীয় বৃহৎপুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী সরকার সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমর্থন করবে না। কারণ তার উদ্দেশ্য হলো বুর্জোয়ার নেতৃত্বে স্বাধীন পূর্ব বাংলাকে শোষণ করা এবং চীনবিরোধী, কমিউনিস্টবিরোধী একটি মিত্র পাওয়া। কিন্তু সর্বহারার নেতৃত্বে মুক্ত পূর্ব বাংলা সহায়ক হবে আসাম, পশ্চিম বাংলা, বিহার, ত্রিপুরা তথা সমগ্র ভারতের শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির। এ কারণে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ শ্রমিক-কৃষকের পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বানচাল করার চেষ্টা করবে।

চতুর্থত,

পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব

পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিকদের শোষণ করে এবং এদের মাঝে একটি অংশ পাকিস্তানি উপনিবেশবাদীদের দালাল হয়ে পূর্ব বাংলাকে শোষণ করছে, অপর অংশ সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল। একটি অংশ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ উভয়েরই বিরোধী, যারা সত্যিকার জাতীয় বুর্জোয়া। পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের প্রথম অংশ দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক। দ্বিতীয় অংশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল যারা ভারতের সাথে আঁতাত রেখে নিজস্ব শ্রেণী বিকাশের জন্য যতটুকু জাতীয় অধিকার প্রয়োজন তারজন্য সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক। পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের ব্যাপক অংশ বর্তমানে এদের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ। এদের নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রাম কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না।

www.pathagar.com

এদের সাথে জনগণের শত্রুতার সম্পর্ক ছাড়াও তারা যতক্ষণ পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করে ততক্ষণ জনগণের সাথে একটা মিত্রতার সম্পর্কও রয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর তৃতীয় অংশ জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে জনগণের শত্রুতার সম্পর্ক ছাড়াও তারা যতক্ষণ উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম করে ততক্ষণ একটা মিত্রতার সম্পর্কও রয়েছে।

বর্তমানে জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক দালাল বুর্জোয়াদের হাতে। এ নেতৃত্বের অবসান তিন প্রকারে হওয়া সম্ভব। (ক) সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি দৃঢ়ভাবে জাতীয় পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে কৃষক-জনতাকে উপনিবেশবাদ ও সামন্ত বাদবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করলে, (খ) উপনিবেশিক শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে চীনবিরোধী, কমিউনিস্টবিরোধী জোট স্থাপন করলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাহায্যে ও সমর্থনে দালাল বুর্জোয়াদের জাতীয় সংগ্রাম ধ্বংস করতে সক্ষম হবে, (গ) উপনিবেশিক শাসকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের দালাল বুর্জোয়াদের সাথে আপোসে এই দালাল বুর্জোয়াদের আসল বিশ্বাসঘাতকতা ও গণবিরোধী চরিত্র প্রকাশ পাবে।

প্রধান দ্বন্দ্ব

উপরিউক্ত দ্বন্দ্ব ছাড়াও পূর্ব বাংলার সমাজে আরো দ্বন্দ্ব রয়েছে, কিন্তু এই চারটি মূল দ্বন্দ্ব। সভাপতি মাও বলেছেন, 'কোনো প্রক্রিয়াতে যদি কতকগুলো দ্বন্দ্ব থাকে তবে তাদের মধ্যে অবশ্যই একটা প্রধান দ্বন্দ্ব থাকবে যা নেতৃস্থানীয় ও নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে। অন্যগুলো গৌণ ও অধীনস্থ স্থান নিবে। তাই দুই বা দু'য়ের অধিক দ্বন্দ্ববিশিষ্ট কোন জটিল প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের অবশ্যই তার প্রধান দ্বন্দ্বকে খুঁজে পাবার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই প্রধান দ্বন্দ্বকে আঁকড়ে ধরলে সব সমস্যাকেই সহজে মীমাংসা করা যায়।'

পাকিস্তানি উপনিবেশবাদবিরোধী জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষক, ক্ষুদে-বুর্জোয়া, মাঝারী বুর্জোয়ার এক অংশ এবং দেশপ্রেমিক ধনী চাষী ও জমিদারদের অর্থাৎ সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। কাজেই বর্তমান সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্ব।

কিন্তু উপনিবেশবাদবিরোধী জাতীয় সংগ্রাম একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছলে পাকিস্তানি উপনিবেশিক শ্রেণীকে রক্ষার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ একযোগে অথবা আলাদাভাবে নিজেদের সৈন্য দ্বারা পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রামকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা চালাবে। এ অবস্থায় পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ গণসংগ্রামবিরোধীর প্রধান ভূমিকা থেকে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিংবা সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ অথবা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ পূর্ব বাংলার গণবিরোধী সংগ্রামে গৌণ ভূমিকা থেকে ক্রমশ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদে কিংবা সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ অথবা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হবে। এই প্রধান দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে নতুন করে ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে সঠিক মুক্তি সংগ্রামের পথে পরিচালিত করতে হবে।

www.pathagar.com

পূর্ব বাংলার বিপ্লব ও তার চরিত্র

পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা নিজেদের বিকাশের জন্য পাকিস্তানে যোগ দেয়। কিন্তু পাকিস্তানি উপনিবেশিক শ্রেণী পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া বিকাশের জন্য যে সুবিধা প্রয়োজন তা নিজেদের বিকাশে ব্যবহার করে। ফলে এদেশে বুর্জোয়া বিকাশ ব্যাহত হয়। তাই বুর্জোয়া বিকাশের প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃষ্টি অর্থাৎ সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদের অবসান প্রয়োজন।

সামন্তবাদের অবসান সম্ভব গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে এবং উপনিবেশিক শাসনের অবসান সম্ভব জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে। কাজেই পূর্ব বাংলার বিপ্লব হবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়ারা এ বিপ্লব সম্পূর্ণ করতে পারে না। নিজেরাই কিছুদিন পরে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালাল হয়ে যায়। এ বিপ্লব সম্পূর্ণ করার মত একটি শক্তিই রয়েছে তা হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণী ও তার পার্টি। সর্বহারার নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের লক্ষ্য ধনতন্ত্র নয়, সমাজতন্ত্র। বিপ্লব সর্বহারার নেতৃত্বে পরিচালিত বলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে পরিচিত হবে যা বিশ্ব বিপ্লবের একটি অংশ।

এ বিপ্লবের একটি চরিত্র হলো সশস্ত্র বিপ্লব। পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল উপাদান সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও আইন এবং এদের সাহায্যে উপনিবেশিক শাসকশ্রেণী পূর্ব বাংলাকে শাসন ও শোষণ করছে। এ নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্ল-বসম্পন্ন করতে হলে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণী ও স্তরকে ঐক্যবদ্ধ করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণী ও স্তরের সমন্বয়ে নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। সভাপতি মাও-এর ভাষায় 'বন্দুকের নলের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হবে।'

এ বিপ্লবের একটা চরিত্র হলো দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। এ বিপ্লবে দ্রুত বিজয়ের সম্ভাবনা খুবই কম। কারণগুলো হচ্ছে পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক-জনগণের অনৈক্য অবস্থা, সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী পার্টির অভাব, সংশোধনবাদী ও নয়া সংশোধনবাদী পার্টি কর্তৃক জনগণকে বিপ্লথে পরিচালনা, জনগণের মাঝে প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের প্রভাব।

পক্ষান্তরে, উপনিবেশিক শক্তি একত্রিত, শাসনক্ষমতা সুদৃঢ়, বি.ডি. প্রথার মাধ্যমে গ্রাম পর্যন্ত তাদের শাসনব্যবস্থা বিস্তৃত এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সম্প্রসারণবাদ তাদের সাহায্য করবে। তাই বর্তমানে শক্তির ভারসাম্য পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের পক্ষে। এ অবস্থা পরিবর্তন করতে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। কাজেই পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী দুরূহ যুদ্ধের মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে।

এ বিপ্লবের আর একটি চরিত্র হলো গ্রাম্য এলাকা দ্বারা শহর ঘেরাও এবং পরে শহর দখল। সভাপতি মাও বলেন, 'নিয়ম অনুসারে বিপ্লব আরম্ভ হয়, গড়ে ওঠে এবং জয়ী হয় ঐ সকল স্থানে যেখানে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল।'

কাজেই গ্রাম্য এলাকায় গিয়ে কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধের জন্য জাগ্রত করে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে গ্রাম্য এলাকা দখল করতে এবং ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করতে হবে। শহরগুলো দখলকৃত গ্রাম্য এলাকা দ্বারা ঘেরাও করতে হবে এবং পরে শহর দখল করতে হবে।

www.pathagar.com

এ বিপ্লবের আর একটি চরিত্র হলো ঐক্যফ্রন্ট গঠন।

জাতীয় পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিতে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করা অপরিহার্য।

কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর ভিত্তিতে, সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদবিরোধী সকল দেশপ্রেমিক শ্রেণী ও স্তরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। ঐক্যফ্রন্টের মাঝে সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি অবশ্যই আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক স্বাধীনতা রক্ষা করবে এবং স্বাধীনতা ও উদ্যোগ গ্রহণের নীতিতে অটল থাকবে এবং নিচের নেতৃত্বের ভূমিকার জন্য জিদ ধরবে। কাজেই ঐক্যফ্রন্টের সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব, স্বাধীনতা ও উদ্যোগ গ্রহণ থাকতে হবে আর তার তা থাকার একটিমাত্র গ্যারান্টি হচ্ছে সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে একটি গণফৌজ। সভাপতি মাও বলেছেন, 'গণফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকবে না।'

কাজেই ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে গণফৌজ।

জাতীয় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ কর্মনীতি

(১) সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও গেরিলা যুদ্ধের জন্য সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক এমন স্থানে অর্থাৎ জংলাকীর্ণ পার্বত্য গ্রামাঞ্চলে যেতে হবে।

(২) গ্রাম্য মজুর, গরিব চাষী ও মাঝারী চাষীকে উজ্জীবিত করতে হবে সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদবিরোধী গেরিলা যুদ্ধে।

(৩) কৃষি বিপ্লবঃ উপনিবেশবাদ সমর্থক জমিদার, ধনী চাষীদের জমি দখল করে তা ক্ষেত মজুর ও গরিব চাষীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। সরকারি (পুলিশ, সার্কেল অফিসার) এবং বি.ডি.দের মাঝে উপনিবেশবাদ সমর্থকদের ধ্বংস করতে হবে।

দেশপ্রেমিক জমিদার, ধনী চাষী ও অন্যান্যদের বর্গা বদলানো বাতিল, পত্তনি বদলানো বাতিল, বর্গা শোষণ ও পত্তনি শোষণ কমানো প্রভৃতি কার্যকরী করতে হবে। সুবিধাজনক অবস্থায় দৃঢ়ভাবে ভূমি সংস্কার করতে হবে।

(৪) গেরিলা বাহিনী থেকে নিয়মিত বাহিনী সৃষ্টি ও ঘাঁটি এলাকা তৈরি করতে হবে।

(৫) ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(৬) গ্রাম্য এলাকা দখল করে তা দিয়ে শহর ঘেরাও ও শেষ পর্যন্ত শহর দখল করতে হবে।

(৭) পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ ও তার দালাল পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, অন্য যে সকল বৈদেশিক শক্তি উপনিবেশিক শাসকশ্রেণীকে সমর্থন করে (যদি তাদের সম্পত্তি এ দেশে থাকে) এবং বৈদেশিক শক্তিসমূহের দালালদের (যখন তারা জাতীয় বিপ্লবের বিরোধিতা করে) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

(৮) দখলকৃত এলাকায় জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে হবে। এ সরকার গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের মাধ্যমে, সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণী ও স্তরের সহযোগিতায় শত্রুর ওপর একনায়কত্ব ও জনগণের মাঝে গণতন্ত্র কায়েম করবে।

(৯) বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিকে স্বায়ত্তশাসন ও বিভিন্ন উপজাতিকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে।

www.pathagar.com

(১০) সকল অবাঙালি দেশপ্রেমিক জনগণের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে।

(১১) জনগণের ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

বিপ্লবী যুদ্ধের সাধারণ কর্মনীতি

(১) নিয়মিত বাহিনী গড়ে না ওঠা পর্যন্ত গেরিলা যুদ্ধ বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান রূপ।

(২) প্রধানত চাষীদের নিয়ে গঠিত লালফৌজ প্রধান সংগঠন।

(৩) গেরিলা যুদ্ধের গতিপথে নিয়মিত বাহিনী গড়ে উঠবে।

(৪) দীর্ঘস্থায়ী দুরূহ যুদ্ধ চলবে।

প্রধান কাজ

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী সর্বহারার রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠা।

অনুপূরক কাজ

(১) সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে কৃষকদেরকে গেরিলা যুদ্ধে উজ্জীবিত করা, (২) প্রধানত চাষীদের নিয়ে গেরিলা বাহিনী করা ও গেরিলা যুদ্ধ করা, (৩) কৃষি বিপ্লব করা, (৪) নিয়মিত বাহিনী ও ঘাঁটি এলাকা তৈরি করা।

আন্তর্জাতিক বক্তব্য

বর্তমান বিশ্বের মূল দ্বন্দ্বগুলো নিম্নরূপ-

(১) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের দ্বন্দ্ব;

(২) একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব ও সংশোধনবাদীদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও সংশোধনবাদের মাঝে দ্বন্দ্ব;

(৩) সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের শাসকশ্রেণীর সাথে নিজেদের দেশের জনগণের দ্বন্দ্ব;

(৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিপীড়িত জনগণের দ্বন্দ্ব;

দ্বন্দ্ব বিশেষণ

(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সংশোধনবাদের সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের দ্বন্দ্ব ঃ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বব্যাপী তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার পথে এবং বিশ্বকে নিজেদের শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে পুনর্বণ্টনের পথে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহকে বিশেষত সমাজতান্ত্রিক চীনকে প্রধান বাধা বলে মনে করে। কারণ, চীন সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে সর্বদা সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী শোষণের স্বরূপ তুলে ধরছে। এ শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ বিপ্লবের পতাকাকে চীন ঊর্ধ্বে তুলে ধরছে। চীনের বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণী বিশ্বের দেশ ও জাতিসমূহের শাসন ও শোষণবিরোধী সংগ্রামকে নৈতিক সমর্থন দিচ্ছে ও বাস্তবে সাহায্য করছে। চীন বিশ্বের শাসন ও শোষণবিরোধী সংগ্রামকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

কাজেই সাম্রাজ্যবাদ ও সংশোধনবাদ ও প্রতিবন্ধককে ধ্বংস করতে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অবস্থা বিপ্লবের পক্ষে, জনগণের পক্ষে, সমাজতন্ত্রের পক্ষে এবং সাম্রাজ্যবাদ, সংশোধনবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়ার বিপক্ষে। বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য সমাজতন্ত্রের পক্ষে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদীরা ও সংশোধনবাদীরা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ দ্বন্দ্বের

www.pathagar.com

অবসান করতে অক্ষম। সভাপতি মাও বলেছেন, 'আজকের দিনে দু'ধরনের বাতাস প্রবাহিত, পুবালী বাতাস ও পশ্চিমী বাতাস।'

চীনে একটি প্রবাদ আছে, 'হয় পুবালী বাতাস পশ্চিমী বাতাসকে দাবিয়ে রাখে, না হয় পশ্চিমী বাতাস পুবালী বাতাসকে দাবিয়ে রাখে।' আমাদের মতে বর্তমান পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পুবালী বাতাস পশ্চিমী বাতাসকে দাবিয়ে রাখছে। এর অর্থ এই যে, সমাজতান্ত্রিক শক্তি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ওপর অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। এ কারণে সাম্রাজ্যবাদীরা ও সংশোধনবাদীরা বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ, ব্যাকমেইল এবং আভ্যন্তরীণ দালালদের সাথে যোগাযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমপরিবর্তন ঘটিয়ে ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে এবং সে অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সভাপতি মাওসেতুঙ কর্তৃক সূচিত ও পরিচালিত মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধনবাদী ও আভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদী দালালদের চীনে ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্নকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছে। এ সংস্কৃতিক বিপ্লব পথ দেখিয়েছে কিভাবে বিপ্লবীরা সংশোধনবাদী দেশসমূহের পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীকে উৎখাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কাজেই সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের সাথে সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের দ্বন্দ্ব বর্তমান। কিন্তু এ দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্ব নয়।

(২) একদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের নিজেদের মাঝে ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব; অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশগুলোর মাঝে দ্বন্দ্ব ঃ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহকে কমিউনিজমের ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন সামরিক জোটে আবদ্ধ করছে এবং এভাবে তাদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শোষণ করছে। একারণে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের দ্বন্দ্ব রয়েছে। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের শাসকশ্রেণীগুলোর মাঝে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে।

সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ অন্যান্য সংশোধনবাদী দেশগুলোকে শাসন ও শোষণ করছে এবং যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন জোটে আবদ্ধ রেখেছে যাতে তার খপ্পর থেকে কেউ বেরুতে না পারে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের স্বার্থে সংগ্রাম ও সহযোগিতা করে। তারা নয়া-উপনিবেশিক ও উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের জন্য ক্রমশ পৃথিবীকে নিজেদের প্রভাবের এলাকা হিসেবে ভাগ করে নিচ্ছে। এ এলাকা বন্টনের বিষয় নিয়ে তাদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় আবার নিজেদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা সহযোগিতা করে। কাজেই এ দ্বন্দ্ব বর্তমান। কিন্তু এটা প্রধান দ্বন্দ্ব নয়।

(৩) সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের শাসকশ্রেণীর সাথে নিজেদের দেশের জনগণের দ্বন্দ্বঃ সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের শাসকশ্রেণী নিজেদের দেশের আপামর জনসাধারণকে শোষণ করছে। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে এবং একারণে তাদেরকে বিশাল সামরিক বাহিনী গঠন করতে হয়েছে। এ সামরিক ব্যয়ভার আসে দেশের জনগণের কাছ থেকে, ফলে জনগণের ওপর শাসন ও শোষণ তীব্রতর হচ্ছে। কোনো কোনো সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশের অভ্যন্তরে সংখ্যালঘু জাতির ওপর শাসন ও শোষণ অধিকভাবে চালানো হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও আফ্রো-আমেরিকান (নিগ্রো)-দের ওপর জাতিগত শোষণ করছে। সোভিয়েত সামাজিক

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদ গুটিকয় বিশ্বাসঘাতক দালালদের সহায়তায় সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে শোষণ করছে। কাজেই এ দ্বন্দ্ব বর্তমান; কিন্তু ইহা প্রধান দ্বন্দ্ব নয়।

(৪) **মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতিসমূহের দ্বন্দ্বঃ** মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ শাসন ও শোষণ করছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহকে উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশে পরিণত করে। এ শোষণের ওপর নির্ভর করছে তাদের বিকাশ। এ কারণে আফ্রো-এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো হচ্ছে পৃথিবীর গ্রামাঞ্চল। তাদের লুণ্ঠন করে বেঁচে আছে পৃথিবীর শহরাঞ্চল ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো। এই গ্রামাঞ্চলে যেখানে ইউরোপ ও আমেরিকার মত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সুদৃঢ় নয় এবং অপেক্ষাকৃত অনেক দুর্বল, সেখানেই বিপ্লবের সূচনা করতে হবে এবং কালক্রমে সমগ্র গ্রামাঞ্চল দখল করে শহর অবরোধ করা এবং শেষে শহর দখল করা মাওসেতুঙের চিন্তানুসারী নীতি।

এশিয়া, আমেরিকা ও লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশের বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ শাসন ও শোষণ থেকে নিজেদের দেশ ও জাতিগুলোকে মুক্তি করছে। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামের এটা একটা বিরাট বিজয়। কিন্তু এই বুর্জোয়াশ্রেণী, শ্রেণী বিকাশের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করে নিজ দেশকে নয়া-উপনিবেশে পরিণত করছে। এ অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শর্ত তৈরি করা সর্বহারা শ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

ভিয়েতনামের বীর জনগণের মহান মুক্তিযুদ্ধ যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণ পরাজিত করার পর্যায়ে পৌছেছে তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অধঃপতিত দোসর সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ শান্তি আলোচনার প্রহসনের ভেতর দিয়ে এ মহান মুক্তি সংগ্রামকে মুছে দেওয়ার জঘন্য ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

তবু ভিয়েতনাম, লাউস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, বার্মা, নক্সালবাড়ী, বিহার, কঙ্গো, মোজাম্বিক, এ্যাঙ্গোলা, আজানিয়া, প্যালেস্টাইন, বায়াফ্রা, রোডেশিয়া, নিউজিল্যান্ড, বলিভিয়া প্রভৃতি স্থানে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান বিশ্বপ্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র। ঘটনাবলী প্রমাণ করছে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়ার জনগণের প্রধান শত্রু। এ দ্বন্দ্ব বর্তমান এবং ইহাই প্রধান দ্বন্দ্ব।

আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলন

আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান বিপ্লব হলো সংশোধনবাদ ও নয়া সংশোধনবাদ। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সংশোধনবাদ বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি দ্বারা কু-দেতা ঘটিয়ে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছে কয়েকটি সমাজতন্ত্রী দেশে। যে সকল কমিউনিস্ট পার্টি এখনো ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়নি সেগুলোর মাঝে বুর্জোয়া দালালদের সহায়তায় প্রতিবিপ্লবী কাজ পরিচালনা করছে এবং কোনো কোনো পার্টির ক্ষমতা এই দালালরা দখল করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে ধনতন্ত্র

www.pathagar.com

পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তারা সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জঘন্য চক্রান্ত করছে।

কোনো কোনো পার্টি সংশোধনবাদীদের এ চক্রান্তের খপ্পরে পড়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে স্বাধীন পথ অনুসরণ করছে ঘোষণা করে প্রকৃতপক্ষে সুবিধাবাদী পথ অনুসরণ করছে, সংশোধনবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা আর সংশোধনবাদের মাঝে কোন মাঝারী পথ নেই।

বর্তমান দুনিয়ায় চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও আলবেনিয়ার শ্রমিক পার্টি সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হয়ে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। সভাপতি মাওসেতুঙ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, বর্তমান দুনিয়ার সর্বহারা শ্রেণীর মহান নেতা ও পরিচালক।

সভাপতি মাওসেতুঙ প্রতিভার সঙ্গে সৃজনশীলভাবে ও সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করছেন, রক্ষা করছেন ও বিকাশ করছেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। মার্কস ও এঙ্গেলস মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতা। লেনিন মার্কসবাদকে সাম্রাজ্যবাদী যুগে সর্বহারা বিপ্লব পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করেন, সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। স্ত্যালিন লেনিনবাদকে রক্ষা করেন ও সর্বহারা বিপ্লবের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করেন। সভাপতি মাওসেতুঙ সাম্রাজ্যবাদের সামগ্রিক ধ্বংসের যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকাশ করেছেন। তিনি সমাধান করেছেন, কিভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশে ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রতিরোধ করা যায় এবং যে সকল দেশে ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানকার সর্বহারা বিপ্লবীরা কীভাবে পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে। তিনি প্রতিভার সঙ্গে দুনিয়ার প্রথম মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা ও পরিচালনা করেন। এভাবে তিনি মার্কসবাদকে এক সম্পূর্ণ নতুন স্তরে উন্নীত করেন, যে স্তর হলো মাওসেতুঙ চিন্তাধারা স্তর।

'বিশাল সাগর পার হবার জন্য নির্ভর করি কর্ণধারের ওপর, বিপ্লব করার জন্য নির্ভর করি মাওসেতুঙ চিন্তাধারার ওপর।' কাজেই বর্তমান যুগের বিপ্লবীদের চেনার উপায়-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা অধ্যয়ন, অনুশীলন ও তার ভাল সৈনিক হওয়ার ওপর।

বর্তমান আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক নতুন ধরনের সংশোধনবাদ দেখা দিয়েছে। এরা মুখে মাওসেতুঙ-এর বুলি ঝাড়ে এবং কাজে তার বিরোধিতা করে; কথায় ও কাগজে মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী ও অনুশীলনে সংশোধনবাদী পথ অনুসারী। মাওসেতুঙ চিন্তাধারার মুখোশ এঁটে জনগণকে ও বিপ্লবীদের ধোঁকা দেয়ার বুর্জোয়া দালালদের এ এক অভিনব কারসাজি ও ইহাই নয়া সংশোধনবাদ।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরাট পুনর্গঠন-পুনর্বিন্যাসের সময়। বিভিন্ন দেশে যেখানে সংশোধনবাদী ও নয়া সংশোধনবাদীরা নেতৃত্ব কুক্ষিগত করছে, সেখানে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারীরা নতুন পার্টি সৃষ্টি করে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণকে বিপ্লবের পথে পরিচালনা করছে।

নয়া মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা

সভাপতি মাও বলেছেন, 'যদি বিপ্লব করতে হয় তাহলে অবশ্যই একটি বিপ্লবী পার্টি থাকতে হবে। বিপ্লবী পার্টি ছাড়া মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবীতত্ত্বেও বিপ্লবী রীতিতে গড়ে

www.pathagar.com

ওঠা একটি বিপ্লবী পার্টি ছাড়া, শ্রমিক শ্রেণী ও ব্যাপক জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের পরাজিত করতে নেতৃত্ব দান করা অসম্ভব।'

আমাদের দেশে গতানুগতিক যে মার্কসবাদী নামধারী পার্টি ছিল তা 'মস্কোপন্থী' ও 'পিকিংপন্থী' নামধারী দুই উপদলে বিভক্ত হয়, তাদেরকে, তাদের থেকে বেরিয়ে আসা অথবা বিতাড়িত এবং অন্যান্য বিচ্ছিন্ন দল ও উপদলগুলোকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা প্রয়োজন।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী সংশোধন পার্টি

এই পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সকল মূলতত্ত্বকে সংশোধন করে প্রকৃতপক্ষে শোষক শ্রেণী অর্থাৎ উপনিবেশবাদী, সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল হয়ে পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লবে পরিচালিত করছে। এই অধঃপতিত দলদ্রোহী গোষ্ঠী অর্থনীতিবিদ, বার্নস্টাইনবাদের অনুসারী। শ্রমিক-কৃষক জনগণকে বিভ্রান্ত করে শোষণশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধি এদের লক্ষ্য। এরা 'মস্কোপন্থী' নামে পরিচিত। এরা পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক জাতীয় শত্রু।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নামধারী নয়া-সংশোধনবাদী পার্টি

এরা কথায় ও কাগজে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী ও অনুশীলনে সংশোধনবাদী। অর্থাৎ এরা লাল পতাকা ওড়ায় লাল পতাকা বিরোধিতা করার জন্য। এরা পূর্ব বাংলার ওপর পাকিস্তানি উপনিবেশিক শোষণ স্বীকার করে না এবং জাতীয় সংগ্রাম না করায় এরা পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট উপনিবেশিক সরকারের দালাল হিসেবে পরিচিত। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতি না নিয়ে তারা একদিকে উপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর হাত শক্ত করেছে এবং অন্যদিকে ব্যাপক জনগণকে উপনিবেশিক শোষণবিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত মার্কিনের দালাল বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে ঠেলে দিচ্ছে। 'পিকিংপন্থী' নাম ধরে তারা বিশ্ববিপ্লবের কেন্দ্রকে অবমাননা করছে। এরা নয়া-সংশোধনবাদী।

নতুন দল, উপদল ও বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী

পূর্ব বাংলায় বিপ্লবের ফুটন্ত অবস্থা হওয়ায় বর্তমানে দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। মার্কসবাদী নামধারী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিবিপ্লবী চরিত্র, দালালি ক্রমশ পার্টি কর্মী ও বিপ্লবীদের সামনে প্রকাশ হওয়ায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারীরা দৃঢ়ভাবে বিদ্রোহ করছে। এ অবস্থায় কিছু সুযোগ সন্ধানী প্রতিক্রিয়াশীলচক্র ঘোলা পানিতে মাছ ধরতে নেমেছে।

মোটামুটি অনুসন্ধানের ফলে তাদের নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়-

নয়া-সংশোধনবাদী পার্টির আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে বিতাড়িত একটি চক্র নিজেদেরকে সঠিক মার্কসবাদী, নক্সালবাড়ী ও অনুসারী বলে জাহির করে। তবে এ গ্রুপটি সকল কর্মী ও জনসাধারণের নিকট উপনিবেশিক শক্তির দালাল বলে প্রকাশ্যভাবে পরিচিত।

অপর একটি গ্রুপ বর্তমানে নয়া-সংশোধনবাদীদের সাথে আঁতাত করছে। এরা অধঃপতিত ভাগ্যান্বেষী বুর্জোয়াগোষ্ঠীর একটি ভগ্নাংশ। সচেতন কর্মীদের গ্রুপটি একটি

www.pathagar.com

জোট বা সুবিধাবাদী, নেতৃত্বলোভী ও হীনমনা গ্রুপটি সুযোগসন্ধানী ও পদলোভী, মেরুদণ্ডহীনতার একটি প্রতিক্রিয়াশীল আঁতাত।

অন্য একটি উল্লেখযোগ্য দল মার্কসবাদী নামধারী পার্টির অভ্যন্তরে ভ্রূণ-পার্টি সৃষ্টির দায়ে বিতাড়িত। বক্তব্যের দিক দিয়ে তারা নয়া সংশোধনবাদী পার্টি থেকে অভিন্ন। জাতীয় বক্তব্যে এর অস্পষ্ট, তত্ত্বগতভাবে দুর্বল।

আরেকটি গ্রুপ বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের নামে প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদে বুর্জোয়াদের একটি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরা ধার করা বক্তব্য, এলোপাথারি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তাধারার কথা বলে তাদের সত্যিকার ক্ষুদে বুর্জোয়ারা চরিত্র গোপন করার প্রয়াস পায়। এরা শিশু অবস্থায় পার্টির মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না বলে স্টালিন ও মাওসেতুঙ কর্তৃক বহুপূর্বে ধিকৃত ভাববাদী ডেবরিন তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছিল যাতে আন্দোলন কয়েকজন ক্ষুদে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর পকেটস্থ হয়। এছাড়া রুদ্ধদ্বার নীতি, মনগড়া মনোলিথিজম, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তাধারার ভিত্তিতে ঐক্যে আতঙ্কবোধ কিন্তু সংশোধনবাদী, নয়া-সংশোধবাদী ও প্রমাণিত দালালদের সাথে নীতিহীন সুবিধাবাদী পবিত্র আঁতাত রাখতে উৎসাহী, বহুকেন্দ্রের তত্ত্বে বিশ্বাস, বিপ্লবী যুবকদের হাতে পার্টির নেতৃত্ব থাকবে এই তত্ত্ব, সভাপতি মাওসেতুঙ-এর গেরিলা যুদ্ধের নীতির পাশে চে-র মার্কসবাদবিরোধী গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বের স্থান প্রদান প্রভৃতি জঘন্য মার্কসবাদবিরোধী ক্ষুদে বুর্জোয়া তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিছু কিছু বিপ্লবী এদের খপ্পরে পড়লেও অচিরেই তারা এদের সঠিক রূপ আবিষ্কার করে বেরিয়ে আসবে। সম্প্রতি তারা মার্কসবাদী নয়া-সংশোধনবাদী পার্টির অভ্যন্তরে ভ্রূণ পার্টির সৃষ্টির দায়ে বিতাড়িত যে পার্টির কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সে পার্টিতে যোগ দিয়েছে। এছাড়া জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভাবে বহু বিপ্লবী বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছেন। তারা কেউ সমঝোতা রেখে, কেউ সমঝোতাহীনভাবে কাজ করছেন, আবার কেউ এলোপাথারি তীর ছুঁড়ছেন।

কাজেই প্রতিটি বিপ্লবী যারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী ও সে অনুযায়ী অনুশীলনকারী তাদেরকে অবশ্যই সংশোধনবাদ, নয়া-সংশোধনবাদ ও অন্যান্য মার্কসবাদ বিরোধী আদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে এবং 'প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায়সঙ্গত'-এ পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। সভাপতি মাও বলেছেন, 'ধ্বংস ব্যতীত কোনো প্রকার গঠনকার্য সম্ভব নয়। ধ্বংস বলতে সমালোচনা ও বর্জন বুঝায় এবং ইহাই বিপ্লব। যুক্তি সহকারে সত্য বের করা তার সাথে জড়িত, যা হলো গঠনমূলক কাজ।'

কাজেই প্রতিটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারীদের উচিত নিজেদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশব্যাপী সর্বহারা শ্রেণীর একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করা। সভাপতি মাও বলেছেন, 'সুশৃঙ্খলিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ তত্ত্বে সুসজ্জিত, আত্মসমালোচনার পদ্ধতি প্রয়োগকারী ও জনগণের সাথে যুক্ত এমন একটি পার্টি। এমন একটি পার্টির নেতৃত্বাধীন একটি সৈন্য বাহিনী। এমন একটি পার্টির নেতৃত্বে সকল বিপ্লবী শ্রেণী ও বিপ্লবী দলের একটি যুক্তফ্রন্ট-এ তিনটি হচ্ছে আমাদের শত্রুকে পরাজিত করার প্রধান অস্ত্র।'

চেয়ারম্যান মাও-দীর্ঘজীবী হোন

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা জিন্দাবাদ।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-২

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা সাহসী হোন, দৃঢ়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করুন, জাতীয় শত্রু খতম করুন, জাতীয় মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলুন, কর্মসূচি বাস্তবায়িত করুন

(২৩ এপ্রিল, ১৯৭১)

পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও তার পদলেহী কুকুর পূর্ব বাংলার বিশ্বাসঘাতকরা পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জেলা, মহকুমা শহর দখল করেছে এবং সেখানে নিজেদের দখল বজায় রেখেছে। যে কয়টি জেলা বা মহকুমায় তাদের অধিকার কায়েম হয়নি তা অচিরেই তারা দখল করবে। শহরে আওয়ামী লীগ, বিদ্রোহী বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর. পুলিশের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ছে। শহরে পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাদের ফ্যাসিবাদী বর্বরতা অব্যাহত রেখেছে এবং ভেঙ্গে যাওয়া বেসামরিক প্রশাসন পুনরায় চালু করার জন্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্য-লুণ্ঠন চালাবার চেষ্টা করছে।

পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলের থানা, ফাঁড়িসমূহ নিষ্ক্রিয়। তারা পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, জনগণের বিরুদ্ধে, বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে, কোনো তৎপরতা চালাচ্ছে না এবং কারও ইচ্ছে থাকলেও সাহস করছেন না। এদের অনেকেই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সমর্থন করে আওয়ামী লীগের সাথে সহযোগিতা করছে।

থানাসমূহের বেসামরিক প্রশাসন কোনো কোনো এলাকায় চলছে, কোনো কোনো এলাকায় নিষ্ক্রিয়। তারাও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, জনগণ ও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কিছু করছে না বা কেউ করতে চাইলে সাহস পাচ্ছে না।

স্থানীয় টাউট, জুলুমবাজ, জাতীয় শত্রুরা নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে এবং অনেকে আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক রেখে বেঁচে আছে। তারাও জনগণ ও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে এবং পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু করতে সাহস করছে না।

আওয়ামী লীগের অবস্থা ধ্বংসোন্মুখ। কোথাও কোথাও তাদের নেতৃত্ব পালিয়েছে বা নিষ্ক্রিয় হয়েছে। সাধারণ কর্মীরাও নেতৃত্বশূন্য হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়েছে। তারা আভ্যন্তরীণ কোন্দল, উপনিবেশিক সরকারের চাপ, জনগণের ওপর নির্ভরতা ও বিপ্লবী কাজে অক্ষমতার জন্য ভারতীয় সমর্থন ও বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর. পুলিশের সহায়তা সত্ত্বেও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার সুযোগ পেয়েও তা যথাযথভাবে দখল করে জনগণের উপকারে লাগায়নি। উপরন্তু তারা অর্থ আত্মসাৎ, মুনাফাখোর, কালোবাজারী, টাউট, জাতীয় শত্রুদের ছত্রছায়া দিয়েছে। তাদের ব্যর্থতা ও দেউলিয়াত্ব জন-সাধারণের সামনে স্পষ্ট হয়েছে, তারা বুঝতে পেরেছে আওয়ামী লীগের দ্বারা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সম্ভব নয়।

জনগণের রয়েছে উঁচু রাজনৈতিক চেতনা, কালোবাজারী-মজুতকারী ও মুনাফাখোর, জাতীয় শত্রু ও উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর উৎখাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তারা মুক্তিযুদ্ধ চালাতে, এতে শরীক হতে এবং তাতে সহায়তা করতে চায়।

www.pathagar.com

মুনাফাখোর, কালোবাজারী, মজুতদারদের কারণে গ্রামে কৃত্রিমভাবে দ্রব্যমূল্য প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। শহর থেকে গ্রামে শ্রমিকরা চলে আসায় এবং গ্রামে কর্মস্বল্পতাও এর কারণ।

উপরিউক্ত অবস্থা থেকে দেখা যায় উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব শহর এলাকায় স্থাপিত হয়েছে এবং তা সুদৃঢ় হচ্ছে, এতে তারা সক্ষম। কিন্তু বিস্তীর্ণ গ্রাম্য এলাকায় তাদের কর্তৃত্ব নেই। ইহা পূর্বের মত স্থাপন করতেও এদের বহু সময় লাগবে। বিশেষ করে প্রশাসনিক কর্মচারীদের পূর্ববাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজে লাগানো, পুলিশ বাহিনী থানায় মোতায়েন করে তাদের দ্বারা স্বাধীনতাবিরোধী কাজ করানো সময়সাপেক্ষ।

সৈন্যবাহিনীর নিজেদের পক্ষে থানায় ঘাঁটি করা, সেখান থেকে গ্রাম দখল করা তাদের সৈন্য স্বল্পতা, জনগণ এবং বিপ্লবীদের সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য বর্তমানে সম্ভব নয়। তারা বহুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে (অল্প সৈন্য নিয়ে যাবে না কারণ তাহলে তারা ধ্বংস হবে, এ সম্ভাবনা রয়েছে বলে) এক এক এলাকায় 'খোঁজ কর ও ধ্বংস কর,' 'ঘেরাও কর ও দমন কর' অভিযান চালাবে এবং সবাইকে হত্যা করবে, সবকিছু পুড়িয়ে দিবে এবং লুট করবে এবং পুনরায় শহরের ঘাঁটিতে ফিরে যাবে। এ অবস্থায় পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ গ্রাম্য এলাকায় পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের সরকার কায়েম করা, জাতীয় শত্রুদের খতম করা, জাতীয় মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা এবং আমাদের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা সম্ভব।

ক্ষমতা দখল

গ্রাম্য এলাকায় পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্রের গ্রাম থানাভিত্তিক কমিটি কায়েম করতে হবে, কমিটি জনগণের সভা আহ্বান করে নির্বাচিত হবে। কমিটিতে ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী, শ্রমিক, মাঝারী চাষী, দেশপ্রেমিক জমিদার ও বুর্জোয়া ও আমাদের প্রতিনিধি থাকবে। কমিটিতে সভাপতি-সহসভাপতি ও সদস্য থাকবে (৫ বা ৭ জন)

এই কমিটির মাধ্যমে আমাদের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে হবে। কালোবাজারী-মজুতদারী, অতিরিক্ত মুনাফাখোরদের শাস্তি দিতে হবে। স্কুল, কলেজ, ইউনিয়ন কাউন্সিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অর্থের হিসাব নিতে হবে। অর্থ আত্মসাৎকারীদের শাস্তি দিতে হবে। এই কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে হবে জনসাধারণ, গেরিলা, সশস্ত্র জনসাধারণ (গ্রামরক্ষী বাহিনী ইত্যাদি) দ্বারা।

গ্রামের জাতীয় শত্রুদের বিচার ও শাস্তি বিধান করা

তাদের ভূমি বিতরণ করা, সুদ বাতিল করা, অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবিধান করা, গ্রাম্য বিচার করা, চুরি ডাকাতি, দুর্নীতি বন্ধ করা।

জাতীয় শত্রুদের নিকট থেকে বলপূর্বক চাঁদা নিতে হবে। জনসাধারণের নিকট থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা নিতে হবে। জনসাধারণের মাঝে প্রতিরোধের প্রচার চালাতে হবে, জনতাকে গ্রাম রক্ষীবাহিনীতে সংগঠিত করতে হবে, তাদের মধ্যে থেকে সৈন্য-বাহিনীতে যোগদানে ইচ্ছুকদের সংগ্রহ করতে হবে। স্কুল, কলেজ, হসপিটাল ও অন্যান্য জনগণের প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে হবে।

গ্রাম্য এলাকায় জনসাধারণের মধ্য থেকে সৈন্যবাহিনীতে লোক সংগ্রহ করা সম্ভব। তাদের ভাতার ব্যবস্থা করা সম্ভব জাতীয় শত্রুদের অর্থ ও খাদ্য দ্বারা। তাদেরকে সশস্ত্র করা যায় থানাসমূহে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে তাদের অস্ত্র দ্বারা, জাতীয় শত্রুর অস্ত্র দখল করে এবং জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধ করছে না এরূপ ব্যক্তিদের অস্ত্র সংগ্রহ করে তার দ্বারা

www.pathagar.com

এবং দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা। সৈন্যবাহিনীকে খতম করে তার নিকট থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা।

সাত বা নয় জনকে নিয়ে একটি সেকশন, তিনটি সেকশন নিয়ে একটি স্কোয়াড, তিনটি স্কোয়াড নিয়ে একটি প্লাটুন গঠন করা। প্রতিটি ইউনিটের নেতা, সহকারী নেতা থাকবে। এদেরকে উদ্ধৃতির শৃঙ্খলা তিনটি প্রবন্ধ, গণযুদ্ধ পড়াতে হবে। দীর্ঘ হাঁটা, অতর্কিত আক্রমণ, বোমাবর্ষণ, তীর, ল্যাজা, ছুরি, তলোয়ার ব্যবহার শেখানো, বেয়নেট মারা শেখানো উচিত।

এদের মধ্য থেকে পার্টি সদস্য সংগ্রহ করতে হবে এবং পার্টি কমিটি গঠন করতে হবে। এই সেনাবাহিনী বিভিন্ন গ্রাম, ছোট শহর দখল করবে। রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম করবে, স্থানীয় জনসাধারণকে সশস্ত্র করবে। পার্টি সংগঠন গড়ে তুলবে, প্রচার করবে, সৈন্য সংগ্রহ করবে।

মুক্তিবাহিনী স্কোয়াডসমূহ স্থানীয় পার্টি কর্মীর সহায়তায় এক এক গ্রামে প্রবেশ করবে এবং জাতীয় শত্রু খতম করবে। জনসমর্থন ও সহায়তার জন্য অবস্থা বিরাজ করলে জনসভা করবে এবং উপরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। এই সৈন্যবাহিনী ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পক্ষে বর্তমান পর্যায়ে টিকে থাকা ও বিকাশলাভ করা সম্ভব।

গ্রাম্য এলাকায় পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর স্থানীয় প্রশাসন ও দালাল জাতীয় শত্রুদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হলে সেখানে বিপ্লবীদের গোপন কাজ করা এবং বিকাশ করা কষ্টকর হবে, ফ্যাসিবাদী নিয়ন্ত্রণে বিপ্লবী কাজে ভাটা আসবে।

কাজেই আসুন, আমরা বর্তমান বিপ্লবী জোয়ারের সুবিধাজনক অবস্থায় পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ গ্রাম দখল করি, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করি, জাতীয় মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলি। কর্মসূচি বাস্তবায়িত করি।

* পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন জিন্দাবাদ।
* পূর্ব বাংলা প্রজাতন্ত্র কায়েম কর।
* গ্রাম্য এলাকা দখল কর।
* রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম কর।
* জাতীয় শত্রু খতম কর।
* জাতীয় মুক্তিবাহিনী গড়ে তোল।
* কর্মসূচি বাস্তবায়িত কর।
* পাকিস্তানের উপনিবেশিক ফ্যাসিস্টদের ধ্বংস অনিবার্য, এরা কাগুজে বাঘ।
* পূর্ব বাংলার সর্বহারা বিপ্লবী জনগণ ঐক্যবদ্ধ হোন।
* সংশোধনবাদ, নয়াসংশোধনবাদ, ট্রটস্কি-চেবাদ, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত খতম করুন।
* পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন সঠিক। এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হোন।
* আমাদের বিজয় অনিবার্য।
* ইয়াহিয়া-টিক্কার ধ্বংস অনিবার্য।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৩

দেশপ্রেমিকের বেশে ছয় পাহাড়ের দালাল

পূর্ব বাংলার জনগণের রক্তের বিনিময়ে উপলব্ধি করছেন যে, পূর্ব বাংলার সকল রাজনৈতিক পার্টি, মুক্তিবাহিনী, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চাকরিজীবী, শিশু, নারী, যুবক, বৃদ্ধ, ধর্মীয়, ভাষাগত, উপজাতীয় সংখ্যালঘু অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সমগ্র জাতির ঐক্য ব্যতীত পাকিস্তানের উপনিবেশিক সামরিক ফ্যাসিস্ট খুনীদের পূর্ব বাংলা থেকে পরিপূর্ণরূপে উৎখাত করা সম্ভব নয়। এ কারণে তারা আন্তরিকভাবে সকলের ঐক্য কামনা করে। জনগণের এ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনস্বরূপ পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির প্রস্তুতি সংগঠন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন পূর্ব বাংলার সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বর্তমানে সর্বহারা পার্টি এ উদ্দেশ্যে আন্ত রিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন সর্বপ্রথম ১৯৬৮ সালে উল্লেখ করে-পূর্ব বাংলা পাকিস্ত ানের উপনিবেশ; সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার জন্য পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালায়।

কর্মী স্বল্পতা, আর্থিক অসুবিধা এবং নতুন সংগঠন হওয়ার জন্য ব্যাপক জনতাকে সংগঠিত করা ও তাদের মাঝে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচার করা সম্ভব হয়নি। তবুও গড়ে সাড়ে তিন বৎসর সময়ের মাঝে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় গোপনভাবে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা হয় এবং পূর্ব বাংলার বুকে সর্বপ্রথম সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা করা হয়। আমাদের গেরিলা ও কর্মীরা পাকিস্তান কাউন্সিল কেন্দ্র, মার্কিন তথ্যকেন্দ্র, বি.এন.আর. এবং ঢাকাসহ অন্যান্য জেলায় কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানে বোমাবর্ষণ করে।

আমাদের সংগঠন সর্বপ্রথম তুলে ধরে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে, জাতীয় মুক্তির গেরিলা যুদ্ধ সূচনা করার সঠিক সামরিক লাইন। আমাদের সংগঠনের বিপ্লবী কর্মী ও গেরিলারা সর্বপ্রথম ১৯৭১ সালের প্রথমদিকে জাতীয় শত্রু খতম করে। গত নির্বাচন, পরবর্তীকালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন এ পথের ভুল ও ব্যর্থতা তুলে ধরে এবং সশস্ত্র সংগ্রাম জোরদার করার জন্য বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানে বোমাবর্ষণ করে এবং কর্মীদের গ্রামে গ্রামে গেরিলাযুদ্ধ সুচনার নির্দেশ দেয়।

পাক সামরিক ফ্যাসিস্টরা পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের বাঘের মতন ভয় পায় এবং বহু কর্মীকে গ্রেফতার করে। তারা পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের তৎপরতা শ্বেতপত্রে স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন পূর্ব বাংলার সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নিকট প্রকাশ্য পত্র প্রেরণ করে। একই সময় বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রকাশ্য আহ্বান জানায়। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন নিজস্ব

www.pathagar.com

উদ্যোগেই ছাত্রলীগের রব গ্রুপ, কমান্ডার, মোয়াজ্জেম গ্রুপ, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির দেবেন-বাসার গ্রুপের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়।

আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ সকল প্রচেষ্টায় সাড়া না দিলেও স্থানীয় ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ ও মুক্তিবাহিনীর দেশপ্রেমিকদের অনেকেই আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সমাপ্ত করে ৩ জুন প্রতিষ্ঠিত করে পূর্ব বাংলার বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি 'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি'।

গত মার্চ থেকে আগস্ট মাসের মাঝে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে পাঁচটিরও বেশি জেলায় গেরিলা যুদ্ধ চলছে। জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে।

পূর্ব বাংলার ইতিহাসে এভাবে সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র বাহিনী ও ঘাঁটি এলাকা গড়ে ওঠে। সর্বত্রই আমাদের গেরিলা ও কর্মীরা জাতীয় ঐক্যের নীতিতে দৃঢ় থেকেছে, দেশপ্রেমিক জনসাধারণ, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্যদের রক্ষা করেছে। ঐক্যে ইচ্ছুকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের ২৫ মার্চের পরবর্তীকালীন আক্রমণের ফলে আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। তখন আওয়ামী লীগ ও মুক্তিবাহিনীর বহু নেতা ও কর্মীকে সর্বহারা পার্টির কর্মী ও গেরিলারা আশ্রয় দেয়। তাদের ও তাদের পরিবারকে অর্থ, বাসস্থান, খাদ্য, নিরাপত্তা ও কাজের সুযোগ প্রদান করে।

পরবর্তীকালে ভারত থেকে সশস্ত্র হয়ে আওয়ামী লীগ, মুক্তিবাহিনী পূর্ব বাংলায় ফিরে এলে সর্বহারা পার্টির কর্মীরা ঐক্যের প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আওয়ামী লীগ ও তার মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ করার পরিবর্তে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমাদের রক্তে হাত কলঙ্কিত করেছে এবং আমাদের ধ্বংস করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

তারা এ জঘন্য অন্তর্ঘাতী কাজ করার জন্য সাধারণ দেশপ্রেমিক সৈনিক ও কর্মীদের বাধ্য করেছে। কিন্তু তবুও প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে অনেক কর্মী এদের নীতি ও স্বরূপ উপলব্ধি করে আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে। এরূপ ঐক্যের ফলে ঢাকায় সর্বপ্রথম জাতীয় শত্রু ব্যারিস্টার মান্নানকে খতম করা হয়।

অতীতে আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বের যতটুকু স্বাধীন ভূমিকা ছিল তাও তারা ভারত ও তার মাধ্যমে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রদত্ত আশ্রয়, অস্ত্র, অর্থ ও সমর্থনের বিনিময়ে বিসর্জন দেয়, নিজেদেরকে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ ঃ পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ-এই ছয় পাহাড়ের দালালে পরিণত করে। পূর্ব বাংলাকে তারা ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের নিকট বন্ধক দেয়, তারা ভারতের ও সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। পূর্ব বাংলায় ছয় পাহাড়ের দালাল হতে ইচ্ছুক নয় এরূপ আমাদেরসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের ধ্বংসের কাজকে প্রাধান্য দেয়। পক্ষান্তরে, পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বার্থ বিক্রয়কারী জাতীয় শত্রুদের পয়সার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। জনগণের ওপর অত্যাচার করে।

২

ছয় পাহাড়ের দালাল, ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার মুক্তিবাহিনী বরিশালের স্বরূপকাঠিতে আমাদের চারজন কর্মী ও গেরিলাকে হত্যা করে, অন্যান্যদের খুঁজে বেড়ায়।

www.pathagar.com

মাদারীপুরে তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কার্যরত আমাদের সমর্থকদের খতমের ষড়যন্ত্র করলে তারা বেরিয়ে আসে। এই তাঁবেদার বাহিনী আমাদের কর্মীর বাড়িতে হানা দেয় এবং নারীদের নির্যাতন করে ও বাড়ি লুট করে।

সম্প্রতি টাঙ্গাইলে তারা আলোচনার কথা বলে আমাদের দু'জন কর্মীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয় এবং সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে গ্রেফতার করে। তারা গ্রেফতারকৃত কর্মীদের বন্দুকের ডগায় সমস্ত গেরিলাদের নিকট থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার জন্য পাঠায়। আমাদের গেরিলারা এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়। একজন নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়, কিন্তু অপরজনকে তারা বন্দি করে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এ এলাকার এক জাতীয় শত্রুর নির্দেশে তারা আমাদের দু'জন গেরিলাকে কেটে লবণ দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

তারা বরিশাল জেলার ঝালকাঠি, কাউখালি, স্বরূপকাঠি অঞ্চলে আমাদের তিনটি গেরিলা ইউনিটকে ঘেরাও ও নিরস্ত্র করে এবং গেরিলাদের বন্দি করে, আমাদের গেরিলাদের কেউ কেউ পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়, বাকিদের খোঁজে পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে তাদেরকে মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্ট খুনীরা হত্যা করেছে। এ এলাকায় তারা আমাদের হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে এবং আমাদের দ্বারা মুক্ত বিরাট অঞ্চল দখল করে নেয়।

তারা আমাদের নারী গেরিলা শিখাকে বন্দি করে, তার পরিবারের সকলকে নির্দয়ভাবে নির্যাতন করে। শিখার উপর নির্মম পাশবিক অত্যাচার চালায়, তাকে ধর্ষণ করে। তার খোঁজ আজও পাওয়া যায়নি। তারা আরো কয়েকজন নারী গেরিলা ও কর্মীকে খতমের জন্য খোঁজ করে।

তাদের এই ঘৃণ্য, বর্বর, ফ্যাসিবাদী তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে ভারতীয় শিখ, গুর্খা সৈন্য ও অফিসাররা। তারা ফরিদপুরের কালকিনী অঞ্চলে আলোচনার কথা বলে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের দু'জন গেরিলাকে বন্দি ও নিরস্ত্র করে এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়। তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হলে জনসাধারণ বুক পেতে দেয়, 'আমাদের আগে হত্যা কর, তারপর এদেরকে হত্যা কর'। জনগণের হস্তক্ষেপে তারা আমাদের কর্মীদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কুখ্যাত ডাকাত-নারী নির্যাতনকারী কুদ্দুস মোল্লার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্ট দস্যুরা মেহেদিগঞ্জেও আমাদের একাধিক গেরিলা ইউনিটকে নিরস্ত্র করে, মূল্যবান দ্রব্যাদি লুট করে এবং গেরিলাদের গ্রেফতার করে। তাদের ওপর অশেষ নির্যাতন চালায়। গৌরনদী অঞ্চলে তারা আমাদের দ্বারা মুক্ত বিরাট অঞ্চলের দখল করে নেয় এবং কর্মীদের খতম করার প্রচেষ্টা চালায়।

মঠবাড়িয়া অঞ্চলে এই ফ্যাসিস্ট দস্যুরা আমাদের মুক্ত অঞ্চল আক্রমণ করে ও দখল করে নেয়। গেরিলাদের সামনা-সামনি ধ্বংস করতে না পেরে বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্ত র্ঘাতকতার পথ গ্রহণ করে। একসাথে কাজ করার ভাঁওতা দিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হয় এবং যৌথ আক্রমণের সময় পিছন থেকে গুলি করে প্রতিভাবান কর্মী হাসানকে হত্যা করে। এর মধ্যে শহীদ হয় হিমু নামের অপর এক কর্মী।

বরিশালের পাদ্রিশিবপুর অঞ্চলে আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ভান করে তারা সুযোগ সন্ধান করে নেতৃস্থানীয় কর্মীদের খতম করার জন্য। শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে ডেকে নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে মাসুম ও অপর এক গেরিলাকে তারা হত্যা করে। ঢাকার নরসিংদী অঞ্চলে আমাদের গেরিলাদের তারা অস্ত্র জমা দিতে এবং যুদ্ধ

www.pathagar.com

থেকে বিরত থাকতে বলে, অন্যথায় খতম করবে বলে হুমকি দেয়। আমাদের গ্রেফতারকৃত কর্মীদের নিকট বেত দেখিয়ে এ ফ্যাসিস্টরা বলে তোমাদের নেতা 'সিরাজ সিকদারকে' গ্রেফতার করে বেত দিয়ে মারতে মারতে ভারতে নিয়ে যাব।

পূর্ব বাংলার সর্বত্র মুক্তিবাহিনীর এই ফ্যাসিস্টরা সভা করে সিদ্ধান্ত নেয় ভারতের গোলাম হতে ইচ্ছুক নয় এরূপ দেশপ্রেমিকদের খতম করার জন্য। পাক সামরিক দস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়ে আমাদেরসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের খোঁজ করা-খতম করার ওপর তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

৩

পঁচিশে মার্চের পূর্বে ক্ষমতার দম্ভে ভুলে এই প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্টরা কমিউনিস্টদের জ্যান্ত কবরস্ত করা, নকসাল ধ্বংস করার জন্য গ্রামে গ্রামে সভা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রথমেই বামপন্থীদের খতম করবে। কিন্তু তারও ধৈর্য তাদের ছিল না, অনেক স্থানেই দেশপ্রেমিকদের তারা খতম শুরু করে। অসিংহ-অসহযোগ আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে তাদের দখলকৃত এলাকার জেলখানায় আমাদের কর্মীদের মুক্তি দিতে তারা অস্বীকৃতি জানায়।

তারা উগ্রজাতীয়তাবাদী হয়ে হিটলারের ইহুদি নির্মূলের অনুসরণ করে। অপরাধী-নিরপরাধী নির্বিশেষে অবাঙালি উর্দু ভাষাভাষী শিশু, নারী, বৃদ্ধ, অর্থাৎ সবাইকে হত্যা করার ফ্যাসিস্ট তৎপরতা চালায়। শত শত নিরপরাধ নারীদের তারা ধর্ষণ করে, উলঙ্গ করে হাঁটায়, নির্মম অমানুষিক অত্যাচার চালায়, শিশুদের মায়ের সামনে হত্যা করে, মা'কে শিশুর রক্ত পানে বাধ্য করে, বৃদ্ধ-যুবকদের সারিবেঁধে গুলি করে হত্যা করে। এ জঘন্য কাজে তারা মেশিনগান, কামান পর্যন্ত ব্যবহার করে। অনেকক্ষেত্রে তারা আগুন দিয়ে হত্যা করে। অনেকক্ষেত্রে শিশু-নারীদের তারা নদীর মাঝে নির্জন দ্বীপে ফেলে আসে অভুক্ত অবস্থায় তাদের মরার জন্য। নিরীহ নারী-শিশুরা আশ্রয়ের জন্য গ্রামের পর গ্রাম হেঁটে বেড়ায়। এই ফ্যাসিস্টদের ভয় উপেক্ষা করে কেউ কেউ তাদের আশ্রয় ও খাদ্য দেয়। এসকল আশ্রয়হীন নারী-শিশুদের তারা পথিমধ্যে হত্যা করে, নারীদের ধর্ষণ করে ও অপহরণ করে।

এভাবে বহু দেশপ্রেমিক শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, কর্মচারী প্রাণ হারায়। এদের অপরাধ এরা উর্দু ভাষায় কথা বলে। এভাবে এরা পূর্ব বাংলার উর্দু ভাষাভাষী জনগণের সাথে বাঙালিদের সম্পর্ক তিক্ত করে তোলে। তাদের এসকল কার্যকলাপের সাথে পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের কার্যকলাপের কোন পার্থক্য নেই।

৪

পাক সামরিক দস্যুদের শীতকালীন অভিযান শুরু হওয়ার পূর্বেই আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্টরা আমাদেরকে উৎখাত করতে চায়। শীতকালীন অভিযানে তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, টিকতে পারবে না, বাধ্য হয়ে তাদেরকে ভারতে পালাতে হবে। পরবর্তী বর্ষাকাল আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাদের ভয় হলো আমাদেরসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের ধ্বংস করতে না পারলে আমরা তাদের পরিত্যক্ত এলাকায় গেরিলা যুদ্ধকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবো। ফলে তাদের ফিরে আসা অসুবিধাজনক হয়ে উঠবে।

www.pathagar.com

পূর্ব বাংলার জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পথে তারা আমাদেরকে প্রধান বাধা বলে মনে করে বর্তমানে তারা অস্ত্র, অর্থ, আশ্রয় ও সমর্থনের বিনিময়ে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের দিকটা পূর্ব বাংলাকে বন্ধক দিয়েছে। যুদ্ধ করে পূর্ব বাংলাকে দখল করতে ব্যর্থ হলে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের তাঁবেদার আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্টরা পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপোস করবে, পূর্ব বাংলাকে একসাথে ভাগ করে লুট করার চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে।

পূর্ব বাংলাকে যত্রতত্র বিক্রির ষড়যন্ত্রকে আমরাই জনগণের সামনে তুলে ধরি, জনগণ তাদের বুঝে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে বরখাস্ত করবে।

৫

আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্টদের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ভারতের কলোনীতে রূপান্তরিত হবে। এতে পূর্ব বাংলার কোন উপকার হবে কি?

ভারতের শাসকগোষ্ঠী হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং সামন্তবাদের প্রতিনিধি। পূর্ব বাংলায় নেমে আসবে এই চার পাহাড়ের শোষণ, এক সাথে যুক্ত হবে চার পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠনের উচ্ছিষ্ট ভোগের জন্য পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ অর্থাৎ দুই পাহাড়। পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্টদের দ্বারা মুক্ত হলে এভাবে ছয় পাহাড়ের শোষণ জনগণের ওপর চেপে বসবে।

চার পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে ভারত আজ দুর্ভিক্ষ, অভাবের দেশে পরিণত হয়েছে। সেখানে পাঁচ টাকা সের চাল, আট টাকা একটা ইলিশ মাছ, একটা ডিম এক টাকা। জনগণ সারাদিন দেড় ছটাক চালও খেতে পায় না। অনাহার, বেকার, অসুস্থতার ফলে জনগণ উপলব্ধি করছে, বৃটিশের হাত থেকে 'স্বাধীনতা' অর্জনের মাধ্যমে লাভবান হয়েছে বিড়লা, টাটা, ভারতের জমিদার-জোতদার এবং সাম্রাজ্যবাদীরা। ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন জাতি, উপজাতিকে শোষণ করছে। তারা গণতন্ত্রের নামে কায়েম করেছে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব, তারা পাক সামরিক দস্যুদের মতো রাজপথে, বাড়িতে বিনাবিচারে জনগণকে গুলি করে হত্যা করে, বন্দি করে, গ্রাম লুট করে, পুড়িয়ে দেয়, সেখানে জনগণকে হত্যা করে।

শোষণ-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতের কৃষক-জনতা আজ বিদ্রোহ করছে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে চার পাহাড়ের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে। এরাই আজ নকশাল নামে জমিদার, পুঁজিপতি আর সাম্রাজ্যবাদীদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

ভারত পূর্ব বাংলায় তার কলোনী স্থাপন করে তারা আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকট কিছুটা দূর করার চেষ্টা করছে। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের এই কলোনীতে লুণ্ঠন ও শোষণের বখরা নেয়া এবং চীন ও কমিউনিজম প্রতিহত করার ঘাঁটি স্থাপনের স্বপ্ন দেখছে।

পূর্ব বাংলার সীমান্ত বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার মাছ, মাংস, ধান, পাট ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বাজার হয়ে ভারতে যায়। এর ওপর রয়েছে পাক সামরিক দস্যুদের লুণ্ঠন ও শোষণ। তবুও পূর্ব বাংলার জনগণ দেড় টাকা বা তার কম সের চাল, এক টাকা-দেড় টাকা দর ইলিশ মাছ, ছোটোখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য, কিছু কিছু চাকরি পায়।

www.pathagar.com

ভারতের কলোনী হলে পূর্ব বাংলার মাছ-মাংস-চাল-সবজি চলে যাবে কলিকাতা, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, মেঘালয়ে। পূর্ব বাংলার জনগণকে তখন খেতে হবে পাঁচ টাকা সের চাল, আট টাকায় একটি ইলিশ মাছ। সাধারণত শিক্ষিত দূরের কথা, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারদের মাঝে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারীদের চাকরির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে ভারতের প্রায় লাখ খানেক বেকার ইঞ্জিনিয়ার এবং কয়েক লাখ বেকার ডাক্তারের সাথে। একশ' দেড়শ' টাকার চাকরি তাদের জন্য সৌভাগ্য হবে।

পূর্ব বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প চলে যাবে ভারতের বিড়লা, টাটা এবং অন্যান্য দক্ষ পুঁজিওয়ালা মাড়োয়ারী, সাহা, বসাকদের হাতে। পূর্ব বাংলা থেকে ১৯৪৭ সাল ও তার পরবর্তীকালে বিতাড়িত হিন্দু জমিদার-জোতদাররা পুনরায় ফিরে আসবে গ্রামসমূহে, দখল করবে তাদের পরিত্যক্ত ভূ-সম্পত্তি, কৃষকদের ওপর শুরু করবে নির্যাতন।

সমগ্র পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর নেমে আসবে ধর্মীয় নির্যাতন, রায়ট, দাঙ্গা। পূর্ব বাংলার জনগণ পৃথক ভূখণ্ড চেয়েছিল কেন? সুদীর্ঘ কাল থেকেই পূর্ব বাংলা ছিল হিন্দু জমিদার আর ব্যবসায়ীদের লুণ্ঠনক্ষেত্র। জমিদার-ব্যবসায়ীদের কেন্দ্র ছিল কলিকাতা, পূর্ব বাংলা ছিল কলিকাতার পশ্চাদভূমি। পূর্ব বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ভূমি একচেটিয়াভাবে হিন্দুদের হাতে ছিল। হিন্দু জমিদারদের নির্মম মুসলিমবিরোধী নির্যাতনের কাহিনী শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মুসলিম জনগণের ওপর এ নির্মম নির্যাতন ও শোষণের কারণেই তারা পৃথক ভূখণ্ড পূর্ব বাংলা দাবি করে। পূর্ব বাংলা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের কলোনীতে পরিণত হলে পূর্ব বাংলার জনগণের ভাগ্য হবে তপ্ত খোলা থেকে চুলায় পড়ার সামিল।

৬

ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর দস্যুরা এখনও পূর্ব বাংলার ক্ষমতা দখল করেনি, এর মাঝে তারা ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার হতে ইচ্ছুক নয় এরূপ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের সহ্য করছে না, ফ্যাসিস্ট হিটলারের মত পূর্ব বাংলায় মুক্তিযুদ্ধ করছে এরূপ অন্যান্য দেশপ্রেমিক পার্টি ও ব্যক্তিদের অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য বন্দুক ব্যবহার করছে। পূর্ব বাংলা এদের নেতৃত্বে মুক্ত হলে সেখানে এরা কায়েম করবে হিটলারের এক পার্টির একনায়কত্বের শাসন ও লুণ্ঠন।

অসংখ্য ঘটনা প্রমাণ করছে এরা যে গণতন্ত্র চায় তা হলো হিটলারের এক পার্টির ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব, এরা যে সমাজতন্ত্র চায় তা হচ্ছে ছয় পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠন এবং এরা যে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চায় তা হচ্ছে ভারতের ও সাম্রাজ্যবাদের কলোনী হিসেবে পূর্ব বাংলাকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা।

৭

পূর্ব বাংলার জনগণকে এরা ভাঁওতা দিতে সক্ষম হচ্ছে কারণ, হক-তোয়াহা নয়া সংশোধনবাদী, দেবেন-বাসার, মতিন-আলাউদ্দিন, ট্রটস্কি-চেবাদী, কাজী-রন ষড়যন্ত্রকারী এবং মণি সিং-মোজাফফর সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতকচক্র পূর্ব বাংলার জাতীয় প্রশ্নে বামপন্থীদের ভূমিকা যথাযথভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। এদের অনেকে পাক সামরিক দস্যুদের দালালি করে।

www.pathagar.com

ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্ট দস্যুরা ব্যাপক হারে ভারত থেকে পূর্ব বাংলায় অনুপ্রবেশ করছে। তারা আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত। তারা দম্ভভরে বলে বেড়াচ্ছে পূর্ব বাংলা তারা এবার দখল করবে, একে ভারতের কলোনীতে পরিণত করবে। এরা পূর্ব বাংলায় প্রবেশ করে ভারতের তাঁবেদার হতে ইচ্ছুক নয় এরূপ আমাদেরসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের আক্রমণ করছে বা বিশ্বাসঘাতকতা করে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, পাট পুড়াচ্ছে, জনগণকে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে উৎখাত করছে, যত্রতত্র মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে, জনগণকে হত্যা করছে, বলপূর্বক অর্থ সংগ্রহ করছে। পানাহার, নারী নিয়ে মত্ত রয়েছে। পাক সামরিক দস্যু ও তাদের দালালদের আক্রমণ করা তাদের গৌণ কাজ। এদের অধিকাংশই ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ভারতের কয়েকদিন ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। এরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে থাকে, নৌকায় অবস্থান করে, অনেক সময় সামন্ত-জমিদার-জোতদারদের বাড়িতে থাকে। কয়েকটি দলের একজন কমান্ডার থাকে। এসকল দলের নিজেদের মাঝে ঐক্য বা হৃদ্যতা শৃঙ্খলা খুবই নিম্নমানের। মাদারীপুর মহকুমার ডামুডিয়ায় পাক সামরিক দস্যুদের আক্রমণের সময় দেখা যায় তাদের মাঝে কোন সমন্বয় নেই। ফলে এরা মার খায়।

এরা মুখে বলে গেরিলা যুদ্ধ করছে, নিজেদের গেরিলা বলে পরিচয় দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধক্ষেত্রে এরা প্রয়োগ করছে সামনা-সামনি অবস্থান, যুদ্ধ, ঘেরাও যুদ্ধের কৌশল। ডামুডিয়া এলাকায় তারা বাংকার থেকে পাক সামরিক দস্যুদের আক্রমণ করে। পাক দস্যুদের একদল পিছন দিয়ে তাদের ঘিরে ফেলে খতম করে। ডামুডিয়ার নিকট ভেদরগঞ্জ থানা পনেরো ঘণ্টা ধরে আক্রমণ করে, বহু মর্টার-গোলা বর্ষণ করে তা ধ্বংস করে।

অস্ত্রের ওপর অতি নির্ভরতা, দখলকৃত ভূমি হাতছাড়া হতে না দেয়া, নিজেদের শক্তির ওপর অতিবিশ্বাস, শত্রু শক্তির ওপর অবিশ্বাস, জনগণের ওপর আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি নিজেদের ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে না শেখার ফলে উদ্ভূত হয়েছে তাদের উপরিউক্ত যুদ্ধনীতি ও কৌশল। শত্রুকে তাদের গেটের বাইরে ঠেকাবার জন্য তারা তাদের শক্তি একত্রিত করে, পাক দস্যুদের বাধা দেয়, সামনা-সামনি যুদ্ধ করে এবং ধ্বংস হয়।

তারা জাতীয় শত্রুদের খতম করা, জাতীয় শত্রুদের ভূমি কৃষকদের মাঝে বিতরণ, দেশপ্রেমিক সামন্তবাদীদের শোষণ কমানো, দেশপ্রেমিক অন্যান্য শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, জনগণকে সশস্ত্র করা, তাদের সংগঠিত করা, তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম করা, জনগণের ওপর নির্ভর করার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে না; উপরন্তু জনগণকে করে অত্যাচার, দেশপ্রেমিকদের হত্যা। এ কারণে পূর্ব বাংলার কোটি কোটি জনতা তাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না, তাদের নিয়মিত বাহিনী একার পক্ষে যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

সর্বোপরি তারা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে প্রগতিবিরোধী যুদ্ধ করছে। একারণে তারা ব্যর্থ হচ্ছে গণযুদ্ধের নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে। অতীতেও তারা এই যুদ্ধনীতি ও কৌশল প্রয়োগ করছে। তারা শহর দখল করার দিকে প্রথমে নজর দেয়, শত্রুর শক্তিশালী ঘাঁটি ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করে, নিজেদের দখলকৃত এলাকা বজায় রাখার জন্য শহর-বন্দরে সামরিক দস্যুদের বাধা দেয়। তাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র- লোকজন এবং দখলকৃত শহর-বন্দর থাকতেও তারা পরাজিত ও উৎখাত হয়।

www.pathagar.com

চট্টগ্রামে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর, পুলিশ, ছাত্র, ভারতীয় সৈন্যসামন্ত হাজার হাজার যোদ্ধা প্রতিরোধ তৈরি করে, টেলিফোন লাইন বসায়, অস্ত্র, সৈন্য আনার জন্য ভারতের সাথে ট্রাক যোগাযোগ স্থাপন করে, তারা কামান, মর্টার, মেশিনগান, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র অর্থাৎ বিমান ও ট্যাঙ্ক ব্যতীত সবকিছু ব্যবহার করে কিন্তু সম্মুখ অবস্থান যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয় এবং ভারতে বিতাড়িত হয়।

মেজর জিয়া দম্ভভরে চট্টগ্রামে ঘোষণা করেছিলেন ঢাকা কয়েকদিনের মাঝে দখল করবে। মেজর জলিল ঘোষণা করেছিলেন বরিশাল আর পরাধীন হবে না। এদেরসহ আরো অনেক মেজর-ক্যাপ্টেন-লেফটেন্যান্টের মাথা শেষ পর্যন্ত দেয়ালে ঠেকে, তারা ভারতে বিতাড়িত হয় বা প্রাণ হারায়। এদের ভুলের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়, তাদের ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট হয় এবং তারা ভারতে যেতে বাধ্য হয়।

ভারত ও তার মাধ্যমে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ যদি তাদের আশ্রয় না দিত, পুনরায় সশস্ত্র না করতো তবে তাদের এই বিদ্রোহ জুন-জুলাই মাসেই শেষ হয়ে যেতো। ভারত থেকে সশস্ত্র হয়ে পুনরায় তাদের পূর্ব বাংলায় অনুপ্রবেশ করার প্রক্রিয়ায় তাদের চরিত্রের বিরাট পরিবর্তন হয়। অতীতে তাদের যতটুকু স্বাধীন ভূমিকা ছিল তাও তারা ভারত ও সাম্রাজ্যবাদ প্রদত্ত আশ্রয়, অর্থ ও সমর্থনের বিনিময়ে বিসর্জন দেয়, তারা ছয় পাহাড়ের দালালে পরিণত হয় এবং পূর্ব বাংলাকে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের নিকট বন্ধক দেয়।

এভাবে তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে প্রগতিবিরোধী যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। জাতীয় মুক্তির যুদ্ধ জাতীয় পরাধীনতার যুদ্ধে পরিণত হয়। পূর্ববাংলাসহ পৃথিবীর কোনো প্রগতিশীল শক্তিই তাদের এ প্রগতিবিরোধী পশ্চাদগামী যুদ্ধ সমর্থন করে না।

আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্টদের যুদ্ধনীতি ও কৌশল এবং কার্যকলাপ এবং প্রগতিবিরোধী যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানি দস্যুদের তাদের সবল দিকসমূহ ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে। তারা তাদের সৈন্যদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা, উন্নত সৈন্যসংস্থান (কোম্পানী, ব্যাটেলিয়ান, রেজিমেন্ট ইত্যাদি), শৃঙ্খলা, ধর্মীয় মনোবল, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, আন্তর্জাতিক দেশসমূহের সমর্থন বা নিরপেক্ষতা ব্যবহার করছে।

এ কারণে ২৫ মার্চের পরবর্তী সময় বিরাট এলাকা ও শক্তি এবং গণসমর্থন থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্টরা পরাজিত হয়। বর্তমানেও তারা একই কারণে পরাজিত হবে যত অস্ত্র-শস্ত্র, সৈন্য তাদের থাকুক না কেন! তাদের লোকজন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, অনেকে ভারতে পালিয়ে যাবে। তাদের অস্ত্রশস্ত্র কিছু অংশ পাক সামরিক দস্যুদের হাতে যাবে, কিছু অংশ নদী-খাল-পুকুর-মাটির তলে আশ্রয় নেবে, কিছু অংশ আমাদের হাতে আসবে, বাকিটা ভারতে ফেরত যাবে। তাদের ভুলের জন্য পুনরায় লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাবে, তাদের ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হবে।

পাক সামরিক দস্যুদের পরাজিত করে পূর্ব বাংলার দখল করতে হলে বিরাট সংখ্যায় অর্থাৎ হাজারে হাজারে তাদেরকে একে একে যুদ্ধে খতম করতে হবে; তাদের ঘাঁটি ও শহর দখল করতে হবে। এজন্য উচ্চ পর্যায়ের ঘেরাও যুদ্ধ ও অবস্থান যুদ্ধও করতে হবে। এজন্য যে সৈন্য-সংস্থান, শৃঙ্খলা, যুদ্ধ অভিজ্ঞতা, মনোবল ও যুদ্ধনীতি এবং কৌশল প্রয়োজন তা এ মুক্তিবাহিনীর দস্যুদের নেই।

www.pathagar.com

সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ দ্রুত পূর্ব বাংলা দখল করার আরেকটি পথ অবলম্বন করতে পারে। অর্থাৎ ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্বারা পূর্ব বাংলা বা গোটা পাকিস্তান আক্রমণ করা এবং তাদের তাঁবেদার মুক্তিবাহিনী দ্বারা পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরে অভ্যুত্থান ঘটানো। অর্থাৎ সীমান্ত আক্রমণ করে পাক দস্যুদের সেখানে ব্যাপৃত রাখা ও তাদের ধ্বংস করা এবং তাঁবেদার বাহিনী কর্তৃক পূর্ব বাংলার ভেতর থেকে দখলের সুযোগ করে দেয়া।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যাতে সৈন্য আসতে না পারে তারজন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত আক্রমণ করা, সমুদ্র দিয়ে যাতে পূর্ব বাংলায় সামরিক দস্যুরা আসতে না পারে তারজন্য সমুদ্রপথ বন্ধ করে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এতে পাক-ভারতে যুদ্ধ বেঁধে যাবে। চীনসহ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিসমূহ ভারতের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট পূর্ব বাংলা দখলের এ আগ্রাসী যুদ্ধকে বিরোধিতা করবে। পূর্ব বাংলার জনগণেরও একটা বিরাট অংশ এ যুদ্ধের বিরোধিতা করবে। ভারত নিজেও অধিকতর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংকটে পড়বে।

ভারতের আগ্রাসী বাহিনী এবং পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরস্ত তাঁবেদার মুক্তিবাহিনীর একযোগে আক্রমণের ফলে কয়েকটি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। একটি পরিস্থিতি হতে পারে-পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসক-গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ পরাজয়, পূর্ব বাংলা ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের কলোনীতে রূপান্তর, মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্টদের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় একটি পুতুল সরকার গঠন।

অন্য পরিস্থিতি হতে পারে-পাকিস্তানি ফ্যাসিস্ট দস্যুরা আভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থান ও ভারতীয় হামলা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে, তখন আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্টদের পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ পরিচালনার পথ গ্রহণ করা ব্যতীত আর কোনো পথ থাকবে না। এর ফলে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র হবে, আপোস-টেবিলে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের অংশ স্বীকার করে সমাধানে আসার জন্য ভারত, সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তাঁবেদার মুক্তিবাহিনী প্রচেষ্টা চালাতে পারে ফলে অনিবার্যভাবেই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব সর্বহারা শ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টির হাতে এসে পড়বে।

পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের কলোনীতে রূপান্তরিত করলে পূর্ব বাংলার জনগণ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে সক্ষম হবে তাদের রক্তদান বৃথা হয়েছে; ছয় পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠন উপড়ে ফেলার জন্য তারা প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু করবেন। সর্বহারা শ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টি ব্যতীত এ সংগ্রামে নেতৃত্বদানের আর কেউ থাকবে না। যে পরিস্থিতিরই উদ্ভব হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টির হাতে পূর্ব বাংলার বিপ্লবের নেতৃত্ব আসবেই।

ভারত যুদ্ধ বাঁধিয়ে পূর্ব বাংলাকে তার কলোনীতে রূপান্তরিত করবে এ সম্ভাবনা কম, ভারতের পক্ষে সীমান্তে উস্কানি সৃষ্টির সম্ভাবনাই অধিক। এর কারণ ভারতের এই আগ্রাসী যুদ্ধ চীনসহ বিশ্বের প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিসমূহ বিরোধিতা করবে। এ যুদ্ধে ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়বে, এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়বে। ভারতের জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধ তীব্রতর হয়ে উঠবে। প্রথম মহাযুদ্ধে জন্মলাভ করেছে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জন্ম লাভ করেছে চীনসহ আরো বহু সমাজতান্ত্রিক দেশ। কাজেই পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের ফলে পাকিস্তান, ভারত, পূর্ব বাংলা যে কোন স্থানেই সর্বহারা শ্রেণীর দ্রুত ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা দেখা দেবে। সাম্রাজ্যবাদীরা এজন্য প্রচেষ্টা চালাবে যুদ্ধকে রোধ করতে।

www.pathagar.com

৯

ছয় পাহাড়ের দালাল, ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার আওয়ামী লীগ ও মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্টদের দ্বারা জাতীয় মুক্তির নামে প্রগতিবিরোধী জাতীয় পরাধীনতার যে প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ চলছে তা পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারে না। যুদ্ধক্ষেত্র বা আপোস-টেবিল কোনোটার মাধ্যমেই এরা পূর্ব বাংলাকে সকল বৈদেশিক শোষণ-মুক্ত এবং দেশের অভ্যন্তরে সামন্তবাদীদের উৎখাত করে কৃষকের মুক্তি আনতে সক্ষম হবে না। পূর্ব বাংলার জনগণ অনেকেই এদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারছে না কিন্তু আজ হোক কাল হোক জনগণ এদের ছদ্মাবেশ ছুঁড়ে ফেলে এদের-প্রকৃত ছয় পাহাড়ের দালালির চরিত্র বুঝতে পারবে এবং অনিবার্যভাবেই জনগণ এদেরকে বরখাস্ত করবে।

ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার হতে ইচ্ছুক নয়, এরূপ আমাদেরসহ অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধরত দেশপ্রেমিকদের এবং নিরীহ শিশু, নারী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধের রক্তে এরা হাত কলঙ্কিত করেছে, আজ হোক কাল হোক, রক্ত দিয়েই তাদেরকে এ রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে। সমাজ নিজস্ব নিয়মেই এগিয়ে যাচ্ছে। যত প্রচেষ্টাই চালাক না কেন তারা পূর্ব বাংলাকে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না, পূর্ব বাংলার জনগণ ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্টদের জাতীয় পরাধীনতার প্রতি-বিপ্লবী যুদ্ধকে জাতীয় স্বাধীনতার বিপ্লবী যুদ্ধ দ্বারা বিরোধিতা করবে, পাকিস্তানের উপনিবেশিক সামরিক শাসকগোষ্ঠী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে পূর্ব বাংলা থেকে পরিপূর্ণরূপে উৎখাত করবে, সামন্তবাদকে উৎখাত করবে, কৃষক-জনতাকে মুক্ত করবে এবং স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিবাদী পূর্ব বাংলা প্রজাতন্ত্র কায়েম করবে। পূর্ব বাংলার জনগণের বিজয় অনিবার্য।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪

জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে কৃষকের ওপর নির্ভর করুন; পাক সামরিক দস্যুদের শীতকালীন অভিযান এবং ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের জনগণ বিরোধী তৎপরতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করুন, গেরিলা যুদ্ধকে বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিন!

(১৯৭১-এর অক্টোবরে লিখিত এ দলিলটি ছিল মূলত একটি সামরিক রচনা। '৭১-এর জটিল পরিস্থিতিতে যখন পূর্ব বাংলার বিপ্লবী শক্তি একদিকে পাক-ফ্যাসিস্ট বাহিনী ও অন্যদিকে আওয়ামী-মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্টদের দ্বি-মুখী আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে পড়ে তখন সামরিক ক্ষেত্রে কিভাবে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে এ দ্বি-মুখী আক্রমণের মুখে টিকে থাকা যাবে ও বিকাশ লাভ করা যাবে তারজন্য সাধারণ গাইড এ দলিলে এসেছিল। এগুলো এসেছিল '৭১-এ পার্টির নেতৃত্বে গেরিলা তৎপরতার বাস্তব অভিজ্ঞতার সারসংকলন, তখনকার পরিস্থিতিতে বাস্তব ও দ্বান্দ্বিক বিশেষণ এবং গেরিলা যুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিশেষত চীন ও ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতার শিক্ষার ভিত্তিতে)

পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাদের শীতকালীন অভিযান শুরু করে দিয়েছে। পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল শুকিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এ অভিযান তীব্রতর ও নির্মম হয়ে উঠবে। ১৯৭২ সালের জুন-জুলাই পর্যন্ত এ অভিযান চলবে।

পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের এ শীতকালীন অভিযানের লক্ষ হলো পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বাধীন জাতীয় মুক্তিবাহিনীর গেরিলা এবং আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট মুক্তিবাহিনীকে গ্রাম থেকে উৎখাত করা, গ্রামসমূহকে পরিষ্কার করা, ডিসেম্বরের উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা, উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা।

পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের শীতকালীন অভিযানে যুক্ত হয়েছে ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সমস্যা। এরা পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি ও তার নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তিবাহিনীকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

কাজেই একদিকে পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের শীতকালীন অভিযান, অন্যদিকে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের টিকে থাকা ও বিকাশ লাভ করার সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

১

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তিবাহিনী এবং আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট মুক্তিবাহিনীকে গ্রামাঞ্চলে ধ্বংস করার জন্য পাকসামরিক ফ্যাসিস্টরা ঘেরাও-দমন অথবা 'খোঁজ কর, ধ্বংস কর' অভিযান পরিচালনা করবে।

প্রথমটিকে তারা প্রয়োগ করবে ঐ সকল এলাকায় যেখানে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার কেন্দ্র রয়েছে বলে তারা মনে করে। যেমন ১ নং ফ্রন্ট এরিয়া প্রথমে সমগ্র অঞ্চলকে তারা

www.pathagar.com

ঘেরাও করে, এ অঞ্চল থেকে বেরুবার পথসমূহের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে প্রধান ক্যাম্প স্থাপন করে, কারফিউ জারি করে, প্রতি ক্যাম্পের মধ্যকার অঞ্চলে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা করে। এ সকল প্রধান ক্যাম্পের সাথে নিকটবর্তী বড় সামরিক ঘাঁটির সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা।

এরপর তারা ঘেরাওকৃত অঞ্চলের মাঝে কয়েকটি উপক্যাম্প স্থাপন করে। ক্যাম্পগুলো সাধারণত তারা স্কুলবিল্ডিং বা পাকা বাড়িতে স্থাপন করে। এ সকল ক্যাম্প থেকে তারা ঘেরাও-এর মধ্যকার ও আশে-পাশের প্রতিটি গ্রামে 'খোঁজ কর, ধ্বংস কর' অভিযান পরিচালনা করে এবং সব কিছু লুট করে, পুড়িয়ে দেয় এবং সবাইকে হত্যা করে।

অনেকক্ষেত্রে তারা বন্দুক দেখিয়ে এবং জাতীয় শত্রুদের সহায়তায় আশেপাশের অঞ্চল থেকে হাজার হাজার জনসাধারণকে গেরিলাদের খোঁজ করা, লুট, অগ্নিসংযোগ, হত্যার কাজে লাগায়। অনেক সময় তারা ধর্মের পার্থক্য বা ভাষা, জাতীয়তার পার্থক্যকে কাজে লাগায় এবং জনগণের এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

গেরিলারা ধ্বংস হয়েছে বা নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত বা নিজেদের পরাজয় বরণ পর্যন্ত এ অভিযান তারা অব্যাহত রাখে। এরপর তারা ঘেরাও উঠিয়ে চলে যায়।

'খোঁজ কর, ধ্বংস কর' অভিযান সাধারণত দিনে শুরু হয়, গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করা হয়, কয়েকদিন থেকে ধ্বংসকারী বাহিনী এক স্থানে মিলিত হয়। সারাদিন ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে দস্যুবাহিনী দিন থাকতেই শহরের ঘাঁটিতে ফিরে যায়।

ঘেরাও-দমন বা 'খোঁজ কর, খতম কর' অভিযানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাক সামরিক দস্যুদের ইউনিটসমূহ ঝোপঝাড়, মাঠ-ঘাট লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলিবর্ষণ করতে করতে অগ্রসর হয়। এর কারণ তারা অজানা-অচেনা গ্রামের প্রতিটি ঝোপ-ঝাড়, মাঠ-ঘাট, বাড়ি-ঘরকে শত্রু বলে ভয় করে, যে কোন স্থান থেকে অতর্কিতে হামলার সম্ভাবনায় তটস্থ থাকে। এর ফলে তাদের অবস্থান সহজেই জানা যায়।

শহরে পালিয়ে আসা জাতীয় শত্রু, আশেপাশের জাতীয় শত্রু ও তাদের গ্রামস্থ গোপন ও প্রকাশ্য চররা সামরিক ফ্যাসিস্ট দস্যুদের সাথে আসে, পথ দেখিয়ে দেয়; লুট, হত্যা, অগ্নিসংযোগ করে। খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে, খবর সরবরাহ করে, গেরিলাদের খোঁজ করে, সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ধরিয়ে দেয়।

২

আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলরা যথাযথ খবরের ভিত্তিতে আমাদের কোন কোন ইউনিটকে ঘেরাও করে, নিরস্ত্র করে কিছুসংখ্যক কর্মীকে হত্যা করে। টাঙ্গাইলের জাতীয় শত্রু চেয়ারম্যানের খবরের ভিত্তিতে তারা আমাদের দু'জন গেরিলাকে কেটে কেটে লবণ দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বহু স্থানে আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে। আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল এরূপ কিছু বুদ্ধিজীবী, ভ্রষ্ট সর্বহারাদের আমরা সরল বিশ্বাসে আমাদের গেরিলা বাহিনীতে নিয়েছিলাম, পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। কিন্তু ভারত-প্রত্যাগত মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে যোগাযোগ হলে তারা প্ররোচিত হয়ে দলত্যাগ করে এবং বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করে আমাদের কর্মীদের ও ইউনিটের অবস্থান জানিয়ে দেয়, তাদের সাথে যোগদান করে। অনেকক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্ব মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল কিন্তু আমাদের আশ্রয়ে বেঁচেছিল এরূপ কিছুসংখ্যক

www.pathagar.com

সামন্তবাদী, বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী সহানুভূতিশীলরা ভারত-প্রত্যাগত মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের খবর সরবরাহকারী হয়।

কয়েকক্ষেত্রে ঐক্যের আলোচনার কথা বলে তারা ঐক্য-বৈঠকে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের কর্মীদের গ্রেফতার ও নিরস্ত্র করে মৃত্যুদণ্ড দেয়। এক্ষেত্রে জনসাধারণ হস্তক্ষেপ করে। তারা বুক পেতে বলে আমাদের আগে হত্যা কর, তারপর একে হত্যা কর। জনসাধারণের হস্তক্ষেপে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আমাদের কর্মীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কয়েকক্ষেত্রে গ্রেপ্তারকৃত আমাদের কর্মীরা পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

৩

আমাদের গেরিলাবাহিনী শূন্য থেকে গড়ে উঠেছে, তাদের সংখ্যা কম, বন্দুক এবং পুরনো রাইফেল দ্বারা সজ্জিত, অস্ত্রের স্বল্পতার জন্য সকল গেরিলা সশস্ত্র নয়। পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের সাথে লড়াইয়ে তারা অভ্যস্ত নয়। এগুলো হচ্ছে তাদের দুর্বলতা। পক্ষান্তরে, তাদের শক্তিশালী দিক হলো, তাদের শৃঙ্খলা উন্নত, তারা নিজেদের দেশে ন্যায়যুদ্ধ করছে, জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে পোড় খাওয়া। রাত্রি-অভিযানে অভ্যস্ত, বিভিন্ন ইউনিট ও উচ্চস্তরের সাথে দৃঢ় সংযোগ রয়েছে, রাজনৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে তারা আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ, জনসাধারণের সাথে তারা অনেকখানি যুক্ত।

পাক-সামরিক দস্যুদের শক্তিশালী দিক হলো তাদের হাতে রয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতা, আধুনিক অস্ত্র, সামন্তবাদী ধর্মীয় মনোবল, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কষ্টসহিষ্ণুতা। কিন্তু তাদের দুর্বল দিক হলো তারা বিদেশে অন্যায় বর্বর যুদ্ধ করছে, তাদের জনসমর্থন নেই। তাদের সংখ্যা স্বল্পতা, অজানা-অচেনা গ্রামে তারা লড়াই করছে।

আওয়ামী লীগের মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্টদের সবল দিক হলো তাদের আধুনিক অস্ত্র রয়েছে, লোকবল রয়েছে, ভারত তাদেরকে সহায়তা ও সমর্থন করছে, ভারতের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ তাদেরকে সাহায্য ও সহায়তা করছে, তাদের কিছুটা গণ-সমর্থনও আছে। তাদের দুর্বল দিক হলো, তারা জনগণের ওপর অত্যাচার করে, তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব নেই, ছয় পাহাড়ের নিকট নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে, ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের কলোনী স্থাপনের জন্য তারা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে প্রগতিবিরোধী যুদ্ধ করছে, তাদের নিজেদের মাঝে সংযোগ কম, নিজেদের মাঝে সংঘর্ষ হয়, তারা জনগণের সাথে যুক্ত নয়।

আমাদের দুর্বলতা ও শত্রুর সবলতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে যে আমাদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে হবে, এ যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী। আমাদের সবলতা এবং শত্রুর দুর্বলতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে যে, আমরা শত্রুর আক্রমণকারী দুর্বল অংশকে পাল্টা ঘেরাও আক্রমণ করে দ্রুত ধ্বংস করতে পারি। এভাবে ধীরে ধীরে আমাদের দুর্বলতা কেটে যাবে, শত্রুর দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে। শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের হাতে ধ্বংস হবে।

৪

পাক সামরিক ফ্যাসিস্টরা সংখ্যাস্বল্পতার কারণে ঘেরাও-দমন বা 'খোঁজ কর, ধ্বংস কর' অভিযানে নিজেদেরকে ছোট ছোট ইউনিটে (২ জন, ৪ জন, ৬ জন) ভাগ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে সমগ্রের তুলনায় কোন কোন ক্ষুদ্রদল দুর্বল হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

জনসমর্থন নেই এবং জনগণ তাদের সাথে সহযোগিতা করে না বলে তারা গেরিলাদের অবস্থান সম্পর্কে যথাযথ খবর পাওয়া, অজানা-অচেনা এলাকায় যুদ্ধ করছে বলে তারা পথঘাট চেনেনা, ফলে তাদের অগ্রসরমান ইউনিটসমূহের মাঝে ফাঁক রয়ে যায়, ঘেরাও বলয়েও ফাঁক রয়ে যায়।

আমাদের গেরিলারা অগ্রসরমান পাক সামরিক দস্যুদের বিভিন্ন ইউনিটের ফাঁকের মাঝে অবস্থান করতে পারে, সবচাইতে দুর্বল ইউনিটকে অনুসন্ধান করে তাকে অনুসরণ করতে পারে, সুবিধামত স্থানে দস্যুদলটিকে কয়েকজন গেরিলা সমাবেশ করে অতর্কিতে হামলা করে ধ্বংস করতে পারে। আক্রান্ত ইউনিটের সহায়তায় অন্য কোন নিকটস্থ ইউনিট যাতে আসতে না পারে সেজন্য তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য গেরিলা নিয়োগ করা যায়। গেরিলারা দস্যুদলটিকে পরিপূর্ণভাবে ঘিরে ফেলবে, গুলির জাল তৈরি করবে, একটিও দস্যুও যেন বেরিয়ে না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। দ্রুত শত্রুদের খতম করে আহত, বন্দি, অস্ত্র, পোশাক নিয়ে সরে পড়তে হবে। সম্ভব হলে ও সুযোগ থাকলে অন্য দস্যু ইউনিটকে আক্রমণ করতে হবে।

চলমান শত্রুকে এভাবে আক্রমণের জন্য আমাদের শক্তিকে একত্রিত করতে হবে। আক্রমণ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গোপন থাকতে হবে, প্রয়োজন হলে ডাল-লতা-পাতা দিয়ে ছদ্মাবরণ তৈরি করতে হবে। ঝোপ-ঝাড়, বাঁশবন-কলার ঝাড়, জঙ্গল শত্রুর পথে পড়বে এরূপ বাড়িতে লুকিয়ে ওঁৎপেতে থাকতে হবে।

অনুসন্ধানের ভুলের জন্য বড় শত্রুকে আক্রমণ করে ফেললে বা অন্যকারণে দ্রুত খতম করা সম্ভব না হলে শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য অল্পসংখ্যক গেরিলা রেখে গেরিলাদের প্রধান অংশকে সরে পড়তে হবে। বাকিরা শেষে সরে পড়বে। পাক সামরিক দস্যুরা যখন কোন বিল্ডিং-এ ক্যাম্প করে বা বেশি সংখ্যায় অবস্থান করে তখন আমরা আক্রমণ করবো না। কেবলমাত্র চলমান শত্রুকে আমরা পূর্ব থেকে ওঁৎপেতে অতর্কিতে আক্রমণ করবো।

শত্রু খতম নিশ্চিত হলেই আমরা আক্রমণ করবো। শত্রুদের খতম করা, তাদের অস্ত্র দখল করা যায় না এরূপ অবস্থায় আমরা একটিও বুলেট নষ্ট করবো না, অর্থাৎ ক্ষয়কারক যুদ্ধ করবো না। শত্রু সম্পূর্ণ খতম হলেই তাদের অস্ত্র-গোলাবারুদ আমরা দখল করতে পারি, তাদের শক্তি কমিয়ে দিতে পারি, তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে পারি, জনগণ ও গেরিলাদের সাহস বাড়াতে পারি, শত্রুর অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমরাও শক্তিশালী হতে পারি।

শত্রু এগোয় আমরা পিছুই, শত্রু শিবির ফেলে আমরা হয়রানি করি, শত্রু ক্লান্ত হয়, আমরা আক্রমণ করি, শত্রু পালায় আমরা পিছনে ধাওয়া করি। যখন আমরা জিততে পারি তখন লড়ি, জেতার আশা না থাকলে সরে পড়ি। তারা (শত্রু) যখন আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে চায়, আমরা তখন লড়বো না, এমনকি, আমাদের খুঁজেও পায় না। কিন্তু আমরা যখন তাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই তারা যেন পালাতে না পারে এবং সঠিকভাবে আঘাত হানি ও নিশ্চিহ্ন করি। যখন আমরা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারি তখন করি, যখন পারি না তখন আমরা নিশ্চিহ্ন করার সুযোগ দেই না প্রভৃতি নীতিসমূহ আমাদের প্রয়োগ করতে হবে।

আমাদের আক্রমণের সাথে যুক্ত করতে হবে জনসাধারণের প্রতিরোধ। সমস্ত রাস্তা উপড়ে ফেলে ক্ষেত বানিয়ে ফেলো, শত্রুর আগমন পথে খাদ কেটে বাঁশের বা সুপারি গাছের বিশাক্ত শলা পুঁতে রেখে ঠিক রাস্তার মত বানিয়ে রাখো, শত্রুর চলার পথে পড়ে

www.pathagar.com

এরূপ খালের মধ্যে বিষাক্ত শলা পুঁতে রাখা, রাস্তায় গর্ত করে পায়ের মাপমত কাঠে লোহার শলা মেরে পুঁতে রাস্তার সমান করে ঢেকে রাখা, গ্রামের ঝোপ-ঝাড় থেকে বিষাক্ত তীর, ল্যাজা, বল্লম মারার ব্যবস্থা করা, রাস্তায় গ্রেনেডের ফাঁদ বানানো, মাইন পোঁতা, সম্ভব হলে ভীমরুল ড্রেইন করে তার ফাঁদ পেতে রাখা প্রভৃতি কাজে জনসাধারণের সাহায্যে করা যায়।

এভাবে গেরিলা ও জনগণের সমন্বিত যুদ্ধের ফলে পাকদস্যুদের ব্যাপকভাবে ক্ষতি করা সম্ভব। এ ধরনের সমন্বিত যুদ্ধ সম্ভব জাতীয় শত্রুমুক্ত আমাদের স্থায়ী বা অস্থায়ী ঘাঁটি এলাকায়, যেখানে জনগণ আমাদের পক্ষে এবং শত্রুর নিকট খবর যাবে না। এ কারণে সামরিক দস্যুদের ভুলিয়ে মুক্ত অঞ্চলের গভীরে নিয়ে আসতে হবে, তাদেরকে জনগণ ও গেরিলাদের সমন্বিত যুদ্ধের সমুদ্রে ফেলতে হবে।

এভাবে যদিও আমাদের অস্ত্র, সৈন্য-সংখ্যা কম ও তাদের মান নীচু কিন্তু অধিকাংশ গেরিলাদের একত্রিত করার পদ্ধতি, জনগণের যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং বিপ্লবী রাজনীতিতে দীক্ষিত, আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ গেরিলাদের একত্রিত করলে তা পাক সামরিক দস্যুদের দুর্বল অংশের তুলনা অনেকগুণ শক্তিশালী হয়। এভাবে সমগ্রের তুলনায় নিকৃষ্ট হলেও অংশের তুলনায় আমরা উৎকৃষ্ট, এভাবে তাদের ঘেরাও-দমনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা গ্রহণ করি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের নীতি কিন্তু তাদের দুর্বল অংশকে পাল্টা ঘেরাও ও ধ্বংস করে আমরা প্রয়োগ করি আত্মরক্ষার মাঝে আক্রমণের রণকৌশল।

যখন পাক সামরিক দস্যুরা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আক্রমণ করে, গেরিলাদের অঞ্চল ছোট, জনসাধারণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না, পাক সামরিক দস্যুদের বিভিন্ন ইউনিটসমূহের শক্তি ক্ষমতা আমাদের আক্রমণের ক্ষমতার চেয়ে বেশি, তখন আমাদেরকে গ্রুপে ভাগ হয়ে ঘেরাও বলয়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। আশেপাশের শত্রু অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধকে বিস্তৃত করে দিতে হবে। অনেক সময় নিকটবর্তী আমাদের অন্য অঞ্চল থাকলে সেখানে সরে যাওয়া যায়। শত্রু অঞ্চলে ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিক, সহানুভূতিশীল, তাও সম্ভব না হলে ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল, সবুজ শস্যের যবনিকার মাঝে আশ্রয় নেওয়া যায়।

ঘেরাও-দমন অভিযানে টিকতে না পারলে কোথায় স্থানান্তরিত করতে হবে সে বিষয়ে পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি থাকা উচিত। বাধ্য হয়ে স্থানান্তরিত হলে বিপর্যয়ের ও অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। ১ নং ফ্রন্ট এরিয়া থেকে পাক সামরিক দস্যুদের চাপের ফলে প্রত্যাহার এর উদাহরণ।

ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী, নিম্ন মাঝারী চাষী, শ্রমিকদের বাড়িতে গেরিলাদের থাকতে হবে (শত্রু এলাকায়, মুক্ত এলাকায়ও) তাদের মধ্যে থেকে গেরিলা সংগ্রহ করতে হবে, পার্টি গড়ে তুলতে হবে, তাদের ওপর সর্ববিষয়ে নির্ভর করে জাতীয় শত্রু খতম অভিযান চালিয়ে যেতে হবে। শত্রু এলাকায় উদ্যোগ, নমনীয়তা ও পরিকল্পনার সাথে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হবে।

বিভিন্ন গেরিলা ইউনিটসমূহকে যোগাযোগের স্থান, উপায়, দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। ঘেরাও-দমনের বাইরের শত্রু এলাকায় কাজ করার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি ইউনিটের স্বাধীনভাবে কার্যপরিচালনার ক্ষমতা। ঘেরাও উঠে গেলে গেরিলা বাহিনী পুনরায় তাদের ঘাঁটি এলাকায় ফিরে আসবে।

www.pathagar.com

এজন্য সমভূমিতে অস্থায়ী চরিত্রের ঘাঁটিতে বিরাট বিরাট স্টোর করা উচিত নয়, বহন করে নিয়ে যাওয়া যায় এরূপ মালপত্র রাখা উচিত। দখলকৃত দ্রব্যাদির মাঝে যা বিক্রয় করা যায় তা বিক্রি করতে হবে, যা জনগণের মাঝে বিতরণ করা যায় তা বিতরণ করতে হবে।

এ সকল অস্থায়ী ঘাঁটি এলাকায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। পার্টির নেতৃত্বে এক বা একাধিক শক্তিশালী নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে। এর মাঝেই নিহিত রয়েছে ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের চাবিকাঠি। স্থানীয় অনিয়মিত গেরিলাদের মধ্য থেকে উন্নতমানের গেরিলাদের নিয়ে নিয়মিত গেরিলাগ্রুপ গঠন, নিয়মিত গেরিলাগ্রুপ নিয়ে প্লাটুন, কয়েকটি প্লাটুন নিয়ে কোম্পানী-এভাবে সৈন্যসংস্থান গড়ে তুলতে হবে। এ সেনাবাহিনীর মাঝে পার্টি-সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, রাজনৈতিক কাজের ব্যবস্থা করতে হবে, যুদ্ধের মাধ্যমে একে পরিপক্ব করে তুলতে হবে, জনগণের মাঝে যুদ্ধ ছাড়াও প্রচার চালানো, তাদের মাঝে পার্টি-সংগঠন গড়ে তোলা, তাদের সশস্ত্র করা, তাদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েমে সহায়তা করা, তাদেরকে গণসংগঠনে সংগঠিত করা প্রভৃতি কাজে দক্ষ করে তুলতে হবে। এভাবে রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ, জনগণের সাথে যুক্ত, পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত একটি অজেয় বাহিনী গড়ে উঠবে।

অস্থায়ী বা স্থায়ী মুক্ত অঞ্চলে আমাদেরকে প্রকাশ্য কাজের সাথে গোপন কাজের সমন্বয় করতে হবে। ঘেরাও-দমন বা অন্যকোন কারণে আমাদের সেনাবাহিনী ও প্রকাশ্য কার্যরত কর্মীরা অন্যত্র চলে গেলেও গোপন কার্যরত কর্মীরা পার্টি-সংগঠন, গ্রাম রক্ষীবাহিনী, স্থানীয় গেরিলা গ্রুপ, গ্রাম পরিচালনা কমিটি এবং অন্যান্য গণসংগঠন তৈরি ও পরিচালনা করতে পারবে, উচ্চতর স্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবে। স্থায়ী বা অস্থায়ী মুক্ত এলাকায় এ কারণে পার্টি-সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। পার্টির কাজ কিছুটা প্রকাশ্য হলে মূল অংশ গোপন থাকবে। শত্রু এলাকার পার্টির কাজ সম্পূর্ণ গোপনে হবে। এর ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে ঘেরাও-দমনের ফলে নতুন জাতীয় শত্রুরা আমাদের ক্ষতি করতে না পারে বা আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট মুক্তিবাহিনী আমাদের এলাকা দখল করলেও যেন আমাদের কাজ চলতে পারে।

আমাদের নেতৃত্বে জাতীয়-শত্রুমুক্ত এলাকা বিস্তৃত হলে এক অংশে ঘেরাও-দমন হলে আমরা অন্য অংশে সরে যেতে পারি। ১ নং ফ্রন্ট এরিয়ায় আমাদের মুক্ত এলাকার এক অংশ পাক সামরিক দস্যুরা ঘেরাও করলেও কিছু অংশ ঘেরাও-দমনের বাইরে ছিল। একারণে সভাপতি মাও বলেছেন, 'গেরিলাদের সমভূমিতে টিকে থাকার প্রধান শর্ত হলো ঘাঁটি এলাকার বিস্তৃতি।'

কোন একটি এলাকায় গেরিলা তৎপরতা শুরু করার সাথে সাথেই বিস্তৃতির সমস্যার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। গেরিলা তৎপরতার সময় দূর-দূরান্ত থেকে জনগণ জাতীয় শত্রু খতমের তালিকা নিয়ে আসে এবং গেরিলাদের আমন্ত্রণ জানায়। গেরিলারা অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এ ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে, প্রথম অল্পদূরে এক-দুইদিনের জন্য যাবে, তারপর অধিক দিনের জন্য অধিক দূরে। এভাবে দূর-দূরাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধবিস্তৃত হবে। গেরিলা গ্রুপসমূহ স্বাধীনভাবে কাজ করতে শিখবে।

যে সকল অঞ্চল থেকে আমন্ত্রণ আসেনি কিন্তু আমাদের স্বার্থে গেরিলা যুদ্ধকে বিস্তৃত করা প্রয়োজন সেখানে প্রথমে প্রেরণ করতে হবে সন্ধানী অগ্রগামী দল বা কর্মী। এর কাজ হবে গোপনে ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিক ও সহানুভূতিশীলদের মাঝে

www.pathagar.com

কাজ করে জাতীয় শত্রুদের বিষয় অনুসন্ধান করা, গেরিলাদের থাকার ব্যবস্থা করা, স্থানীয় লোক সংগ্রহ করা। এই কাজের ভিত্তিতে আসবে গেরিলা দল। তারা জাতীয় শত্রু খতম করবে, সন্ধানী দল এগিয়ে যাবে। তার পিছনে যাবে গেরিলা দল, গেরিলা দলের পিছনে আসবে সংগঠক দল। সংগঠক দল বা ব্যক্তির কাজ হবে জাতীয় শত্রু খতম হয়েছে বা হচ্ছে এরূপ এলাকায় ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিকদের মাঝে পার্টি, গ্রামরক্ষী বাহিনী, স্থানীয় গেরিলা গ্রুপ, বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিকদের মাঝে পার্টিতে যোগদানে ইচ্ছুকদের মাঝে গড়ে তুলবে পাঠচক্র।

বিস্তৃতি উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনাহীনভাবে করা উচিত নয়। বিস্তৃতির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত বিভিন্ন গেরিলা অঞ্চল, ঘাঁটি এলাকা বা ফ্রন্ট এরিয়ার সাথে সংযোগ করা, মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের বড় সমাবেশ এড়িয়ে অগ্রসর হওয়া, গেরিলা যুদ্ধের জন্য সুবিধাজনক অঞ্চলের দিকে এগুনো ইত্যাদি।

আমাদের গেরিলা অঞ্চলগুলোর সাথে নদী-খাল যুক্ত। কাজেই নদী-খালে মাঝি, জেলে, চরের লোকদের মাঝে কাজ করে গেরিলা সংগ্রহ করতে হবে বা নৌকাসহ গেরিলাদের নদীতে নৌ-গেরিলা যুদ্ধের জন্য নিয়োগ করতে হবে। তারা নদীতে নৌকা ভাড়া খাটবে বা মাছ ধরে গেরিলা তৎপরতা চালাবে। নদী-খালসংলগ্ন সমভূমির গেরিলারা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সহজেই এ সকল নৌকায় যেতে পারবে। নৌ-গেরিলারা চরাঞ্চল, নদী-খালের উভয় পার্শ্বে, নদী-খালে স্বাধীনভাবে এবং সমভূমির সাথে সমন্বিত করে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে পারবে। শত্রুর যাতায়াত ব্যবস্থাকে ব্যাহত করতে সক্ষম হবে। এভাবে পূর্ব বাংলার বিশেষত সমভূমি আর নদী-খাল, উভয় অংশে সমন্বিতভাবে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করা হলে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে। শহরের গেরিলারা গ্রাম এবং নদীর গেরিলাদের অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা জাতীয় শত্রুদের খতম করবে। এভাবে গ্রামের বিপ্লবী যুদ্ধের সাথে শহরের কাজকে সমন্বিত করতে হবে।

৫

আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিশেষ কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী, শ্রমিক, যুবলীগ, পার্টির নেতৃত্বে গণসংগঠনের লোক ব্যতীত সরাসরি কাউকে গেরিলা দলে রিক্রুট না করা, গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী, প্রাক্তন আওয়ামী লীগ, মুক্তিবাহিনী ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের মাঝে ইচ্ছুকদের প্রথমে যথাযথ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে পাঠচক্র সংগঠিত করতে হবে, সেখানে তারা কৃষকদের মাঝে কাজ করবে, পার্টির লাইনে শিক্ষা গ্রহণ করবে, গেরিলাদের সাথে অপারেশনে যাবে। এ প্রক্রিয়ায় যারা পার্টিতে যোগদানের যোগ্য তাদেরকে গেরিলা বাহিনীতে সংগ্রহ করা যায়। পাঠচক্র বা পার্টিতে যোগদানে ইচ্ছুক নয় এরূপ বুদ্ধিজীবী, জমিদার, ধনী চাষী, মাঝারী চাষী ও অন্যান্য শোষকশ্রেণী থেকে আগতদের গেরিলা হিসেবে সরাসরি সংগ্রহ করা বন্ধ করতে হবে, সংগৃহীত হয়ে থাকলে বের করে দিতে হবে। আলোচনার বিষয়ে আলোচনা সংক্রান্ত নীতি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

যে সকল এলাকায় আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা রয়েছে সেখানে গেরিলা ও পার্টি-কর্মীরা কঠোরভাবে গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করবে, প্রধানত শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষীদের ওপর নির্ভর করবে, তাদের বাড়িতে ছড়িয়ে থাকবে, তাদের মাঝে পার্টি গেরিলা সংগঠন গড়ে তুলবে, তাদের ওপর নির্ভর করে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কাজ করবে।

www.pathagar.com

কৃষকরাই হচ্ছে গ্রামের সবচাইতে বিপ্লবী শ্রেণী। জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ মূলত এদেরই যুদ্ধ। আমরা কতখানি এদের ওপর নির্ভর এদের জাগ্রত ও সংগঠিত করি তার ওপর নির্ভর করছে আমাদের অস্তিত্ব ও বিপ্লবের বিজয়।

গ্রাম্য এলাকায় ক্ষেতমজুর, গরিব চাষীদের মাঝে জাতীয় শত্রুদের ভূমি বিনামূল্যে বিতরণ এবং দেশপ্রেমিক জমিদার-জোতদার-সুদখোরদের শোষণ কমানো দৃঢ়ভাবে কার্যকরী করতে হবে। ভূমি বিতরণ ও সামন্তবাদী শোষণ কমানোর কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে কৃষক-জনতা একচেটিয়াভাবে আমাদের সমর্থন করবে। আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলরা এ কর্মসূচির বিরোধিতা করে কৃষকের শত্রু বলে পরিচিত হবে। ইহাই হবে তাদের সাথে আমাদের কাজের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য।

এদের ওপর নির্ভর করে ছয় পাহাড়ের দালালদের গেরিলা তৎপরতা পরিচালনা করে ধ্বংস করা যায়। জনগণের ওপর নির্ভর করে আমাদের ১৭ জন গেরিলা এই প্রতিক্রিয়াশীলদের ২৮৭ জনকে আক্রমণ করে, ৫ জনকে হত্যা করে, বাকিরা প্রাণভয়ে পালায়। শেষ পর্যন্ত তারা পাক সামরিক দস্যুদের হাতে নিহত হয়। আমাদের মুক্ত এলাকায় ঢুকে পড়া আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পরে উল্লেখিতভাবে গেরিলা তৎপরতা চালাতে পারি এবং তাদেরকে উৎখাত ও বিতাড়িত করে আমাদের এলাকায় আমাদের অধিকার কায়েম রাখতে পারি।

৬

সম্প্রতি আমাদের গেরিলাদের মাঝে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সমভূমিতে গেরিলা যুদ্ধ টিকিয়ে রাখা যাবে কিনা, আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের হামলার মোকাবেলা করা এবং তাদের উপস্থিতি রয়েছে এরূপ অঞ্চলে কাজ করা যাবে কিনা।

সমভূমিতে গেরিলা যুদ্ধ টিকিয়ে রাখা যাবে কিনা এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে ১ নং ফ্রন্ট এরিয়ায় পাক সামরিক দস্যুদের ঘেরাও-দমন অভিযানের তীব্রতা ও নির্মমতা এবং কর্মীদের বই পড়ে সৃষ্ট, পার্বত্য অঞ্চল গেরিলা যুদ্ধের জন্য সুবিধাজনক এ ধারণা থেকে। শেষোক্ত প্রশ্নটি উদ্ভব হয়েছে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সর্বত্র উপস্থিতি, তাদের 'নকশাল পেলেই খতম কর নীতি এবং ১ নং ও অন্যান্য ফ্রন্ট এরিয়ায় আমাদের ইউনিটসমূহকে ঘেরাও ও নিরস্ত্র করা, কর্মীদের বন্দি ও হত্যা করা, শেষ পর্যন্ত গেরিলাদের বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে প্রত্যাহারের কারণে।

পূর্ব বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলই সমভূমি এবং নদীমাতৃক। পূর্ব বাংলার বিপ্লবের জয়-পরাজয় নির্ভর করছে এ সমভূমি ও নদীসমূহে গেরিলা যুদ্ধ সূচনা করা, টিকিয়ে রাখা, বিকশিত করার সমস্যার সমাধানের ওপর।

গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে সমভূমিতে অস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা বা পরিবর্তনশীল যুক্ত এলাকা স্থাপন করা যায়। ১ নং, ২ নং, ৫ নং, পাবনা এবং টাঙ্গাইলের ফ্রন্ট এরিয়াসমূহ তার প্রমাণ। এ সকল এলাকা জাতীয় শত্রু মুক্ত, গেরিলারা অবাধে বিচরণ করে, রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম হচ্ছে না হয়েছে।

১ নং ফ্রন্ট এরিয়া ও অন্যান্য ফ্রন্টের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে পাক সামরিক দস্যুদের ঘেরাও-দমন আমাদের ধ্বংস করতে পারে না, ঘেরাও-দমন পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ভেঙ্গে ফেলতে না পারলেও, ঘেরাও-দমনের বলয় অতিক্রম করে নতুন অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ সম্প্রসারিত করা ও টিকে থাকা যায়। এভাবে ১ নং ফ্রন্ট এরিয়ার ঘেরাও-দমনের পর বরিশাল জেলার কয়েকটি অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ বিস্তৃতি লাভ করে, গেরিলারা টিকে থাকে।

www.pathagar.com

কিন্তু গেরিলাদের মাঝে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলরা ছিল যারা ভারত-প্রত্যাগত মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে যোগ দেয় এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমাদের গেরিলাদের অবস্থান জানিয়ে দেয়। কোন কোন এলাকায় প্রতিক্রিয়াশীল জোতদার-জমিদার, বুদ্ধিজীবীরা আমাদের খবর আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের দিয়ে দেয়। এর ফলে আমাদের প্রচুর ক্ষতি হয়।

গেরিলা গ্রুপসমূহে পার্টি-সংগঠন না করা, গেরিলাদের রাজনৈতিক শিক্ষা না দেওয়া, নেতৃত্বের সমরবাদ, কমান্ডার-রাজনৈতিক কমিসারদের উচ্চস্তর ও সদস্যদের সাথে ভাল সম্পর্ক না থাকা, জনসাধারণের মাঝে কাজ না করা, কৃষকের ওপর সর্ববিষয়ে নির্ভর না করা, গেরিলাদের অবস্থানের বিষয় এবং উচ্চস্তর-নিম্নস্তরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথাযথ গোপনীয়তা বজায় না রাখা প্রভৃতি এ বিপর্যয়ের কারণ। কাজেই উপরিউক্ত কারণসমূহ দূর করলেই আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতা ও দলত্যাগী বন্ধ হবে এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেউ আমাদের খতম করতে পারবে না।

উপরন্তু সরাসরি সংগ্রহ করতে হবে, ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিক, যুবলীগ ও পার্টির নেতৃত্বাধীন গণসংগঠনের বিপ্লবীদের মধ্য থেকে। বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের মাঝে যারা পাঠচক্রে যোগদানের মাধ্যমে পার্টিতে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করে তারাই গেরিলা বাহিনীতে যেতে পারে।

গেরিলা ও পার্টি-কর্মীদের ক্যাম্প করে থাকার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে, ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিকদের বাড়িতে ছড়িয়ে থাকতে হবে, তাদের সাথে শ্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে, তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে, এভাবে কর্মীদের পুনর্গঠন এবং কৃষকের ওপর নির্ভরতা জন্মাবে এবং জনগণের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

এভাবে কৃষক-শ্রমিক-বিপ্লবীদের সমন্বয়ে জনগণের সাথে যুক্ত একটি অপরাজেয় বাহিনী গড়ে উঠবে। আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলরা, জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা নৌকায় থাকে বা জোতদার-মহাজনদের বাড়িতে থাকে। তারা গেরিলা সংগ্রহ করে, কমপক্ষে অষ্টমশ্রেণী পাস বুদ্ধিজীবী থেকে। অর্থাৎ জোতদার, মহাজন, ধনী চাষী, বুর্জোয়াদের ছেলেদের থেকে।

গ্রাম্য এলাকায় ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিকদের সমাজ জোতদার-জমিদার-ধনী চাষীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের পক্ষে সহজেই ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিকদের মাঝে গোপন কাজ করা, গেরিলা সংগ্রহ করা, জাতীয় শত্রু খতম করা, পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা, আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের খতম করে নিরস্ত্র করা সম্পূর্ণ সম্ভব।

আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনী রয়েছে এরূপ অঞ্চলে কঠোরভাবে গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করতে হবে, একজন একজন করে গেরিলা সংগ্রহ করতে হবে। গোপনে থাকতে হবে, প্রয়োজনবোধে থাকার স্থান গোপন রাখার জন্য প্রতিনিয়ত স্থান পরিবর্তন করে থাকা যায়। থাকার স্থানে রাতে প্রবেশ করা আবার শেষরাতে বেরিয়ে আসা, দিনে প্রয়োজন হলে মাচার ওপর থাকা প্রভৃতি পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। গেরিলাদের গোপনীয়তা সম্পর্কে ট্রেনিং দেওয়া। ফিস ফিস করে প্রচার, পোস্টার, লিফলেট মারফত প্রচার চালানোর পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

www.pathagar.com

এক গ্রামের ক্ষেতমজুর-গরিব চাষীদের সাথে অন্য গ্রামের ক্ষেতমজুর-গরিব চাষীদের আত্মরক্ষা, পরিচয় রয়েছে। এভাবে এক গ্রামে কৃষকের মাধ্যমে গ্রামের পর গ্রামে গেরিলা গ্রুপ গঠন, পার্টি-সংগঠন গড়ে তোলা, জাতীয় শত্রু খতম করা, গেরিলা তৎপরতাকে বিস্তৃত করা যায়। এ সকল কাজে ঐ ধরনের বুদ্ধিজীবী লাগাতে হবে যারা সহজেই ক্ষেতমজুর, গরিব চাষীদের মত জীবনধারণ করতে পারে ও কঠোর গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করতে পারে।

যে সকল অঞ্চলে মুক্তিবাহিনী স্থায়িভাবে থাকে না, কিন্তু আনাগোনা করে সেখানেও ওপরের পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। ঢাকার নিকটে তিনটি অঞ্চলে এভাবে কাজ হচ্ছে। আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের নাকের ডগায় আমাদের কাজ হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা আমাদের সহানুভূতিশীল বা কর্মীদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এদের নিরস্ত্র ও উৎখাত করার কাজ অচিরেই শুরু হচ্ছে।

অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে রিক্রুটমেন্ট এবং কাজের বেলায় উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করলে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের এলাকায় তারা আনাগোনা করে এরূপ এলাকায় আমাদের গেরিলা যুদ্ধকে বিস্তৃত করা ও টিকিয়ে রাখা এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলদেরকে বিতাড়িত করে তাদের এলাকা দখল করা যায়।

আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলরা সাধারণত নৌকায় অবস্থান করে, চলমান অবস্থায় থাকে। তারা সাধারণত সামন্ত, জমিদার, ধনীচাষীদের বাড়িতে ওঠে, বেপরোয়া পান-ভোজ চালায়, অর্থের বিনিময়ে জাতীয় শত্রু ছেড়ে দেয়, তাদের বাড়িতে থাকে, জোর করে অর্থ সংগ্রহ করে, কখনও কখনও গরিব লোকদের বাড়িতে উঠে মাঝিদের বিনা পয়সায় কাজে লাগায়, জনগণকে অস্ত্র বহনে বাধ্য করে, মেয়েদের ওপর নির্যাতন করে, ডাকাতি করে, জনগণের ধন-সম্পত্তি নষ্ট করে, বিশেষ করে পাট পুড়িয়ে দেয়, ফসল নষ্ট করে।

প্রায় ক্ষেত্রেই মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা হচ্ছে জমিদার-জোতদার-ধনী চাষী, বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ শোষক শ্রেণীর সন্তান। তারা স্থানীয় ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী, নিম্ন মাঝারী চাষী, শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখার জন্য বন্দুক ব্যবহার করে।

তারা শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে যাকে খুশি তাকেই হত্যা করে, এমনকি নিজেদের লোকদেরও হত্যা করে। তারা জনসাধারণের মাঝে প্রচার, তাদেরকে সশস্ত্র করা, তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি কাজ করে না।

তারা দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে নিরস্ত্র ও খতম করার পথ গ্রহণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে তারা তথাকথিত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্দেশে ছয় পাহাড়ের স্বার্থে কাজ করছে।

এ সকল কারণে জনসাধারণ অধিকাংশ এলাকায় তাদের উপর ক্ষুব্ধ এবং তাদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। কোন কোন এলাকায় জনগণ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের খতম করলে পুরস্কার দিতে ইচ্ছুক। তারা পাক সামরিক দস্যু ও মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল দস্যুদের উভয়কেই উৎখাত করতে চায়। এ প্রতিক্রিয়াশীল দস্যু বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের মাঝে প্রায় ক্ষেত্রেই কোন সংযোগ নেই। তারা নিজেদের মাঝে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে নিরস্ত্র করে বা হত্যা করে।

পাক সামরিক দস্যুদের ঘেরাও-দমন বা 'খোঁজ কর, ধ্বংস কর' অভিযান মোকাবিলা করার জন্য যে সামরিক নীতি ও কৌশল, মনোবল, জনগণের ওপর নির্ভরতা প্রয়োজন তাদের নেই, যদিও তাদের আধুনিক অস্ত্র ও লোকবল রয়েছে।

www.pathagar.com

যে সকল জাতীয় শত্রুদের বাড়িতে তারা থাকে বা যাদেরকে তারা ছেড়ে দেয় তারাই সামরিক দস্যুদের ডেকে এনে তাদেরকে খতম করবে। কোন কোন এলাকায় জনসাধারণও তাদের বিরুদ্ধে সামরিক দস্যুদের সাথে সহযোগিতা করবে।

পাক সামরিক দস্যুদের শীতকালীন অভিযানের মুখে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল দস্যু বাহিনীর বড় বড় ইউনিটসমূহের টেকা সম্ভব হবে না। তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে, অনেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে, ভারতে চলে যাবে। ইতিমধ্যেই পরবর্তী বর্ষায় আসবে বলে অনেকেই ভারতে চলে যাচ্ছে। ঢাকা শহরে এভাবে গ্রেপ্তারের ফলে বিভিন্ন ইউনিট সদস্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

এর ফলে মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল দস্যু বাহিনীর সৃষ্ট আমাদের উপরস্তু চাপ কমে যাবে।

এরূপ অবস্থায় এ দস্যুবাহিনীর সদস্যদের নিকট থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা, তাদের পরিত্যক্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। আমাদের পুরনো এলাকায় পুনরায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে।

৮

উপরিক্ত বিষয়সমুহ গভীরভাবে পর্যালোচনা করা এবং সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করা হলে আমরা অবশ্যই সক্ষম হবো আমাদের বিকাশ ও গতিকে বজায় রাখতে, আরো জটিলতার সমস্যার মোকাবিলা করে বিজয় অর্জন করতে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৫

পূর্ব বাংলার বীর জনগণ, আমাদের সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি, পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মহান সংগ্রাম চালিয়ে যান!

(মার্চ ১৯৭২)

(১৯৭২-এর মার্চ মাসে প্রকাশিত এবং ১৯৭৪-এর মার্চে চূড়ান্তভাবে সংশোধিত এ দলিলটি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক ঢাকা দখলের মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সর্বহারা পার্টির সার্বিক রণনৈতিক বক্তব্য সম্পন্ন দলিল। এ রণনীতির ভিত্তিতেই পার্টির কাজের অগ্রগতি ঘটে, ১৯৭১-এর প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে পার্টি বিকশিত হয়ে ওঠে, দেশব্যাপী জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে এবং এভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার পুতুল মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত জনগণের জাতীয় মুক্তি যুদ্ধকে নেতৃত্ব দেয়)

১

পূর্ব বাংলার জনগণ বৃটিশ উপনিবেশিক দস্যু, তাদের ওপর নির্ভরশীল প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার-জোতদার, পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং এ শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির জন্য পাকিস্তানে যোগদান করে।

পাকিস্তানের সামরিক ফ্যাসিস্টরা পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় বিকাশে অবাধে চলতে দেয়ার পরিবর্তে পূর্ব বাংলাকে শোষণ ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করে, একে তার উপনিবেশে পরিণত করে।

পূর্ব বাংলার জনগণ এ উপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির জন্য মহান সংগ্রাম পরিচালনা করে, লক্ষ লক্ষ জনগণ এ সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দেয়। পূর্ব বাংলার জনগণের এ মহান সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণী মণি সিং-মোজাফফর সংশোধনবাদী, পূর্ব বাংলার লিউশাওচী-ক্রুশ্চেভ হক-তোয়াহা, পূর্ব বাংলার নাম্বুদ্রিপদ-জ্যোতিবসু, দেবেন-বাসার, কাজী-রনো, পূর্ব বাংলার ট্রটস্কি-চে মতিন-আলাউদ্দিন প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। এরা সকলেই পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণী ও জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

ফলে পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া, সামন্তবাদী ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। তারা এ সংগ্রামকে বিপথে পরিচালনা করে। প্রথমে তারা পার্লামেন্টারী নির্বাচনের কানা গলিপথে জনগণকে পরিচালনা করে, এ পথের দেউলিয়াত্ব প্রমাণিত হলে তারা জনগণকে, অহিংস অসহযোগের ভুল পথে পরিচালনা করে, পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টরা জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে এ পথেও দেউলিয়াত্ব প্রমাণিত হয়, জনগণ সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। তারা বিচ্ছিন্নভাবে

www.pathagar.com

কোনো কোনো স্থানে এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়, কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার জনগণকে অসহায়ভাবে রেখে তারা ভারতে পলায়ন করে।

মীরজাফর ক্ষমতার লোভে বৃটিশ দস্যুদের নিয়ে আসে, তাদের হাতে শেষ পর্যন্ত তুলে দেয় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা। এ ইতিহাস পরিবর্তিত অবস্থায় পুনরাবৃত্তি লাভ করে ১৯৭১ সালে। পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী ও সামন্তবাদীদের প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ ও মণি সিং-মোজাফফর বিশ্বাসঘাতক চক্র নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে পূর্ব বাংলা মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতার লোভে সাড়ে সাত কোটি জনগণের জাতীয় স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। বাঙালি জাতির আত্মমর্যাদাকে পদদলিত করে পূর্ব বাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিকট বিক্রি করে দেয়, পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের উৎখাতের জন্য তাদেরকে ডেকে আনে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তা ও সমর্থনে এ সুযোগ গ্রহণ করে। তারা পূর্ব বাংলা দখল করার জন্য বাংলাদেশে পুতুল সরকার গঠন করে একে শিখণ্ডী হিসেবে দাঁড় করায়, কামানের খোরাক হিসেবে ব্যবহারের জন্য তারা সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে তাঁবেদার মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলে, তাদেরকে পূর্ব বাংলায় নাশকতামূলক তৎপরতা চালাবার জন্য প্রেরণ করে। শেষ পর্যন্ত তারা পাকিস্তান আক্রমণ করে এবং সশস্ত্র আগ্রাসী বাহিনী দ্বারা পূর্ব বাংলা দখল করে নেয় এবং আওয়ামী লীগ বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা পুতুল সরকার কায়েম করে।

এভাবে পূর্ব বাংলা ভারতের উপনিবেশে রূপান্তরিত হয় এবং পূর্ব বাংলার জনগণ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক জনগণের রক্তপাত বৃথা যায়।

আওয়ামী লীগ তার নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনী ও অন্যান্য সংগঠন, মোজাফফর, ন্যাপ, মণি সিং-মোজাফফর কমিউনিস্ট নামধারী সংশোধনবাদী বুর্জোয়া উপদল, এর নেতৃত্বাধীন সংগঠনসমূহের মধ্যকার প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী ও সামন্তবাদীরা সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ এবং পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ এ ছয় পাহাড়ের স্বার্থ রক্ষা করছে। এরা এই ছয় পাহাড়ের দালাল। বাংলাদেশ পুতুল সরকার এ ছয় পাহাড়ের স্বার্থ রক্ষা করছে। দেবেন-বাসার, কাজী-রনো, জ্যোতিবসু-নাম্বুদ্রিপদ উপদল ছয় পাহাড়ের দালালদের তাঁবেদারে পরিণত হয়েছে এবং ছয় পাহাড়ের দালালি করছে।

২

পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশ স্থাপনের একটি উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলার পাট, চা, চামড়া ও অন্যান্য কাঁচামাল, মাছ, মাংস, ডিম, চাল, তরিতরকারি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, সাড়ে সাতকোটি লোকের বাজার, সস্তা শ্রমশক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, পূর্ব বাংলার গ্যাস, বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রশাসন ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সকল ক্ষেত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও তা লুণ্ঠন করা। ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট হ্রাস করা।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের পূর্ব বাংলায় উপনিবেশ স্থাপনের অপর এক উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম, নাগা-মিজো, কাশ্মীরীদের মুক্তি সংগ্রাম ধ্বংস করা, ভারত মহাসাগরে ও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভুত্ব করা।

www.pathagar.com

সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে সহায়তা ও সমর্থন করেছে ভারতের ওপর তার আধিপত্য জোরদার করা, পূর্ব বাংলা লুণ্ঠনের বখরা নেয়া, ভারত মহাসাগরের কর্তৃত্ব করা, এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং চীন ও কমিউনিজম প্রতিহত করার জন্য।

৩

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা নির্মম শোষণ ও লুণ্ঠন শুরু করে দিয়েছে। এ শোষণ ও লুণ্ঠন আরো জোরদার করার জন্য তারা সীমান্ত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করছে।

পূর্ব বাংলার মাছ-মাংস-ডিম, তরিতরকারি, ধান-চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রত্যহ ট্রাক-ট্রেন, জাহাজে ভারতে যাচ্ছে। বাজার করার জন্য কলিকাতা থেকে ভারতীয় নাগরিকরা পূর্ব বাংলার সীমান্ত শহরগুলোতে আসছে। এভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পূর্ব বাংলার খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পূর্ব বাংলা দখলের সময় শতসহস্র মণ পাট, চা, চামড়া ও অন্যান্য শিল্পের কাঁচামাল লুট করে। ভারত কর্তৃক কাঁচামাল, বিশেষ করে পাট ক্রয়ের ওপর থেকে বাংলাদেশ পুতুল সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। এর ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অবাধে পূর্ব বাংলার শিল্পের কাঁচামাল, পাটক্রয় করা এবং বিদেশে রপ্তানির সুযোগ পাচ্ছে। এভাবে পূর্ব বাংলার কাঁচামাল বিশেষ করে পাটের ওপর ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ ও লুণ্ঠন প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের সাথে পূর্ব বাংলার পাটের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়েছে। পূর্ব বাংলার জনগণ কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পূর্ব বাংলার বহু গোটা শিল্প প্রতিষ্ঠান, যন্ত্রপাতি, খুচরা অংশ ভারতে পাচার করেছে, পূর্ব বাংলার অসংখ্য গাড়ি, স্বর্ণ, রৌপ্য, পূর্ব বাংলার বাজারের বৈদেশিক দ্রব্যাদিও তারা পাচার করেছে। এর ফলে বহু শিল্প-কারখানা চালু করা বা পুরো উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। তারা পূর্ব বাংলার বিদ্যুৎ-গ্যাস ভারতীয় শিল্পে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাচ্ছে।

এ সকলের উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলার শিল্প-কারখানা ধ্বংস করা, এর বিকাশ ব্যাহত করা এবং ভারতীয় শিল্পের সাথে পূর্ব বাংলার শিল্প যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে তা নিশ্চিত করা।

তাদের অপর এক উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলার শিল্পকে ভারতের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা। এ উদ্দেশ্যে তারা ভারত থেকে বিদ্যুৎ, তৈল, কাঁচামাল ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল করে পূর্ব বাংলার সীমান্ত এলাকার শিল্পসমূহ চালু করার চেষ্টা করছে।

ভারতীয় পণ্যে বাজার ছেয়ে গেছে। এ সকল পণ্যদ্রব্য নিম্নমানের কিন্তু উঁচু মূল্যের। পূর্ব বাংলার জনগণ বাধ্য হচ্ছে এগুলো কেনার জন্য। এভাবে পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনগণের বাজার দখল করছে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা এবং কোটি কোটি টাকার মুনাফা লুটছে।

ভারত থেকে পণ্যদ্রব্য আমদানি, তা বাজারে বিক্রয় করা এবং পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরে থেকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও ভারতে রফতানির বিরাট প্রক্রিয়ার ফলে পূর্ব বাংলার গোটা ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা আত্মসমর্পণকারী পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের শত শত কোটি টাকার অস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ভারতে নিয়ে যায়। এভাবে পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের ন্যায্য পাওনা অস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য থেকে বঞ্চিত হয়।

www.pathagar.com

পূর্ব বাংলার পুনর্গঠনের বিরাটাকার কাজগুলো ভারতীয় কোম্পানিসমূহ লাভ করেছে। ফলে পূর্ব বাংলার প্রতিষ্ঠানসমূহ বঞ্চিত হচ্ছে। ভারতীয় চলচ্চিত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা, পাঠ্যপুস্তক পূর্ব বাংলার বাজার দখল করছে এবং এসকল ক্ষেত্রে নিয়োজিত পূর্ব বাংলার প্রতিষ্ঠানসমূহ এর ফলে মারাত্মক সংকটে পড়ছে।

তারা বৃটিশ উপনিবেশবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের ওপর নির্ভরশীল প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথের জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি-সাহিত্য দ্বারা পূর্ব বাংলার বাজার দখলের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যাতে তাদের শোষণ ও লুণ্ঠন মেনে নেয়ার পক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়। পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ ব্যাহত হয় এবং তাদের আর্থিক লাভ হয়।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা বাংলাদেশ পুতুল সরকার দ্বারা মুদ্রামান হ্রাস করে এবং ভারতীয় মুদ্রা অবাধে চালু করে, পূর্ব বাংলার মুদ্রাকে ভারতীয় মুদ্রার ওপর নির্ভরশীল করে ফেলেছে এবং বিরাটাকার মুনাফা লুটছে। যৌথভাবে কাজ করা, পরামর্শদাতা, উপদেষ্টা, সাহায্যদাতা প্রভৃতির ছদ্মবেশে তারা উদ্বৃত্ত কর্মচারী ও বেকার যুবকদের পূর্ব বাংলার সরকারি-আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে নিয়োগ করে তা নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সংশ্লিষ্ট ভারতীয় বিভাগের অধীনস্ত সংস্থায় রূপান্তরিত করেছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা স্মরণার্থীর বেশে ভারতীয় নাগরিক, যুব কংগ্রেসের সশস্ত্র গুণ্ডা-গোয়েন্দাদের বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে। তারা ছাত্রলীগ, মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশের মধ্যে তার এজেন্ট অনুপ্রবেশ করিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করছে।

ভারতে যায়নি এ অজুহাতে দেশপ্রেমিক কর্মচারীদের তারা পুতুল সরকারের মাধ্যমে ছাঁটাই করাচ্ছে। দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং বিভিন্ন পেশার লোকদের হয়রানি করছে, তাদের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। তারা পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের প্রাক্তন দালাল যারা ভারতের তাঁবেদার হতে ইচ্ছুক তাদেরকে চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে দিচ্ছে।

অতীতে পাক সামরিক ফ্যাসিস্টরা উর্দু ভাষাভাষীদের মধ্যকার প্রতিক্রিয়াশীলদের মাধ্যমে সাধারণ উর্দুভাষী জনগণকে প্রতারিত করে, তাদের কিছু অংশকে হাত করে এবং বাঙালি জনগণের ওপর অত্যাচার চালায়।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরাও একইভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বী জমিদার-জোতদার, পুঁজিপতি, বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ টাউটদের ওপর নির্ভর করে সাধারণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণকে প্রতারিত করে, পূর্ব বাংলার হিন্দু-মুসলিম জনগণের ঐক্যকে বিনষ্ট করে জনগণের এক অংশকে হাত করে অন্য অংশের ওপর শোষণ ও লুণ্ঠন চালাবার চক্রান্ত করছে।

পূর্ব বাংলার কোথাও কোথাও হিন্দু ধর্মাবলম্বী জমিদার-জোতদার, পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যকার ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দালাল প্রতিক্রিয়াশীল অংশ এবং টাউটরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ধর্মালম্বী জনগণের সাংস্কৃতিক ও আচার-ব্যবহারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে, জোর করে তাদের বিক্রয় করা সম্পত্তি দখল করছে।

এভাবে পূর্ব বাংলায় ধর্মীয় বৈষম্য এবং কোথাও কোথাও মুসলিম জনগণের ওপর ধর্মীয় নিপীড়নের ষড়যন্ত্র চলছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ এবং পূর্ব বাংলার মুসলিম ধর্মাবলম্বী প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার-জোতদার, পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবীদের

www.pathagar.com

মধ্যকার তার দালাল অংশ (পি.ডি.পি. জামায়াত, মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগের একাংশ) এ ধর্মীয় নিপীড়নের সুযোগ গ্রহণ করে সাধারণ দেশপ্রেমিক হিন্দু জনগণ বিরোধী দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক সংঘাত বাধাবার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে এবং এর সহায়তায় পূর্ব বাংলায় তার উপনিবেশ স্থাপনের চক্রান্ত করছে। তথাকথিত মুসলিম বাংলার দাবি এ ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ।

৪

১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতের সংশোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণীর নিপীড়নের একটি রূপ ধর্মীয় নিপীড়নের বিরোধিতা করেনি। ফলে পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগণ বৃটিশ-উপনিবেশিক দস্যু ও তাদের ওপর নির্ভরশীল হিন্দু ধর্মাবলম্বী প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার-জোতদার-পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিশেষ করে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক মুসলিম সামন্তবাদী, বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের পাকিস্তান দাবি সমর্থন করে এবং পাকিস্তানে যোগদান করে। এর ফলে পাক-ভারত উপমহাদেশকে বিভক্ত করে তার সমর্থকদের দ্বারা শোষণ ও লুণ্ঠন করার বৃটিশ দস্যুদের চক্রান্ত সফল হয়।

বর্তমানেও পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার দালালদের ধর্মীয় নিপীড়ন এবং এর সুযোগ গ্রহণ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের দাঙ্গা, রায়ট বাধানো এবং পূর্ব বাংলায় তার উপনিবেশ স্থাপনের চক্রান্তকে পূর্ব বাংলার জনগণ যদি বিরোধিতা না করেন, তবে পূর্ব বাংলায় দাঙ্গা, রায়ট ও সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ স্থাপনের সম্ভাবনা জোরদার হবে।

অতীতের মতো বর্তমানেও বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতকরা এ প্রশ্নে নীরব থেকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্প্রদায়িক ও উপনিবেশিক চক্রান্তকে সহায়তা করছে।

৫

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা প্রচার করছে তাদের আগ্রাসী বাহিনী যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তা সম্পন্ন হওয়ায় তারা ভারতে ফিরে গেছে। তারা যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তাহলো পূর্ব বাংলায় তার উপনিবেশ স্থাপন করা, তার তাঁবেদার ছয় পাহাড়ের দালালদের ক্ষমতায় বসানো। তার তাঁবেদার বাহিনী ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, রক্ষীবাহিনী, পুলিশ তারা স্বার্থ রক্ষার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ায় বিপুল পরিমাণে ভারতীয় সৈন্য রাখা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তারা বাঙালিদের দ্বারা বাঙালি দমন করে শোষণ ও লুণ্ঠন চালাতে চায়।

তারা শিক্ষাদাতা, উপদেষ্টা, গোয়েন্দা এবং তাঁবেদারদের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ওপর সামরিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চায়। উপরন্তু পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষা ভারতের ওপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষা ভারতের নিয়ন্ত্রণে-এ সত্য বাংলাদেশ পুতুল সরকার বহু বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে। পূর্ব বাংলার জনগণ ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম দমনের জন্য বহু সৈন্য প্রেরণ করেছে, এমনকি বিমানবাহিনী পর্যন্ত ব্যবহার করেছে।

এভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পূর্ব বাংলার সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, লুণ্ঠন, শোষণ ও নির্যাতন প্রতিষ্ঠা করেছে, পূর্ব বাংলাকে তার উপনিবেশে পরিণত করেছে এবং পূর্ব

www.pathagar.com

বাংলাকে তাদের পশ্চাদভূমিতে রূপান্তরিত করেছে। বাংলাদেশ সরকার তার[illegible] ব্যতীত আর কিছুই নয়। ছয় পাহাড়ের দালালরা প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তির মা[illegible] শোষণ ও লুণ্ঠন নিয়ন্ত্রণের, নির্যাতনের সুযোগ করে দিয়েছে, পূর্ব বাংলাকে ভারত[illegible] সম্প্রসারণবাদীদের নিকট বিক্রি করে দিয়েছে।

অতীতে জাপানি ফ্যাসিস্টরা এশিয়াসহ উন্নত অঞ্চল গড়ে তোলার শ্লোগানকে উপনিবেশ স্থাপনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। বর্তমানে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরাও তাদের অনুকরণে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগানকে তার উপনিবেশ স্থাপনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের এ উপনিবেশে লুটের ভাগ বসাচ্ছে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিনের নেতৃত্বে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরা। তারা ঋণ প্রদান, অসম বাণিজ্যচুক্তি প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের লুণ্ঠন চালাচ্ছে।

এভাবে পূর্ব বাংলার জাতীয় বিপ্লব অর্থাৎ পূর্ব বাংলা থেকে বৈদেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের অবসান এবং স্বাধীন-সার্বভৌম পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

সামন্ত, জমিদার-জোতদারদের উৎখাত করে কৃষকদের মাঝে ভূমি বিতরণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মহান দায়িত্বও অসমাপ্ত রয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ছয় পাহাড়ের দালালরা প্রতিক্রিয়াশীল গ্রাম্য সামন্ত, জমিদার-জোতদার-মহাজন-টাউট ও অত্যাচারীদের শাসন কায়েম করেছে। এদেরকে পাহারা দেয়ার জন্য গঠন করা হয়েছে ডাকাত দল গ্রামরক্ষী বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। এভাবে পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

৬

পূর্ব বাংলার ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী বা সামন্তবাদী কোনো শ্রেণীর পক্ষেই পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এরা নিজেদের ও জাতীয় স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, বিদেশের কাছে দেশ ও জাতিকে বিক্রি করে দেয় এবং দেশের মধ্যকার সামন্তবাদের সাথে আপোস করে।

কাজেই অনিবার্যভাবেই পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মহান দায়িত্ব এসে পড়েছে পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টির ওপর। পূর্ব বাংলার কিছুসংখ্যক মীরজাফর-বিশ্বাসঘাতক ব্যতীত পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-বুদ্ধিজীবী-ব্যবসায়ী-শিল্পপতি-চাকরিজীবী অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সমগ্র বাঙালি জাতি অচিরেই ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের, সামাজিক, সাম্রাজ্যবাদী, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, লুণ্ঠন ও তাদের তাঁবেদারদের শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে বিরাটাকার সংগ্রাম পরিচালনা করবে। পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির মহান ঐতিহাসিক দায়িত্ব হলো এ সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করা এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালনা ও সম্পন্ন করা।

পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের দখল কায়েম হবার ফলে পাকিস্তানের সামরিক ফ্যাসিস্টদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। পূর্ব বাংলার সমাজের বিকাশের জন্য বর্তমানে নিম্নলিখিত মৌলিক দ্বন্দ্বসমূহ দায়ীঃ

১। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

২। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয়

মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দালালদের সাথে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তাদের দালালদের দ্বন্দ্ব।

৫। পূর্ব বাংলার সামন্তবাদের সাথে কৃষক-জনতার দ্বন্দ্ব।

৬। পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা তার সেনাবাহিনীর সাহায্যে আগ্রাসী যুদ্ধ চালিয়ে পূর্ব বাংলায় তার উপনিবেশ কায়েম করেছে, এ কারণে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব উপরিউক্ত দ্বন্দ্বসমূহের মাঝে প্রধান দ্বন্দ্ব।

এ দ্বন্দ্ব সমাধানের উপায় হচ্ছে সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লব পরিচালনার মাধ্যমে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার পদলেহী কুকুর ছয় পাহাড়ের দালাল জাতীয় শত্রুদের খতম ও উৎখাত করা, পূর্ব বাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করা।

এ বিপ্লবের অপর এক লক্ষ্য হবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের উৎখাতের সাথে সাথে পূর্ব বাংলা থেকে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা, এদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্বের সমাধান করা।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক সামন্ত, জমিদার-জোতদার জাতীয় শত্রু হিসেবে খতম ও উৎখাত করা, তাদের ভূ-সম্পত্তি ভূমিহীন-কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা, জাতীয় বিপ্লব সমর্থক সামন্তবাদীদের সামন্ত শোষণ কমানো, শেষ পর্যন্ত সামন্তবাদ উৎখাত করা। এভাবে পর্যায়ক্রমে গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা ও সম্পন্ন করা।

এ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের জাতীয় শত্রু হিসেবে উৎখাত করা।

এ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় এ বিপ্লব সমর্থক বুর্জোয়াদের রক্ষা করা, শ্রমিকদের আটঘণ্টা শ্রম সময় নির্ধারণ এবং তাদেরকে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

এ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক মুসলিম, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগণ অবশ্যই তাদের ঐক্যকে দৃঢ়তর করবেন। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার দালাল প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার-জোতদার-পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবী, টাউটদের মুসলিম জনগণের ওপর ধর্মীয় নিপীড়নের এবং সম্প্রসারণবাদী স্বার্থে হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণকে ব্যবহার করার চক্রান্তকে বিরোধিতা করবেন। একই সাথে এ ধর্মীয় নিপীড়নের সুযোগ গ্রহণ করে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও তার মুসলিম ধর্মাবলম্বী দালাল জমিদার-জোতদার, পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবী (পি.ডি.পি. জামায়াত, মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের একাংশ) এবং টাউটদের দেশপ্রেমিক হিন্দু জনগণবিরোধী সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত এবং পূর্ব বাংলায় মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ স্থাপনের ষড়যন্ত্রকে বিরোধিতা করবেন। সকল প্রকার ধর্মীয় নিপীড়নের অবসান করবেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অধিকার, সমতা ও সম্প্রীতি রক্ষা করবেন।

পূর্ব বাংলার এই অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌলিক পরিচালিকা শক্তি হচ্ছে শ্রমিক-কৃষক ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণী। সর্বহারা শ্রেণী হচ্ছে এ বিপ্লবের নেতা।

www.pathagar.com

পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা ও সম্পন্ন করা সম্ভব দীর্ঘস্থায়ী নির্মম গণযুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। এ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ সূচনা করতে হবে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে, শ্রমিক-কৃষক-বিপ্লবীদের সমন্বয়ে শূন্য থেকে গেরিলা গ্রুপ গঠন করতে হবে, হাতের কাছে যা কিছু পাওয়া যায় তাই দিয়ে ছয় পাহাড়ের দালাল জাতীয় শত্রুদের খতম করতে হবে, শত্রুর অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে, গেরিলা যুদ্ধকে পূর্ব বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে, গেরিলা যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে, গ্রাম্য এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন, নিয়মিত বাহিনী, স্থানীয় গেরিলা, গ্রাম্য আত্মরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত উন্নত পর্যায়ের সচল যুদ্ধ, বড় রকমের ঘেরাও ও অবস্থান যুদ্ধ পরিচালনা করে শহরসমূহ দখল করতে হবে এবং সমগ্র পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করতে হবে।

সর্বহারা শ্রেণী কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর ভিত্তিতে জাতীয় বুর্জোয়া এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, ধর্মীয়, ভাষাগত ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করবে। একই সময়ে বুর্জোয়া সামন্তবাদী ও বুদ্ধিজীবীদের আপোসমুখিতা, দোদুল্যমানতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার মনোভাব ও কার্যকলাপকে সমালোচনা ও বিরোধিতা করবে।

এ বিপ্লব পরিচালনা করে সমগ্র পূর্ব বাংলা মুক্ত করে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে সকল দেশপ্রেমিক শ্রেণীর যৌথ গণতান্ত্রিক একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা।

এ বিপ্লব পরিচালনার প্রক্রিয়ায় মুক্ত এলাকায় স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতান্ত্রিক সরকার কায়েম করতে হবে।

পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা ও সম্পন্ন করে পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকাংশের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার সম্পর্কের সমস্যার (পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, পশ্চিম পাকিস্তানস্থ বাঙালিদের ফিরিয়ে আনা, পূর্ব বাংলার গণহত্যা ও ফ্যাসিস্ট ধ্বংসযজ্ঞের অপরাধে অপরাধী পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিদের বিচার ও শাস্তি প্রদান করা, পূর্ব বাংলা থেকে গত ২৪ বৎসরে পশ্চিম পাকিস্তানে যে পুঁজি ও মূল্যবান সম্পদ পাচার হয়েছে তা সুদসহ ফেরত আনা, পূর্ব বাংলা থেকে পাচার করা ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি ফেরত আনা, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের সমস্যা, পূর্ব বাংলায় তারা যে নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন চালিয়েছে তার যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায় করা ইত্যাদি সমস্যার) সমাধান করা।

৭

পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তি সংগ্রাম সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর একটি নির্ভুল রাজনৈতিক পার্টি প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে ১৯৬৮ সালে মার্কসবাদী-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারাকে পথ প্রদর্শক তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে নিয়ে প্রস্তুতি সংগঠন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন তার প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের উপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করে। পূর্ব বাংলা শ্রমিক

www.pathagar.com

আন্দোলনের কর্মী ও গেরিলারা পাকিস্তান কাউন্সিলে, মার্কিন তথ্যকেন্দ্র, বি.এন.আর-এ বোমাবর্ষণ করে, চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে সর্বপ্রথম জাতীয় মুক্তির গেরিলা যুদ্ধ সূচনা করে।

পঁচিশে মার্চ ও তার পরবর্তী সময়কার পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের চরমতম ফ্যাসিস্ট নির্যাতনের মুখেও পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা ভারতে পলায়ন না করে জনগণের শক্তির ওপর নির্ভর করে।

জনগণকে পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সঠিক পথে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের গেরিলারা জাতীয় শত্রু পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া অস্ত্র দ্বারা গেরিলা যুদ্ধ চালায়। অচিরেই বরিশাল, ফরিদপুর, পটুয়াখালী, ঢাকা, পাবনা, টাঙ্গাইল প্রভৃতি জেলার আটটিরও বেশি গেরিলা ফ্রন্ট, মুক্ত অঞ্চল ও নিয়মিত বাহিনী গড়ে ওঠে, গেরিলা যুদ্ধ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

এভাবে আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন সশস্ত্র জাতীয় শত্রু মুক্তিযুদ্ধ সঠিক পথে পরিচালনা করে সমগ্র বাঙালি জাতির সামনে সঠিক পথের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের কামানের গোলার শব্দের মাঝে গড়ে ওঠে ৩ জুন, ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলার জনগণকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি 'পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি'।

ছয় পাহাড়ের দালালরা পূর্ব বাংলায় ছয় পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠন কায়েম এবং অব্যাহতভাবে তা পরিচালনার পথে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টিকে একমাত্র বাধা বলে গণ্য করে। তারা আমাদের আক্রমণ করে, আলোচনার ভাঁওতা দিয়ে আমাদের বহু গেরিলা, কর্মী, সহানুভূতিশীল ও জনগণকে নির্মমভাবে হত্যা করে, তাঁদের রক্তে হাত কলঙ্কিত করে, আমাদের মুক্ত অঞ্চলসমূহ তারা দখল করে নেয়। এভাবে তারা সঠিক পথে পরিচালিত মুক্তি সংগ্রামকে অস্থায়ীভাবে ব্যাহত করে।

পূর্ব বাংলার প্রতিবিপ্লবী ক্ষমতা দখলের পর তারা তাদের নির্যাতন ও লুণ্ঠন জোরদার করেছে। তারা যত্রতত্র লুটতরাজ, হত্যা, ডাকাতি, অপহরণ, ধর্ষণ, অর্থ সংগ্রহ, অগ্নিসংযোগ করছে। পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের মতো তারাও 'বধ্যভূমি' তৈরি করেছে। তারা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের নির্যাতন ও নিয়ন্ত্রণ করছে। এভাবে তারা 'মগের মুল্লুক' কায়েম করেছে।

তারা অপরাধী-নিরপরাধী নির্বিশেষে উর্দু ভাষাভাষী শিশু-যুবক, বৃদ্ধ-নারীদের হিটলারের ইহুদি নিধনের অনুরূপভাবে নির্মূল করছে।

তাদের প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তাদের শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে পূর্ব বাংলার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অগ্নিমূল্য হয়েছে, শত-সহস্র লোক বেকার হয়ে পড়েছে। জনগণ অনাহারে-অর্ধাহারে জীবনধারণ করছে।

অসংখ্য ঘটনা প্রমাণ করছে, ছয় পাহাড়ের দালালরা যে গণতন্ত্র চায় তা হচ্ছে ছয় পাহাড়ের দালালদের ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব, তারা যে সমাজতন্ত্র চায় তা হচ্ছে ছয় পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠন, তারা যে ধর্মনিরপেক্ষতা চায় তা হচ্ছে মুসলিম জনগণের ওপর ধর্মীয় নিপীড়ন, পূর্ব বাংলায় ভারতের উপনিবেশ বজায় রাখার পথে মুসলিম ধর্মের প্রতিবন্ধকতাকে দাবিয়ে রাখা, তারা যে জাতীয়তাবাদের কথা বলছে তা হচ্ছে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও জাতীয় পরাধীনতা এবং পূর্ব বাংলার জাতিগত সংখ্যালঘু ও উর্দু ভাষা-ভাষীদের নির্মূল করা। মুজিববাদ হচ্ছে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও ফ্যাসিবাদ।

www.pathagar.com

পূর্ব বাংলার জনগণের মাঝে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। জনগণ উপলব্ধি করছেন পাক-সামরিক ফ্যাসিস্ট ও ছয় পাহাড়ের দালালদের মাঝে কোন তফাত নেই, তাঁরা সাপের মুখ থেকে বাঘের মুখে পড়েছেন।

গত নয় মাসের বিপ্লবী ঝড়-তরঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণের চেতনা খুবই উচ্চস্তরে পৌঁছেছে। তাঁরা উন্নত রাজনৈতিক মান অর্জন করেছেন, মৃত্যুকে তাঁরা ভয় করেন না।

তাঁরা ছয় পাহাড়ের দালাল ও তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছেন। পূর্ব বাংলার শ্রমিকরা ধর্মঘট, মিছিল, ঘেরাও সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছেন। ছোট চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীরাও সংগ্রাম শুরু করেছেন।

কৃষকরা ছয় পাহাড়ের দালাল জোতদার-জমিদার-টাউটদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছেন।

এভাবে ছয় পাহাড়ের দালালরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, তাদের মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছে, জনগণ তাদের ভাঁওতা ও মীরজাফরী বুঝতে পেরেছেন।

ছয় পাহাড়ের দালাল, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের প্রচণ্ড গণসংগ্রাম শুরু হয়েছে।

ছয় পাহাড়ের দালালদের নিজেদের মধ্যকার কামড়া-কামড়ি প্রকট আকার ধারণ করেছে। এমনকি নিজেদের মাঝে সশস্ত্র সংঘর্ষ, হত্যা, অপহরণ চলছে।

তারা সংকট এড়ানোর উদ্দেশ্যে ভিক্ষার ঝুলি হাতে বৈদেশিক সাহায্যের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে।

কিন্তু কোন কিছুই তাদের পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। জনগণ পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের মতো এদেরকে ও এদের প্রভুদেরসহ চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করবে।

আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের জনপ্রিয়হীনতা এবং সমাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করে এককালের মুজিববাদের প্রণেতা রব গ্রুপ (বর্তমানে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) তথাকথিত শ্রেণী সংগ্রাম, সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলে পূর্ব বাংলার ক্ষমতা দখল করে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ স্থাপনের চক্রান্ত করছে। আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের মতো তাদের পতনও অনিবার্য।

৮

আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট ও তার তাঁবেদার জনগণের ওপর নির্যাতন জোরদার করার সাথে সাথে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের 'নকশাল' দমন অভিযান, চীন ও কমিউনিজম প্রতিহত করা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করার প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপে অংশগ্রহণ জোরদার করছে।

কাজেই পূর্ব বাংলার সর্বহারা বিপ্লবীদের গোপনভাবে কার্য পরিচালনা করতে হবে। পার্টি পরিচিতি গোপন রেখে প্রকাশ্য কাজের সুযোগকে সশস্ত্র সংগ্রামে সহায়তার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে।

পূর্ব বাংলার বিপ্লবীদের অবশ্যই ভারতের সর্বহারা বিপ্লবীদের সাথে ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগিতা স্থাপন ও দৃঢ়করণ, ভারতের সর্বহারা বিপ্লবীদের নেতৃত্বে জনগণের মহান সংগ্রাম, নাগা, মিজো, কাশ্মীরীদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাথে একাত্ম হতে হবে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে উৎখাত করতে হবে।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের হাতে নিহত পূর্ব বাংলার জনগণের রক্তের রক্ত, মাংসের মাংস পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান কমরেড চুন্নু, যিনি মৃত্যু পর্যন্ত ধ্বনি দিয়েছেন স্বাধীন পূর্ব বাংলা জিন্দাবাদ, পূর্ব বাংলার সর্বহারা প্যার্টি জিন্দাবাদ, কমরেড সিরাজ সিকদার জিন্দাবাদ, কমরেড হিরু, নজরুল, আনিস, শশাঙ্ক, জিলু, তাহের, পলাশ, সাঈদ, রইস এবং অন্যান্যদের। গেরিলা মান্নান, মজিদ অন্যান্যদের; পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের হাতে নিহত কমরেড পিন্টু ও অন্যান্যদের; দুর্ঘটনায় শাহিন ও অন্যান্যদের; নিখোঁজ কমরেড ও গেরিলা এবং পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামে শহীদ লক্ষ জনতার কথা স্মরণ রেখে আসুন আমরা এগিয়ে যাই, পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি গড়ে তুলি, ৩০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে পেয়ার বাগানে পূর্ব বাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে যে নিয়মিত বাহিনী গড়ে ওঠে তার পথ অনুসরণ করে পার্টির অধীন প্রধান ধরনের সংগঠন হিসেবে পূর্ব বাংলার সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী গড়ে তুলি, কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর ভিত্তিতে সকল দেশপ্রেমিক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তুলি পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট, ছয় পাহাড়ের দালাল জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট, ছয় পাহাড়ের দালাল জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তির গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাই, শহীদ কমরেড গেরিলা ও বন্ধুদের রক্তের বদলায় রক্ত নেই, সশস্ত্র সংগ্রামে লেগে থাকি। এর মাধ্যমে পার্টি, সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী ও জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গড়ে তুলি, বন্দুকের নলের মাধ্যমে গড়ে তুলি স্বাধীন গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র, সম্পন্ন করি পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৬

বাংলার বীর কৃষকগণ! দেশ গঠনে প্রস্তুত হও

(১৯৭২ সালের ৩০ এপ্রিল ঢাকার শিবপুরে কৃষক সমিতির প্রতিনিধি ও কর্মী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী প্রদত্ত ভাষণ)

আমার কৃষক ভাই-বোনেরা,

আজ আমাদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে, মাবোনের ইজ্জত দিয়ে যে স্বাধীনতা আপনারা অর্জন করেছেন, সে স্বাধীনতা সর্বোতভাবে রক্ষার জন্য গোটা বাংলাদেশের মানুষ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, পিয়ন, আর্দালী, সকল স্তরের নিপীড়িত মানুষ, নির্যাতিত মানুষ, শোষিত মানুষ, মজলুম মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়াজ তুলুনঃ আগামী ১৬ মে'তে আওয়ামী লীগ সরকার যে শাসনতন্ত্র আপনাদের সম্মুখে পেশ করবে, আপনাদের জন্য তৈয়ার করে পাঠাবে, এই সভা থেকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি, শেখ মুজিবুর রহমান-গণতন্ত্রের নিয়ম-যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, যারা সংখ্যায় বেশি, তারাই দেশ শাসন করবে, তারাই দেশ পরিচালনা করবে। এই দেশে কৃষক-মজুরের সংখ্যা শতকরা ৯৫ ভাগ। তারাই এদেশের শাসক হতে পারে। অন্য কেউ নয়। তাদেরই একমাত্র অধিকার এই বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করার। অতএব, শাসনতন্ত্রে আমাদের এই দেশের নাম রাখতে হবে, 'বাংলাদেশ কৃষক-মজুর রাজ'। এটাই এদেশের নাম হবে। এই দেশ কৃষকের দেশ, মজুরের দেশ, কৃষকদের চাহিদা পূরণ করতে হবে। 'কৃষক-মজুর-রাজ' ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের রাজ কায়েম করবার কোন অধিকার নাই। সেই শাসনতন্ত্রে ১৮ বৎসরের প্রত্যেক নারী এবং পুরুষকে ভোটের অধিকার দিতে হবে। তোমাদের শাসনতন্ত্রে কৃষক-শ্রমিকের শতকরা ৯৫ জন। অতএব, ৯৫ জন মানুষের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধির ব্যবস্থা করতে হবে, সংরক্ষণ করতে হবে। এই শাসনতন্ত্রে বাংলাদেশে দেশী-বিদেশি সর্বপ্রকারের পুঁজি বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্ত করে সরকারের আয়ত্তাধীনে জাতীয়করণ করতে হবে। এই দেশের সমস্ত জমি জাতীয়করণ করতে হবে বিনা ক্ষতিপূরণে। এই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করছে, যারা বিদ্রোহ করছে, তাদের নাম সন্ধান করে উপযুক্ত কমিটি নিয়োগ করে সেই কমিটির প্রধান পরিচালক হবেন হাইকোর্টের একজন যোগ্যতম জজ, বিচারের পর যারা দোষী সাব্যস্ত হবে, তাদের নাম ভোটার লিস্ট হতে বাদ দিতে হবে। যারা চোরাকারবার করে, পারমিট শিকার করে, পশ্চিমা শোষকদের সাথে হাত মিলিয়ে গত ২৪ বৎসরে নিজেদের বাড়ি-গাড়ি, ভোগ-বিলাস করেছে, অবৈধভাবে মানুষকে ঠকিয়ে, ২২টি পরিবার যে-রকম উভয় অঞ্চলের পুঁজিপতি পাকিস্তান থাকাকালীন কোটি কোটি কৃষক, মজুর হাড়িদের রক্ত শোষণ করে কোটিপতি হয়েছিল, সেই রকম বাংলাদেশের ধনিক-বণিকের একটা লিস্ট করতে হবে-যারা চোরাকারবার করে, যারা ঘুষ ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে নিজেদের গাড়ি, বাড়ি নির্মাণ করে ধনদৌলত বৃদ্ধি করে বাংলার কোটি কোটি কৃষক-শ্রমিককে পথের কাঙাল করে কঙ্কালসার করে ফেলেছে-বাংলার কৃষকের আর কোন সম্বল নেই-এই শাসকশ্রেণীকে ভোটার লিস্ট হতে বাদ দিতে হবে। যারা খুনী আসামী,

www.pathagar.com

অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করেছে, যারা রাহাজানি করে মানুষের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেছে, যারা ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পথের কাঙাল করেছে এই বাংলাদেশে এই রকম দুস্কৃতকারীদের তদন্ত করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাক্ষী-প্রমাণ গ্রহণ করে দোষী সাব্যস্ত হলে তাদেরকে ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দিতে হবে।

এই দেশের ব্যাংক, বীমা, ক্ষুদ্র শিল্প, বৃহৎ শিল্প, যানবাহন সমস্ত জাতীয়করণের Provision রাখতে হবে শাসনতন্ত্রে বিনা ক্ষতিপূরণে। শাসনতন্ত্রে প্রত্যেক ইউনিয়নকে একটি করে কেন্দ্র স্বীকার করে সেটা পঞ্চায়েত বোর্ড হোক, সেই ইউনিয়নে যা উৎপাদন হবে যা Gross income হবে, তার মধ্যে সরকারের থাকবে শুধু পাঁচ ভাগ, বাকি ৯৫ ভাগ সেই কেন্দ্রকে অর্পণ করতে হবে। সেই কেন্দ্রে যারা মেহনত করে ফসল অথবা কোন ছোট শিল্প কারখানা গড়ে তুলে যে লভ্যাংশ সৃষ্টি করবে, একমাত্র তারাই হবে সে অঞ্চলে অংশীদার। অন্য এলাকার লোক, অন্য বিভাগের লোক সে পঞ্চায়েত বোর্ডে বা ইউনিয়নে কোন অংশ পাবে না।

যারা ১৮ বৎসর বয়সের কম অথবা ৬০ বৎসরে উর্ধ্বে মেয়ে হলে ৫০ বৎসরের উর্ধ্বে তাদের পেনশন দিতে হবে। জীবিত থাকাকাল পর্যন্ত তাদের খোরাক, পোশাক, চিকিৎসা ব্যবস্থার সমস্ত দায়িত্ব সে পঞ্চায়েত বোর্ড গ্রহণ করবে। আর যারা নাবালক, নাবালিকা তাদের প্রতিপালনের জন্য যারা বৃদ্ধ, অক্ষম, অন্ধ, পঙ্গু, মজুরদের প্রতিপালনের জন্য নির্ধারিত হবে শতকরা ৩০ ভাগ। আর ৬৫ ভাগ আয় সেই পঞ্চায়েত বোর্ডের অধীনে যারা বাস করে। শুধু বাস করে না শরীর খেটে পরিশ্রম করে যারা উৎপাদন করে সে মেয়ে হোক বা পুরুষ হোক সমবণ্টন করতে হবে।

এই দেশে হিন্দু হলে, বৌদ্ধ হলে, খ্রিস্টান হলে তার ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। মানুষের নৈতিক উন্নতির জন্য spiritual development-এর জন্য, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে সমস্ত শিক্ষা অপরিহার্য, তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে সরকারকে। এই দেশের শত শত কোরআন, হাদিস, ফেকাহ, ইজমা পড়াবার ব্যবস্থা যেখানে আছে, সেই মাদ্রাসা শিক্ষার পরীক্ষা গ্রহণ করার দায়িত্ব ছিল সরকারের। আলিম পরীক্ষা, টাইটেল কোর্স পরীক্ষা, ফাজিল পরীক্ষা। চার মাস অতীত হয়ে গেল-এই দায়িত্ব তোমরা পালন না করলে পদত্যাগ করো! জানিয়ে দাও বাংলার মুসলমানদিগকে পাঞ্জাবি সরকার, বৃটিশ সরকার যে দায়িত্ব পালন করেছে, আমরা সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবো না। আমরা সেক্যুলার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র করেছি, অতএব মাদ্রাসার পরীক্ষা পরিচালনা করার ইচ্ছা আমাদের নাই-তোমরা যে রকমে পার নিজেরা জাতীয় বোর্ড করে অথবা অন্য কোনভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা করো। মাদ্রাসার পরীক্ষার দায়িত্ব সরকারের নাই। এটা না বলে যে, মনে এমন একটা সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে-তারা মনে করে, এই সরকারের কোরআন, হাদিসের, গীতা, মনুসংহিতার, বেদবেদান্ত শিক্ষা, বাইবেল, নিউ টেস্টামেন্ট, ওল্ড টেস্টামেন্ট, ত্রিপিটক শিক্ষার ঘোর বিরোধী, অতএব এই সরকার দেশ থেকে ধর্ম নির্বাসন দিবে। আমি বারবার বলেছি, সরকার এ রকম কোনো অভিপ্রায় রাখেন বলে আমি মনে করি না। সরকার কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করো, হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার পরীক্ষা এমতেহান গ্রহণের দায়িত্ব তোমাদের আছে কি নাই, পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দাও।

www.pathagar.com

ভাইয়েরা,

আমি শুধু আপনাদেরকে এই বলতে চাই যে, আপনারা গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি গড়ে তুলুন, ইউনিয়ন সমিতি গড়ে তুলুন, জেলা কৃষক সমিতি গড়ে তুলুন। কৃষকের দাবি পূরণ না হলে কৃষক-মজুরদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পূরণ না হলে, আওয়ামী সরকার যে শাসনতন্ত্র রচনা করবে, আমরা সেই শাসনতন্ত্র কিছুতেই মানব না। আমরা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর শাসনতন্ত্র মানি নাই, আমরা আইয়ুব শাহীর শাসনতন্ত্র মানি নাই, আওয়ামী লীগ যদি গরিবের দুঃখ মোচনের জন্য, নির্যাতিত মানুষের অধিকার পূরণের জন্য একমাত্র পথ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যদি এই শাসনতন্ত্রে, খাঁটি সমাজতন্ত্র নকল নয়, মেকী নয়, জাল নয়, ভাঁওতা নয়, কারসাজি নয়-সত্যিকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা না থাকে, আমরা সে শাসনতন্ত্র মানব না। শাসনতন্ত্রে শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার না থাকে, সংবাদপত্রে লিখবার পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকে, বাক স্বাধীনতা না থাকে, ধর্মীয় স্বাধীনতা না থাকে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকে আমরা সেই শাসনতন্ত্র বরদাস্ত করবো না।

আজ দুনিয়াতে দু'টি জাতি বাস করছে। এক জাতি ধনী আর এক জাতি গরিব-গরিবের দল কাঙালের দল। ধনিকের দল জনবল সংগ্রহ করে আমাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দেয়। আজ সময় এসেছে ধনতন্ত্রকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবার। ধনতন্ত্রবাদ চিরকালের জন্য দুনিয়ার বুক থেকে পদাঘাত করে তাড়িয়ে দাও, কামানের ভয় করি না, বন্দুকের ভয় করি না, এটম বোমার ভয় করি না, জনগণের কাছে এটম বোমার কোন মূল্য নেই। একমাত্র আল্লাহকে ভয় করি, আওয়ামী লীগ সরকারকে ভয় করি না, মস্কোপন্থী কমিউনিস্টগণকে ভয় করি না-মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট সাবধান হয়ে যাও, রাশিয়ার গর্বে গর্বিত হয়ে, রাশিয়ার লাখ লাখ টাকা দিয়ে আন্দোলন করে কোনদিন বাংলার কৃষককে ধোঁকা দিতে পারবে না। রাশিয়ার রুবল দিয়ে বাংলার মজুরকে কখনো ধোঁকা দেওয়া চলবে না, আমেরিকার ডলার দিয়ে বাংলার মানুষকে খরিদ করা চলবে না।

ইন্দিরা গান্ধী! ভারতে যতদূর পার, যতশীঘ্র পার, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ খতম করে, সাম্রাজ্যবাদকে পদাঘাত করে, ভারতের মাটিতে সমাজতন্ত্রবাদ কায়েম করো। ইনশাআল্লাহ আমরা পেছনে থাকবো না, আমরা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ, যত বাধাবিঘ্ন আসুক, আমেরিকার ডলার আসুক-রাশিয়ার রুবল আসুক কেউ আমাদের ঠেকাতে পারবে না। আমরা বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করব।

আজ আওয়ামী লীগ! সাবধান হয়ে যাও, তা করলে চলবে না। বাংলার কৃষকের জন্য সাত কোটি কম্বল দিয়েছিল দুনিয়ার মানুষ, বাংলার সবচেয়ে গরিব কৃষক-মজুরকে সাহায্য করবার জন্য। তোমার লুটপাট সমিতি একখানা কম্বল কেটে দু'জনকে দিয়েছে, তারা রিলিফ আত্মসাত করেছে, তদন্ত কমিটি করে লুটপাট সমিতির কার্যাবলী তদন্ত করো। দোষী সাব্যস্ত হলে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলাও। না হলে তোমার নিস্তার নাই।

আমার কৃষক সমিতির কর্মীরা,

শুধু শ্লোগান দিলে হবে না। এই বাংলাদেশের ১৯টি জেলায়, ৫৪টি মহকুমায়, ৬২ হাজার গ্রামে যেখানে আছেন; মেয়ে হোক, পুরুষ হোক কালবিলম্ব না করে কৃষক সমিতি গড়ার কাজে নেমে পড়ুন। আমরা সমাজতন্ত্রবাদ করবোই। সমাজতন্ত্র আমাদের সাধারণ ছাড়া সি.এস.পি. অফিসার চালাতে পারবে না, লুটপাট সমিতির মেম্বাররা চালাতে পারবে না। সমাজতন্ত্র চালাবে কৃষক-মজুররা, সমাজতন্ত্র চালাবে কামার-কুমার, তাঁতি, জেলেরা।

www.pathagar.com

আমি বলি ভাই ভ্রাতঃ সংগঠন করতে যত দেরি হবে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ততই বিলম্ব হবে। কালবিলম্ব না করে কাজে নেমে পড়ুন। শ্লোগান নয়, সেন্টিমেন্টাল আন্দোলন নয়, হুজুগের আন্দোলন নয়, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হলে, সমাজতন্ত্র পরিচালনা করতে হলে ৬২ হাজার গ্রামের মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। কৃষক সমিতি গড়ে তুলতে হবে। কৃষক-মজুরের ঐক্য স্থাপন করতে হবে। তাই আগামী ২৮ ও ২৯শে মে তারিখে ঢাকার পার্শ্বে টঙ্গী শহরে কৃষক-শ্রমিক মৈত্রী সম্মেলন হবে-গোটা বাংলার শ্রমিক, গোটা বাংলার কৃষক আজ রাস্তাঘাটে শ্লোগান দিতে থাকুন-'চলো, চলো টঙ্গী চলো।' টঙ্গী সম্মেলনে আমরা আওয়ামী লীগের শাসনতন্ত্র পড়ে শোনাবো আপনাদের। আপনারা যদি অগ্রাহ্য করেন, সেই দিন আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো-এই সরকারের সাথে আমাদের সম্বন্ধ কি হবে? সরকার যদি কৃষকের কল্যাণের জন্য, শ্রমিকের কল্যাণের জন্য সমাজতন্ত্রবাদ, গণতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার বাস্তব কর্মসূচি শাসনতন্ত্রে বাধ্যতামূলকভাবে স্থান দেয়, তাহলে আমরা সরকারকে অভিনন্দন জানাব টঙ্গীতে। আর যদি কৃষকের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয় শাসনতন্ত্রে, শ্রমিকের দাবি যদি শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ না থাকে; তাহলে আমরা সেই তারিখে কৃষক-মজুর রাজের পতাকা উত্তোলন করব।

সমাজতন্ত্রবাদ যদি কায়েম করতে চান, সাম্প্রদায়িকতার বীজ চিরকালের জন্য বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত করুন। আমরা মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। হিন্দু মানুষ, মুসলিম মানুষ, খ্রিস্টান মানুষ, বৌদ্ধ মানুষ, গারো, সাঁওতাল, হাজং মানুষ-সকলে মানুষ। সকল মানুষ পরস্পরের ভাই। দুশমন আমাদের সাম্রাজ্যবাদ, দুশমন আমাদের সামন্তবাদ, দুশমন আমাদের পুঁজিবাদ। আমরা সংগ্রাম করে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদকে ধ্বংস করব-মাটির সাথে মিশিয়ে দেব।

ভিয়েতনামের সংগ্রামী বন্ধুরা,

কৃষক সমিতির নেতারা যে তার পাঠিয়েছেন-আমি আবার ওয়াদা করছি, বহু পূর্বেও করেছি-কম্বোডিয়া, লাওস, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া তথা দুনিয়ার নির্যাতিত এলাকার মানুষকে আমরা শুধু নৈতিক সমর্থন জানাব না, আপনাদের সংগ্রামে-দুধে পানিতে যে রকম একত্র হয়ে যায় তেমনি আপনাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমরা সমর্থন করবো, সমর্থন করবো যারা এসেছেন, আমি আমার সাড়ে সাত কোটি বাঙালি কৃষক-মজুরের পক্ষ থেকে জানাই ভারতের কৃষক-মজুরদিগকে অভিনন্দন। ভারতের কৃষকের মুক্তি, শ্রমিকের মুক্তি আমি বাংলার মুক্তি মনে করি, সারা জাহানের মুক্তি, সারা বিশ্বের মানুষের মুক্তি কামনা করি, আপনারা তাদের জন্য আমাদের ভালবাসা নিয়ে যাবেন। আপনারা কৃষক-মজুর আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে গড়ে তুলুন। আমাদের জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জান দিয়ে হলেও আমরা সমর্থন জানাব। আমরা কৃষক আন্দোলনকে ভাষার ভিত্তিতে, সীমানার ভিত্তিতে বিচার করি না। আমাদের কৃষক সমিতির বাংলাদেশ নাম রাখলেও আমরা দুনিয়ার নির্যাতিত মানুষের, নিপীড়িত মানুষের, শোষিত মানুষের, মজলুম মানুষের মুক্তির জন্য বাংলাদেশ কৃষক সমিতি সংগ্রাম করে যাবো, জেহাদ করে যাবো, লড়াই করে যাবো। আওয়ামী লীগ সরকার! মন্ত্রীদের বেতন ধার্য হলো তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য, দয়া করে ৭৩ লক্ষ বেকার মানুষ কাজের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের জন্য ভাবো।

www.pathagar.com

সংগ্রামী কর্মীরা,

মুক্তিযোদ্ধারা, মুজিব বাহিনীরা এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী-যারা বাংলাদেশের মুক্তির জন্য আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়েছে, যারা রক্ত দিয়েছে, কোন কোন বাড়ি একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে-তাদের ব্যবস্থা তুমি কি করেছে স্পষ্টভাবে জানাও। বাংলার প্রাইমারী শিক্ষকদের জন্য কি করেছ, বাংলার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য কি করছে। আজ একমণ চাউলের দাম ৮২ টাকা, এক সের সরিষার তেলে দাম সাড়ে আট টাকা, এক সের কেরোসিনের দাম দুই টাকা। এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে তুমি নয় মাসের বেতন বন্ধ করে দিয়েছ-চার মাসের বেতন দেবার পর আবার নতুন আদেশ জারি করেছে। নতুন মাসের বেতন ঐ বেতন থেকে কেটে নাও। এইসব তোগলকী শাসন বাদ দাও। নয় মাসের বেতন গভর্নমেন্টকে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবে। তাঁতিদের সূতার ব্যবস্থা করতে হবে, তাঁত শ্মশান হয়ে গেল, কামারদের লোহার ব্যবস্থা করো, মিস্ত্রীদের কাঠের ব্যবস্থা করো। মানুষ বেকার হয়ে কাজ না থাকার দরুন চোর ডাকাত হয়ে গেল; তাদের ব্যবস্থা করো। বেকার সমস্যার সমাধান করো। নইলে তোমার সরকারের নিস্তার নেই। তুমি জাতির পিতা হয়েছ। তুমি দালানে থাকবে আর তোমার ছেলেরা সব কুঁড়েঘরও পাবে না এ কেমন বিচার, কোন পিতা তার ছেলেকে, ছেলে মূর্খ হোক, পণ্ডিত হোক বাপ থাকে চৌমহলায়, আর বেটা থাকে জঙ্গলের ধারে, রাস্তাঘাটে এ কখনো হয়? আমার দেশের পিতা তাই রাখে? তুমি Artificial পিতা খাঁটি পিতা যদি হও তো তুমি নেমে আস দালান থেকে নেমে আস ঐ ময়দান সব ছেলেদের কাছে। সব ছেলেদের কাছে তুমি যদি খাঁটি পিতা হও, তাহলে এ সন্তানদের সাথে বেগুনের খিচুড়ি খাওয়া শুরু করে দাও। তুমি যদি খাঁটি পিতা হও তোমার ছেলেরা রাস্তায় রাস্তায় ভুখা মরছে, তুমি বাপ কোন লজ্জায় সুখ করে দালানে বাস করছো, তুমি তোমার ছেলে-মেয়েদের সাথে বাস করো তবেই জাতির জনক হবে। বাপ হওয়া বড় মুস্কিল কথা, বাপের যন্ত্রণা আছে, আর মায়েরা না খেয়ে থাকে, তবু ছেলের মুখে একটা কিছু দিয়ে দেয়। নিজে অনাহারে থাকে, ছেলের কষ্ট বরদাস্ত করতে পারে না। যদি জাতির জনক হতে চাও তাহলে তোমার দালানের বাড়িঘর ছেড়ে চলে আস তোমার ছেলেদের সঙ্গে, যা জোটে খাও, যেভাবে ছেলে-মেয়েরা থাকে, সেভাবে থাক। তাছাড়া জাতির জনক হওয়া চলবে না।

বাংলাদেশের মানুষ বড় সচেতন। তোমাকে আমি অনুরোধ করি, সমাজতন্ত্রের ব্লাফ দিও না। তোমার নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র কায়েম হোক, ইহা আমি মনে-প্রাণে কামনা করি। তুমি আমার ছয় বৎসর সহকর্মী ছিলে। আমি নেতৃত্ব চাই না। কিন্তু সমাজতন্ত্রের নামে ফাঁকি দিয়ে, ব্লাফ দিয়ে, ধোঁকা দিয়ে চালাতে দেবো না। আগামী ২৮/২৯ মে প্রতিটি এলাকাতে হাটে হাটে ঢোল পিটিয়ে দাও, বাংলার কৃষক, বাংলার কামার, বাংলার কুমার, তাঁতি, জেলে, মাঝি যতই কষ্ট হোক, বাধা হোক-তৈয়ার হয়ে থাকুন, টঙ্গীতে যাবেন। সেদিন হবে আমাদের শপথের দিন-আজ শপথ গ্রহণ করবো না-আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি আমি সে সভায় ইনশাআল্লাহ ঘোষণা করবো। কমরেড মোজাফফর আহমদকে ভারত সরকার আসতে না দেওয়ায় আমি মর্মাহত হয়েছি। তাঁর মতো নির্ভীক মানুষ, তাঁর মতো ত্যাগী মানুষ, আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি, দেখি নাই। কমরেড মুজাফফরের জন্মস্থান আমাদের এই পূর্বাঞ্চল। আজ হিন্দুস্থান সরকার তাঁকে পারমিট না দেওয়ায় আমি কি ভাষায় তার প্রতিবাদ করবো, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না-শুধু আমি প্রতিবাদ জানাই। আবার আমি কমরেড মোজাফফর আহমদ, আগরতলার নৃপেন চক্রবর্তী, হরেকৃষ্ণ কোঙার,

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ্ রসুল প্রভৃতি কৃষক সমিতির কর্মকর্তাগণকে পুনরায় টঙ্গী সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আশা করি, ভারত সরকার এবারে তাঁদের পারমিট বন্ধ করে মানুষের জন্মগত অধিকার হতে বঞ্চিত করবেন না। বাংলার মানুষ তাঁদের চায়, প্রাণের চেয়ে ভালবাসে তাদের।

এখন যারা শহীদ হয়েছে তাদের কথা আমি আবার বলতে চাই এবং সিরাজকে যেভাবে প্রহার করা হয়েছে, আমি মর্মাহত। মারামারি করে, গুণ্ডামি করে রাজনীতি করা যায় না। আমি সিরাজকে কি ভাষায় সান্ত্বনা দেব জানি না। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যে আল্লাহ সিরাজকে অতি সত্বর আরোগ্য দান করো। সিরাজের মতো কর্মী আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে যাতে টঙ্গী সম্মেলনে যোগদান করতে পারে এই কামনা করি। আমার বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা তাই প্রচার করো, আপত্তি নাই। কিন্তু বাংলার কৃষক-মজুরের দাবি প্রত্যাখ্যান করলে আমার ৯০ বৎসর বয়স মনে করো না যে, আমি চুপ করে বসে থাকবো। জীবনে আমি কোন দিন বসে থাকি নাই। বাংলার মেরুদণ্ড কৃষক-মজুর। আমি জীবনে ৩০ বৎসর দশমাস কারাগারে কাটিয়েছি, ফাঁসির মঞ্চে যেতে হয় আমি যাব। কিন্তু বাংলার কৃষক-মজুরের প্রাণের চেয়ে প্রিয় সমাজতন্ত্রের দাবি কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করতে, অগ্রাহ্য করতে দিব না। শহীদ আসাদ আমাদের মধ্যে নেই। শহীদ আসাদের স্মরণে আমি সন্তোষের নাম আসাদ নগর দিয়েছি। হে আল্লাহ্, তুমি আসাদের পবিত্র আত্মার প্রতি করুণা বর্ষণ করো। যারা শহীদ হয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আত্মার প্রতি তুমি দয়া কর। আসুন মোনাজাত করি ঃ

হে আল্লাহ ইয়া রাহমানের রাহিম সারা দুনিয়ার জালিমকে ধ্বংস করো,
হে আল্লাহ সারা দুনিয়ার মজলুমকে তুমি রক্ষা করো,
হে আল্লাহ সারা দুনিয়ার শোষককে তুমি বিনাশ করো,
হে আল্লাহ সারা দুনিয়ার শোষিত মানুষকে তুমি রক্ষা করো

আল্লাহ আমিন।

বাংলার কৃষক তোমরা প্রস্তুত হও, প্রকাশকঃ শ্রী মনীন্দ্র মহাজন, মে ১৯৭২, চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৭

আওয়ামী লীগের কথা ও কাজ :ওয়াদা ভঙ্গের এক অতুলনীয় নজির

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আসিয়াছে। কিন্তু গণ-মানুষের জীবনে সুখ ও শান্তি নাই। গরিবের ভাত-কাপড়ের কষ্ট আরো বাড়িয়াছে। আগে সারাদিনে মেহনতের মজুরি দিয়া অন্তত দুই সের চাউল কেনা যাইত। এখন তাহা দিয়া এক সের চাউলও পাওয়া মুশকিল। আগে তিন-চার টাকার মধ্যে একখানা লুঙ্গি, দশ-এগারো টাকার মধ্যে একখানা শাড়ি পাওয়া যাইত। এখন দশ টাকার কমে লুঙ্গি পাওয়া যায় না। দেশ জুড়িয়া মজলুম ও গরিব মানুষের হাহাকার শুনা যাইতেছে। ফসলের ভাণ্ডারে সিলেটের মানুষ না খাইয়া মরিতেছে। বরিশালে অনাহারে একের পর এক মানুষের জীবনপ্রদীপ নিভিয়া যাইতেছে। খুলনা, যশোর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা বর্ডার সংলগ্ন জেলাগুলোতে না খাইয়া মানুষ মরিবার হিড়িক পড়িয়াছে।

মানুষের হাতে কাজ নাই। তদুপরি প্রতিটি জিনিসের দাম কয়েকগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। মানুষ নিজের ঘরের হাঁড়ি-বাটি, লোটা, কলস বেচিয়া খাইতেছে। ছাঁটাইয়ের কবলে পড়িয়া কারখানার শ্রমিকদের সোনার সংসার ভাঙ্গিয়াছে। অনাহারে বাচ্চা-কাচ্চার আকুল আহাজারি শুনিয়া টিকিতে না পারিয়া গৃহবধূরা পালাইতেছে। মানুষ ফাঁসিতে ঝুলিয়া পড়িয়া জীবনের সব জ্বালা হইতে মুক্তি পাইতে চাহিতেছে। জায়গা-জমি ভিটামাটি নতুন মাতব্বরদের সাফকাওলা করিয়া দিতেছে। চাষী জমির দিকে তাকাইয়া হা করিয়া আছে। গরু নাই, আহার নাই কি করিয়া সন্তান ও নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবে? দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে অল্প বেতনের সরকারি-বেসরকারি চাকরিয়াওয়ালারা দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে। বেতনের পয়সা দিয়া ভাত খাইলে কাপড় কেনা হয় না, কাপড় কিনিলে ছেলের বই আসে না। অসুখে চিকিৎসা করানো যায় না। স্কুলের মাস্টার, মাদ্রাসার শিক্ষক, সেনাবাহিনীর অধঃস্তন সিপাহী, গরিব পুলিশ কর্মচারী, ছোট দোকানদার, হকার, মুটে-মজুর, কামার-কুমার, তাঁতি দেশের শতকরা ৯৫ জন মানুষের জীবনে নামিয়া আসিয়াছে ভয়ানক অনটন। অভাব-অনাহারে কাহাকে কি বলবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া সর্বহারা ও গরিবরা দিশেহারা। আজ তাহাদের একটিই জিজ্ঞাসা-মানুষের মতো সচ্ছল ও স্বচ্ছন্দে বাঁচিবার নিশ্চয়তা কি তারা পাইবেন? কাহারো বিরুদ্ধে অভিযোগ না তুলিয়া সমাজের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে, গরিবের সংসার পাহাড় হইতে শিলা পতনের মতো ধাপে ধাপে মরণ আঘাত খাইয়া গুঁড়াইয়া নিশ্চিহ্ন হইতেছে। উপার্জনক্ষম সন্তান সামান্য আয় হইতে নিজের পেট চালাইয়া অচল পিতা-মাতা, ভাই-বোনদের জন্য কিছু দিতে পারিতেছে না। সেখানে সংসার ভাঙ্গিতেছে। অর্থনৈতিক দুর্দশায় গরিবের সংসারের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব-কলহ অবিশ্বাস দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। সোনার সংসারগুলো ছারখার হইতেছে। প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য বারবার মরিয়া হইয়া জীবনের সংগ্রাম চালাইতেছে। কিন্তু গরিবেরা বারবার পরাজিতের দলে নিজেদের খুঁজিয়া পাইতেছে। স্বাধীনতার পর এলাকার মাথা তোলা চাঁই এরা আরো বড় হইয়াছে, শুধু বড়ই হয় নাই আলাদীনের চেরাগ হাতে পাইয়া 'মহলা'

www.pathagar.com

দালান তুলিয়াছে। কিন্তু কোন গরিব, নিম্ন মধ্যবিত্ত, কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্য ফিরিয়াছে কি? নতুন টাউটদের হাতে গঞ্জনা ছাড়া এই হতভাগাদের আর কিছুই জুটে নাই। অথচ সরকার বলিতেছে সমাজতন্ত্র হইয়া গেল বলিয়া। তাহাদের প্রচার দেখিয়া মনে হয়, সমাজতন্ত্রের পথে, অর্ধেকের বেশি রাস্তা তাহারা ইতিমধ্যে অতিক্রম করিয়াছে। ইহাকেই যদি সমাজতন্ত্র বলি, তবে পুরোপুরি সমাজতন্ত্র হইলে দেশের শতকরা ৯০ জন গরিব মানুষ ১৯৫০-এর দুর্ভিক্ষের মতো কঙ্কালদশায় না পৌঁছাইয়া আর কোথায় যাইবে?

ইহার কারণ কি?

প্রত্যেকটি অবস্থা ও ঘটনার পশ্চাতে একটি না একটি কারণ থাকে। আজ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনে এই অবাঞ্ছিত দুর্বিপাক নামিয়া আসিবার কারণ কি? এই কারণ খুঁজিয়া না দেখিলে আমরা দুর্দশা হইতে মুক্তির পথও খুঁজিয়া পাইবো না।

জনগণ কি ভুল করিয়াছিল?

মানুষ কি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়া ভুল করিয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই 'না'। মানুষ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে ভুল করে নাই। পশ্চিম পাকিস্তানিদের অমানুষিক আঞ্চলিক শোষণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যদিও লড়াইয়ের তাগিদ আসে, তথাপি মানুষ ভাবিয়াছিল, এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়া সকল শোষণের অবসান ঘটিবে। মানুষের আশা ছিল, এই লড়াইয়ের আগুনে পোড় খাইয়া দেশ দুর্নীতিমুক্ত, স্বজনপ্রীতিমুক্ত, অনাচারমুক্ত, শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিবনগর নামীয় কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী সরকার এই অঙ্গীকার দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গীকারে কোন কারচুপি বা দুর্বলতা ছিল না। অনাহারে শিশু মরে, মায়ের বুকে দুধ নেই, অন্নের কষ্ট বলিয়া আগের সমাজকে চিত্রিত করিয়া সকল শোষণের অবসান ঘটাইয়া একটি পবিত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের অঙ্গীকার দিয়া তাহারা বিপ্লবী আওয়াজ তুলিয়াছিল। মানুষ তাহাদের কথাবার্তা ও অঙ্গীকারের মধ্যে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া দেশ উদ্ধারের লড়াইতে জনগণ যোগ দিয়াছিল। এক্ষেত্রে জনগণ ভুল করে নাই। জনগণ রক্ত দিয়াছে, ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। কঠিন পরিস্থিতিতেও মনোবল ও দৃঢ়তা হারায় নাই। অথচ মুক্তিযুদ্ধের বিধাতা বলিয়া যাহারা কলকাতায় বিখ্যাত হোটেলগুলো রিজার্ভ করিয়া নীল আলোর নিচে বহু কাণ্ড-কারখানা করিয়াছে আজ তাহারাই দেবতা সাজিয়াছে। তাহারা যে কোন কিছু সাজিয়া থাকুক, দেশ ও জনগণের সর্বনাশ না করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে বলিবার কিছু ছিল না। অথচ জনগণ চোখের সামনেই দেখিতেছে, ইহারাই দেশটিকে লুটিয়া-পুটিয়া শেষ করিতেছে।

জনগণ মূল্য দিয়াছে ঠিকই

মোটকথা হইল, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য জনগণের কাছ হইতে পুরোপুরি মূল্য আদায় করা হইয়াছে, কিন্তু বাটপাররা নিজেদের স্বার্থের ও গদির জন্য সবকিছুকে জলাঞ্জলি দিয়া সাফ করিতেছে। প্রথমে দেখি, জনগণ কি পাইতে চাহিয়া এই লড়াইতে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং আজ তাহারা ইহা পাইয়াছে কিনা?

জনগণ কি চাহিয়াছিল?

(১) জনগণ হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানিদের জুলুম, নিপীড়ন-কুশাসনের কবল হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হইতে চাহিয়াছিল।

www.pathagar.com

(২) জনগণ চাহিয়াছিল, অর্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ হইবে। জাতীয় স্বাধীনতার ওপর কেহ কোন উপায় যেন হস্তক্ষেপ করিতে না পারে।

(৩) জনগণ চাহিয়াছিল পাকিস্তান হাসিলকালে যেরূপ হইয়াছিল সেরূপ-অর্থাৎ পতাকা বদলের স্বাধীনতা না হয় রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তিও যেন অর্জিত হয়।

(৪) পাকিস্তান আমলে এবং ইহার পূর্ব হইতে যে সামাজিক ব্যাধিগুলো জনগণের জীবনকে বিষাইয়া তুলিতেছিল, মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেই অথবা মুক্তিযুদ্ধের পর পরই এই সকল ব্যাধি চিরতরে যেন দূর হইয়া যায়, ইহাই জনগণের কামনা ছিল।

(৫) জনগণ চাহিয়াছিল, আইয়ুব আমলে সৃষ্ট ৮০ হাজার ফেরেশতা ধরনের টাউট শ্রেণী খতম হইবে এবং নতুন টাউট গজাইবে না।

(৬) সুখ-শান্তিতে জীবন কাটাইবার নিশ্চয়তা এবং দেশের সম্পদ একমাত্র দেশের জন্য কাজে লাগানো, কোনো লুটেরা বিদেশি শক্তি যেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের সম্পদ লুট করিতে না পারে তাহার নিশ্চয়তা জনগণ চাহিয়াছিল।

(৭) জনগণ চাহিয়াছিল, সকল প্রকার শোষণের অবসান হউক। একজনের মেহনতের ফল যেন অন্যে ভোগ বা জবরদস্তি ছিনাইয়া না নিতে পারে।

(৮) জনগণ চাহিয়াছিল, স্বাধীন হইলে দেশটিকে সর্বোতভাবে নিজের পায়ে দাঁড় করানো হইবে। যেন নিজ শক্তিতে জাতি সকল দুর্বিপাকের মোকাবিলা করিতে পারে।

(৯) এদেশের কৃষক-শ্রমিক সর্বহারা মানুষ বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পক্ষে দাঁড়াইয়া কথা বলিবে। ইহার ব্যতিক্রম হইবে না।

(১০) এদেশ সাম্রাজ্যবাদের কবল মুক্ত থাকিবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, রাশিয়ান সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, বৃটিশের কূট-কৌশল আধিপত্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, জাপানি সমরবাদের মত সকল অশুভ শক্তির কবল হইতে মুক্ত থাকিয়া এই দেশ আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও বৃহৎ শক্তিবর্গের শক্তি-দ্বন্দ্বের কবল হইতে রক্ষা পাইবে।

(১১) জনগণ চাহিয়াছিল, পাকিস্তানিরা বিদেশ হইতে বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও রাশিয়ান সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নিকট হইতে যে ২৩০০ কোটি টাকা ঋণ লইয়াছিল; তাহার এক কানাকড়ি শোধের দায়িত্বও আমরা গ্রহণ করিব না। পাকিস্তানের দেনা আমাদের ওপর চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইলে আমরা সর্বোতভাবে তাহা রোধ করিব।

(১২) জনগণ চাহিয়াছিল, ওই মুক্তিযুদ্ধের পর জনগণের ভাগ্য হেফাজতের পবিত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ঘুষ, দুর্নীতি ও সকল প্রকার অপকর্ম হইতে মুক্ত হইবেন।

(১৩) কোন বিদেশি শক্তি বা সরকারের ইঙ্গিতে পরিচালিত না হইয়া এদেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি গরিব মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে দেশ পরিচালিত হইবে।

(১৪) জনগণ চাহিয়াছিল, পাকিস্তান আমলে হককথা বলিলে যেরূপ নির্যাতনের স্টীমরোলার চালানো হইত, স্বাধীন বাংলাদেশে তাহা চালানো হইবে না।

(১৫) ভূতের পা নাকি পিছনের দিকে, দেশকে ভূতের কাঁধে সওয়ার না করিয়া দেশটিকে প্রগতিশীল রাখা হইবে।

(১৬) সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বহু ত্যাগ স্বীকারের অভিজ্ঞতা হইতে জনগণ ভাবিয়াছিল, এই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়া সমাজতন্ত্রে পৌছিবার ধাপগুলি অতিক্রম করা যাইবে।

www.pathagar.com

এক কথায় জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল

সত্যিকার স্বাধীনতা-সার্বভৌম, কৃষক-শ্রমিকের সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ লাভ করা। আজ জিজ্ঞাসা হইল, জনগণ তাহা পাইয়াছে কি? সাড়ে সাত কোটি মানুষ রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় স্বাধীনতা বিনা বাধায় ভোগ করিতে পারে তজ্জন্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বাঙালিকে নৈতিক চরিত্র গঠন ও আত্মিক উন্নতির প্রধান সোপান ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করার বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে-জনগণ ইহা আশা করিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আমলেও এদেশের হিন্দু-মুসলমানরা যেভাবে ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য সাহায্য-সহানুভূতি পাইত, আজ বাংলাদেশ সরকার নিজেকে জাতীয় সরকার বলিয়া প্রচার করিলেও উহার কোন ব্যবস্থা করিতেছে না।

আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় নাই

নিজের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা দিয়া যাহারা চলতি পরিস্থিতি পরিমাপ করিতে সক্ষম, সেই কৃষক, শ্রমিক, গরিব মেহনতি মানুষ দেশের শতকরা ৯০ জন মানুষের জবাব হইল আমরা কাম্য বাংলাদেশ পাই নাই।

কুশাসন আবার শুরু

জনগণ পশ্চিমা হানাদারী হইতে মুক্তি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু পাকিস্তানি আমলের কুশাসন নতুন মাটির রস পাইয়া যে কত শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিয়া আতঙ্কিত হইতে হয়।

ভারতের ইঙ্গিতে চলে দেশ

পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তি আমাদের আসে নাই। কেননা, আগেকার প্রাদেশিক গভর্নর ও মন্ত্রীদের চাইতে অধিকতর নগ্নভাবে বাংলাদেশের মন্ত্রীরা নয়াদিল্লীতে হপ্তায় হপ্তায় গমন করেন, সেখান হইতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, ভারতীয় কিসিঞ্জার বাংলাদেশের অসরকারি প্রধানমন্ত্রী ডিপি ধর (হালে ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বস্ত হাত পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ বাবুরা) আসিয়া যে নির্দেশনা দিয়া যান, ঠিক সেভাবেই দেশ চালানোর এস্তেমাল হইতেছে। রাশিয়া পর্দার সমান্তরালে ভাসিয়া না উঠিলেও পর্দার অন্তরালে থাকিয়া নয়াদিল্লী ও কলকাতার মাধ্যমে বাংলাদেশকে শাসন ও শোষণের কাজে অংশ লইতেছে। বাংলাদেশের বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা দিল্লীর অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা যায় না, বাণিজ্য চুক্তি আলোচনার নাম করিয়া অর্থমন্ত্রী নয়াদিল্লীর প্রভুদিগকে উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া দেখাইয়া আনেন। সবচাইতে লজ্জার ব্যাপার হইল, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের জনগণের পবিত্রতম সনদ শাসনতন্ত্রটিরও খসড়া হইবার পর জনগণের কাছে প্রকাশের আগে দিল্লী পাঠানো হইয়াছে। জুন মাসে (১৯৭২) আইনমন্ত্রী কামাল হোসেন শাসনতন্ত্রের খসড়া বগলদাবা করিয়া 'বিলাত যাইবার' নাম করিয়া দিল্লীর প্রভুদের খেদমতে হাজির হইয়াছিলেন। মৎস্য বিভাগ এমনকি সমবায়ের মত অনুল্লেখ্য দফতরের মন্ত্রীরাও ওদেশের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও ফরমায়েশ লইয়া আসেন।

পতাকা বদলই হইয়াছে

বস্তুত পতাকা বদলের স্বাধীনতা ছাড়া এ স্বাধীনতা জনগণের জীবনের প্রান্তে অধিকতর দুঃখ ছাড়া আর কি আনিয়া দিতে পারিয়াছে। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি রাষ্ট্রীয়

www.pathagar.com

পুঁজিবাদের বিধাতা আমলা শ্রেণী এবং ১৫ লাখ টাকার চরম নব্য শোষক শ্রেণীর পদতলে বিসর্জন দেওয়া হইতেছে। শ্রমের প্রকৃত মূল্য নিরূপণের বৈজ্ঞানিক হিসাব মোতাবেক শ্রমিকের মজুরি দানের প্রথা প্রচলন এবং জনগণের সংশ্লিষ্ট শাখার হাতে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ন্যস্ত করার মাধ্যমে সংখ্যাগুরু জনসংখ্যাকে উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দান হইল সমাজতন্ত্র, অথচ আদমজীর লাভ আমলাদিগকে খাওয়াইয়া, যথেচ্ছা দুর্নীতির সুযোগ রাখিয়া অবশেষে মুনাফাগুলি ব্যাংকের মাধ্যমে ও সরাসরি সরকারের হাতে তুলিয়া দেওয়া রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ আর টাউট পুঁজিবাদ ছাড়া আর কি? আর এই সরকার, বিদেশি প্রভুদের মনোরঞ্জন ও সাম্রাজ্যবাদের পদসেবার জন্য এই অর্থ দেদারভাবে বিদেশমুখী স্রোতে না ভাসাইয়া আর কি করিবে?

সামন্ত শোষণ এখনও আছে

সামন্তবাদী শোষণ হইতে ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী, ভাগচাষীদের মুক্ত করিবার আন্দোলন চালাইয়া বহু কৃষক প্রাণ দিয়াছে। এই আওয়ামী লীগ ১৯৫৪ সালেও বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ করিতে দেয় নাই। জমিদারীর নবরূপ জোতদারী ও ভূমি মালিকানার জোরে মেহনতি মানুষের শোষণ করিবার বর্বর প্রথার অবসানের দাবিকে অন্যতম দাবি হিসেবে খাড়া করিয়া সামন্তবাদ বিরোধী শ্লোগান দিয়া মুজিবনগরের প্রবাসী সরকার কৃষকদের মুক্তিযুদ্ধে নামাইয়াছিল। আজ বলিতেছে, ১০০ বিঘার বেশি জমি থাকিলে ২২ জুন, ১৯৭২ হইতে বাড়তি জমি 'সীজ' করিতে হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে সমস্ত জোতদাররা কি ঘুমাইতেছিল? তাহারা কি জমি সংসার, আইন-আদালতে নাবালক পুত্রদিগের মধ্যে বাটিয়া পরিবারপিছু জমির পরিমাণ ১০০ বিঘার কমে নামাইয়া আনে নাই? আর ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ৯৫ বিঘা জমি তো কম নয়, এই জমির জোরে যাহারা মেহনতি মানুষদের নির্মমভাবে শোষণ করিতেছে তাহাদের ছাড়িয়া দিয়া বড় হেকমতি সমাজতন্ত্র কায়েম করা হইতেছে। ২৫ বিঘার কম চাষীর জমির খাজনা মাপের ফলে দুই-পাঁচ-দশ বিঘা জমির মালিক দরিদ্র কৃষকদের কি লাভ হইয়াছে? জমির খাজনা ২/৩ টাকা মাফ হইলেও জমির পরিমাণভিত্তিক অন্যান্য চৌকিদারী ট্যাক্স, ইউনিয়ন কাউন্সিল ট্যাক্স, আর কত প্রকার কর ঠিকই আদায় হইতেছে গরিবদের নিকট হইতে। ২৫ বিঘার খাজনা মাফ করিয়া শহরবাসীর চোখে ধূলি দেওয়া সম্ভব হইলেও গ্রামবাসীকে ধোঁকা দেওয়া যাইবে না। হাটের ইজারাদারী প্রথা বিলোপ করিয়া মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের বাহবা লওয়া হইয়াছে, কিন্তু শুভংকরের ফাঁক হইল, ইজারাদারদের বদলে জবরদস্তি হাটতোলা তুলিবার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে সরকারি কমিটিকে। এই টাউট কমিটি আরো জঘন্যভাবে জনগণকে শোষণ শুরু করিয়াছে বলিয়া হৈ চৈ পড়িয়া গেলে কীর্তিমান সরকার অবশেষে ১০ টাকার কম মূল্যের বিক্রয় সামগ্রীর উপর হাটতোলা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। মজা হইল, ওই নয়া ইজারাদার টাউট বেশি দামের বলিয়া ধরিয়া লয় এবং সরকারি খাতা ফাঁকা রাখিয়া বলিয়া দেয় যে, দশ টাকার বেশি দামের পণ্য তেমন বাজারে উঠে নাই।

৫ লাখ দানব

আইয়ুব আমলের ৮০ হাজার ফেরেশতা লালনের ইনস্টিটিউশন ছিল ইউনিয়ন কাউন্সিল, ওয়ার্কার্স প্রোগ্রাম ইত্যাদি। কিন্তু স্বাধীন হইবার পর আওয়ামী লীগের কৃপায় ৫

www.pathagar.com

লাখেরও বেশি দানব গজাইয়াছে। পঞ্চায়েত কমিটি, হাট কমিটি, রিলিফ কমিটি, টেস্ট রিলিফ বোর্ড ইত্যাকার কত ব্যবস্থা যে ইহাদের সেবার জন্য গড়িয়া তোলা হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। আইয়ুব আমলের ফেরেশতাদের শতকরা ৬০ জন শান্তি কমিটি ও দালালি করিয়াও 'খাস আওয়ামী লীগার' হইতে পারিয়াছে এবং এইসব কমিটিতে ঢুকিয়া নতুন টাউটদিগকে শোষণের তালিম দিতেছে। জনগণের সুখ-স্বস্তির আশা দেশী ও বিদেশি লুটেরাদের উচ্চাভিলাষের বানে ভাসিয়া গিয়াছে। এই দেশীয় লুটপাট সমিতি গ্রামে টাউট হইতে শুরু করিয়া সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা অবধি, ভারতীয় বেনিয়া ও ভারত সরকারকে এবং বিদেশি শক্তিকে অবাধে লুটপাট করিবার সুযোগ করিয়া দিতেছে। স্বাধীনতার পর বহু কোটি টাকার অস্ত্র, স্বর্ণ, মেশিনপত্র ও অন্যান্য সম্পদ ট্রাকের পর ট্রাক বোঝাই করিয়া ভারতে পাচার হইয়াছে। মেজর জলিলের মতো একজন ছাড়া কেহ সাহস করিয়া বাধা দেয় নাই। কারণ বিদেশি প্রভুর দাসানুদাস এদেশের মস্ত দেশপ্রেমিকরা প্রভুকে বিড়ম্বনা দিতে মোটেও প্রস্তুত নয়, এখনও যে অবাধে চোরাচালান চলিতেছে, প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার সম্পদ পাচার হইতেছে, তাহা দমনের জন্য কেবল কাগজপত্রেই 'কঠোর ব্যবস্থা' নেওয়া হইতেছে। আসলে সীমান্ত একদম ফাঁকা। ভারতীয় বর্ডারের ভারতীয় সীমান্ত-রক্ষীরাই নাকি চোরাচালান দমনের জন্য যথেষ্ট। ১৪০০ মাইল উন্মুক্ত সীমান্তে ১০ মাইল করিয়া অবাধ বাণিজ্যের এলাকা রাখা হইয়াছে, একুনে ১৪ হাজার বর্গমাইল ভারতের মুখগহ্বরে পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশের মোট আয়তন ৫৪ হাজার বর্গমাইল। অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ ভারতের জিহ্বার ডগায়। স্বাধীনতার চার মাসে ২৪ হাজার কোটি টাকার সম্পদ ভারতে পাচার হইয়াছে, গোটা ২৩ বৎসরেও পাকিস্তানে এত যায় নাই।

বাটপারি রহিয়া গিয়াছে

মানুষের মেহনতের ফল বাটপারের দ্বারা লুণ্ঠিত হইবার পথ বন্ধের চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছে সরকার। মালিক ও প্রশাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একমাত্র অস্ত্র শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার সরকার ছিনাইয়া লইয়াছে। আইয়ুব আমলের চাইতে জঘন্য উপায়ে শোষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই সরকার মাতিয়া উঠিয়াছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আজ নাই। সাহসী সাংবাদিকদের ওপর নামিয়া আসে গ্রেপ্তার-গুপ্তহত্যার মৃত্যুবাণ।

পরের ব্রেনে রাজনীতি করার ফল

গ্রামের জোতদার, বদমায়েশ মহাজন, অসৎ পরশ্রমজীবী শোষকদের অত্যাচার, যুগ যুগান্তরের শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া এই অসহ্য পাষাণের চাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কৃষক-জনতা মরিয়া হইয়া সংগ্রাম শুরু করে। প্রধানমন্ত্রীর মতো দায়িত্বশীল লোক এবং তাহার আসকারা পাইয়া তাহার চেলাচামুণ্ডারা এই শোষিত মানুষদের বিদ্রোহের কারণ অন্বেষণ না করিয়া প্রতিকারে উদ্যোগী না হইয়া 'নক্সাল' বলিয়া সব দায়িত্ব চুকাইতে চাহে। এই নির্যাতিত কৃষক-শ্রমিকদের 'নক্সাল' বলিয়া অভিহিত করার পর 'নক্সালদের' দেখামাত্র গুলি করিবার নির্দেশ দিয়া প্রধানমন্ত্রী জনতার দরবারে ক্ষমাহীন অপরাধ করিয়াছেন। দেখামাত্র গুলি করার আদেশ চরম ফ্যাসিস্ট হিটলারও দেয় নাই। ইন্দিরা গান্ধীর মতো সুদক্ষ কৃষক হত্যাকারী ও প্রগতিশীল যুবক নিধনকারী শাসক এ যুগে আর দ্বিতীয়টি নাই। তথাপি ইন্দিরা গান্ধীর মুখেও গুলি করিয়া হত্যা কর, 'দেখামাত্র গুলি কর'

www.pathagar.com

ধরনের নির্দেশ উচ্চারিত হয় নাই। বস্তুত নিজের ব্রেন দিয়া রাজনীতি না করিলে এই দশা হয়।

বাংলাদেশের স্বনির্ভরতার দুশমন ভারত

দেশটিকে সর্বোতভাবে নিজের পায়ে দাঁড় করাইবার জন্য কৃষক-শ্রমিকরা আগ্রহশীল হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে সার্থক উদ্যোগ গ্রহণ করা হইতেছে না। ভারতীয় চক্রান্তে আমাদের জাতীয় জাহাজ চলাচল সংস্থাকে পঙ্গু রাখা হইতেছে। পাট রফতানি বাণিজ্য যেন বাংলাদেশ একাকী সমাধা করিতে না পারে এবং ভারতকে অংশীদার করিয়া লইতে বাধ্য হয় তজ্জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে ভারতের পছন্দসই আমলা বসানোর চক্রান্ত চলিতেছে। সেনাবাহিনীকে ও বিমানবাহিনীকে পঙ্গু রাখিয়া, বাহিনীগুলোর অভ্যন্তরে আমলাদের প্রশ্রয় দিয়া আমাদের প্রতিরক্ষাকে ভারতের কৃপার ওপর নির্ভরশীল করিয়া তোলা হইতেছে। চট্টগ্রাম নৌ-ঘাঁটিতে রাশিয়ানরা আস্তানা করিতেছে। চট্টগ্রামের জুলদিয়ায় আসামের ডিব্রুগড়ে অবস্থিত তৈলক্ষেত্রের তৈল ভূ-স্তর বাহির অধিকতর নিচু জুলদিয়ায় আসিয়া পড়িবে, ইহাতে ভারতের স্বার্থহানি হইবে। বাংলাদেশের স্বার্থে আকণ্ঠ মিতালী সত্ত্বেও রাশিয়ার সহযোগিতায় বানানো গলার ফাঁস ফারাক্কা এখনও ভারত রাখিয়া দিয়াছে। ইহার বিকল্প হিসেবে রাজশাহীর নিকটে বিরাটায়তন হ্রদ নির্মাণের কথা সরকার ভাবে না। দেশের শিল্প-কারখানাগুলি স্থাণু হইয়া পড়িয়াছে। ঐদিকে ভারতীয় শিল্প পণ্য আসিয়া বাজার ভরিতেছে। একমাত্র সেভেন ওক্লক বিলাসী ব্লেড আসিয়াছে দেড় কোটি টাকার।

পররাষ্ট্রনীতি ইন্দিরার হাওলা

নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির নামে ঐ দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে ইন্দিরা গান্ধী ও ডিপি ধরের হাওলা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারাই এখন ভুটানের মতো বাংলাদেশের অভিভাবক হইয়া যেখানে যেভাবে বাংলাদেশকে লাগানো যায় লাগাইয়া চলিয়াছেন। ভারত নিজ দেশে গণনিপীড়ক, রাশিয়া সমাজতন্ত্রের নামে আমেরিকার প্রতিযোগী হইয়া দুনিয়া লুট করিতে নামিয়াছে। গণমুক্তি সংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশ নিজ উদ্যোগে সমর্থন না জানাইলে ঐসব দেশ নিজ শক্তি ও রাজনীতির প্রয়োজনে বাংলাদেশকে হাতের তাসের মতো ব্যবহার করিবে।

৭০ পয়সার ছওয়াব আদায়কারী সাম্রাজ্যবাদীরা আসিয়াছে

রাশিয়ান সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে দিয়া এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জাপানকে দিয়া বাংলাদেশের উর্বর ক্ষেত্রে শোষণের বীজ বপনের কাজ শুরু করিয়াছে। মাঝে-মধ্যে খোদ কর্তারা তসলিফ আনিয়া শোষণের বীজ বুননের কাজটি পাকাপোক্ত করিয়া দিয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়াও বাংলাদেশ আবার ইহাদের খপ্পরে পড়িয়াছে সরকারের মেহেরবানীতে। এক পয়সা দান বা ঋণ দিয়া যাহারা ৭০ পয়সার ফায়দা তুলিতে চায় সাম্রাজ্যবাদী সেই বেনিয়ারা ইহাদের হাত হইতে দূরে থাকার চেষ্টা দূরে থাক বরং মুজিব সরকার ম্যাকানামার কিসিঞ্জার প্রতি আহ্লাদ দেখাইয়া 'মান-অভিমানের পালা' চুকাইয়া জবর পীরিতিতে মাতিয়াছে। পাকিস্তানকে ২৪ বছরে ২৩০০ কোটি টাকা ঋণ গিলাইতে সাম্রাজ্যবাদীরা সমর্থ হইয়াছিল। বাংলাদেশকে আমেরিকা ৫ বছরের মধ্যে ৩৩০০ কোটি টাকা ঋণ গিলাইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। ইতিমধ্যে গম ও

www.pathagar.com

ঋণের মোটা চালান আসিতেছে। ইহার বিপরীতে রাশিয়ান তুকতাক 'বেদের ব্যবসা'। রাশিয়া গরিব দেশকে ভারি কল-কব্জা বানাইবার মূল যন্ত্রপাতি দেয় না নিজেরা বানাইয়া প্রচুর লাভে এবং চক্রবৃত্তি সুদে গরিব দেশকে লুণ্ঠন করে। অথচ সাচ্চা সমাজতান্ত্রিক দেশের নীতির ইহা বরখেলাপ লইয়া বাংলাদেশে নামিয়াছে। ইহার সাথে সাথে নামিয়াছে আমেরিকার কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ, রাশিয়ার কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি আর ভারতের ভয়ঙ্কর গোয়েন্দা সংস্থা রুথলেস র‍্যাড। বিভিন্ন শক্তি নিজ নিজ স্বার্থে বাংলাদেশকে নিজ মুঠোয় পুরিবার জন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে তৎপর রাখিয়াছে। ইহাদের তিনমুখি টানে সরকার 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' দশায় পড়িয়াছে। অবশ্য অবৈধ গোপন পীরিতের ফল এমনি হয়।

বাংলাদেশের ঘাড়ে পাকিস্তানি ঋণ

পাকিস্তানের পাপতুল্য ঋণের বোঝার এক বৃহদাংশ ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ঘাড়ে চাপিয়াছে। সরকারের পীরিতের আভাস পাইয়া সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের নির্দেশ, প্রভুদের মনতুষ্টির জন্য বাংলাদেশ সরকার জনগণকে না জানাইয়া পাকিস্তানি ঋণ পরিশোধ করিতে রাজি হইয়াছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা প্রকল্প ও রেলওয়ে প্রকল্পের নামে পাকিস্তান যে ঋণ লইয়াছিল ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার আমেরিকার কাছে তাহা শোধ করিতে রাজি হইয়াছে। থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের নামে পাকিস্তান রাশিয়ার নিকট হইতে যে ঋণ লইয়াছিল, রাশিয়ান বন্ধুরা বাংলাদেশের ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহা আদায় করিতেছে। ঘোড়াশাল সার প্রকল্পের জন্য নেওয়া ঋণ জাপান বাংলাদেশের হাত মোচড়াইয়া আদায় করিতেছে। এভাবে বাংলাদেশ কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার অযথা চাপের নিচে পড়িবে। এই ঋণ পাকিস্তানের। বাংলাদেশের এই সরকার বিদেশি ঋণ শোধ করিতে রাজি হইয়াছে। কিন্তু ২৩ বছরের লুণ্ঠনের সম্পদ হিসাব করিয়া ফিরাইয়া আনবার দায়িত্ব কি সরকার গ্রহণ করিবে? রাশিয়ার স্বার্থ হইল, বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান-আফগানিস্তান জুড়িয়া তৃতীয় মহাযুদ্ধের ঘাঁটি করা। তাহারা সেজন্য পাকিস্তানকে প্রকারান্তরে তোষামোদ করিবে হাত করিবার জন্য। বৃহৎ শক্তিবর্গের তোষামোদির তেলের খরচ বাংলাদেশ যোগাইবে কেন? সরকারের কাছে এই প্রশ্নের জবাব আছে কি?

দুর্নীতির নতুন স্বর্গ

জনগণকে শাসনের পবিত্র দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত তাহারা আজও দুর্নীতিমুক্ত হয় নাই। দেশের পবিত্র শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব যাহাদের উপর সেই এম.সি.এরা করেন নাই হেন দুর্নীতি ও অপকর্ম খুবই কম আছে। এই মহারথীরা দেশটিকে পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। লুটপাটের সুসংগঠিত কার্যক্রম ও লুটেরা রক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে, সর্বত্র এ একটি লুটপাট সমিতি গঠিত হইতেছে। রাতের বেলায় ইহারা লুটপাট চালায়, মজুতদারী করে, দিনের বেলায় দুর্নীতি দমনের টুপি পরিয়া কসরৎ দেখাইতে সার্কেল ইন্সপেক্টর হইতে টপ করিয়া জয়েন্ট সেক্রেটারীর পদে উন্নীত নব্য আমলারা আরো জঘন্য চেহারা লইয়া গণনিপীড়কের ভূমিকা অবতীর্ণ হইয়াছে। দুর্নীতিতে এরা সিদ্ধহস্ত। ঘুষের পরিমাণ কোন কাজের জন্য কত এখন নাকি তাহা রীতিমত রেট বাঁধা ব্যাপার।

www.pathagar.com

শ্রমিক-কৃষক কিছু না

দেশ পরিচালনায় কৃষক-শ্রমিক কেহ নহে। তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সরকারের তোয়াক্কা নেই। যে কৃষকরা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য দৃঢ়প্রত্যয় লইয়া সংগ্রাম করিবে, যে শ্রমিকেরা শ্রমের ন্যায্য মজুরি, ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা লইয়া বাঁচিবার দাবি তুলিবে তাহাদিগকে লাঠির জোরে ঠাণ্ডা করিয়া দিবার কায়দা সরকার রপ্ত করিতে শুরু করিয়াছে। এই সরকারের নিজেদের অপকীর্তি ও কুকীর্তির পরও নড়েবড়ে গদি টিকাইয়া রাখিবার জন্য মেহনতিদের একটা অংশকে লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহারের তোড়জোড় সম্পূর্ণ হইয়াছে। গণস্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া হিটলার-মুসোলিনী টিকিতে পারে নাই, ইহারাতো কোন ছার। অযথা সাবেক যুগের জমিদারদের মত জমিদারী ঠিক রাখিবার জন্য নির্দোষ কতকগুলো মানুষকে জনতার রুদ্ররোষের সামনে ঠেলিয়া দিবে। ফ্যাসিবাদের হাতিয়ার হিসেবে যাহারা ব্যবহৃত হয় তাহাদের শোচনীয় পরিণতি অবশ্যম্ভাবী।

জুলুমের স্টীমরোলার

যে শাসকশ্রেণীর পতন অনিবার্য, তাহাদের পূর্ব লক্ষণ হইল, তাহারা সমালোচনা বরদাশ করিতে পারে না, মুসলিম লীগ সরকারগুলোর মতো বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারকেও এই ভূতে পাইয়াছে। তাহাদিগকে ঠিক পথে আসিতে বলিলে, অন্যায় ভূমিকা পরিত্যাগ করিতে বলিলে তাহারা সমালোচনাকারীদের ওপর খড়গহস্ত হইয়া উঠে। পাকিস্তান আমলে হককথা বলিলে যে জুলুম হইত এখন সেই ধারার পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে; বরং এই সরকার শক্তি সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস হেতু জুলুমের মাত্রা আরো তীব্রতর করিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইবার পর ছয়টি মাস না কাটিতে এই সরকার পুলিশ বাহিনীকে সেই আগের মতো গুলিবাজ বাহিনীতে পরিণত করিয়াছে। পুলিশ দিয়াও ভরসা না পাইয়া পুলিশের উপর ও কৃষক-শ্রমিক জনতার ওপর ডাণ্ডাবাজি করিবার জন্য লালবাহিনী, সবুজ বাহিনী, জয় বাংলা বাহিনী বানাইতেছে। এই ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলো গণতন্ত্রকে শিকায় তুলিয়া সমাজতন্ত্রকে ত্রি-সীমানার বাহিরে ঝাঁটাইয়া দিয়া তারপর মুজিববাদ কায়েম করিবে।

ইন্দিরাবাদের তাঁবেদার

দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর করিবার পরিবর্তে ভারতে প্রবর্তিত জঘন্য ইন্দিরাবাদকে নির্লজ্জের মতো মুজিববাদ নামে এদেশে প্রবর্তনের চেষ্টা করা হইতেছে। বশংবদ বিরোধীদলকে বগলে রাখিয়া সময় সময় বশংবদদের মুখে ঝাঁটা দিয়া গণতন্ত্রের প্রহসনের অপর নাম ইন্দিরাবাদ। সত্যিকার বিরোধীদলের অস্তিত্ব তাতে বরদাশত করা হয় না। ভারতে কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের গুণ্ডাবাহিনীর ত্রাস সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ, নরহত্যাযজ্ঞ, কৃষক-শ্রমিক-বুদ্ধিজীবী হত্যার রহস্য উদঘাটিত হইতে শুরু করিয়াছে। মুজিববাদ ইন্দিরাবাদেরই বাংলাদেশ সংস্করণ মাত্র।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ

সমাজতন্ত্রে উপনীত হইবার ভাঁওতা দিয়া দেশে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটানো হইতেছে। এই রাষ্ট্রযন্ত্র জনগণের সেবা অপেক্ষা বিদেশি প্রভু ও তা এদেশীয় এজেন্টদের সেবায় বেশি নিয়োজিত। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ তাই বিদেশি লুটেরাদের লুণ্ঠনকে সহজতর করিবে। এই কাজটি এখন সম্পাদন করিবে ক্ষমতাসীন সরকার।

www.pathagar.com

ওয়াদাভঙ্গের শেষ নাই

আওয়ামী লীগ বলিয়াছিল, ক্ষমতায় গেলে তাহারা জনগণকে ১০ টাকা মণ দরে গম ও ২০ টাকা মণ দরে চাউল খাওয়াইবে। আজ চাউলের মণ ৮০/৯০ অতিক্রম করিয়া কোনো কোনো জায়গায় ১০০ টাকায়ও পৌঁছিয়াছে। আওয়ামী লীগের প্রবাসী সরকার অঙ্গীকার করিয়াছিল, এই দেশে সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সত্যিকার গণপ্রজাতন্ত্র হইবে। অথচ এই দেশে সামন্তবাদ টিকিয়া থাকিতেছে। এই দেশে পুনরায় সাম্রাজ্যবাদের জিঞ্জির পরিতেছে। এই দেশে গণপ্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বলিতে নামের বিশেষণ ছাড়া আর কিছু নাই। আওয়ামী লীগ বলিয়াছিল, জনগণের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালনাকারী বিডি মেম্বার, শান্তি কমিটি মেম্বার ও দুস্কৃতকারীদের শায়েস্তা করিবে। আওয়ামী লীগের রিলিফ কমিটি, হাট কমিটি, মাঠ কমিটিতে ইহারাই আজ সর্বেসর্বা।

বিচারক আজ মেহনতি জনতা

বিদেশের নিকট দেশের সর্বস্ব বিকাইয়া দিয়া বর্তমান সরকার যে জঘন্য অপরাধ করিয়াছে, ইহার বিচারের দায়িত্ব দেশের প্রবঞ্চিত কৃষক-শ্রমিক মেহনতি গরিব মানুষদের ওপর আজ ন্যস্ত হইল।

বিরোধী পক্ষের ওপর হামলা

আওয়ামী লীগের এ সকল কুকীর্তির কথা ফাঁস করিয়া দিবার উদ্যোগ লইলেই আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষেপিয়া ওঠে। এদেশের ওপর বিদেশিদের লুটতরাজের বিরোধিতা করিলে বিদেশি শক্তির ইঙ্গিতে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী পক্ষের ওপর হিংস্রতা লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।

এখনও চক্রান্ত

আর ইহার প্রমাণ হইল গোয়েন্দা সংস্থা রুথলেস র‍্যাড (র) ও কেজিবি'র ইঙ্গিতে এদেশে এক লক্ষ বামপন্থী দেশপ্রেমিক হত্যার জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে। ২২ জুনের শেখ মুজিবের বক্তৃতা হইতে সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, নিজের ফ্যাসিস্ট বাহিনী দ্বারা তিনি বিরোধিতাকারীদের সমূলে নিপাত করিবে।

কৃষক-শ্রমিক তোমাদের রুখিবে

পাকিস্তান কায়েমের পর মুসলিম লীগ সরকারও এমনি লম্পঝম্প দিয়াছিল। কিন্তু সত্যের নিকট তাহাদের পরাজয় ঘটিয়াছে। এদেশে কৃষক-শ্রমিক ও তাহাদের শিক্ষিত সন্তানেরা জীবনের কঠোর কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতা, দুঃখ-দুর্দশা, অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটাইয়া কৃষক-শ্রমিকদের সত্যিকার মুক্তির যে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে সেই সব পথের কথা বলিতে তাহারা কোনদিন ভয় পাইবে না। দুর্নীতিবাজ, বিদেশি লুটেরা এজেন্ট, ওয়াদা বরখেলাপকারীদের বিরুদ্ধে সত্যের পতাকাবাহী শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত মানুষের জয় অনিবার্য।

ভিয়েতনামের শপথ

মনোবল অক্ষুণ্ন রাখিয়া বাংলাদেশে ভারতীয় ইন্দিরাবাদের সম্প্রসারণ প্রতিহত করুন। স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য বীর ভিয়েতনামীরা আজ ২৪ বছর ধরিয়া লড়াই

www.pathagar.com

করিতেছে। এক সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে আরেক সাম্রাজ্যবাদের হাতে পড়িয়া বীর ইন্দো-চীনবাসী দুর্বল হয় নাই। একের পর এক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া মঞ্জিল-মকসুদের পথে অগ্রসর হইতেছে। বাংলাদেশের বীর কৃষক-শ্রমিক, সাহসী যুবক-জনতা, গরিব মানুষেরা বীরত্বপূর্ণ ঐতিহ্যের অধিকারী।

জয় নির্যাতিত জনতার

বাংলাদেশ চিরদিন স্বাধীন থাকিবে। অর্জিত স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতায় রূপান্তরের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। মুজিববাদের ধ্বজাধারীরা বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করিতে চাহিতেছে। একটি জাতিকে জোরপূর্বক অপরের বশ্যতা স্বীকার করাইবার অপচেষ্টায় ইহারা মাতিয়াছে। এই চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিতে প্রস্তুত হোন। জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দান, বিদেশি লুটেরা শক্তিকে খাল কাটিয়া ডাকিয়া আনা, দেশের অভ্যন্তরে এক শ্রেণীর পিশাচের জঘন্য শোষণ ও প্রতারণার বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিক-গরিব মেহনতি মানুষের ঐক্যজোট গড়িয়া তুলুন।

এই দেশ, এই মাটি, দেশের সম্পদরাজি এই দেশের জনগণের। জনগণ এই দেশের ইজ্জত রক্ষা করিবেই। শোষিত-নির্যাতিত জনগণের কণ্ঠই আল্লাহর কণ্ঠ। নিপীড়িত শোষিত জনগণই অসীম শক্তির আধার।

আওয়ামী লীগের কথা ও কাজ-ওয়াদা ভঙ্গের এক অতুলনীয় নজির, প্রকাশক মোহাম্মদ হোসেন, জুলাই ১৯৭২, মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস, টাঙ্গাইল।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৮

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী

শনিবার, জানুয়ারি ২৫, ১৯৭৫

খণ্ড ৫-বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল, ইত্যাদি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৭৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা ইহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে-

১৯৭৫ সনের ২ নং আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধান সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম-এই আইন সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদের সংশোধন-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (অতঃপর 'সংবিধান' বলিয়া অভিহিত)-এর ১১ অনুচ্ছেদের 'এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে' শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৩। সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন-সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৪৪ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপন হইবে-

'৪৪। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ-এইভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য সংসদ আইনের দ্বারা একটা সাংবিধানিক আদালত, ট্রাইব্যুনাল অথবা কমিশন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন'।

৪। সংবিধানের চতুর্থ ভাগের সংশোধন-সংবিধানের চতুর্থ ভাগে,

(ক) ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

১ম পরিচ্ছেদ-রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি

৪৮। রাষ্ট্রপতি-(১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।

(২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন।

www.pathagar.com

৪৯। উপ-রাষ্ট্রপতি-বাংলাদেশের একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

৫০। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার এবং উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা-কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি

(ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন; অথবা

(খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন; অথবা

(গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।

৫১। রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ-(১) এই সংবিধানের বিধানাবলীর সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহার পদ হইতে পূর্বে অপসারিত না হইয়া থাকিলে উপ-রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৩) উপ-রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে উপ-রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভারকালে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না এবং কোন সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত কিংবা উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইলে রাষ্ট্রপতি কিংবা উপ-রাষ্ট্রপতি রূপে তাঁহার কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৫২। রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি-(১) এই সংবিধানের ৫৩ নং অনুচ্ছেদের হানি না ঘটাইয়া বিধান করা হইতেছে যে, রাষ্ট্রপতি কিংবা উপ-রাষ্ট্রপতি তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোন কার্য করিয়া থাকিলে বা না করিয়া থাকিলে সেইজন্য তাঁহাকে কোন আদালতে জবাবদিহি করিতে হইবে না, তবে এই দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণ কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না।

(২) রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতির কার্যভারকালে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকার ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাইবে না এবং তাঁহার গ্রেপ্তার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত হইতে পরোয়ানা জারি করা যাইবে না।

৫৩। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন-(১) এই সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করিবেন।

www.pathagar.com

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত কোন ট্রাইব্যুনালের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করিতে পারিবেন।

(৩) অভিযোগ-বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকিবে।

(৪) অভিযোগ-বিবেচনার পর মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

৫৪। অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ-(১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের স্বাক্ষরে কথিত অসামর্থ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে।

(২) সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে নোটিশ প্রাপ্তিমাত্র স্পীকার সংসদের অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং একটি চিকিৎসা পর্ষদ (অতঃপর এই অনুচ্ছেদে পর্ষদ বলিয়া অভিহিত) গঠনের প্রস্তাব আহ্বান করিবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইবার পর স্পীকার তৎক্ষণাৎ উক্ত নোটিশের একটি প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাহার সহিত এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিবেন যে, অনুরূপ অনুরোধ-জ্ঞাপনের তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যেন পর্ষদের নিকট পরিক্ষীত হইবার জন্য উপস্থিত হন।

(৩) অপসারণের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদানের পর হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না এবং অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য পুনরায় সংসদ আহবানের প্রয়োজন হইলে স্পীকার সংসদ আহ্বান করিবেন।

(৪) প্রস্তাবটি বিবেচিত হইবার কালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকিবে।

(৫) প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত না হইয়া থাকিলে প্রস্তাবটি গৃহীত ভোটে দেওয়া যাইতে পারিবে এবং সংসদের মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ভোটে তাহা গৃহীত হইলে প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

(৬) অপসারণের জন্য প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপিত হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকিলে সংসদের নিকট পর্ষদের মতামত পেশ করিবার সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না।

(৭) সংসদ কর্তৃক প্রস্তাবটি ও পর্ষদের রিপোর্ট (যাহা এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে পরীক্ষার সাত দিনের মধ্যে দাখিল করা হইবে এবং অনুরূপভাবে দাখিল না করা হইলে তাহা বিবেচনার প্রয়োজন হইবে না) বিবেচিত হইবার পর সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে তাহা গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

৫৫। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি-(১) রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত শূন্যপদে নির্বাচিত

www.pathagar.com

নতুন রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি রূপে কার্য করিবেন।

(২) কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি উভয়ের পদশূন্য হইলে কিংবা রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি উভয়েই অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত শূন্যপদে নির্বাচিত নতুন রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতি রূপে কার্য করিবেন।

(৩) কোন সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের কোন বিধান না থাকিলে সংসদ যেরূপ যুক্তিযুক্ত মনে করেন, সেইরূপ বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৫৬। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব-(১) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির উপরে ন্যস্ত হইবে এবং এই সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাহার অধীনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে।

(২) (১) দফায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি যে ক্ষমতা, তাহার আদেশের দ্বারা নির্ধারণ করিবে, উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে।

(৪) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কীরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৫) রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যাবলী বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।

৫৭। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন ইত্যাদির অধিকার-কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।

২য় পরিচ্ছেদ-মন্ত্রিপরিষদ

৫৮। মন্ত্রিপরিষদ-(১) রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিবার এবং পরামর্শদানের জন্য একটা মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে।

(২) পরিষদ বা মন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শ দান করিয়াছেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে কী পরামর্শ দান করিয়াছেন কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।

(৩) রাষ্ট্রপতির তাঁহার বিবেচনায় সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে কিংবা সংসদ-সদস্য হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে একজন প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি যেরূপ আবশ্যক মনে করিবেন সেইরূপ অন্যান্য, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী পরিষদের সদস্য হইবে না।

(৪) রাষ্ট্রপতি পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তিনি ঐ সকল সভায় উপ-রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতিত্ব করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৫) মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৬) রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে কোন মন্ত্রী স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

www.pathagar.com

(৭) এই অনুচ্ছেদে 'মন্ত্রী' বলিতে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত; এবং
(খ) ৩য় পরিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।
৫। সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানে ৬৬ অনুচ্ছেদের-
(ক) (২) দফায়-
(অ) (ঙ) উপ-দফায় সেমিকোলন শেষে 'অথবা' শব্দটা সংযোজিত হইবে;
এবং (আ) (চ) উপ-দফা বিলুপ্ত হইবে এবং
(খ) (৩) দফা বিলুপ্ত হইবে।
৬। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন-সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

'৭০। পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে আসন শূন্য হওয়া-কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

ব্যাখ্যা-যদি কোন সংসদ সদস্য, যে দল তাঁহাকে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত করিয়াছেন, সেই দলের নির্দেশ অমান্য করিয়া-
(ক) সংসদে উপস্থিত থাকিয়া ভোটদানে বিরত থাকেন অথবা
(খ) সংসদে কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।'

৭। সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফার শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে;
'তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি বৎসর সংসদের অন্তত দুইটা অধিবেশন হইবে'।
৮। সংবিধানে নতুন ৭৩ ক অনুচ্ছেদের সংযোজন-সংবিধানের ৭৩ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নূতন ৭৩ ক অনুচ্ছেদ সংযোজিত হইবেঃ
'৭৩ ক। সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার। (১) প্রত্যেক মন্ত্রী সংসদে বক্তৃতা করিতে এবং অন্যভাবে ইহার কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করিতে অধিকারী হইবেন, তবে তিনি যদি সংসদ সদস্য না হন, তাহা হইলে তিনি ভোট দান করিতে পারিবেন না।
(২) এই অনুচ্ছেদে 'মন্ত্রী' বলিতে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত।'
৯। সংবিধানের ৭৪ নং অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের (৩) দফার 'রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে রত থাকিলে' শব্দগুলির পরিবর্তে 'রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করিলে' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।
১০। সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদের (১) দফার 'সংসদের প্রত্যেক অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে' শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।
১১। সংবিধানের ৮০ অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ৮০ অনুচ্ছেদের (ক) দফায় 'সম্মতি দান করিবেন' শব্দগুলির পর 'কিংবা তাহাতে সম্মতিদানে বিরত রহিলেন বলিয়া ঘোষণা করিবেন' শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।
১২। সংবিধানের ৮৮ নং অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ৮৮ নং অনুচ্ছেদের (ক) দফার পর নিম্নরূপে নতুন দফা সংযোজিত হইবেঃ
'(ক ক) উপ-রাষ্ট্রপতিকে দেয় পারশ্রমিক ও তাহার দফতর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়।'
১৩। সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (১) দফা প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

www.pathagar.com

'(১) প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।'

১৪। সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের-

(ক) (২) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (২) দফা প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

'(২) অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা কোন বিচারককে তাহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিচারককে তাহার সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগদান না করা পর্যন্ত তাহাকে অপসারিত করা যাইবে না।' এবং

(খ) (৩) দফা বিলুপ্ত হইবে।

১৫। সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের 'প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া' শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১৬। সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন-সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১০২ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

'১০২। কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা-

(১) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে

(ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে

(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাহার কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশ দান করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে

(অ) আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ করিয়া, অথবা

(আ) কোন সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবি করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশ দান করিতে পারিবেন।

(২) (১) দফায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও হাইকোর্ট বিভাগের কোন অন্তর্বর্তী আদেশদানের বা এই সংবিধানে ৪৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন কোন আদেশ দানের ক্ষমতা থাকিবে না।

(৩) প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্য রূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে 'ব্যক্তি' বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগসমূহ অথবা কোন শৃঙ্খলা বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে'।

www.pathagar.com

১৭। সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদের 'আদালত ও ট্রাইব্যুনালের' শব্দগুলির পরিবর্তে 'আদালতের' শব্দটা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৮। সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন-সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১১৫ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

'১১৫। অধঃস্তন আদালতে নিয়োগ- বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্য প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।'

১৯। সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের 'সুপ্রিম কোর্টের' শব্দগুলির পরিবর্তে 'রাষ্ট্রপতির' শব্দটা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০। সংবিধানে নূতন ১১৬ ক ধারার সংযোজন-সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের ১১৬ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নূতন ১১৬ ক অনুচ্ছেদ সংযোজিত হইবেঃ

'১১৬ ক। বিচার বিভাগীয় কর্মচারীগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন-এই সংবিধানের বিধানাবলীসাপেক্ষে বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।'

২১। সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদের (১) দফার (গ) উপ-দফার '৩' সংখ্যার পরিবর্তে '২' সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২২। সংবিধানের নূতন ষষ্ঠ-ক ভাগের সংযোজন-সংবিধানের ষষ্ঠভাগের পর নিম্নরূপ নূতন ষষ্ঠ-ক ভাগ সংযোজিত হইবে ঃ

ষষ্ঠ-ক ভাগ

জাতীয় দল

১১৭-ক। জাতীয় দল-(১) রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটা পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে অনুরূপ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি, আদেশ দ্বারা নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, রাষ্ট্রে শুধু একটা রাজনৈতিক দল (অতঃপর জাতীয় দল নামে অভিহিত) থাকিবে।

(২) যখন (১) দফার অধীন কোন আদেশ প্রণীত হয়, তখন রাষ্ট্রের সকল রাজনৈতিক দল ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং রাষ্ট্রপতি জাতীয় দল গঠন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৩) জাতীয় দলের নামকরণ, কার্যসূচি, সদস্যভুক্তি, সংগঠন, শৃঙ্খলা, অর্থসংস্থান এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কিত সকল বিষয় রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) (৩) দফার অধীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত আদেশসাপেক্ষে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি জাতীয় দলের সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন।

(৫) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও, যখন জাতীয় দল গঠিত হয়, তখন কোন ব্যক্তি-

(ক) যদি তিনি, যে তারিখে জাতীয় দল গঠিত হয়, সেই তারিখে, সংসদ-সদস্য থাকেন, তাহা হইলে তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় দলের সদস্য না হইলে সংসদ সদস্য থাকিবেন না এবং সংসদে তাহার আসন শূন্য হইবে;

(খ) যদি তিনি জাতীয় দলের দ্বারা রাষ্ট্রপতি বা সংসদ সদস্য নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত না হন, তাহা হইলে অনুরূপ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি বা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না;

www.pathagar.com

(গ) জাতীয় দল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠন করিবার বা অনুরূপ দলের সদস্য হইবার কিংবা অন্যভাবে অনুরূপ দলের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না।

(৬) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কোন আদেশ পরবর্তী কোন আদেশ দ্বারা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

২৩। সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের (১) দফার-

(ক) 'সংসদের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং সংসদের নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি পদের শব্দগুলির পরিবর্তে 'রাষ্ট্রপতি-পদের ও সংসদের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) (খ) দফায় 'এবং' শব্দটা বিলুপ্ত হইবে; এবং

(গ) (গ) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (গ) এবং (ঘ) দফা প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

(গ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকা সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং

(ঘ) রাষ্ট্রপতি-পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন।'

২৪। সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদে-

(ক) (১) দফার 'ভোটাধিকার-ভিত্তিতে' শব্দটার পরে 'রাষ্ট্রপতি-পদের ও' শব্দগুলি সংযোজিত হইবে; এবং

(খ) (২) দফার পর নিম্নরূপ নতুন দফা সংযোজিত হইবেঃ

'(৩) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি-পদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি তিনি (২) দফার অধীন কোন নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হন।

২৫। সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদে,

(ক) (১) দফায়-

(অ) 'নব্বই দিন' শব্দগুলির পরিবর্তে 'একশত আশি দিন' প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) শর্তাংশটি বিলুপ্ত হইবে'

(খ) (২) দফার 'নব্বই দিনের' শব্দগুলির পরিবর্তে 'একশত আশি দিনের' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৬। সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন-সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১২৪ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

'১২৪। নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা-এই সংবিধানের বিধানাবলীসাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা-

(ক) ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ

(খ) সংসদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ;

(গ) নির্বাচন অনুষ্ঠান; এবং

(ঘ) রাষ্ট্রপতি-পদের নির্বাচনের জন্য এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ রাষ্ট্রপতি পদের কিংবা সংসদের নির্বাচন সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।'

২৭। সংবিধানের ১৪১ ক অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ১৪১ ক অনুচ্ছেদের (১) দফার শর্তাংশটা বিলুপ্ত হইবে।

www.pathagar.com

২৮। সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদের (৪) দফার (ক) উপ-দফার পর নিম্নরূপ নতুন উপ-দফা সংযোজিত হইবেঃ

'(ক ক) উপ-রাষ্ট্রপতি,'।

২৯। সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদের সংশোধন-সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদের (২) দফার 'এবং কোন কারণে সেই ব্যক্তির নিকট শপথ গ্রহণ সম্ভব না হইলে' শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৩০। সংবিধানের দ্বিতীয় তফসিলের বিলোপ-সংবিধানের দ্বিতীয় তফসিল বিলুপ্ত হইবে।

৩১। সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের সংশোধন-সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে-

(ক) ১ ফরমে 'প্রধান বিচারপতি' শব্দগুলির পরিবর্তে 'স্পীকার' শব্দটা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) (১) ফরমের পর নিম্নরূপ নতুন ফরম সংযোজিত হইবেঃ

'১ ক। উপ-রাষ্ট্রপতি-রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা) পাঠ পরিচালিত হইবেঃ

'আমি,..........................., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রপতি পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী, যথাবিহিত আচরণ করিব;

(গ) ৩ ফরমে 'প্রধান বিচারপতি' শব্দগুলির পরিবর্তে 'রাষ্ট্রপতি' শব্দটা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) ৪ ফরমে 'প্রধান বিচারপতি' শব্দগুলির পরিবর্তে 'রাষ্ট্রপতি' শব্দটা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঙ) ৫ ফরমে 'সংসদের কোন বৈঠক' শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৩২। চতুর্থ তফসিলের সংশোধন- সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১২ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।

৩৩। প্রথম সংসদের মেয়াদ বৃদ্ধি-সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে দায়িত্ব পালনরত সংসদ, রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে, এই আইন প্রবর্তন হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে ভাঙ্গিয়া যাইবে।

৩৪। রাষ্ট্রপতি-সংক্রান্ত বিশেষ বিধান-সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে,

(ক) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি রাষ্ট্রপতির পদে থাকিবেন না এবং রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে;

(খ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হইবেন এবং রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত প্রবর্তন হইতে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি-পদে বহাল থাকিবেন যেন তিনি এই আইনের দ্বারা সংশোধিত সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতি-পদের নির্বাচিত হইয়াছেন।

সৈয়দ মাহবুবার রহমান
সচিব।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৯

জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েমে সংগঠিত হোন

(ইউনাইটেড পিপলস পার্টি কর্তৃক ২৯-৮-১৯৭৫ তাং-এ প্রদত্ত বিবৃতি)

গত ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সাড়ে তিন বছরের ঘৃণ্য ও গণধিকৃত মুজিবী রাজত্বের অবসান হয়েছে। লুট-দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষ-অনাহার, চোরাচালান-পারমিটবাজি, স্বৈরাচার-পারিবারিক রাজত্ব কায়েম, জাতীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও অবমাননায় বিক্ষুব্ধ জনগণ প্রতি মুহূর্তে মুজিবের পতন কামনা করেছে। সন্ত্রাস ও হামলা, বিভ্রান্তি ও হতাশাকে দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করে গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ। বিশেষ করে বিগত নয় মাসের কালো দিনগুলোতে পরম ধৈর্য ও সাহসিকতা নিয়ে সংগঠিত হয়েছে মুজিবী শাসনব্যবস্থাকে চিরতরে কবর দেয়ার জন্য। মুজিবের অপসারণে জনগণ উল্লসিত। তার মৃত্যু কারো মনে সামান্যতম সমবেদনা বা দুঃখ জাগায়নি-জাগাতে পারে না। ইতিহাস নির্ধারিত ফ্যাসিস্ট একনায়কের পরিণতিই তাকে বরণ করতে হয়েছে। আর কেউ এ পথ নিলে তাকেও এই ভাগ্য বরণ করতে হবে। মুজিবী আমল জনগণের কাছে একটি শিক্ষা। আর তাই মুজিবের পর জনগণের মনে প্রশ্ন-ভবিষ্যৎ কোন পথে?

এদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ইতিহাস জাতীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লড়াইয়ের ইতিহাস। শেখ মুজিব ও তার সহচররা জনগণের সেই লড়াইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। গণতন্ত্রকে হত্যা করে কায়েম করেছে স্বৈরাচারী পারিবারিক রাজত্ব। অর্থনীতিকে ধ্বংস করে সৃষ্টি করেছে মুষ্টিমেয় নতুন ধনী। দেশকে তুলে দিয়েছে বিদেশি শোষণ ও লুণ্ঠনের জন্য। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে সম্প্রসারণবাদী ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে অধীনতামূলক সামরিক ও বাণিজ্যিক চুক্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে। সোভিয়েত সংশোধনবাদী শাসকচক্রের আধিপত্য বিস্তারের লালসা পূরণে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাদের নগ্ন ও অন্যায় হস্তক্ষেপকে মেনে নিয়েছে। আর একই সাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লগ্নি-পুঁজির ঘৃণ্য ফাঁসকে ছড়িয়ে দিয়েছে সমগ্র অর্থনীতিতে। এক কথায় বাংলাদেশকে পরিণত করেছে ভারত-রুশ-মার্কিনী শক্তিদ্বয়ের অবারিত লীলাভূমিতে। আর এই সকল দেশী-বিদেশি লুটেরা-বদমাশ ও চক্রান্তকারীদের স্বার্থ পাহারা দেওয়ার জন্য মুজিব তার সিংহাসন থেকে হুকুম করেছে নির্বিচারে জনগণ ও গণতান্ত্রিক কর্মীদের হত্যা, গ্রেপ্তার, এমনকি সপরিবারে ধ্বংস করার জন্য। জেলে আটক হাজার হাজার রাজবন্দি, বিভিন্ন অঞ্চলে আবিস্কৃত গণকবর এর প্রমাণ। (যশোরের কালিগঞ্জ থানার কালীর বাজারে একটি গণকবরেই ৬০টি লাশ পাওয়া গেছে।)

শেখ মুজিব শেষ হয়েছে। কিন্তু মুজিবী শাসনব্যবস্থা শেষ হয়নি। কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, কিন্তু জনগণের অধিকার কায়েম, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও আধিপত্য অবসানের মৌলিক নীতি ঘোষিত হয়নি। দু'চারজন রাজবন্দি মুক্তি পেয়েছেন, হাজারো রাজবন্দি

www.pathagar.com

এখনও কারাগারে। দু'একটি সংবাদপত্র মুক্ত হয়েছে কিন্তু সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল হয়নি। জনগণের ভাত-কাপড়-আশ্রয়-চিকিৎসার প্রশ্ন অমীমাংসিত। দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী খুনীরা এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছে। তাই প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে এবং সঙ্গতভাবেই। কোন প্রকার চোখ রাঙানি বা বিভ্রান্তির সৃষ্টির প্রচেষ্টা সেই প্রশ্নের অবসান ঘটাতে পারে না। তাই জনগণের স্বার্থ অটুট রাখার জন্য এখনই মুজিবী ব্যবস্থা অবসানের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। জনগণের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য এই মুহূর্তেই যা করা দরকার তা হলো ঃ

॥ক॥ মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনী তথা একদলীয় শাসন আইন বাতিল, সংবাদপত্রসহ সকল নির্যাতন ও নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার, বাক-স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ, রাজনৈতিক দল গঠন করার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের অধিকার প্রদান করা।

॥খ॥ সকল রাজবন্দি, রাজনৈতিক বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি প্রদান ও সকল রাজনৈতিক মামলা ও হুলিয়া প্রত্যাহার করা।

॥গ॥ কোন ব্যতিক্রম না করে মুজিবী আমলের দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী, এমপি, দলীয় নেতা-উপনেতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান।

॥ঘ॥ মুজিবী সন্ত্রাসের স্থানীয় পাণ্ডা, হত্যা-লুট-নারী ধর্ষণকারী বদমাইশ ও তাদের নির্দেশ ও আশ্রয়দানকারী মন্ত্রী, এমপি, দলীয় কর্মকর্তা ও অফিসারদের গ্রেফতার, বিচার ও শাস্তি দান।

॥ঙ॥ খাদ্য-বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানোর জন্য মজুতদার, চোরাচালানী ও চোরাকারবারী দমন ও ঐসব জিনিসের সরবরাহ ও বন্টন সুনিশ্চিত করা।

॥চ॥ কৃষি, শিল্প, ব্যবসার ক্ষেত্রে মুজিবী অব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভিমুখী প্রগতিশীল কর্মসূচি ঘোষণা করা।

॥ছ॥ বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও আধিপত্যের অবসানকল্পে ভারতের সাথে সম্পাদিত গোপন চুক্তি প্রকাশ করা ও সকল অসম অধীনতামূলক চুক্তি বাতিল করা। সোভিয়েতের অন্যায় হস্তক্ষেপ বন্ধ করা ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সকল শোষণ ও চক্রান্তকে প্রতিহত করা। এই লক্ষ্যে জনগণের উদ্যোগ ও সচেতনতাকে সংগঠিত করা ও তার উপর নির্ভর করা।

দেশবাসী শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী-সামরিক বাহিনীর জোয়ান ও অফিসার ভাই,

অনেক রক্তক্ষয়, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা আমাদের একই পথের পথিক করেছে। কোন ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ বা বিদেশি শোষকের স্বার্থ নয়, আমাদের দেশ, জনগণ ও জাতীয় স্বার্থকে উর্ধ্বে তুলে ধরেই কেবলমাত্র আমরা শেখ মুজিবের ঘৃণ্য শাসন ব্যবস্থাকে চিরতরে কবর দিতে পারি। নিজেদের সচেতন ও সংগঠিত প্রয়াস দিয়েই কেবলমাত্র অধিকার আদায় ও রক্ষা করতে পারি। যারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়-মুজিবী প্রেতাত্মা ফিরিয়ে আনতে, নতুন কায়দায় তাকে বহাল রাখতে চায় অথবা যারা নতুন করে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা ও শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার! আমরা নতুন করে বিভ্রান্ত ও বঞ্চিত হতে চাই না। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে-বন্ধুগণ!

www.pathagar.com

(১) ১৫ আগস্টের পর থেকে রুশ-ভারত শক্তি অসন্তুষ্ট রয়েছে এবং তাদের ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও সাবোটাজ চলবে। তাদের অনুচররা গণধিকৃত মুজিবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালাবে। সরাসরি হস্তক্ষেপ ও আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চাইবে। এ ষড়যন্ত্রকে রুখতে হবে।

(২) অন্যদিকে বৈদেশিক চক্রান্ত বা বিদেশি হামলার সম্ভাবনার প্রশ্নকে জনগণের অধিকার না দেওয়ার অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা চলবে। চেষ্টা চলবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার। এর বিরুদ্ধে আপোসহীনভাবে লড়তে হবে।

(৩) বর্তমান অবস্থার বিশেষ অনুকূল পরিস্থিতিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত আরও বেশি বেশি করে তার থাবা বিস্তার করতে চাইবে। প্রতিক্রিয়াশীল ও সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তিকে মদদ যোগাবে। তাদের লগ্নি-পুঁজির দাসত্ব বন্ধনে দেশকে আরো বেশি করে আটকাতে চাইবে। এই অনুপ্রবেশ ও ষড়যন্ত্র রুখতে হবে।

(৪) সাম্প্রদায়িক, পশ্চাদমুখী, প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণাকে নবউদ্যমে প্রগতিশীল অগ্রগতির বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা চলবে। চেষ্টা চলবে ইতিহাসের চাকাকে পিছনে ঠেলে দেয়ার। প্রগতির অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হবে।

তাই আসুন এক মুহূর্ত দেরী না করে নিজেরা সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হই। মুজিবী শাসন, অন্যায় বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে তাকে সংগঠিত ও কার্যকর রূপদান করি। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও আধিপত্য প্রতিরোধের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েমের সংগ্রামকে দৃঢ় ও অবিচলভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাই। জনগণই একমাত্র নিয়ামক শক্তি। জনতার জয় অবশ্যম্ভাবী।

ইউনাইটেড পিপলস পার্টি।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১০

জিয়াউর রহমানের নেতৃত্ব মেনে নেব তবে........ মশিউর রহমান

(২১ এপ্রিল, ১৯৭৮ সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রদত্ত সাক্ষাতকার)

জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংরক্ষক এবং আধিপত্যবাদ বিরোধী একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের কথা প্রেসিডেন্ট প্রথম ঘোষণা করেন ১৫ ডিসেম্বর '৭৭ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষণে। পরবর্তী পর্যায়ে এই ফ্রন্ট নিয়ে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। কিন্তু ফ্রন্ট গঠনের কাজ খুব বেশিদূর এগোয়নি।

৫ এপ্রিল জাপান যাত্রার প্রাক্কালে প্রেসিডেন্ট ঢাকা বিমানবন্দরে ঘোষণা করেন এই ফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনা এখন সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে। প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা, সাধারণ নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা এবং সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বাতিল করে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এই তিনটি শর্ত সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট বলেন, এগুলোর মধ্যে অসম্মতি তো কিছু দেখি না, এগুলো ঠিকই আছে এবং আমরা ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারে কাজ শুরু করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই তিন দফার ভিত্তিতে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার কথা প্রথম ঘোষণা করেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির চেয়ারম্যান মশিউর রহমান (যাদু মিয়া)। পরবর্তী পর্যায়ে অনেকে এই ঘোষিত ঐকমত্যের বিরোধিতাও করেন।

কিন্তু আলোচনা চলতে থাকে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, এই তিন দফার প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে সুস্পষ্ট ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন। অন্যদের মধ্যে যারা ফ্রন্ট গঠনে ঐকমত্যে পৌছাতে পারেননি, তাঁদের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেয় প্রস্তাবিত ফ্রন্টের অর্থনৈতিক কর্মসূচি প্রশ্নে। প্রেসিডেন্টের জাপান সফরের সময়, দলীয় কর্মী সমাবেশে ভাষণদানকালে মশিউর রহমান ফ্রন্টে যোগদান এবং প্রেসিডেন্টের বিমানবন্দরে বক্তব্য সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন ফ্রন্ট গঠিত হলে মশিউর রহমানের নেতৃত্বাধীন ন্যাপ ফ্রন্টের অন্যতম শরিক হবে। যেহেতু আগামীদিন এই ফ্রন্ট বাংলাদেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে, সে কারণেই এই সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারে মশিউর রহমান ফ্রন্টের কাঠামো সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেননি, ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যেহেতু প্রেসিডেন্ট এখনো কোনো ঘোষণা দেননি, তাই তিনি কিছু আগাম বলতে চান না। এতে আলোচনা ব্যাহত হতে পারে। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকারের সম্ভাবনা মশিউর রহমান পুরোপুরি উড়িয়ে দেননি কিন্তু তাঁর নিজের অংশগ্রহণের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি একদিকে আলোচনার মাধ্যমে গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া শুরু করার পক্ষপাতী অন্যদিকে নির্বাচিত না হয়ে সরকারে অংশগ্রহণে রাজি নন। নিম্নোক্ত সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয় ১৪ এপ্রিল '৭৮। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন-মাহফুজুল্লাহ/চিন্ময় মুৎসুদ্দী/ চন্দন সরকার।

প্রঃ বিগত বছরগুলোতে আমাদের দেশে বহুবার সরকার ও রাজনীতির পরিবর্তন হয়েছে এমনকি নতুন রাষ্ট্র কাঠামোর অভ্যুদয় ঘটেছে। অথচ জনগণের জীবনে কোন মৌলিক পরিবর্তন আসেনি। কেন?

www.pathagar.com

উঃ এদেশে জনগণের মূল অংশ কৃষক-শ্রমিক। অথচ তাদের ইচ্ছায় এদেশে কেউ ক্ষমতায় আসেনি। '৭২ সালে যাঁরা জনগণের প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁদের ক্ষমতায় আরোহণেও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ছিল না। জনগণ সব সময় পরিবর্তন চেয়েছেন কিন্তু কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হয়নি।

প্রঃ ভাসানী ন্যাপের নেতা ও কর্মীদের 'জাগদলে' যোগদান সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উঃ ভাসানী ন্যাপের কোনো কর্মী জাগদলে যোগ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। কয়েকজন নেতাই কেবল যোগ দিয়েছেন। আমার মনে হয়, এই নেতারা ভাসানী ন্যাপে টায়ার্ড হয়ে পড়েছেন তাই কিছুটা হাওয়া বদলের ইচ্ছায় জাগদলে গেছেন।

শর্তাধীনে প্রেসিডেন্ট জিয়ার নেতৃত্ব মেনে নেবো, নইলে আমার দলের চাইতে জাগদলের ম্যানিফেস্টো বেশি প্রগ্রেসিভ বা বেশি ডেমোক্রেটিক নয়। তাছাড়া তারা জাগদলে বর্তমান পদের চাইতে ভালো কোনো পদও পাননি।

প্রঃ জনগণের সঙ্গে প্রস্তাবিত ফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে আলোচনা কতদূর অগ্রসর হয়েছে?

উঃ মূলত জাগদলের সঙ্গে কোনো ফ্রন্ট আমরা করতে চাই না। আমি জাগদলকে রাজনৈতিক দল মনে করি না। ফ্রন্ট হবে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। তিনটি কারণে আমরা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফ্রন্ট করতে রাজি হয়েছি।

ক. প্রেসিডেন্ট দেশের সেনাবাহিনীর প্রধান। সেনাবাহিনীর মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা রয়েছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

খ. প্রেসিডেন্ট দেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। সামরিক আইনসংক্রান্ত সকল ক্ষমতা তাঁর।

গ. প্রেসিডেন্ট দেশের সরকারপ্রধান। তিনি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়ও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ শর্তগুলো পূরণ করলেই আমি প্রেসিডেন্ট জিয়ার নেতৃত্ব মেনে নেব।

প্রঃ প্রস্তাবিত ফ্রন্টবিরোধীদের আপনি কি মনে করেন?

উঃ ফ্রন্টবিরোধীরা জাতীয় শত্রু। তারাই ঐক্যের রাজনীতির বিরোধিতা করছে। এ ..নের লোক জাগদলেও আছে।

প্রঃ জাগদলে মূলত কারা যোগদান করছে?

উঃ সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব দিয়ে আমি প্রমাণ করে দিতে পারি মফস্বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জাগদলে পুরনো বাকশালীরা যোগ দিয়েছে। হিসাব করলে দেখা যাবে ৭০ শতাংশই হবে বাকশালী।

প্রঃ ১৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে আপনার পার্টির সাধারণ সম্পাদক এসএ বারী এটি অভিযোগ করেছেন, 'জাগদলে' যোগ দেয়ার জন্য আপনার দলের কর্মীদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

উঃ হ্যাঁ, চাপ দেয়া হচ্ছে। শুধু আমার দলের কর্মীদের ওপর নয়, অন্যান্য দলের কর্মীদেরও চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে। অনেকটা আওয়ামী লীগ কায়দায়। জাগদলে যোগদান করার জন্য প্রশাসনের মাধ্যমে ফেভার ডিস্ট্রিবিউশনের কথাও আমি শুনেছি।

প্রঃ প্রস্তাবিত ফ্রন্টে কোন কোন দলকে নেয়ার জন্য আপনি পক্ষপাতী?

উঃ যারা জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক তাদের সবাইকে নেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

প্রঃ কোন দল জাতীয়তাবাদী এবং গণতন্ত্রিক তা কিভাবে ঠিক করা হবে বা এর মাপকাঠিই বা কি?

উঃ প্রত্যেক দলেই স্ব স্ব ম্যানিফেস্টো রয়েছে। ম্যানিফেস্টো আলোচনা করলেই বোঝা যাবে কে জাতীয়তাবাদী আর কে গণতান্ত্রিক।

প্রঃ জাসদ, আওয়ামী লীগ এবং ডেমোক্রেটিক লীগ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উঃ পিপিআর অনুযায়ী জাসদ তো কোনো দল নয়, আর আওয়ামী লীগকে আমি জাতীয়তাবাদী বা গণতান্ত্রিক মনে করি না। কারণ আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় বিপ্লবে বিশ্বাসী। এর মানে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর সে পক্ষপাতী। ৪র্থ সংশোধনীতে জনগণের সকল মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছিল। কাজেই সে গণতান্ত্রিক দল হতে পারে না। এখন রং পাল্টিয়েছে মাত্র। আসলে এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নয়, সার্বিক অর্থে 'বাকশাল' বলাই শ্রেয়। মার্কসের কথায় 'একজন ব্যক্তি বদলাতে পারেন তাঁর শ্রেণী, চরিত্র বদলায় না।' শ্রেণী স্বার্থের আলোকে একদিন না একদিন তারা পুনরায় আগের চেহারাই নেবে।

প্রঃ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি এবং পার্লামেন্টারী পদ্ধতি নিয়ে বর্তমানে একটি রাজনৈতিক বিতর্ক রয়েছে আপনি কোন ধরনের সরকারের পক্ষপাতী?

উঃ আমি প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি বা পার্লামেন্টারী পদ্ধতির মানে বুঝি না। আমি বুঝি যে লোক পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রধান রাষ্ট্রীয় নির্বাহী হিসেবে নির্বাচিত হবেন তিনি যেই হোন না কেন তিনিই রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হবেন। সভরেইনটি অব পার্লামেন্টের প্রশ্নে অমিল হলে ফ্রন্টে থাকবো না আমরা। ফ্রন্টে আমাদের তিন দফা গৃহীত হতে হবে। তিন দফা বাদে কোনো ফ্রন্টে আমরা নাই। তিন দফার বাইরে অর্থনৈতিক কর্মসূচিও থাকবে তবে এ মুহূর্তে আমি কিছু বলবো না। প্রেসিডেন্টের তরফ থেকেই সেটা আসা উচিত।

প্রঃ আপনার তিনদফা ছাড়া কি অন্য কোনো দফা নেই?

উঃ আমার এই তিন দফার সঙ্গে মিল থাকলে আছি নতুবা নেই। তিন দফাকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পরে আরো অন্যান্য দফাও যুক্ত হতে পারে। অর্থনৈতিক দফাও থাকতে হবে। এ ব্যাপারেও কিছু বলছি না। কারণ আলোচনা চলছে।

প্রঃ গাজী শহীদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ফ্রন্টে যোগদান করলে আপনি কি করবেন?

উঃ ন্যাপ (গাজী-নাসের) নামে কোন দলকে সরকার পিপিআর অনুযায়ী অনুমোদন দিয়েছে বলে আমার জানা নেই। পিপিআর অনুযায়ী ফ্রন্টে তাঁরা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে সবাই আসতে পারে। এতে আমার আপত্তি নেই। তাছাড়া সংবাদপত্রের পাতা ভিন্ন অন্য কোথাও কি এ সংগঠনের অস্তিত্ব আছে?

প্রঃ প্রেসিডেন্ট কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদান করবেন বলে কি মনে করেন?

উঃ জাগদল যাঁরা গঠন করেছেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করুন প্রেসিডেন্ট কোন দলে যোগদান করবেন।

প্রঃ সবাই মিলে যদি ফ্রন্ট গঠন করেন তাহলে কি দেশে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হবে না?

উঃ ফ্রন্ট সচেতন থাকলে ফ্রন্ট সরকারই হবে সর্বশেষ সরকার যা রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণে সক্ষম হবে। অন্যথায় আর এক বাকশালের পুনরুত্থান ঘটবে।

প্রঃ ফ্রন্ট গঠিত না হলে আপনি কি করবেন?

উঃ ফ্রন্ট গঠিত না হলে তিন দফার ভিত্তিতে জনগণের কাছে যাবো। নীতিটাই হচ্ছে 'হয় আলোচনার মাধ্যমে নতুবা সংগ্রামের মাধ্যমে।' তবে আমি আলোচনার ওপর জোর

www.pathagar.com

দেই। কারণ সংগ্রামের মাধ্যমে তৃতীয় শক্তির উদ্ভব হতে পারে। আমি মনে করি এ মুহূর্তে আলোচনার মাধ্যমে গণতন্ত্র উত্তরণের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

প্রঃ প্রেসিডেন্ট জিয়া ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উঃ এ উনিশ দফা যে কোন একটি গণতান্ত্রিক দলের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। ১৯ দফা সম্পর্কে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে প্রশ্ন এ কর্মসূচি কখন, কিভাবে এবং কতটুকু বাস্তবায়িত করা হবে-কথা সেটাই। এ ব্যাপারে আলোচনা চলছে। এখনই কোনো কিছু বলতে চাই না।

ফ্রন্টের কর্মসূচিতে ১৯ দফা থাকলে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চাকরি জনগণকে দেয়া হবে কিন্তু সেটা কিভাবে দেয়া হবে, কতদূর দেয়া হবে সেটাই বড় কথা। সে ব্যাপারে আমাদের আলোচনা করা দরকার।

প্রঃ সরকার বলেছেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন দেবেন। এই নির্বাচন মধ্যবর্তী সময়ের জন্য আপনি কোন অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠনের পক্ষপাতী?

উঃ নির্বাচনী-মধ্যবর্তী সময়ে আমি কোনো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আমার পক্ষ থেকে চাই না। অবশ্য অন্য কেউ কেউ বলছে ফ্রন্ট করতে হলে ফ্রন্টের শরিক দলগুলোর একটা সরকার প্রয়োজন। সরকার চাইলে তা করতে পারেন। আমার এতেও কোনো আপত্তি নেই। তবে আমি নির্বাচিত হয়েই সরকারে যাবো। নির্বাচিত না হয়ে আমি সরকারে যোগদানের পক্ষপাতী নই।

প্রঃ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে নির্বাচন করলে আপনি কি তা মেনে নেবেন?

উঃ সরকার থাকলেই যে নির্বাচনে কারচুপি হবে এরকম কথা অন্তত এ যুগে শুনিনি। নির্বাচনের আগে কোথাও ক্ষমতাসীন সরকার পদত্যাগ করেছে বলেও আমার জানা নেই। যে দেশে নির্বাচনকে মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকার পদত্যাগ করেননি সেখানে কি কোনো কারচুপি হয়েছে? ভারত, ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স সর্বত্রই ক্ষমতাসীন সরকার ক্ষমতায় থেকেই নির্বাচন করে। আসলে নির্বাচন পরিচালনা করে নির্বাচন কমিশন যা সরকার থেকে ভিন্ন। সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনই নিশ্চয়তা দেয় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের।

প্রঃ অন্তর্বর্তীকালীন দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উঃ আসলে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা আমলাদের দ্বারা করানো উচিত হয়নি। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রত্যেকের সঙ্গেই আলোচনা করে তা প্রণয়ন করা উচিত ছিল।

প্রঃ আমাদের পরিকল্পনায় দেখা যায় প্রায় ৭৫ শতাংশ নির্ভর করছে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর। এতে করে কি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুণ্ন হবে না?

উঃ বাংলাদেশের গাড়ির চাকা আটকে গেছে। সে চাকা চালাতে হবে। কাজেই স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য বৈদেশিক সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন। আজও আমাদের বার্ষিক ঘাটতির পরিমাণ হচ্ছে ৮০০ থেকে ১০০০ কোটি টাকা। স্বনির্ভর হতে হলে পরনির্ভর হতে হবে। তবে তা নির্ভর করে সমাজব্যবস্থার ওপর। আজকাল পৃথিবীতে খুব কম দেশই আছে, যারা অন্য দেশের ঋণ ছাড়া চলতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ঋণের বোঝা কতখানি হবে। আমাদের অবশ্যই বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে হবে।

www.pathagar.com

প্রঃ বন্ধন এবং বন্ধনহীন সাহায্য বলে একটা কথা প্রচলিত রয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

উঃ বন্ধন বা বন্ধনহীন বলে কোনো কথা নেই। আসলে কথাটি হবে শর্তহীন বা শর্তাধীন। শর্তাধীন ঋণ অবশ্যই কাম্য নয়। সরকার এ পর্যন্ত যে ঋণ গ্রহণ করেছেন, সে সম্পর্কে আমাদের বলেছেন, এর কোনোটাই শর্তাধীন নয়।

প্রঃ বাংলাদেশের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উঃ স্বাধীনতার পর যেটা 'নতজানু পররাষ্ট্রনীতি' ছিল বর্তমানে সেই নতজানু পররাষ্ট্রনীতি-পরিস্থিতি আর নেই। আগে যেটা ছিল একশিলা অর্থাৎ একদিকে মোড় নেয়া পররাষ্ট্রনীতি, বর্তমানে তার বদলে পঞ্চশিলা নীতি মেনে চলা হচ্ছে।

প্রঃ তবে কি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সর্বাত্মক সফল?

উঃ সর্বাত্মক সফল একথা এখনও বলব না। কারণ স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলোতে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করতে সময় লাগবে। এত সহজে তা সম্ভব হয়। তবে বর্তমানে একটা সঠিক লক্ষ্যে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে।

প্রঃ উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে একটা পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন– শ্রীলংকা, ভারত এবং পাকিস্তানের ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে। উপমহাদেশ নতুন প্রভাব বলয়ে প্রবেশ করছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে এর কি কোন প্রভাব পড়েছে?

উঃ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে পুরোটাই যে স্রোতের সঙ্গে গা এলিয়ে দিয়েছে তা নয়। বাংলাদেশ তার নিজের ক্ষেত্রে স্বকীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কতদিন এবং কতটা পারবে সেটাই কথা।

প্রঃ আপনার দল ক্ষমতায় গেলে ভারতের সঙ্গে অতীতে যেসব অসম চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে (সীমানা নির্ধারণসহ) সেগুলো সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করবেন?

উঃ চুক্তিসমূহ যদি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে থাকে তবে অবশ্যই তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা হবে।

প্রঃ আফ্রিকার শৃঙ্গে এবং দুই মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উঃ আফ্রিকার শৃঙ্গে অনেকদিন আগে থেকেই দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সাল থেকেই আফ্রিকার স্বাধীনতার শুরু। কিন্তু এসব দেশে কখনই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিকাশ লাভ করেনি। সরকার পরিবর্তন ঘটেছে বারবার। কিন্তু জনগণের ইচ্ছেমত হয়নি। আর এই ছিদ্রপথেই পরাশক্তিসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটে। এ দ্বন্দ্ব আজো আছে। মধ্যপ্রাচ্যে একসময় বৃটেনের প্রভাব ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অন্য একটি পরাশক্তির চাপে বৃটেন পাততাড়ি গুটাতে রাজি হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় ইসরাইল। একে জিইয়ে রেখেই পরাশক্তিদ্বয় এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে এবং দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে একটি শান্তির প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। মনে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করছে।

প্রঃ বর্তমানে জনগণের সঙ্গে আমলাতন্ত্রের যে বিরোধ রয়েছে তার সমাধানের পথ কি?

উঃ জনগণের অধিকারকে যদি কেউ জোর করে কেড়ে নেয় তখনই দেখা দেয় বিরোধ। জনগণ যদি ক্ষমতার উৎস হয় তবে এ বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ

www.pathagar.com

আমলারা জনগণেরই সেবক। বর্তমান আমলারা আপারহ্যান্ড পেয়েছে। কারণ যারা ক্ষমতায় রয়েছে তারাই এদের কাছে যায়। আমলাদের পরামর্শ এদের কাছ থেকে অনেক সময় প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়।

প্রঃ আপনার দল ক্ষমতায় গেলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে কি নীতিমালা গ্রহণ করবেন?

উঃ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অবশ্যই থাকবে। তবে তাদেরকে এথিকস মানতে হবে। 'হলুদ সাংবাদিকতা'র প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। এর জন্য ল' অব কন্ডাক্ট বা এথিকস প্রণয়ন করা হবে। কারণ হলুদ সাংবাদিকতা গণতন্ত্র ধ্বংস করছে। এদেশে এরা হুমকি দেয়, অন্যায় করে তাই এদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

প্রঃ বর্তমানে প্রচলিত শ্রমনীতি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উঃ শ্রম আইনে আইএলও কনভেনশকে সার্বিক অমান্য করা হয়েছে। যে দেশে আইএলও কনভেনশন চালু নেই, সেই দেশে শ্রম আইন নিয়ে বলার কিছু নেই। বিস্ত তভাবে আলোচনা করার পূর্বে আমাকে আমার শ্রম সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

প্রঃ বর্তমান সরকারের স্বনির্ভর প্রকল্পগুলো সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উঃ আমি নিজে এ প্রকল্পগুলো দেখিনি। তবে স্বনির্ভরতার নীতিমালা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রঃ আপনার মতে ন্যাপ কোন শ্রেণীর রাজনৈতিক দল?

উঃ ন্যাপকে (ভাসানী) গণতান্ত্রিক বা জাতীয়তাবাদী এবং মেহনতি জনগণের দল বলতে পারেন। যেহেতু এদেশে কোনো শ্রেণীবিন্যাস হয়নি কাজেই শ্রেণীর দল বলা যায় না। তবে প্রগতিশীল অর্থনীতিতে ন্যাপ বিশ্বাসী।

প্রঃ আপনি কি মনে করেন, আজকের বিশ্বে আমাদের মত দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তি সত্যিকার অর্থে আধিপত্যবাদের মোকাবিলা করতে পারে।

উঃ তৃতীয় বিশ্বে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক দল ছাড়া আর কেউ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে বলে আমার জানা নেই।

প্রঃ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সমস্যা সম্পর্কে আপনার অভিমত?

উঃ আমি মনে করি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অধিকার থাকা দরকার। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ভিন্ন। তারা আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১১

আওয়ামী নেতা রাজ্জাক-তোফায়েলের বাকবিতণ্ডা

১৯৯৬ সালে আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি এবং শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি একটি বই প্রকাশনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্তের জন্য বর্তমান পানি সম্পদমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমদকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক।' তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন, 'ওই দু'জন এখনো জীবিত রয়েছেন, তাছাড়া ওই রাতে আরো যারা দায়িত্বে ছিলেন যেমন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল (অবঃ) শফিউল্লাহ, কর্নেল শাফায়েত জামিলকেও জিজ্ঞাসাবাদ করলে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে। কারণ ওই রাতে এদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর টেলিফোনে কথা হয়েছে। কি কথা হয়েছে তা জানতে পারলে মুজিব হত্যার রহস্য উদঘাটিত হবে।' তিনি এই ফাঁকে আরো বলেন, 'যারা বঙ্গবন্ধুর আশেপাশে ছিলেন তারাই ছিল মূলত হত্যা, ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়ক।' *(সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল, ২৯ নভেম্বর, ১৯৯৬)*

১৯৭৫ সালের ৬ জুন জারিকৃত এক ফরমানবলে ১১৫ জনের যে বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়, সে কমিটির অন্যতম সেক্রেটারী ছিলেন আব্দুর রাজ্জাক। ১৫ সদস্যের যে কার্যকরী সংসদ গঠন করা হয়, সে সংসদেও আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন অন্যতম সেক্রেটারী। তারপর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা সব ওলট-পালট করে দেয়।

১৯৮১ সালে ভারত থেকে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় শেখ মুজিবের সর্বশেষ সৃষ্টি কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগকে (বাকশাল) হাসিনা পুণর্জ্জীবিত না করে শুধু ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্ব পরিচালিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নিয়ে তিনি রাজনীতি করতে থাকেন। এ সময় মহিউদ্দিন আহমদ ও আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের কার্যক্রম প্রায় তুঙ্গে। কিছু দিন এলোমোলোভাবে আওয়ামী লীগ (হাসিনা) ও আওয়ামী লীগ (রাজ্জাক) কার্যক্রম চলার পর নেতা-কর্মীদের মধ্যে প্রশ্ন উঠলো কোন সংগঠন থাকবে। শেখ হাসিনা বললেন শুধু আওয়ামী লীগ (হাসিনা) থাকবে। আওয়ামী লীগ (হাসিনা) কার্যক্রম জোরালোভাবে শুরু হলো, আওয়ামী লীগ (রাজ্জাক)ও ময়দানে সক্রিয় হলো। এই দুই দলে সংঘাত শুরু হলো। সেসময়ের পত্রপত্রিকা থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে।

Awami League General Secretary Abdur Razzaque Subnaitted his resignation from the post Sunday night. (16/1/83 New Nation).

আব্দুর রাজ্জাক এবং তার সহযোগীদের কেউই গতকাল সোমবার আওয়ামী লীগ (হাসিনা) অফিসে আসেননি। *(সূত্রঃ দৈনিক দেশ, ১৩ জুন, ১৯৮৩)*

দলীয় আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, গঠনতন্ত্র নিয়মাবলী ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপে অংশগ্রহণের জন্য আওয়ামী লীগের (হাসিনা) প্রেসিডিয়াম সদস্য মালেক উকিল ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকসহ ৬ জন নেতাকে সাময়িকভাবে সাসপেন্ড করা হয়। *(সূত্রঃ দৈনিক বাংলা, ৩ আগস্ট, ১৯৮৩)*

www.pathagar.com

রাজ্জাকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পাল্টা সভা। ডঃ কামাল, তোফায়েল, জোহরাসহ ৯ নেতা সাসপেন্ড। *(সূত্রঃ দৈনিক বাংলা, ৪ আগস্ট, ১৯৮৩)*

আওয়ামী লীগ রাজ্জাক গ্রুপের পক্ষ থেকে ডঃ কামাল, মান্নান, তোফায়েলের বিরুদ্ধে মুজিব হত্যার নীল নকশায় জড়িত থাকার এবং ১৯৮২ সালে আঁতাতের মাধ্যমে সামরিক আইন জারির পর নতুন শক্তি সঞ্চয় করে দলকে চরম আঘাত হানার অভিযোগ করা হয়। *(সূত্রঃ দৈনিক দেশ, ২৪ আগস্ট, ১৯৮৩)*

মালিবাগে এক কর্মীসভায় জনাব আব্দুর রাজ্জাক বলেন, তিনি (শেখ হাসিনা) বুঝলেন না, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারী কামাল-তোফায়েলরা তাকে দিয়ে দল ভাঙ্গালো-তাকে দোষী করে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করালো। ইতিহাস বিচার করবে। জানি শেখ হাসিনা শুনবেন না। তিনি কানে তুলা দিয়েছেন, চোখে চশমা লাগিয়েছেন। আমি অনেক আশা করে তাকে সভানেত্রী করে দেশে এনেছিলাম। তিনি আমার কথা শোনেননি। *(সূত্রঃ দৈনিক বাংলা, ২৭ আগস্ট, ১৯৮৩)*

সংবাদ সম্মেলনে ৭ দফা কর্মসূচি ঘোষণাকালে জনাব আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বাকশাল হইতে সরি নাই, তবে বহু দল মানা ছাড়া গত্যন্তর নাই। *(সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩)।*

আওয়ামী লীগের রাজ্জাক গ্রুপের কার্যনির্বাহী সংসদের ৪ দিনব্যাপী সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ডঃ কামাল হোসেন, জনাব আব্দুল মান্নান ও তোফায়েল আহমদকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের প্রবক্তা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। *(সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩)।*

Sheikh Selim, Editor of Banglar Bani and Former Al (Hasina) Jatiya Sangsad member, yesterday accused Mr. Abdur Razzaque General secretary of Al (Razzak) of involvement in the killing of Sheikh Muhibur Rahman. Addressing as chief guest at the annual conference of Narayangong District chatra league at the municipal Auditorium on 24/9/1983 afternoon (New nation),

১২ অক্টোবর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (রাজ্জাক) দলের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নাম রাখা হয়েছে। চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন আহমদ এবং সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আব্দুর রাজ্জাক নির্বাচিত হন। *(সূত্রঃ দৈনিক সংবাদ, ১৩ অক্টোবর, ১৯৮৩)*

এরপর থেকে শুরু হয় আওয়ামী লীগ ও বাকশালের নেতাদের তীব্র বাক-বিতণ্ডা। বাকশালের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক এক সাক্ষাতে বলেন, 'চারটি প্রধান কারণে আমরা আগস্ট ঘটনাবলী প্রতিরোধে ব্যর্থ হই।

প্রথমত, ক্ষমতায় তখন আমরাই। সময়টা ছিল আওয়ামী লীগ থেকে বাকশালে রূপান্তরের। ওই প্রক্রিয়া শেষে হলেও অবস্থাটা ছিল নতুন এবং খানিকটা অগোছালো। রাজনীতির ভাষায় যাকে বলে ফ্লুইট সিচুয়েশন। তাই আঘাতের জবাব দেয়া সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয়ত, বঙ্গবন্ধু ছিলেন আমাদের প্রেরণা-সোর্স অব অল পাওয়ার। তিনি নেই ঐকথাটি আমাদের হতবিহ্বল করে দেয়। তার মৃত্যু সংবাদ কর্মীদের বুঝে উঠতে সময় যায় পেরিয়ে। ফলে মাঠ থেকে উঠে প্রতিবাদের ধরন হয়ে পড়ে ইতস্তত বিচ্ছিন্ন।

www.pathagar.com

তৃতীয়ত, খুনীর মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দই যোগ দিলেন। ষড়যন্ত্রের জাল ছিল অনেক গভীরে। এতে সৃষ্টি হয় গভীর হতাশার। প্রতিবাদের সম্ভাবনাটুকু তিরোহিত হয়।

চতুর্থ, বঙ্গবন্ধু রক্ষীবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তোফায়েল আহমদকে। কেন তিনি দায়িত্ব পালন করলেন না, তোফায়েলই কেবল এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন।

জনাব রাজ্জাক বলেন, ঐ চারটি কারণের কোনটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়।

জনাব রাজ্জাক তার ভাষায় বলেন, ১৫ আগস্ট ভোর সাড়ে ৪টা কিংবা পৌনে ৫টায় টেলিফোন পেলাম তোফায়েলের। ও বললো, বঙ্গবন্ধু ও শেখ মনির বাসায় হামলা হয়েছে। তোফায়েলকে বললাম রক্ষীবাহিনী মুভ করাতে। আর তখুনি ফোন করলাম তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলীর কাছে। মনসুর আলী বললেন, তিনি পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবছেন। ফোন করি প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ নূরুল ইসলাম চৌধুরী, সেনাবাহিনী প্রধান শফিউল্লাহ ও উপ-প্রধান জিয়াউর রহমানের বাসায়। শফিউল্লাহ বললেন, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি খোঁজ-খবর নিতে। কিন্তু কিছুই হল না। সকাল ৭ টা বেজে গেল। ততক্ষণে শুরু হয়ে যায় নেতাদের বাড়ি বাড়ি তল্লাশি, ধরপাকড়। *(সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয় ১২ আগস্ট এবং দৈনিক দেশ-এ প্রকাশিত হয়, ১৫ আগস্ট, ১৯৮৫)*

তোফায়েল আহমদের পাল্টা জবাব ঃ
আমি রক্ষীবাহিনীর কোন
দায়িত্বে ছিলাম না ঃ তোফায়েল

আমি রক্ষীবাহিনীর কোন দায়-দায়িত্বেই ছিলাম না ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান রক্ষীবাহিনীর প্রধান ছিলেন এবং রাষ্ট্রপতির একজন যুগ্ম সচিব রক্ষীবাহিনী দেখাশোনা করতেন। আওয়ামী লীগ (হাসিনা) সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমদ সম্পর্কে বাকশাল সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক গত ১৪ আগস্ট যে বক্তব্য দিয়েছেন, তারই প্রতিবাদ জানিয়ে তোফায়েল আহমেদ উপরিউক্ত বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি আরো উল্লেখ করেন, আমি প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব এবং পরে রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী ছিলাম।

জনাব তোফায়েল বলেন, ১৫ আগস্ট ভোর রাতে বঙ্গবন্ধু ও মনি ভাই-এর বাসা আক্রান্ত হবার খবর শুনে আমি রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে ফোন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেই। সেদিন আমি রক্ষীবাহিনীর কোন দায়িত্বে না থাকলেও রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী এবং বঙ্গবন্ধুর একজন কর্মী হিসেবেই এই নির্দেশ দেই।

শুধু তাই নয়, আমি জনাব রাজ্জাকের বাসায়ও ফোন করি। তাকে দলীয় কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করার কথা বলি। তখন তিনি বাকশালের অন্যতম আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ছিলেন। ইতিমধ্যে আমি সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহসহ সংশ্লিষ্ট অনেককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলি। এর কিছুক্ষণ পর জনাব রাজ্জাককে ফোন করে বাসায় পাইনি। একথা সবাই জানে রাজ্জাক ভাই বাসা থেকে বেরিয়ে নদীর ওপারে কেরানীগঞ্জে অবস্থান করেন। পরে ঢাকায় এসে গ্রেফতার হন। গ্রেফতার অবস্থায় পুলিশ কন্ট্রোল রুমে রাজ্জাক সাহেবের সামনে আমাকে কি কারণে বারবার শারীরিক নির্যাতন করা হয় তা তার অজানা নয়। *(দৈনিক দেশ, ১৬ আগস্ট, ১৯৮৫)*

www.pathagar.com

বাকশাল নেতা রাজ্জাকের পাল্টা বিবৃতিঃ
তোফায়েল রক্ষীবাহিনীর দায়িত্বে
ছিলেন-এটা ঐতিহাসিক সত্য

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাকশাল ঘোষণার দিনই আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বিলুপ্ত হয়। কাজেই সে বছর ১৫ আগস্ট আমি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ছিলাম, আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদের এই অভিযোগ সত্যের অপলাপ মাত্র।

বিবৃতিতে জনাব রাজ্জাক পুনরায় দাবি করেন যে, জনাব তোফায়েল প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব ও পরে রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী হিসেবে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সমন্বয়কারী ছিলেন-এটা ঐতিহাসিক সত্য। ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ ভোরে জনাব তোফায়েলকে রক্ষীবাহিনীর শেরে বাংলা নগরস্থ হেডকোয়ার্টারে কেন নেয়া হয় এবং কেনইবা রক্ষীবাহিনী পাল্টা আঘাত হানতে ব্যর্থ হয় সে কথা তিনি (তোফায়েল) এবং রক্ষীবাহিনীর তৎকালীন কর্মকর্তারাই ভাল বলতে পারবেন। *(দৈনিক দেশ, ১৭ আগস্ট, ১৯৮৫)*

বাকশাল নেতার বক্তব্যের প্রতিবাদে তোফায়েলঃ
১৫ আগস্ট রাজ্জাক প্রতিরোধের
প্রয়োজনবোধ করেননি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমদ পুনরায় এক বিবৃতিতে বাকশাল সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন।

জনাব তোফায়েল বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যার পর থেকে ক্ষমতা দখলের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তার অবসানকল্পে আমরা যে মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করছি, সে সময়ে ১০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে রাজ্জাক সাহেবদের কাছে প্রকৃত খুনীরা আক্রমণের বিষয়বস্তু না হয়ে আমি কেন আক্রমণের বিষয়বস্তু হয়ে উঠলাম, সচেতন দেশবাসীর নিকট এ প্রশ্নটি দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক।

তিনি বলেন, আব্দুর রাজ্জাক সাহেব নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, জাতীয় রক্ষীবাহিনী ছিল প্যারা মিলিশিয়া ফোর্স। সেহেতু ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান এ বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান ছিলেন মেজর হাসান।

ওই সময় জনাব আব্দুর রাজ্জাক দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বলে উল্লেখ করে তোফায়েল আহমদ বলেন, রাজ্জাক সাহেব নিজেই প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজন বোধ করেননি।

বইয়ের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে জনাব তোফায়েল আহমদ বলেন, পরেশ সাহার লিখিত বঙ্গবন্ধু হত্যার তদন্ত বইতে রাজ্জাক সাহেবের বিরুদ্ধে যা বলা হয়েছে, তাকে কি তিনি সত্য বলে মেনে নেবেন। যদি তা না হয় তাহলে আশা করি দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে রাজ্জাক সাহেবদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। *(দৈনিক দেশ, ১৮ আগস্ট, ১৯৮৫)*

----

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জন্ম সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জের চন্দরপুর গ্রামে নানার বাড়িতে। পৈত্রিক নিবাস গোয়াইনঘাট উপজেলার দেয়ারগ্রামে। পিতা শামসুর রহমান ইরানে অবস্থানকালে ১৯৭৮ সালে পরলোকগমন করেন। মা হেনা বেগম, বড় ভাই লন্ডন প্রবাসী সূফী সুহেল আহমদ, মেজো ভাই ছায়েদ আহমদ জুয়েল, বড় বোন ডা. সুমা রহমান এই নিয়েই তাঁর পারিবারিক জগত।

১৯৯৭ সালে দৈনিক দিনকালের রাজনীতি পাতায় নিবন্ধ লেখার মধ্য দিয়ে লেখক জীবনের সূচনা। এরপর দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক জনতা, দৈনিক ইনকিলাব, সাপ্তাহিক অগ্রযাত্রা, সাপ্তাহিক জনতার ডাক, দৈনিক সিলেটের ডাক, দৈনিক শ্যামল সিলেটসহ বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিকে নিয়মিত লেখালেখি করছেন। লেখালেখি ছাড়াও সমাজকল্যালমূলক কাজে জিবলু রহমান সক্রিয়ভাবে জড়িত। তিনি 'শামসুর রহমান ফাউন্ডেশন' নামের একটি শিক্ষা উন্নয়ন সংগঠনের সদস্য-সচিব। 'শামসুর রহমান ফাউন্ডেশন' প্রতি বছর সিলেট সদর উপজেলার ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান এবং গোয়াইনঘাটে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহায্য প্রদান করে আসছে।

জিবলু রহমান 'শামসুর রহমান ফাউন্ডেশনের' কার্যক্রমকে শিক্ষা উন্নয়নের একটি মডেলে উন্নীত করতে চান, যাতে দেশের অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরাও এটা অনুসরণ করে নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষা-উন্নয়নে ফলদায়ক অবদান রাখতে পারেন।

জিবলু রহমান কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ (সিলেট), সিলেট মোবাইল পাঠাগার (সিলেট), রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি (সিলেট)-এর আজীবন সদস্য।

'জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক' তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। তাঁর প্রকাশিত আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে *'১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও মওলানা ভাসানী*। মওলানা ভাসানীর জীবন নিয়ে তথ্যবহুল দলিল-সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা তাঁর রয়েছে।

ISBN 984 - 8404 - 34 - 1

9 588321 010487